পঞ্চাশটি গল্প

অশোক বসু

যে-জীবন ছড়িয়ে আছে অন্তর্জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, সেই জীবনের বহুবর্ণী ঘটনাকে চিত্রায়িত করেছেন অশোক বসু তাঁর পঞ্চাশটি গল্পে। সব কাহিনিরই উপজীব্য মানুষের পাপ ও পতন, প্রেম ও প্রেমহীনতার একক প্রতীতি। সেই প্রতীতি অবশ্যই লেখকের নিজস্ব অনুভূতি এবং ব্যক্তিত্বের স্পর্শযুক্ত। সব গল্পই একটা বিশেষ আখ্যানের উপর দাঁড়িয়ে। স্কেচধর্মী বা শাস্ত্রবিরোধী কাহিনি লেখক লেখেননি। হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি থেকে উৎসারিত আখ্যানগুলি বাহুল্যবর্জিত এবং ঋজুগতিতে এগিয়ে গেছে পরিণামের দিকে। ন্যূনতম চরিত্রসংখ্যা এদের রসোত্তীর্ণ করেছে। রীতির দিক থেকে প্রাধান্য পেয়েছে প্রধানত ঘটনার ব্যাখ্যান। লেখক উত্তরবঙ্গে থাকেন। তাঁর গল্পে নগরকেন্দ্রিক আধুনিক জটিল-জীবনযাত্রার অনুপুঙ্খ ছবির পবিবর্তে মফস্সলের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই বেশি। গল্পের পরিসর কখনও অতিকথনে দীর্ঘায়িত হয়নি। এক একটি বাস্তব ঘটনাই তাঁর গল্পেব আখ্যানবস্তু এবং অবশ্যই তা বাহুল্যবর্জিত। তিনি বাস্তববাদী, কিন্তু কাহিনিকে বাস্তবধর্মী করতে শুধু জীবনের অন্ধকার আর হতাশার ছবি আঁকেননি। বহুদিন ধরে জীবনকে দেখেছেন এই প্রবীণ লেখক। জীবনও তাঁর গল্পে বহুভাবে উপস্থিত। সবার ওপরে আছে জীবনের প্রতি তাঁর ভালবাসা। যে-ভালবাসা দিয়ে সামান্যকেও সুষমামণ্ডিত করে অসামান্য করতে চেয়েছেন। মানুষের অন্তর্গত মানুষই তাঁর গল্পের বিষয়-আশয়।

... .

ISBN 81-7756-523-0

পঞ্চাশটি গল্প

অশোক বসু

মঞ্জরী
বুবাই
পাপানকে

সূচিপত্র

ক্ষতচিহ্ন. ১
একা দোক্কা খেলা. ৮
শববাহক. ১৬
এক গল্পের তিন দশক. ২৩
আহ্নিক গতি. ২৯
নিজের ছবি. ৩৩
এই প্রবাস. ৪২
খেলনা. ৫৩
রক্তাক্ত সম্পর্ক. ৫৯
লাল রঙের বল. ৬৭
ঈশ্বরের হাসি. ৭৬
মাননীয় জনগণ. ৮৩
হিমঘর. ৮৭
নিলয় না জানি. ৯১
নকল যুদ্ধ. ৯৯
অন্তর্ঘাত. ১০২
মৃত্যু সংবাদ. ১০৭
সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে. ১১২
সাদা দেয়াল কালো দাগ. ১২১
মনের ঘরে খুন. ১২৭
গোকুলবাবু ও জন্মান্তরবাদ. ১৩৩
শ্বাস প্রশ্বাস. ১৩৭
পিছু পিছু আসে সে. ১৪৮
ফসিল. ১৫২
ভূপতি, এই ভূপতি. ১৫৬
একসঙ্গে. ১৬৩
পাঁচ নম্বর ভুল. ১৬৮
চোরা নদী. ১৭২
কনকলতা. ১৭৬
রোমিও মজনু দেবদাস ও তারাপদ. ১৮০
পুনশ্চ. ১৮৭
সবুজ রঙের শাড়ি. ১৯০
সন্ধ্যার মেঘমালা. ১৯৪
ক্রান্তিকাল. ১৯৮

মাটির নীচে শেকড়. ২০৫
যে-ফোন সত্যি ছিল না. ২১১
ভাল থাকা খারাপ থাকা. ২৩৬
মাঝখানের দরজা. ২৪২
এষা. ২৪৬
বনমল্লিকা. .২৫৩
মনের মধ্যে মন. ২৫৮
অমৃতের পুত্র. ২৬২
আবর্তন. ২৬৭
অপত্য ২৭৩
নিশিগন্ধা. ২৭৮
মেঘবতী ২৮৬
ভাল মানুষ. .২৯৪
অতল জল ৩০২
তিমির ভলপুতুল ৩১১
শিস. ৩১৫

গল্প পরিচিতি ৩২৭

ক্ষতচিহ্ন

দেয়ালঘড়িতে ঢং করে শব্দ হল। পুরনো আমলের বিলিতি ঘড়ি। শব্দের গম্ভীর আমেজটুকু এখনও আছে।

তাঁর ঘরের বিছানার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন অবনীশ। ঘড়ির শব্দ তাঁর কানে বাজল। কপালে ছোট্ট ভাঁজ পড়ল। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একই ভাবে। এতক্ষণ যেন অর্থহীন কোনও খেয়ালে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কুয়াশাচ্ছন্ন কোনও জগতে। ঘড়ির শব্দটা যেন তাঁকে ফিরিয়ে আনল দৃশ্যমান পৃথিবীতে। কত সময় হল দেখতে তিনি ঘডির দিকে তাকালেন। বিকেল সাড়ে চারটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা বিজুকে নিয়ে আসবে।

ফুরিয়ে আসছে নভেম্বরের ছোট্ট দিন। বাইরে এখনও কিছু আলো থাকলেও ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে অন্ধকার জমছে। অবনীশ দরজাব দিকে তাকালেন। দরজায় ভারী পরদা ঝুলছে। যেন এখনই পরদাটা নড়ে উঠবে, কেউ এসে ঘরে ঢুকবে। অবনীশ দৃষ্টিটা সরিয়ে নিলেন। পবদার বাইরে সান্যালবাড়িটা কী ভীষণ নিস্তব্ধ এখন। কোনও ঘর থেকে কোনও কথা কিংবা কোনও শব্দ ভেসে আসছে না। অপরাহ্ন এখনও শেস হয়ে যায়নি, কিন্তু ছাইরঙা এই দোতলা বাড়িতে এখনই মধ্যরাত্রি নেমে এসেছে। ঠিক এই মুহূর্তে এই বাড়িতে এখন অনেক মানুষ, অথচ অবনীশের মনে হল, এক পরিত্যক্ত পুরীতে তিনি একা একা অপেক্ষা করছেন সেই বিশেষ সময়ের জন্যে যখন বিজুর মৃতদেহ ওরা নিয়ে আসবে।

এ বাড়িতে আজ শোক। এবং এই মুহূর্তগুলোতে যখন সেই শোক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে আছে, তখনও এ-বাড়ির কোনও ঘর থেকে শোকের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অবনীশেব ইচ্ছে এবং অভিরুচি এ বাড়ির শেষ কথা। তিনি দুঃখ শোক আনন্দ এইসব হৃদয়বৃত্তিগুলোকে পরিমিতির মধ্যে দেখতে চান বলেই যেমন সবসময়, তেমনি আজও, নীরবতাই এখন এ-বাড়ির সবচেয়ে বড় উচ্চারণ হয়ে আছে। একটু পরে বিজুকে যখন ওরা নিয়ে আসবে, তখনও সম্ভবত, বাইরে থেকে কাউকে বিশেষভাবে শোকাহত দেখা যাবে না।

খোলা জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে। অবনীশ এতক্ষণে খেয়াল করতে পারলেন অনেকক্ষণ ধরেই তাঁর একটু একটু শীত লাগছে। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিলে একটু আরাম পাবেন। এতক্ষণ তিনি একই ভাবে একই জায়গায় থেমে আছেন। আলনার কাছে গিয়ে চাদরটা তুলে নিলে একটু কাজের মধ্যে এসে যান। কিন্তু তিনি গেলেন না' প্রচণ্ড কাজের মানুষটার আজ কোনও কাজ নেই। কাজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন আজ।

অন্য যে-কোনও দিন ঠিক এ-সময়ে তিনি কোর্টেই থাকতেন। ডুবে থাকতেন অনেক কাজের মধ্যে। আদালতে সওয়াল করতেন, এ-সময়ে কেস না থাকলে বার লাইব্রেরিতে বসে নথিপত্র দেখতেন, মক্কেলদেব কথা শুনতেন। মুহুরি পরিতোষ দত্তও এখন খুব ব্যস্ত থাকত। ডায়েরিতে তারিখ লিখত, জরুরি কাগজপত্র ঠিকঠাক করে রাখত। অবনীশের বাড়িতে ফিরতে ফিরতে এক একদিন সন্ধে পার হয়ে যেত। কিন্তু আজ তিনি কোর্টেই যাননি, নিজের ঘর থেকেও একবারও নামেননি। পরিতোষ দত্ত দুপুরে একবার এসেছিল, অবশ্যই কোনও কাজে নয়। অবনীশের সামনে মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে গেছে। পরিতোষ দত্ত কোনও কথা বলেনি, কারণ সে জানে অবনীশ কাজের বাইরে বেশি কথা পছন্দ করেন না।

সত্যি সত্যিই আজ তাঁর কোনও কাজ নেই। সকাল থেকে দুপুর, তারপর বিকেল, এই দীর্ঘ সময় কখন গড়িয়ে গেছে, তাঁর কিছুই করবার নেই, শুধু এক বিশেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া। নিজেকে এমনি করে একা একা এর আগে কোনওদিন ধরে রাখতে পেরেছিলেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর মনে অনেক স্মৃতি, অনেক ভাবনা এলোমেলোভাবে যাযাবর মেঘের মতো ভেসে ভেসে এসেছে, আবার হারিয়ে গেছে। সবকিছুর মধ্যে বিজুর মুখটাই বারবার চলে আসছিল চোখের সামনে। কিন্তু ছেঁড়া কাগজের মতো টুকরো টুকরো ছবি। কিছুতেই অবিকল মুখটা মনে করতে পারছিলেন না তিনি। নাক মুখ চোখ কান কিছুই যেন একসঙ্গে সম্পূর্ণ হয়ে আসছিল না। টুকরো টুকরো আদলটাকে কিছুতেই জোড়া দিতে পারছিলেন না। ভারী অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। কেন এমন হচ্ছে? বিজুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই অনেক দিন, তবু বিজু তাঁর নিজের সন্তান। সেই শিশুকাল থেকে চোখের সামনে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে। অথচ সেই সন্তানের মুখটাই তাঁর মনে আসছিল না। কিছুটা মুখ, কিছুটা আভাস, ব্যস, এই পর্যন্তই।

অথচ মুখটা ভাবতে গিয়ে মুখের সেই ক্ষতচিহ্নটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ডান দিকের গালের নীচের দিক থেকে কান পর্যন্ত কাটা দাগ। দাগটা অনেক দিন আগেকার। ইদানীং খুব ভাল করে বোঝাও যেত না। অথচ আজ অন্য সবকিছু অস্পষ্ট করে দিয়ে, কুয়াশার মতো ঝাপসা করে দিয়ে, অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের মতো সেই দাগটা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। বিজু নয়, বিজুর মুখ নয়, বিজুর চলাফেরা কিছুই নয় শুধু সেই ক্ষতচিহ্ন।

জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছে নীচের এক ফালি রাস্তা। সান্যালবাড়ির পাশ থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত স্বল্প পরিসর গলি। হাসপাতালের মর্গ থেকে এই রাস্তায় ওরা আসবে। আসবার সময়ও হয়ে এল। বড় ছেলে অজু সেইরকমই কথা বলে গেছে। রাস্তাটার অনেক দূর পর্যন্ত চোখ গেল তাঁর। ফাঁকা রাস্তা। কেউ নেই। কেউ আসছে না। কিন্তু আসবে। কিছুক্ষণ পরেই আসবে। ওরা আসবে বিজুকে নিয়ে। তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন জানলার বাইরে থেকে। কী করবেন বুঝে পেলেন না। ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। কিছুই করার নেই। আর কিছুই করার নেই বলেই ফাঁকা পথে হাজারো চিন্তা এসে ঢুকছে।

তাঁর কপালের ভাজগুলো হিজিবিজি রেখার মতো জটিল হয়ে উঠল। জীবনের অনিবার্য গতিকে সংযত মনে মেনে নেবার মতো মানসিকতা তাঁর আছে। মৃত্যু তাঁর কাছে কোনও অতর্কিত ঘটনা নয়। চোখের সামনে কতজনকে বাইরের দরজার চৌকাঠ পার হতে দেখেছেন। নিজের স্ত্রীর মৃত্যুও তাঁকে বিচলিত করেনি। অথচ আজ যেন কোথায় ভুল হয়ে যাচ্ছে। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। কত দিন হয়ে গেল কিন্তু চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন সে দিনের ঘটনা। স্মৃতির কত ছবিই তো সময়ের ব্যবধানে ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু পনেরো বছর আগেকার সে দিনের ছবি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

হ্যাঁ, তিনিই আঘাত করেছিলেন। প্রচণ্ড রাগে মেরেছিলেন বিজুকে। তাঁর পকেট থেকে টাকা চুরি, কিংবা তাও নয়, জিজ্ঞাসা করাতে একটা আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেছিল স্কুলের ছাত্র পনেরো বছরের বিজু। আসলে আগে থেকেই বিজুর সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা কানে এসেছিল তাঁর। ওই বয়সেই কুসঙ্গে মেলামেশা করে খারাপ হয়ে গিয়েছিল ছেলেটা। পড়াশোনা করত না, পরীক্ষায় পাশ করতে পারত না, একে মারত, ওকে অপমানিত করত, বিড়ি সিগারেট খেত। তারপর সে-দিনের সেই ব্যবহার। অবনীশের রক্তে আগুন জ্বলে উঠেছিল। সেই দুর্বিনীত অশালীন ছেলেকে শাসন করে সমঝে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

মেরেও ছিলেন অন্ধ রাগে। সান্যালবাড়ির চোদ্দো পুরুষের বনেদি রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছিল তাঁর শরীরে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। হাতের সামনে পেয়েছিলেন এক টুকরো কাঠ। কাঠের গায়ে বুঝি ছোট্ট কোনও পেরেকের মুখ উঁচু হয়ে ছিল। কীভাবে যেন সেই পেরেকে কেটে গিয়েছিল বিজুর গাল। ডান দিকের গালের নীচের দিক থেকে কান পর্যন্ত সেই

কাটা দাগ সারাজীবনের জন্যে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল বিজুর শরীরে।

কোথা থেকে দমকা বাতাস আসে। উড়িয়ে দেয় ধুলোর আস্তরণ। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আরেকটা মুখ। সুধা, তাঁর স্ত্রী। অবনীশের নিস্তরঙ্গ মনে ঢেউ ওঠে। এমনিভাবে কোনওদিনই তাঁকে ভাবতে হয়নি, এমনিভাবে কোনওদিনই মনে পড়েনি সুধাকে।

সুধাকে যেন, যখন সে বেঁচেও ছিল, ভাল করে দেখাই হয়নি। ছোটখাটো রোগাবোগা চেহারার মানুষটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সংসারের এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে। এ-বাড়ির অন্য পাঁচজনের মতো অবনীশের ইচ্ছের পুতুল হয়ে থাকতে হয়েছে তারও। অবনীশের প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে আলাদা করে চোখেই পড়ত না তাকে।

দেয়ালের দিকে তাকালেন অবনীশ। সুধার ছবি। উচ্ছ্বাস আবেগকে তিনি একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে বন্দি করে রেখেছেন। আজও তিনি নিজের জায়গা থেকে এক চুলও সরে আসতে চান না। তবু হিসেবের খাতায় বড্ড বেশি কাটাকুটি পড়ে যাচ্ছে আজ। অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন বারবার। এখন এ-ঘরে কেউ নেই। দরজার ভারী পরদার পেছনে কাউকেও দেখা যাচ্ছে না। কেউ দেখতে পাচ্ছে না তিনি তাঁর স্ত্রীর ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। তার মনে পড়ে না এইভাবে কোনওদিন তিনি সুধাকে দেখেছেন কিনা।

কিছু মনে পড়ে। কিছু মনে পড়ে না। কে এ ছবি স্টুডিয়ো থেকে এনলার্জ করে এনেছিল, কে তাঁর ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছিল, মনে পড়ল না তাঁর। ছবিটা যেন আজ এতদিন পরে তাকিয়ে দেখছেন। বিয়ের পরপরই কোনও এক সময়ের তোলা ছবি। লাজুক লাজুক মুখে তাকিয়ে আছে সুধা। পাতলা ঠোঁটের কোনায় এক চিলতে হাসি যেন লুকাতে গিয়েও লুকাতে পারেনি। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে তার পিসতুতো ভাই নিখিলেশ, খুব সম্ভবত নিখিলেশই, ছবিটা তুলেছিল জোর করে।

সুধার ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবনীশ ভাবছিলেন। কিংবা ভাবছিলেনও না, স্মৃতির অস্পষ্ট অন্ধকারে তিনি হারিয়ে যাচ্ছিলেন। ছবিটা কে তুলেছিল যেমন ভাল করে মনে পড়ে না, তেমনি ছবির মানুষটাও নিখুঁতভাবে তাঁর মনে নেই। সুধা তাঁর জীবনে কখন এল আর কখন গেল, শীতের ছোট্ট বিকেলের মতো কখন যে ফুরিয়ে গেল টেরই পাননি তিনি। তাঁর জীবনে সুধার অস্তিত্ব কোনওদিনই উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল না. চলেও গেছে নিঃশব্দে, অবনীশের একাকিত্ব তাই বিরাট শূন্য মাঠের মতো ধু ধু করে ওঠেনি।

অথচ আজ এই ফুরিয়ে আসা অপরাহ্ণে নিজের ঘরে একা একা দাঁড়িয়ে থেকে অবনীশ প্রচলিত ধারণার বাইরে সত্যকে খুঁজতে চাইলেন। যে সত্যকে তিনি সম্মানিত করেছেন আজীবন, যার জন্যে যে কোনও মূল্য দিয়েছেন, কঠিন হয়েছেন, অপ্রিয় হয়েছেন আপনজনের, সে কি তবে শরীরের বাইরের কোনও খণ্ডিত সত্য? মনের গহনে চেতনার গভীরে অন্য কোনও জীবন আছে কিনা তিনি জানেন না। জানেন না সুধার চোখে কোনও কোনও দিন কোনও বিষণ্ণ দুঃখের ছায়া পড়েছিল কিনা। বিজু সুধার শেষ সন্তান। সেই কনিষ্ঠ সন্তানের জন্যে কোনও অসহায় অভিমান সুধার বুকে খাঁচার পাখির মতো ছটফট করত কিনা তাও তিনি জানেন না। আজ, এতকাল পরে, অবনীশের মনে হল সুধার হয়তো কিছু বলার ছিল। প্রত্যক্ষ এই পৃথিবীর মধ্যে আরেক পৃথিবী আছে কিনা অবনীশ কোনও খোঁজ রাখেননি।

অবনীশের শরীরের মধ্যে কেমন করে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন না কেন এমন হচ্ছে। আবার তিনি জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বিকেলের আলো ফিকে হয়ে এসেছে। একটু পরেই ঝুপ করে অন্ধকার নামবে। মরা আলোয় বাইরেটা দেখা যাচ্ছে একটা ঝাপসা ছবির মতো। বাড়ির সামনে যে-পথটা এ বাড়ি ও বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় মিশেছে সেই রাস্তায় এখন লোক চলাচল দেখা যাচ্ছে। বেল বাজাতে বাজাতে একটা সাইকেল চলে গেল। দুটো বাচ্চা ছেলে খেলছে। একটা রিকশা ঢুকল। রিকশার আরোহীকে দেখা যাচ্ছে. চেনা যাচ্ছে না। সময় হয়ে এল। একটু পরেই ওরা আসবে। নিয়ে আসবে বিজুকে। চারজনের কাঁধে থাকবে, বাঁশের খাটিয়ার ওপর

সাদা কাপড়ের নীচে শায়িত থাকবে অবনীশের শেষ সন্তান। তিনি অপেক্ষা করে আছেন সেই সময়ের জন্যে।

জানলার বাইরে যে পথটা অবনীশের চোখের সামনে ভাসছে সেই পথ দিয়েই অজু নিয়ে আসবে বিজুকে।

জানলার পরদাটা টেনে দিলেন তিনি। ঘরের মধ্যে আরও অন্ধকার ছমছম করে উঠল। আবার সরিয়ে দিলেন পরদাটা। বাইরের খোলা পথটা ঝাঁপিয়ে এল চোখের সামনে, সরে এলেন, চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বসলেন না। টেবিলের কাছে গিয়ে একটা আইনের জার্নাল তুলে নিলেন। দু'-একটা পাতা উলটে আবার রেখে দিলেন। কিছুই করার নেই। কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। এমনটি হয়নি কোনওদিন। কোনওদিন এইভাবে ভাবেননি। অথচ তিনি তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট জীবনের নিয়মগুলো কর্তব্যগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। তিনি শহরের নামকরা উকিল, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। পর্যাপ্ত পয়সা পেয়েছেন জীবনে, সংসারের কোনও প্রয়োজন পয়সার অভাবে কোনওদিনই থেমে থাকেনি। বাবার আমলের পুরনো একতলা বাড়ি ভেঙে হালফ্যাশানের দোতলা বাড়ি করেছেন, জমিজমা করেছেন একমাত্র মেয়েকে দেদার খরচ করে বিয়ে দিয়েছেন, সুধাকে গা ভরা গয়না গড়িয়ে দিয়েছেন। অন্য দুই ছেলে অজু আর সঞ্জু পড়াশোনা করে মানুষ হয়েছে, বিয়েথা করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করছে। বড় ছেলে অজু ল'পাশ করে বাবার পথই ধরেছে। এখন আলাদাভাবে কিছু কিছু মামলাও তার হাতে আসছে। মেজ ছেলে সঞ্জু স্থানীয় কলেজের প্রফেসর। এ বাড়িতেই আলাদা আলাদা ঘরে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে দুই ছেলেই আছে। সবই করেছেন, সবই হয়েছে শুধু যেটা করেননি, সেটা হয়নি সেটা হল অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা। সেইজন্যেই পাঁচ বছর আগে বিজু যখন জানা নেই শোনা নেই একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এল বাড়িতে, সেদিন ছেলেকে এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে এতটুকুও দ্বিধা হয়নি তাঁর। শুধু তাই নয় বিজুকে বলে দিয়েছিলেন অতঃপর ছেলের মুখ দর্শন করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, সান্যালবাড়ির দরজা বিজুর জন্যে বন্ধ থাকবে।

অবনীশ ফেলে আসা জীবনের পরিত্যক্ত পথ দিয়ে হাঁটেন। সুধা মারা যাবার বছর দুই পরের কথা। তাও পাঁচ বছর হয়ে গেল। তার ঘরের সামনে বারান্দায় তেজি ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বিজু। পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি অল্পবয়েসি মেয়ে। মুখটা ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ঘোমটাটা প্রথম মাথায় উঠেছে। তিনি শুনেছেন মেয়েটি বাজারের মিষ্টির দোকানের হারপদ ঘোষের মেয়ে। জাতে মেলে না। বংশটারও মর্যাদাগত পার্থক্য অনেক। এমন মেয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের কোনও প্রশ্নই আসে না। কিংবা তাও হয়তো নয়। এ বাড়ির কোনও ঘটনায় অবনীশের অভিমতকে উপেক্ষা করা হয়েছে, সেটাই তাঁর সহ্যের অতীত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য নিপুণতায় সেদিন তিনি নিজেকে সংযত করে রেখে ছিলেন। এটাই হয়তো হয়। কোনও অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনার সামনে মানুষ হয়তো এইরকমই স্বাভাবিকতার আচরণ করে।

বাড়ির পুরনো চাকর হরি দাঁড়িয়ে ছিল সামনে। দুই ছেলে, ছেলেদের বউরা, কিংবা বাড়ির অন্য কাউকে কাছেপিঠে দেখলেন না। নিস্তব্ধ বাড়িটা যেন অপেক্ষা করছিল অদূরবর্তী কোনও ঝড়ের অপেক্ষায়।

বিজুর সামনে স্তম্ভিত হয়ে একটু সময় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। চোখের চশমাটা হাত দিয়ে ঠিক করে নিলেন। তারপর ঘরে ঢোকার আগে হরিকে বললেন, ওদের চলে যেতে বলে দাও হরি। আর বলে দিয়ো এ-বাড়িতে যেন আর কোনওদিন ওরা না আসে। বলেই তিনি ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন।

না, বিজুকে আর কোনওদিন তিনি দেখেননি। এ পথে আর কোনওদিন আসেওনি সে। মেয়েটার হাত ধরে সেই যে চলে গিয়েছিল, তারপর আর সান্যালবাড়িতে পা ফেলেনি। শুনেছিলেন এ শহরেরই অন্য কোথাও বিজু বাসা ভাড়া করেছে। ব্যস, ওই শোনা পর্যন্তই। সে কীভাবে বউ নিয়ে

সংসার চালায়, কীভাবে জীবন নির্বাহ করে, তার কোনও খোঁজ রাখেননি, রাখা দরকারও মনে করেননি। তিনি মনে করতেন বিজু যে তাঁর সন্তান এটা তাঁর জীবনে কোনও এক শোচনীয় দুর্ভাগ্য। জীবনের সব জিনিস ইচ্ছেমতো পাওয়া যায় না। বিজুও সেইরকম কিছু।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন অবনীশ। কে যেন আসছে। সিঁড়িতে ভারী ভারী পা ফেলে কেউ ওপরে উঠে আসছে। বাড়িটা এত বেশি চুপচাপ নিঝুম রাত্রির মতো যে প্রতিটি পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছেন। কান খাড়া করে সেই শব্দ তিনি শুনলেন। কয়েকটি উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত কেটে গেল। তারপরেই কে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তা হলে ওরা আসছে। নিয়ে আসছে বিজুকে। সেই আসার খবরটা আগেভাগে কেউ এসে জানিয়ে দিল।

তখনই শোনা গেল সামনের রাস্তা থেকে ছুটে আসা সেই শব্দ— বলো হরি হরি বোল। ঈশ্বরের সেই নাম-উচ্চারণ আছড়ে পড়ল এ-বাড়ির ঘরে ঘরে। অবনীশ জানলার কাছে ছুটে যেতে চাইলেন। গেলেন না। অন্ধকার ঘর হাতড়ে হাতড়ে একটু আলোর রেখা পেতে চাইলেন। পেলেন না। পাঁচ বছব পরে বাড়িতে আসছে অবনীশের শেষ সন্তান। বিজু আসছে সোচ্চার শব্দ করে। চার মানুষের চার কাঁধে বাঁশের খাটিয়ার ওপর শুযে। কেননা গত রাত্রের এক গোপন অন্ধকারে আততায়ীর ছুরি তার বেঁচে থাকবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

বিজু খুন হয়েছে। কিন্তু সেই খুনের খবব, হযতো মনের অগোচরে তিনি প্রস্তুত ছিলেন বলে, তাঁর কাছে আচমকা মনে হয়নি। তিনি জানতেন এইভাবে একদিন বিজুর খেলা শেষ হয়ে যাবে। অন্ধকার জগতের নিষিদ্ধ জীবনেব আলো অন্ধকারেই দপ কবে নিভে যায। অন্যায আর অসত্যের জন্যে খুব বেশি সময় কোনওদিনই বরাদ্দ থাকে না। ইদানীং বিজুর সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে আসত। শহরের খাবাপ অঞ্চলের আরও খারাপ লোকেব সঙ্গে তার ঘোরাফেরা ছিল। গুন্ডামি ছেনতাই স্মাগলিং খারাপ সবকিছুই তার জীবনেব সঙ্গে যুক্ত হযে গিয়েছিল। সেসব কথা না শুনতে চাইলেও তাঁর শুনতে হত। ছোট্ট শহরের জানাশোনা খোঁজখবরের পরিধিও খুব ব্যাপক নয়। কথা চলাচলি হতে খুব বেশি সময লাগত না।

বাবা।

দরজার সামনে এসে কে যেন থামল। অবনীশ তাকিযে দেখলেন দরজার দিকে। পরদার পেছনে এক জোড়া পা থেমে আছে। তাঁকে ডাকতে এসেছে কেউ।

অবনীশ সেই এক জোড়া পাযের মানুষটিকে ভেতরে আসতে বলতে চাইলেন, কিন্তু একটা কথাও বলতে পারলেন না। কথা তাঁর গলার কাছে আটকে গেছে। বিস্ফাবিত চোখে সেই পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারলেন না।

মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে বাইরের মানুষটা পরদা সবিয়ে ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার দেয়ালে হাত রাখল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল ঘরের আলো। অবনীশ আগেই জানতেন কে এসেছে। অজু। অজু দাঁড়িয়ে আছে ঘরে। তার থমথমে মুখে একটু সময়ের জন্যে হয়তো চকিত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল। কেননা ঘর অন্ধকার ছিল। আলো জ্বালাবার কথা মনে আসেনি অবনীশের। সুতরাং অন্ধকার ঘরে কেউ আছে কিনা এবং কেউ থেকে থাকলে কী অবস্থায় আছে সেটা অজুর জানা না থাকার কথা।

নীচে তখন এ-বাড়ির নিযম ভেঙে গেছে। আপনজন হারানোর শোক স্বাভাবিকভাবেই মুক্তধারায় প্রবহমান। বাড়ির-মেয়েদের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কে যেন আকুল হয়ে কাঁদছে। সম্ভবত দুই বউযের একজন। এ-বাড়িতে এভাবে কান্না অবনীশ প্রথম শুনলেন যেন। শোকদৃশ্যের ছবিটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। খাটিয়ায় শায়িত বিজুকে এনে রাখা হয়েছে নীচে। শান-বাঁধানো উঠোনে। বিজু শেষযাত্রার পথে কিছুক্ষণের জন্যে এসেছে, থেমেছে তার বাল্য কৈশোর যৌবনের আবাসগৃহে।

অবনীশ তাকিয়ে ছিলেন অজুর মুখের দিকে। অজু যেন অবাক হয়ে গেছে। তার শোকার্ত মুখের বিষণ্ণ চোখদুটো স্থিব হয়ে আছে অবনীশের মুখে। সে তার বাবার চেনা চেহারাটা যেন খুঁজে পাচ্ছে

না। তাব মুখে মমতাব ভঙ্গি ফুটল। একটু এগিয়ে এল অবনীশেব দিকে।

বাবা, একটু নীচে যেতে হবে যে, ওবা এসেছে।

অবনীশ চুপ কবে থাকেন। তিনি জানেন নীচে যেতে হবে তাঁকে। একবাব শেষ দেখতে হবে নিজের সন্তান। এই-ই সংস্কাব। মৃত্যু এসে পবিশুদ্ধ কবে দেহকে, সে তখন আচবিত জীবনেব অতীত। সেই দেহেব সঙ্গে বিবোধ বাখতে নেই। সবকিছুব উর্ধ্বে থাকতে হয তখন।

চলো বাবা, ওবা অপেক্ষা কবছে।

অজু বুঝি অবনীশেব হাত ধবতে চায, হাত ধবে নিয়ে যেতে চায নীচে। কিন্তু হাত বাডিযেও টেনে নেয। বলে, তুমি এসো।

অজু ঘব থেকে বেবিয়ে যায। তাব সময কম। এখান থেকে মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাবে। নানানবকম আচাব অনুষ্ঠান আছে। অন্ত্যেষ্টিব নানান ব্যবস্থা জোগাডযন্ত্র তাকেই কবতে হবে।

অবনীশ পাথবেব মূর্তিব মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। এবাব তাঁকে নীচে নামতে হবে। সেই মুখ শেষবাবেব মতো দেখতে হবে যা কিনা আব কোনওদিন দেখবেন না বলেছিলেন।

এখান থেকে শুনতে পাচ্ছেন নীচেব অনেক মানুষেব ভিডে প্রিযজনেব বুকভাঙা শূন্যতা ফুঁপিযে ফুঁপিযে উঠছে। হঠাৎ খুলে গেছে মনেব দবজা জানলা। খোলাপথে হু হু কবে বেবিয়ে আসছে বহুদিনেব বন্ধ ঘবেব জমাট বাতাস।

অবনীশ অসহাযেব মতো তাকালেন সুধাব ছবিব দিকে। জীবনে এই প্রথম আত্মসমর্পণেব ভঙ্গিতে এসে দাঁডালেন স্ত্রীব ছবিব কাছে। আজ বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে নিজেকে। সুধাকে বড্ড বেশি কাছে পেতে মন চাইছে। কিন্তু ছবি শুধু স্মৃতিবই ছলনা হযে থাকে। অবনীশেব বুকে নিশ্বাস ভাবী হযে ওঠে। আজ তিনি একা। সব থেকেও তিনি আকাশেব মতো নিঃসঙ্গ।

সেই সকাল থেকে অনেক সময বযে গেছে। বিজুব খুনেব খবব সকালেই এসেছিল। তাবপব হাসপাতাল লাশঘব থানা পুলিশ কবতে কবতে এই সন্ধে পযন্ত সময গডিযে গেছে। অবনীশ যাননি, কিন্তু অজু আব সঞ্জু দুই ভাই, পাডাব ছেলেবা, এতক্ষণ ছোটাছুটি কবেছে। এখন আব বেশি সময দিতে পাববে না ওবা, অবনীশকে এক্ষুনি নীচে নামতে হবে। নীচে নেমে বিজুব সামনে দাঁডাতে হবে।

নীচেব তলায তিন দিকে ঘব মাঝখান শান বাধানো উঠোন। এক পাশ দিযে সিঁডি উঠে গেছে ওপবে। উঠোনেব মাঝখানে খাটিযাটা নামানো হযেছে। সাদা কাপড দিযে ঢাকা বিজুব শবীব। মুখটাই শুধু কিছুক্ষণেব জন্যে অনাবৃত। হাঁ কবে আকাশেব দিকে তাকিযে আছে নিঃসঙ্গ দেহটা। খাটিযাব চাব পাশে দাঁডিযে আছে পনেবো বিশজন মানুষ। মাথা নিচু কবে ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদছে মেযেবা। ছোটবা একটু দূবে হতভম্বেব মতো দাডিযে আছে। হবি একপাশে দাঁডিযে চোখ মুছছে।

অবনীশ তখন সিঁডি দিযে নামছেন। একটাব পব একটা ধাপ পা ফেলে নীচে নেমে আসছেন সান্যালবাডিব সেই শর্তহীন চবিত্র। ভাবী মুখটা থমথম কবছে। মাথায কাঁচাপাকা চুল। চোখে মোটা ফ্রেমেব চশমা। তিনি ক্রমশ চাতালেব কাছে চলে আসছেন, শোকদৃশ্যটা স্পষ্ট হচ্ছে। অথচ স্পষ্টতব সেই দৃশ্যটা তাঁব চোখেব সামনে তখন আবছা হযে ভাসছে। স্মৃতি, চেতনা, বুদ্ধি সবই একটা সাদা কাগজেব মতো বেখাহীন বর্ণহীন অথহীন হযে গেছে।

তিনি বিজুব মৃতদেহেব সামনে মাথা নিচু কবে দাঁডিযে বইলেন। একটু পবে ওবা যখন খাটিযাটা নিযে গেল হবিধ্বনি কবতে কবতে, আবেকবাব দুলে উঠল কান্নাব নদী, বিজু চলে গেল চিরদিনেব জন্যে, তখনও তিনি দাঁডিযে বইলেন।

তারপব একসময আস্তে আস্তে বিবাট ধ্বংসস্তূপেব মধ্য দিযে অস্থিপঞ্জবে জোড়া-লাগা মানুষটা হাঁটতে হাঁটতে ওপবে চলে এলেন। ঘবে ঢুকে চুপ কবে দাঁড়িয়ে বইলেন। এখনও তাঁর চোখেব সামনে ভাসছে ক্ষতচিহ্নটা। সাবাদিন ধবে অন্য সবকিছু ঝাপসা কবে দিযে যে-চিহ্নটা জ্বলজ্বল কবে ভেসেছে চোখেব সামনে।

পাঁচ বছর আগে তিনি বলেছিলেন আর কোনওদিন বিজুর মুখ দর্শন করবেন না। তাঁর কথা তিনি রেখেছেন। তিনি একটু আগেই বিজুর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখের পাতা বন্ধ ছিল। তিনি জানতেন চোখের পাতা খুললেই বিজুর নিস্পন্দ মুখ নয়, সেই ক্ষতচিহ্নটাই শুধু দেখবেন। ডান গালের পাশ থেকে কানের নীচ পর্যন্ত গভীর কাটা দাগ। তাঁর বহুদূর বিস্তৃত শিক্ষা, অহংকার, ব্যক্তিত্বের ওপর বিধ্বংসী ঝড়ের মতো আছড়ে পড়বে সেই কাটা দাগ।

তবু দমকা হাওয়া ওঠে। সমস্ত চেতনা জুড়ে ঘটে যায় এক নিঃশব্দ বিস্ফোরণ। তথাপি সেই কাটা দাগ তিনি দেখছেন। তাঁব বুকের মধ্যে কেমন করে উঠছে। দৃষ্টি আবছা হয়ে আসছে। তিনি জানেন না এরই নাম কান্না কিনা, এই আলোড়িত হৃদয়ের নাম পিতৃত্ব কিনা। কেননা গভীরতর কোনও কোনও শোক দেখা যায় না, বোঝা যায়। বুঝতে পারে সে-ই যার বুকের মনের সত্তার অনেক গভীরে ধিধি করে বহ্নিমান চিতার মতো জ্বলে কোন পরাজিত ব্যক্তিত্বের ক্ষতচিহ্ন।

এক্কা দোক্কা খেলা

বাড়িটা এমন ছিল না তখন। টিনের ছাদ, পাকা দেয়াল, চুনকামের রং রোদে-জলে ধোওয়া। এখানে ওখানে পলেস্তারায় সময়ের আঁচড় লেগেছিল। বছর দুয়েক আগে অলোকেশ ওর বিমা কোম্পানির অফিস থেকে লোন নিয়ে টুকটাক মেরামতিতে হাত দিয়েছিল। কিন্তু মেরামতি করতে গিয়ে বাড়ির খোলনলচেই পালটে গেল। ইট এল, সিমেন্ট এল, লোহালক্কড় মিস্ত্রি কুলি সবই এল। টিনের ছাদের বদলে কংক্রিটের ছাদ হল, সামনে একটা ঘর বাড়ানো হল, পুরনো পলেস্তারা উঠিয়ে নতুন করা হল। আগে দেয়ালে শুধু সাদা রং ছিল, এবার বাইরে গোলাপি রং আর ভেতরে হালকা সবুজ ডিসটেম্পার করা হল। পুরনো বাড়ি একেবারে নতুন হয়ে গেল।

খুশির ব্যাপার হলেও, স্মৃতিজীবী মানুষের যা হয়, মণিশঙ্করের মনের গভীরে কোথায় এক দীর্ঘ নিশ্বাস আটকে রইল। পুরনো বাড়ির সঙ্গে অলোকেশের মায়ের যোগসূত্রটা খুঁজতে চেয়েছিলেন তিনি। এ-বাড়িতে রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে অলোকেশের মায়ের সাধআহ্লাদ, স্নেহমমতা। এ-বাড়ি থেকেই একদিন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল অ্যাম্বুলেন্সে, আর ফিরে আসা হয়নি। কিন্তু অলোকেশকে কেউ পিছন থেকে টেনে রাখেনি, সামান্য ইটপাথর মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসার প্রতীক হয়ে থাকেনি। যদিও অলোকেশ কিংবা অলোকেশের বউ নমিতা কিংবা অলোকেশের সাত বছরের মেয়ে বুলার মতো নতুন করে বানানো বাড়ি তাঁকেও সুখী করেছিল, তবুও বারবার মনে হয়েছিল পুরনো বাড়ির সঙ্গে কী যেন চলে যাচ্ছে, যা কোনওদিনই ফিরে পাবেন না তিনি। এমন একটা সময়, যখন ভাঁটায় বয়েস টানে, কিন্তু মন ছোটে উজানে। সেইসময় সব আনন্দের মধ্যে কোথায় যেন একটা নরম দুঃখ তিরতির করে ফেলে-আসা জীবনের জন্যে। তবু ছেলের সংসারের সুখ সচ্ছলতা তাঁকে স্বস্তি দিয়েছিল, নতুন বাড়ি করার জন্যে ছেলেকে উৎসাহ দিয়েছেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নানান পরামর্শ দিয়েছেন, মিস্ত্রিকে বলেছেন এটা করো ওটা করো। বাড়ি শেষ হলে নতুন রং হল, দরজা জানলায় নতুন পরদা এল, তারপর যেদিন অলোকেশ ছোট্ট কাঠের বোর্ডে বাড়ির নাম লিখে এনে বাইরের দেয়ালে পেরেক মেরে ঝুলিয়ে দিল— সেদিন নতুন আর পুরনো দু'দিকের দুটো সময় মিলিয়ে নিতে পেরে ভাল লেগেছিল তাঁর। বাড়ির নাম— শান্তি কুটির। অলোকেশের মায়ের নাম ছিল শান্তিলতা। তার নামেই বাড়ির নাম। আবার জলপাইগুড়ি শহরের এক প্রান্তে শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে এ-বাড়িতে ছিমছাম শান্তিও ছিল, তাই সেদিক থেকেও এ নামকরণও ভাল লেগেছিল। পুরনো বাড়ির শান্তিলতা নতুন বাড়িতে জড়িয়ে রইলেন অন্য কোনওভাবে।

কিন্তু আজ এ-সময় যখন বিকেলের আলো ধূসর হয়ে আসছে, বাড়ির বারান্দায় বেতের চেয়ারে শিথিল শরীরে বসে থেকে যখন তাঁর অনেক কথা মনে পড়ছিল, সামনের বেড়া দেওয়া এক টুকরো সবুজ মাঠে বুলা যখন একা একা খেলছিল, যখন ডানা মেলে পাখিরা দূরে উড়ে যাচ্ছিল, তখন তাঁর ঠোঁটের কোনায় কান্নার হাসি স্থির হয়ে রইল। শান্তি কুটিরের নাম পরবর্তীকালে একটা দুঃখের ঠাট্টা হয়ে গেছে। এ-কুটিরে আর সবই আছে, শুধু নামটাই নিরর্থক হয়ে গেছে।

বুলা খেলছে। খেলার নাম সম্ভবত এক্কা দোক্কা। একা একা আপন মনে কী খেলে কে জানে। মণিশঙ্কর সেই খেলার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু খেলাও দেখছিলেন না, বুলাকেও না। আসলে তিনি তখন খেলছিলেন বুলার মতোই কোনও খেলা। অনেক দূরের কোনও অন্ধকার মাঠে একা

একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ-খেলার নিয়মটাই যে তাই। নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিজেই নিজেকে খুঁজতে হবে।

কী বাজনা দাদু?

বুলার কথায় তিনি ফিরে এলেন শান্তি কুটিরের বারান্দায়, বেতের চেয়ারে। দেখলেন বুলা খেলা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে কী শুনছে। কী শুনছে, তিনিও শুনতে পেলেন। কোথায় যেন ঢাকের বাজনা বাজছে— ডাং ডেডা ডাং, ডেডাং ডাং, ডাং ডেডা ডাং ডেডাং ডাং। খুব কাছেও নয়, খুব দূরেও নয়, মাঝামাঝি কোনও জায়গা থেকে ভেসে আসছে বাজনাব শব্দ।

কীসের বাজনা দাদু? বুলা আবার জানতে চাইল।

মুশকিলে পড়ে গেলেন মণিশঙ্কর। কীসের বাজনা তিনি নিজেও জানেন না। বললেন, কোনও উৎসব টুৎসবের বাজনা।

কী উৎসব?

কোনও পুজোটুজো হবে বোধহয়।

কী পুজো দাদু?

কী জানি।

তুমি কিচ্ছু জানো না। দাদুর অজ্ঞতায় ঠোঁট ওলটায বুলা।

মণিশঙ্কর হেসে ফেললেন। মনে মনে ভাবছিলেন এ-সময় কোন পুজো হয়। দৃষ্টি ঘুবতে ঘুরতে আটকে গেল রাস্তার ওপাশের আম গাছে। বোল এসেছে আম গাছে। অজস্র সোনালি মুকুলে ভরে গেছে গাছের ডালপালা। এ-সময়টা চৈত্রের শেষ ক'টা দিনের এবং এ সময়ে বাজনাটা কীসের হতে পারে খুব স্পষ্ট করে তিনি মনে করতে পারলেন। গাজনের বাজনা বাজছে। কালই চৈত্রের শেষদিন, সংক্রান্তি— সকালেব খবরের কাগজে বাংলাব পুজোপার্বণ বিষয়ে নীলপুজো সম্পর্কে কী একটা লেখাও তিনি দেখেছিলেন। তখন খেয়াল হয়নি, এখন তিনি উত্তেজনায সোজা হয়ে বসলেন। কী আশ্চর্য, আজকেব তারিখটাই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। যে-তারিখটা তাঁর জীবনের গতিধারাই বদলে দিয়েছে, সেই তারিখটাই তাঁর মনে ছিল না। বুলাকে ডাকলেন, এই বুলি, শোন শোন—।

বুলা তখন নতুন করে খেলা আরম্ভ করেছে, বাজনার শব্দও দূরে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বুলার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল দাদুর কথা তার কানেই যাযনি, কিংবা কানে গেলেও শোনা হযনি।

মণিশঙ্কর আবার বললেন, বুলি, শুনছিস না, ডাকছি।

বুলা খেলতে খেলতেই বলল, দাদু, দেখছ না খেলছি!

অন্যসময় হলে মণিশঙ্করও বুলার কথার ছেলেমানুষি কোনও উত্তর দিতেন। কিন্তু এখন সে সময় নয়। অধীর গলায় বললেন, পরে খেলিস, শোন না।

বুলা খেলা ফেলে অনিচ্ছুকভাবে কাছে এসে বলল, কী বলো!

তোর মাকে একটু ডেকে দে তো, বল দাদু ডাকছে।

বুলা জিভ বের করে মুখ ভেঙাল দাদুকে, তারপর একছুটে ভেতরে গেল মাকে ডাকতে।

নমিতাকে দারুণ একটা চমকানো খবর দেবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন মণিশঙ্কর। একটু পরেই নমিতা আসবে। একটু পরেই শুনবে কথাটা। কিন্তু সে-কথা ভাবতেই হঠাৎ একটা নিষেধের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ভারী অবুঝ কাজ করে ফেলেছেন তিনি। আজকের বিশেষ দিনটা আবিষ্কার করার মধ্যে কোনও সুখ, কোনও চাঞ্চল্য আছে কি? বরং এ-কথা মনে করিয়ে দেওয়া মানেই তো এক শূন্যতার বিষাদকে আরও অতলান্ত করে তোলা। না না, ভারী ভুল হয়ে গেছে, নমিতাকে ডাকতে পাঠানো একদম উচিত হয়নি। বয়েস হয়েছে, সব ভুল হয়ে যায়। নাকি জীবনের সুগভীর দুঃখকষ্টগুলো এইভাবে বারেবারে মনকে ঠকিয়ে চলে! মণিশঙ্কর যুক্তি খোঁজেন, কিন্তু মনকে শান্ত করতে পারেন না।

নমিতা এল একটু পরেই। খুব সম্ভব রান্নাঘর থেকে এসেছে, গাছকোমরের মতো পেঁচিয়ে

শাড়ি-পরা, কপালে ঘামের আভাস আর শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে দেখে তা-ই মনে হল। আজ শনিবার, দুপুরেই নমিতার অফিস ছুটি হয়ে গেছে। হিসেবমতো এখন রান্নাঘরেই থাকার কথা। রান্নার আয়োজনও আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি হয়। বাড়তি সময়টা নমিতার রান্নাঘরেই কাটবে, সুখবালাকে বাজারে পাঠিয়ে এটা সেটা কিনে আনবে, গরম তেলে মাছের টুকরো ছেড়ে দিয়ে বলবে, বুলাকে দেখছি না, দেখ তো সুখো, কোথায় গেল মেয়েটা!

নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মণিশঙ্কর হেসে ফেলেন, এই দ্যাখো বউমা, কী বলব বলে তোমাকে ডেকে আনলাম, একদম ভুলে গেছি।

নমিতা জিজ্ঞাসু মুখে তাকিয়েছিল, কী মনে হতে সেও হেসে ফেলল, বলল, আমার কিন্তু মনে পড়েছে।

মণিশঙ্কর অবাক হন, কী বলো তো?

সেই বইটা--

কোন বই, তুষারতীর্থের ডাকে?

নমিতা সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ে। বলল, আজ পেয়ে গেলাম কদমতলার একটা দোকানে। আপনি দুপুরে ঘুমোচ্ছিলেন বলে দেওয়া হয়নি, তারপর ভুলেই গিসলাম। ব্যাগেই আছে।

দাও, দাও তো বইটা। যেন খুব মজার কথা বলছেন এমনিভাবে মাথা দুলিয়ে বললেন, হিমালয়ের পথে পথে একটু সাধুসঙ্গ করি।

বলে হাসতে থাকেন মণিশঙ্কর। আসলে খুব তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গান্তরে যেতে পেরে তিনি খুশি হয়েছেন।

নমিতা বাড়ির ভেতর গেল এবং একটু পরেই বইটা নিয়ে ফিরে এল। ভারী খুশি হয়ে নমিতার কাছ থেকে বইটা নিলেন মণিশঙ্কর, কিন্তু নমিতা চলে যাবার পর বইটার কথা মনেই থাকল না তাঁর। দেখলেন না, পাতা ওলটালেন না, কিছুই করলেন না বইটার। ফুরিয়ে গেল বিকেল। হাঁটি হাঁটি পা পা সন্ধে এসেছে, আবছা অন্ধকার নেমেছে চারধারে। তখনও বসে ছিলেন মণিশঙ্কর। নমিতার সঙ্গে চমৎকার এক লুকোচুরির খেলায় তিনি জিতে গেছেন, অথচ খেলায় জিতে বুলার মতো হাততালি দিয়ে হেসে উঠতে পারছেন না।

তিনি উঠলেন। আরও অন্ধকার হয়ে গেছে চারধার। খেয়াল হল বহুক্ষণ তিনি একইভাবে বসে আছেন। বুলা কখন খেলা শেষ করে চলে গেছে, সন্ধের শাঁখগুলো বেজে বেজে থেমে গেছে, একটা-দুটো করে অনেক তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুটে গেছে আকাশে। আর তো বসে থাকা চলে না। উঠতে গিয়ে তিনি দেখলেন বাইরের দরজার সামনে থেকে কে যেন সরে গেল। মনে হল নমিতা। কিন্তু নমিতা কেন, এখন তো ওর রান্নাঘরেই থাকবার কথা। তবে কি নমিতা নয়, সুখবালা? কিন্তু বাড়ির কাজের লোক কী দেখবে ওখানে অন্ধকারে দাঁডিয়ে দাঁড়িয়ে? কে তবে? নমিতাই কি? ভেবে ভেবে ঠিক করতে পারেন না মণিশঙ্কর। ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে খেয়াল হল বাইরের ঘরে এখনও আলো জ্বলেনি, ঘর অন্ধকার। এমন হল কেন? সন্ধের পর সব ঘরের সঙ্গে এ-ঘরেরও আলো জ্বলে, মণিশঙ্কর ঘরে ঢুকলে সুখবালা এসে বেতের চেয়ার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। আজ কেউ আসেনি।

মণিশঙ্কর ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন। এই ঘরটাই নতুন বানানো হয়েছে, বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দু'পাশে দুটো জানলা। দুটো জানলাতেই গ্রিল বসানো, হালকা গোলাপি রঙের পাতলা পরদা, দেয়ালে সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার। আসবাব বলতে দুটো ছোট আর একটা লম্বা বেতের চেয়ার, একটা ছোট্ট গোল টেবিল। এ পাশের দেয়াল ঘেঁষে একটা তক্তাপোশের বিছানা, তাতে সাদা চাদর বিছানো। দুটো দরজা। একটা বাইরের দিকের, একটা ভেতরে যাবার। বাইরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন মণিশঙ্কর। এরকম প্রত্যেকদিন হয় না। দরজা বন্ধ করে সুখবালা কিংবা নমিতা। আজ নিশ্চয় রান্নাঘরে নতুন কোনও রান্নার আয়োজন হচ্ছে, সুখবালা হয়তো বাজার

থেকে দেরি করে ফিরেছে। মণিশঙ্কর চিন্তিত হচ্ছিলেন।

সুখবালা দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে বললে, নেন, দুধটা খেয়ে নেন— গরম আছে।

এখানেও হিসেব মিলছে না, গরমিল হয়ে যাচ্ছে। সন্ধের পর এক গ্লাস দুধ খান মণিশঙ্কর, কিন্তু সে দুধ সচরাচর নমিতার হাতেই আসে। আজ সুখবালা নিয়ে এসেছে। গ্লাসটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর দিদি কোথায় রে সুখো?

ঘরে শুয়ে আছেন।

ঘরে শুয়ে আছে?

তাই তো দেখলাম। তরকারি রাঁধতে রাঁধতে সেই যে দিদি চলে এল, তা তরকারি নামালাম, দুধ গরম করলাম, ভাতের জল চড়ালাম— ভাবলাম দিদি আসে না কেন—।

এই অবেলায় ঘরে শুয়ে কেন নমিতা, একটু উদ্বিগ্ন দেখাল মণিশঙ্করকে। তখনই নমিতা ঘরে এসে ঢুকল। মণিশঙ্করের হাতে দুধের গ্লাস দেখে লজ্জা পেল যেন। বলল, মাথাটা ধরেছিল একটু।

মণিশঙ্কর কিছু বলবার আগেই সুখবালা বলল, তা একটু শুয়ে থাকলিই পারতে, ইদিক আমিই দেখছি।

নমিতা বলল, না না, তার দরকার নেই।

সুখবালা বলল, একটু বিশ্রাম নাও দিকিনি। বলি চাকরিবাকরি করলি মেয়েমানুষের এত ধকল সইবে কেন।

নমিতা বলল, একটু আধটু মাথা ধরা— সেরে গেছে।

চিন্তিত মুখে মণিশঙ্কর বারবার মাথা নাড়লেন, ঠিক কথা নয়, ঠিক কথা নয়। সারাদিন খেটেখুটে এসে একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার বই কী।

বই খাতা নিয়ে পড়তে বসেছে বুলা, ওর চিৎকার শোনা গেল, মা, ও মা, মশা কামড়াল আমাকে।

মণিশঙ্কর বললেন, যাও, মেয়ে ডাকছে।

সুখবালা বলল, সন্ধেবেলায় একা একা থাকতি ভয় পায়, তাই ওরে মশা কামড়ায়।

দুধটা খেয়ে মণিশঙ্কর দুধের গ্লাসটা নমিতার হাতে দিলেন। দুধ খাওয়া হল, এবার তিনি নিজের ঘরে যাবেন, চিঠিপত্র লেখার থাকলে, লিখবেন। বইপত্র পড়বেন। নমিতা এলে গল্প করবেন, বুলাকে গল্প বলবেন। পাশাপাশি তিনটে ঘর। প্রথম ঘরে থাকে বুলা আর নমিতা, মাঝের ঘরে তিনি, একেবারে শেষের ঘরটা তালাবন্ধ। টুকিটাকি জিনিস থাকে— সুখবালার এটা সেটা, টিনের সুটকেস, ভাঙা চেয়ার, হাতুড়ি কোদাল। এরপরেও এপাশে একটা ঘর আছে, রান্নাঘর। সুখবালা রাতে নমিতার ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়। নিজের ঘরে ঢুকলেন মণিশঙ্কর। ঘরে আলো জ্বালিয়ে গেছে নমিতা। ঘরে ঢুকে একটু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আজ যেন কিছুই করার নেই তাঁর। ভারী অবসন্ন বোধ করছিলেন। নিজেকে শক্ত করে রাখতে চান, কিন্তু পারেন না। একটা প্রশ্ন তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করছে দিনের পর দিন।

দেয়ালের ক্যালেন্ডারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আজ শনিবার, এপ্রিল মাসের বারো তারিখ। কাল চৈত্র সংক্রান্তি। এক বছর হল। এক বছর ধরে প্রশ্নটা তাঁর পিছন পিছন ছুটছে। প্রশ্নটা তাঁকে আঘাত করছে, কষ্ট দিচ্ছে, তাড়িয়ে ফিরছে। তিনি জানেন এক বছর হল অলোকেশ নেই, কিন্তু জানেন না কেন নেই। অলোকেশের না-থাকাটা যতটুকু কষ্টের, তার চেয়ে অনেক কষ্টের না-থাকার কারণটা না-জানা। হয়তো এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, তবু উত্তর খুঁজতে হয়। দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টা উত্তর খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হয় মণিশঙ্করকে।

মণিশঙ্কর খাটের নীচ থেকে ট্রাঙ্কটা টেনে আনলেন, খুললেন। দু'-চারটে জামাকাপড়, গায়ের চাদর, মাফলার— একেবারে নীচে ভাঁজ করা দুটো পুরনো বাংলা খবরের কাগজ। হাতড়ে খুঁজে পেলেন কাগজদুটো, বের করে এনে চেয়ারে বসলেন। দশ-এগারো মাস আগের দু'দিনের দুটো

দৈনিক— একটা মে মাসের উনিশ তারিখের, অন্যটা আরও চোদ্দোদিন পরের। কাগজের পাতাগুলো কিছুটা ম্লান।

মণিশঙ্কর একটা কাগজের দ্বিতীয় পাতাটা খুলে টেবিলে আলোর সামনে ধরলেন। চশমা পরলেন। দুটো কাগজে একই লেখা, হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কলমে একই বিজ্ঞাপন, অলোকেশের একই ছবি। ছবিটা স্পষ্ট নয়, এ-ছবি দেখে মানুষটাকে চেনা যাবে না— লেখা পড়েই যদি কেউ অলোকেশকে চিনতে পারে। মণিশঙ্কর কাপড়ের খুঁট দিয়ে চশমার কাচ মুছলেন, চোখে আবার লাগালেন, তারপব বহুবাব পড়া লেখাগুলো আবার পডলেন—'উপরের ছবি যাঁহার, তিনি গত ১২ই জলপাইগুডি হইতে শিলিগুড়ি যাইবার পথে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বয়স আটত্রিশ, গায়ের রং ফরসা, চোখে কালো ফ্রেমেব চশমা। থুতনির নীচে একটা কাটা দাগ আছে। নাম অলোকেশ চট্টোপাধ্যায়। বিমা কোম্পানির কর্মচারী। উপরোক্ত ব্যক্তির যে-কোনও সংবাদ নীচের ঠিকানায় পাঠাইলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রীমণিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।'

এক বছর আগে এই তারিখেই সকালবেলায় খেয়েদেয়ে প্রত্যেক দিনের মতো ট্রেন ধরতে স্টেশনে ছুটেছিল অলোকেশ। শিলিগুড়িতে বিমা কোম্পানিতে চাকরি— সকালে বিকেলে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি। কিন্তু সেদিন সকালের যাওযাটা প্রত্যেকদিনের মতো হলেও ফেরাটা প্রত্যেকদিনের মতো হয়নি। সন্ধে গেল, রাত্রি হল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত অলোকেশ ফিরল না, তখন খোঁজখবর করতে হল। গাড়ি ঘোড়ায় চাকরি, ভাল মন্দ নানান চিন্তা মনে আসে। বউমা গেল নিউটাউনে অলোকেশের একজন সহকর্মী বন্ধুর বাড়িতে খোঁজ নিতে, নিজে উদ্বিগ্ন হয়ে ঘরবাব করতে লাগলেন। উদ্বিগ্ন হযেছিলেন, কিন্তু মনে মনে আশা ছিল হয়তো সমযমতো ট্রেন ধরতে পারেনি অলোকেশ, ট্যাক্সি কিংবা বাস রাস্তায খারাপ হযে গেছে, হয়তো অফিসে জরুরি কাজ পড়ে গেছে। আজ হয়তো কোনও কারণে আসতে না পেরে শিলিগুডির কোনও বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেছে, কাল ফিরবে। যদিও চাকরির জীবনে এ-ধরনের কোনও ঘটনাই কোনওদিন ঘটেনি, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অলোকেশ ফিরে এসেছে, তবু কারণ অকারণের কথা কিছু বলা যায় না।

কিন্তু নমিতাকে উদ্ভ্রান্তের মতো ফিরতে দেখে মণিশঙ্করের বুকটা ধড়াস করে উঠল। রিকশা থেকে নেমে প্রায় পাগলের মতো ছুটে এসে নমিতা বলল, বাবা, ও আজ অফিসেই যায়নি।

অফিসেই যায়নি. সে কী কথা!

সুকুমারবাবু বললেন, ও আজ অফিসেই যাযনি। বাবা, এখন কী হবে? নমিতা কান্নায় ভেঙে পডল।

তখনও জানা যায়নি, অলোকেশের বাড়ি না-ফেরাটা কোনও সাময়িক ব্যাপার নয়। তখনও আলগা বোঁটা থেকে টুপ কবে খসে পড়েনি আশা। এখানে ওখানে আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে, খোঁজখবর করেছে অলোকেশের অফিসের লোকেরা, মালদার দিদি আর জামশেদপুরেব বোনের কাছে টেলিগ্রাম গেছে, কিন্তু কোনও জায়গা থেকেই অলোকেশের কোনও সংবাদই পাওয়া গেল না। জলজ্যান্ত মানুষটা সকালবেলায় স্নান-খাওযাদাওয়া করে বুলাকে আদর কবে রওনা হল চাকরি করতে, তারপরেই মানুষটা নেই— উধাও হয়ে গেল। জলপাইগুড়ি স্টেশনেও ওকে কেউ দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। থানায এজাহার দেওয়া হল, মাসখানেক পর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, কিন্তু অলোকেশ আর এল না কিংবা তার কোনও সংবাদও কারও কাছ থেকে পাওয়া গেল না।

সুস্থ সবল লোক, সচ্ছল সুখী সংসার, পরিষ্কার স্বভাব চরিত্র— এমন লোক কোথায় গেল, কী হল, কিছুই জানা গেল না। উদ্বিগ্ন বোন দিদি দু'-চারজন আত্মীয়স্বজন এল, গেল, দুঃখ সান্ত্বনার নানান কথা হল, ঠাকুরের কাছে মানসিক করা হল, পাগলাবাবার কাছে ধর্না দেওয়া হল, দিন গেল, রাত গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল। তারপর শোক দুঃখ সবই একসময় নিয়মের মতো হয়ে গেল। এবার সংসার চালাবার চিন্তা এল। অলোকেশের অল্প কিছু সঞ্চয় কিংবা মণিশঙ্করের পেনশনের

টাকায় একটা সংসারের সম্পূর্ণতা আসে না, একটু টানই ধরে, তাই নমিতাকে চেষ্টা করতে হল চাকরির।

বিমা কোম্পানির অফিসে এ-ব্যাপারে সহৃদয়তা ছিল, অলোকেশের বন্ধুবান্ধবদেরও চেষ্টাচরিত্র ছিল, কাজেই কিছুদিনের মধ্যেই নমিতার চাকরি হয়ে গেল বিমা কোম্পানির জলপাইগুড়ি অফিসে। বাইরে থেকে সংসার চলল, কিন্তু ভেতরের ভাঙনটা বিজোড়ই রয়ে গেল। এবং ক্রমে ক্রমে নদীর ধারা ভিন্ন গতি হয়ে গেল। যা ছিল শোকের, দুঃখের, কান্নার, তা আস্তে আস্তে একটা সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসার আকার নিল।

অলোকেশ কোথায় গেল, কেন গেল, অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে কোনও উত্তর খুঁজে পাননি মণিশঙ্কর। শোক সংহত, জীবনের অনিবার্য নিয়মে তা সহ্যাতীত নয়— কিন্তু সন্দেহ অস্থির, বিষাক্ত পোকার মতো কুরে কুরে খায়। মণিশঙ্করের অনেকদিন ঘুম আসে না অনেক রাত পর্যন্ত। ভাবেন, ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েন। নমিতাকে তিনি জানেন, শিক্ষিতা রুচিসম্পন্না, তার মধ্যে কোনও জটিলতা নেই। অলোকেশের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে এমন কিছু মতান্তর বা মনান্তর ছিল না, যা কিনা নিরুদ্দেশ হবার মতো সামান্য কারণও হতে পারে। বরং উলটোটাই ছিল। নমিতা, বুলা আর অলোকেশ— তিনজনে মিলে একটা পরিপূর্ণতা, সুখ অসুখ চাওয়া পাওয়ার এক সরল সমীকরণ। অলোকেশকে তিনি যতটুকু জানেন, সেখানেও কোনও অস্পষ্টতা নেই। নির্বিরোধ, শান্ত, হাসিখুশি মানুষ। বাইরের কোনও ঘটনার জন্যে ঘর ছাড়তে পারে, কিংবা কোনও প্রতিহিংসা তার বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিতে পারে, এমন কোনও খবরের আভাসও তিনি পাননি।

মণিশঙ্কর মাঝেমাঝে ভাবেন তাঁর এই ভাবাটাই বুঝি ভুল। হয়তো সব মানুষের সবটুকু সে কেবল নিজেই জানে, স্ত্রী সন্তান পিতামাতা ভাই বন্ধু যেটুকু দেখে, যেটুকু বোঝে, যেটুকু শোনে, তা-ই শুধু জানে। জীবন তো এক গহন অরণ্য। কোথায় কার কোন অভিমান, কোন গোপন দুঃখ মোমের মতো গলে গলে জ্বলে, কে জানে। মণিশঙ্কর শুধু ভাবতে পারেন, ভাবতে ভাবতে অথই জলে কূল কিনারা হারাতে পারেন। সীমিত আয়তনের মধ্যেই তাঁর যা কিছু ঘোরাফেরা।

বাইরে থেকে হু হু হাওয়া আসছিল। মণিশঙ্কর টেবিলের কাছ থেকে সরে এলেন। নিশি-পাওয়া মানুষের মতো টলতে টলতে এসে দাঁড়ালেন জানলার সামনে। হাওয়ার ঢেউয়ে জানলার পরদাটা ফুলে ফুলে উঠছিল। মণিশঙ্কর পরদাটা একপাশে সরিয়ে দিলেন। বাইরে অন্ধকার আকাশ, কিছু মেঘ, কিছু তারা। ট্রেন চলে যাবার ঝকঝক শব্দ মিলিয়ে গেল দূরের অস্পষ্টতায়। জেলা স্কুলের পেটা ঘড়িতে রাতের ঘণ্টা বাজছে। পাখা ঝটপট করতে করতে কী পাখি উড়ে গেল। জানলার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মণিশঙ্কর। সব যায়। প্রেম যায়, সুখ যায়, শোক যায়— যায় না শুধু সন্দেহ। সব বোঝেন, তবু সন্দেহ থেকে যায়। মনের ফোকরে ফোকরে ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে নিজের থেকেই। অলোকেশ কেন নেই এ-চিন্তার লম্বা হাত তার টুঁটি চেপে রেখেছে।

অলোকেশ যদি অপরিচ্ছন্ন চরিত্রের লোক হত, যদি নারী ও সুরায় তার আসক্তি থাকত, অন্যের সঙ্গে তার শত্রুতার সম্পর্ক হত, কিংবা নমিতার সঙ্গে তার সম্পর্ক চরম অশান্তির হত, তা হলে দুঃখ যতই তীব্রতর হোক না, তা একটা বোঝাপড়ার মধ্যে থাকত। এ যে গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া! ভেবেছিলেন অবসর জীবন শান্তি কুটিরে ছেলের সংসারে থেকে, কাছের দূরের প্রিয়জনদের পরিবেষ্টনে থেকে নিশ্চিন্ত আরামে কাটিয়ে দেবেন। এককালে তিনি সরকারি অফিসে পদস্থ চাকুরে ছিলেন, সংসার করেছেন, মেয়েদের মোটামুটি দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছেন, অবসর নেবার সময় যখন এল তখন মনে হল খরতাপ গ্রীষ্মের তেজি রোদ্দুরে কোনও পল্লবিত গাছের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম নিতে মন চাইছে। স্ত্রীকে হারিয়েছেন তার আগেই— সে শূন্যতা স্মৃতির মুখোমুখি বসে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মণিশঙ্করের বুক চিরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। কিছুই হল না।

আকাশে কখন আরও মেঘ জমেছে, কে জানে। দূরে কোথায় বিদ্যুৎ চমকাল। আরও বেশি

বাতাস আসছিল জানলা দিয়ে। ঠান্ডা ঠান্ডা ভেজা ভেজা বাতাসের ঝাপটা লাগছিল চোখে মুখে। হাওয়ায় সেই খবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর করে উড়ছে। কাগজদুটো তুলে রাখা হয়নি। নমিতা দেখেছে কিনা কে জানে। অমন করে চুপ করেই বা দাঁড়িয়ে আছে কেন। মণিশঙ্কর অস্ফুট স্বরে বললেন, বউমা!

নমিতা মৃদু গলায় বলল, খেতে চলুন বাবা।

মণিশঙ্কর নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। সহজ গলায় বললেন, শরীরটা ভাল লাগছে না। খাবার ইচ্ছেটা তেমন—।

শরীর ভাল লাগছে না? নমিতা ব্যস্ত গলায় বলল। মণিশঙ্কর বুঝলেন শরীর খারাপের কথা বলা ঠিক হয়নি। আজকাল একটুতেই খুব বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে নমিতা। মণিশঙ্কর তাড়াতাড়ি বললেন, না না, শরীর খারাপ হয়নি, ইয়ে মানে খিদেটা খুব একটা—

নমিতা বলল, আপনার আসতে হবে না। ভাত না খান, দুধ রুটি খাবেন। পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নমিতা এগিয়ে এসে খোলা জানলাটা বন্ধ করে দিল, তারপর দুধ রুটি পাঠিয়ে দিতে রান্নাঘরে গেল।

মণিশঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। জানেন ওই দুধ রুটি তাঁকে খেতেই হবে, ভালবাসার এই শাসন না মেনে উপায় নেই। নমিতা চিন্তা করবে, কষ্ট পাবে। মণিশঙ্করের সব কিছুতেই তার দৃষ্টি, কোথাও বেনিয়ম হবার উপায় নেই। গুমোট শোকে তাপে এই ঝিরঝিরে সুখটুকু মণিশঙ্কর দীনহীনের মতো আঁকড়ে থাকেন। এইটুকু তাঁর শেষ জীবনের সম্বল। তবু আজ কেন যেন নমিতাকে একটু আড়ষ্ট লাগল, অন্যান্য দিনের মতো সহজ স্বচ্ছন্দ নয়। তাঁকে খেতে ডাকতে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাটাও স্বাভাবিক নিয়মের মতো মনে হল না। মণিশঙ্কর ভাবলেন হয়তো ঠিক তাই নয়, আজ তাঁর দেখার ভঙ্গিটাই অন্যরকম হয়ে গেছে। তিনি জানেন, নমিতা অন্তঃসলিলা নদীর মতো, বাইরে থেকে তার কিছুই জানা যাবে না। অথবা অলোকেশ নিরুদ্দেশ হওয়ার মধ্যের লজ্জাগ্লানি তাকে লুকিয়ে রেখেছে সবার আড়ালে। অলোকেশকে ধরে রাখতে না-পারার জন্যে তার নিজের কিছু দায়ভাগ সে অস্বীকার করতে চায় না। কারণ থাকুক আর না-থাকুক, আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের সংশয়ী মন হয়তো তাকে পীড়া দেয়— লজ্জায় অভিমানে তাই সে মনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সকলের কাছে। নমিতা হাসে, কথা বলে, কাজ করে— কিন্তু সে সবই বাইরের চেহারা।

মণিশঙ্কর মাঝেমাঝে ভাবেন নমিতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন কিনা। এমন কোনও গোপন কথা আছে কিনা, যা কাউকে বলা যায় না, কারও কাছে প্রকাশ করা যায় না, যা কিনা ছাই-চাপা আগুনের মতো মনের গহনে ধিকিধিকি জ্বলে। কিন্তু বলা হয় না নমিতাকে, জানা হয় না কোনও গোপন দুঃখ বা লজ্জার কথা। নমিতার উদাসীন মুখের মধ্যে অলোকেশ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার ব্যাপার নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা করার মতো প্রশ্রয় খুঁজে পান না। কিংবা তিনি নিজেও হয়তো চান না সোনার কাঠির ঘুম রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে ভাঙিয়ে দিতে।

এখন চারধার শুনশান, নিঝুম। একটু আগেই বুলার কান্নার শব্দ শুনেছেন, এখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। দুধ রুটি খেয়েছেন অনেক আগেই, এখনও ঘুমোতে যাননি বিছানায়, আধশোয়া হয়ে বসে আছেন ইজিচেয়ারে। নমিতারও কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছেন না এখন। হয়তো সেও শুয়ে পড়েছে। মণিশঙ্করের কখন ঘুম আসবে কে জানে। তাঁর ঘরে অলোকেশের কোনও ফোটো নেই। ফোটো আছে নমিতার ঘরে, খবরের কাগজে যে-ছবিটা ছাপা হয়েছিল তারই পরিষ্কার ছবি। তাঁর ঘরে থাকলে মণিশঙ্কর হয়তো আজ সেই ছবি অনেকক্ষণ ধরে দেখতেন। ছোট্টবেলার সেই অলোকেশকে মনে পড়ে। সেই ছোট্টবেলায় বই খাতা নিয়ে ইস্কুলে যাওয়া, দু'পকেটে মার্বেল ভরতি করে সারাদুপুর টইটই করে ঘুরে বেড়ানো, কলেজ জীবনে চশমা-পরা বিজ্ঞানের ছাত্র, মাথায় টোপর দিয়ে বিয়ে করতে যাওয়া। অনেক স্মৃতি। সেই অলোকেশ বড় হয়ে এই বিশাল পৃথিবীর কোথায় হারিয়ে গেল। মণিশঙ্করের বুকের মধ্যে হুহু করে ওঠে।

ঘুম আসবে না এখন। মনে করলেন বাইরে গিয়ে একটু দাঁড়াবেন। বাইরের ঠান্ডা হাওয়ায় একটু শান্ত

হবেন। ঘরের দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে তিনি নিঃশব্দ পায়ে বাইরে এলেন। নমিতার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে, দরজাটা বন্ধ করা হয়নি ভাল করে, ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ভেতরের বারান্দার শেষ প্রান্তে, রেলিংয়ের সামনে। নমিতা। তবে কি আজ নমিতার চোখেও ঘুম নেই?

মণিশঙ্কর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, ডাকলেন, বউমা!

নমিতা চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে মণিশঙ্করকে দেখল। ওর মুখে ধরা পড়ে যাবার লজ্জা। বলল, মাথা ধরাটা—

মণিশঙ্কর নমিতার ছলনাটুকু আমল দিলেন না, দু'পাশে মাথা নেড়ে অস্বীকার করলেন। প্রগাঢ় গলায় বললেন, বউমা, আজ ১২ এপ্রিল।

নমিতা দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দার রেলিং ধরে। ভঙ্গিটা ভেঙে পড়া মানুষের, ঋজুতা নেই, সটান ভাব নেই। ও যেন নিজেকে প্রাণপণে ধরে রাখতে চাইছে, পারছে না। কান্না-আটকানো গলায় বলল, আমি জানি বাবা।

সেকথা মণিশঙ্করও জানতেন। আজকের দিন, আজকের তারিখ, নমিতা জানে। কিন্তু জানতে দেয়নি কাউকেই, মণিশঙ্করকেও না। সে জানাটা একা একা শুধু নিজের মধ্যেই রাখতে চেয়েছিল, কৃপণের মতো, স্বার্থপরের মতো। সন্ধের অন্ধকারে দরজার সামনে থেকে মণিশঙ্কর যাকে সরে যেতে দেখেছেন, তিনি ঠিকই জানতেন, সে নমিতা। লুকিয়ে থেকে দেখছিল স্থবির মণিশঙ্করকে। বইটাও আজ কিনে এনেছে মণিশঙ্করকে অন্যমনস্ক রাখার জন্যে। নিজের বুকে যার এত জ্বালা, সে অন্যের জ্বালাকে ভুলিয়ে রাখতে চায় কেমন ভাবে।

তবু ঠিক এইসময় নমিতাকে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে, সুখ দুঃখ রক্ত মাংসে গড়া এক মানুষ। হাওয়ায় চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল কাঁপছে, শরীর কাঁপছে।

মণিশঙ্কর গলায় কিছু দ্বিধা, কিছু দুঃখ, কিছু শূন্যতা নিয়ে বললেন, বউমা, একটা জিনিস তোমার কাছে চাইব?

নমিতা কোনও উত্তর দেয় না। অপেক্ষা করে থাকে মণিশঙ্করের পরের কথা শোনবার জন্যে। মণিশঙ্কর বললেন, অনেকদিন ধরেই ভাবি, কিন্তু বলা হয়ে ওঠে না।

নমিতা তবু চুপ করে থাকে মণিশঙ্করের বলা এখনও শেষ হয়নি বলে।

মণিশঙ্কর বললেন, অলোকেশ তো ডাইরি লিখত, দেখেছিলাম যেন। শেষ যেটা লিখেছিল, মানে গত বছরেরটা, আমাকে একদিনের জন্যে দেবে?

একটু সময় নমিতা স্থির হয়ে থাকে, তারপর তার ডান হাতটা আস্তে আস্তে মণিশঙ্করের দিকে বাড়িয়ে দেয়। মণিশঙ্করের মনে হল নমিতার ডান হাতে ধরা আছে একটা ছোট্ট বই। অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায় না, তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ওটা অলোকেশের ডাইরি, যা তিনি একটু আগেই চেয়েছেন। এবার তাঁর অবাক হওয়ার পালা। কিন্তু তিনি অবাক হলেন না। তাঁর বুকের মধ্যে মনের মধ্যে কেমন করে উঠল। তিনি পরিষ্কার জেনে গেলেন ওই ডাইরিতে আলাদা করে কিছু লেখা নেই। ওই ডাইরি বারবার পড়েও নমিতা নিরুদ্দিষ্ট লোকটাকে খুঁজে পায়নি। ডাইরিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মণিশঙ্কর। নমিতা কাঁদছে। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সব দুঃখ অভিমান কান্না হয়ে অবাধ জলস্রোতের মতো ছুটে আসছে, গড়িয়ে পড়ছে দু'চোখের কোল দিয়ে। মণিশঙ্করের বড় লোভ হয় নমিতার মতো কাঁদতে। কিন্তু কাঁদতে পারেন না। নমিতার কান্নাটা যেন তাঁকে ধুইয়ে দিচ্ছে, তাঁর দ্বিধা, মলিনতা। হঠাৎ তাঁর রাগ হয়ে গেল। এক বছরের সব দুঃখ বেদনাকে তিনি শক্ত একটা খাঁচায় বন্দি করে রাখলেন। বললেন, তুমি কাঁদছ, কিন্তু কার জন্যে কাঁদছ? ওই ইডিয়ট, অবিবেচকটার জন্যে।

মণিশঙ্কর সোজা হয়ে দাঁড়াতে চান। নিঃসীম বাতাসে হাত বাড়িয়ে ধরবার মতো কিছু খোঁজেন।

শববাহক

এ-বাড়ির সামনে দিয়ে যে-রাস্তাটা মোহন্তপাড়ার মোড় হয়ে দক্ষিণে বেঁকে গেছে মাষকলাইবাড়ি শ্মশানের দিকে, এখন এই শুনশান রাতে সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ছমছমে শব্দগুলো। অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছে বলে খুব স্পষ্ট নয়, তবু বোঝা যায় কীসের শব্দ ওটা। এখনও সরমা ঘুমিয়ে পড়েননি বলে আর ঘুমঘুম আচ্ছন্নতায় শুধু চোখের পাতাদুটো ভারী হয়ে আসছিল বলে প্রথমবার ভাসাভাসা শুনেছিলেন। দ্বিতীয়বার শব্দটা কানে এল ঘুম তাড়িয়ে। এই নির্জন পাড়ায় এখন রাত্রি আস্তে আস্তে নিঃসঙ্গ হয়ে আসছে বলে শব্দটা অন্য কোনও শব্দের সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে যাচ্ছিল না। সরমা কান পেতে শুনলেন। হ্যাঁ, ভবের খেলা সাঙ্গ হল কার, ভগবানের নাম করে করে তার শরীরটাকে নিয়ে যাচ্ছে প্রিয়জনেরা।

যেতে যেতে শব্দটা দূরে চলে গেল একসময়। আর শোনা গেল না। কিন্তু হারিয়ে গেল না। তখনও যেন মিশে রইল সরমার বুকের ধড়াস ধড়াস শব্দের সঙ্গে। দূর থেকে ডেকে ডেকে কে যেন চলে গেল। কে যেন বলে গেল, তৈরি হও, ফুরিয়ে আসছে বেলা। কে? বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভয়ভয় চোখ মেলে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখেন সরমা। কেউ নেই। শুধু ছায়াছায়া অন্ধকার ভাসছে। ভয়টা বুকের ওপর পাথরের মতো চেপে বসে থাকে। মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে। তিনি ইচ্ছে করলেই উঠে বসতে পারবেন না, ডাকতে পারবেন না পাশের ঘরের মানুষকে। অথচ দরজার ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরের আলো দেখতে পাচ্ছেন, শব্দ পাচ্ছেন চলা-ফেরার। ও-ঘরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বলে। এই তো মাস খানেক ধরে ছেলে-বউ নীলিমা খুব ভুগে উঠল। ছেলে নিত্যানন্দের টুইশানি সেরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। তারপর এটা সেটা কাজ সারে, খায়দায়। আলো নেভাতে নেভাতে বেশ রাত্রি হয়ে যায়। সরমা এখন যা দেখছেন, সেই একই ছবি প্রত্যেকদিনের। এ-ঘর অন্ধকার থাকে, ও-ঘরে আলো জ্বলে, বাইরে নিস্তব্ধ রাত্রি দমবন্ধ করে পড়ে থাকে। সেই এক রং, সেই একই চরিত্র, তবু আজ ভয় পেয়ে জেগে উঠেছেন। দূরে কোথায় যেন ঢং ঢং ঘণ্টা বেজেই চলেছে। সময় শেষ, এবার যেতে হবে।

সরমা একটু উঠে বসতে চাইলেন। গলা শুকিয়ে এসেছে। একটু জল খেলে গলাটা ভিজত। জল খেতে হলে উঠে বসতে হবে। আলো জ্বালাতে হবে ঘরের। কেউই নেই যে এখন একটু জল এগিয়ে দেয় তাঁকে। তিনি একাই থাকেন এ-ঘরে। নিত্যানন্দ নিজের বউ-সংসার নিয়েই ব্যস্ত। এ-ঘরে যে এক বাহাত্তুরে নড়বড়ে বুড়ি আছে, টসটসে পাকা ফলের মতো আলগা বোঁটায় লেগে আছে, সে টুপ করে কি খসে গেল, মরল না বাঁচল, সে খবর কে রাখে! বউটা ভুগেছিল, কিন্তু সেরেও উঠেছে সেবাযত্ন, ওষুধে, ডাক্তারে। তা ভোগাটা তো শরীরেরই নিয়ম। শরীর থাকলেই ভুগতে হয়। শরীরকে ফেরানো যায়, বয়েসকে তো যায় না। সরমার যা যাচ্ছে তা যাচ্ছেই। তরতর করে এগিয়ে চলেছে। একেবারে ঘাটে গিয়ে থামবে। সে হুঁশ আছে কারও? এই হয়, বউ-সংসার থাকলে গর্ভধারিণী মা'র কথা কেউ মনে রাখে না।

সরমা আস্তে আস্তে উঠে বসেন বিছানায়। উঠে বসতে বসতে আজ খেয়াল হল জোর অনেক কমে গেছে। একটুতে হাঁপ ধরে গেল যেন। দিন যায়, গুনতির সংখ্যাগুলোও কমে আসে একটা একটা করে। ফুরোতে ফুরোতে একদিন কিছুই থাকবে না, ফুড়ুত করে উড়ে যাবে প্রাণপাখি। ব্যস, খেল খতম। ওইরকম হরিবোল করতে করতে শূন্য খাঁচাটাকে চার কাঁধে নিয়ে যাবে কিছু মানুষ।

ভয়টা আবার ফিরে আসে। বুকের ঝাঁপিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে শীতল সাপের মতো। বিছানা থেকে সাবধানে নামেন। খাটের পায়া ধরে ধরে বসে পড়েন নীচে। আভাসে আন্দাজে হাত বাড়িয়ে খাটের তলা থেকে টিনের তোরঙ্গটা খুঁজে নেন। ডালাটা খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা পলিথিনের থলি বের করে আনেন। থলির ভেতর থেকে অর্ধেক-খাওয়া আপেল বের করে থলিটা আবার তোরঙ্গে ঢুকিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দেন। মেঝেতে বসে বসেই আপেলে কামড় দিলেন। দাঁত প্রায় নেই-ই, যে-ক'টা আছে তাও তিনপায়া চেয়ারের মতো নড়বড়ে। জোর নেই, ভাল করে চিবোতে পারেন না। তবু জানেন আপেল পুষ্টিকর খাদ্য। আপেল খেলে শরীর ভাল থাকবে, বাড়তি বল পাবেন। একটু ভালমন্দ খেলে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারবেন। তা বউটা খায় দুধ, ছানা, ফলপাকড়, নানান ওষুধ। এসব খেয়েই নীলিমা মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে। মাঝের ক'টা দিন তো যমে-মানুষে টানাটানি চলেছিল খুব। না, তার কপালে ওসব নেই। দু'মুঠো মুড়ি, একটু ভাত, এক হাতা দুধ, একটু চিঁড়ের জাউ— বাস। বুড়ো মানুষের নাকি বেশি খেতে নেই। বেশি খেলে নাকি পেটে সইবে না। অসুখবিসুখ বাধিয়ে বসে শেষপর্যন্ত—

সরমা অন্যমনস্ক হয়ে যান। খাটটা ধরে আবার উঠে দাঁড়ান। অসুখবিসুখ বাধিয়ে শেষপর্যন্ত চার কাঁধে চড়ে বসতে হবে। মৃত্যুর নামটা আজ যেন বারবার কানে শুনছেন। সকালে চিঠি এসেছিল নিত্যানন্দের নামে। মনে পডছে সেই চিঠিতে মৃত্যুসংবাদ এসেছিল। একটু আগেই শুনলেন শ্মশানযাত্রীদের গলা। ভাবতে ভাবতে সরমা মনে করতে চাইলেন সকালের চিঠিতে কার মৃত্যুসংবাদ শুনেছেন। অনেক ভেবেও নামটা মনে এল না। অথচ খুব কাছের কোনও মানুষের নাম যেন। এই হয়েছে আজকাল। সবই ভুলে যান। একটু সময় গড়াল কি মন একেবারে ফাঁকা। পাঁচ মিনিট আগের কথা মনে নেই। বযেসটাই বাডছে, কমে যাচ্ছে আর সবকিছু। দৃষ্টি, শরীর, স্মৃতি। হঠাৎ ভারী অসহায মনে হয নিজেকে। মনে হয যেন কোনও জনহীন নদীর পারে একা একা বসে আছেন তিনি। নদীর ওপারে ধীরে ধীরে নেমে আসছে সন্ধে। বুকের মধ্যে ভয় কাঁপে। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখেন। আবছা অন্ধকারে কিছুই দ্যাখা যায় না। কী করবেন, কাকে বলবেন, কিছুই বুঝে পান না।

ভয় ভাঙাতেই বুঝি হাতের আপেলে কামড় বসান। যেন ওই আপেল খাওয়ার ওপরই তাঁর মরণ বাঁচন। কিন্তু খেতে পারলেন না। শক্ত খোসায় দাঁত বসে না। তবু চেষ্টা করেন চিবোতে। পলিথিনের থলিতে পড়ে আছে কয়েকটা ভাঙা বিস্কুট, ওষুধের ক্যাপসুল। কে আর দেবে। সবই জোগাড় করতে হয়েছে নিজেকেই। নীলিমা এসব খুঁটিনাটি খেয়াল করে না। ফাঁক ফোকরে তার চোখ নেই। টেরও পায না কে কী নিল। সরমা ও-ঘরে গেলে চুপিচুপি ফলটা বিস্কুটটা কাপড়ের আড়ালে তুলে নেন। ওষুধের ক্যাপসুলগুলো এনেছেন বেশ কিছুদিন আগে। ভেবেছিলেন খেলে হয়তো শরীর ভাল থাকবে। কিন্তু পরে ভাবনা হয়েছিল। কীসের ওষুধ জানেন না, তাই খেতেও ভরসা পাননি।

বাড়ির বাইরে বিশাল শিশু গাছটাতে পাখার ঝটপটানির শব্দ হয়। রাজ্যের শকুন ওই গাছে রাত কাটায়। সরমার গা ছমছম করে। বড় বড় চোখে ঘরের অন্ধকার দেখেন। অনেকদিন ধরে দেখছেন। অন্ধকারটা চেনা হয়ে গেছে। বয়েস বুঝতে পারেন অন্ধকারের। না, এখন খুব বেশি রাত্রি হয়নি। একটু আগেই হয়তো নিত্যানন্দ ফিরেছে। আপেলটা বালিশের নীচে রেখে সরমা বিছানার পায়ের দিক থেকে লাঠিটা হাতে চেপে ধরে উঠে দাঁড়ান। মজবুত বেতের শক্ত লাঠি। কর্তার আমলের জিনিস। এখনও আগের মতোই আছে। শেষের দিকে অশক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, বাতের ব্যথায় ভাল করে হাঁটতে পারতেন না শশীকান্ত। তখন এই লাঠিটা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। এখন সরমার। লাঠিটা বাড়তি শরীর জোগায়। একটু সাহস পান। মনে হয় যেন কর্তা ধরে ধরে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন।

লাঠিটা শক্ত করে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে যান সরমা। দরজায় খিল নেই। এমনি ভেজানো থাকে। বয়েস হয়েছে তাঁর। রাতবিরেতে বিনা নোটিশে হঠাৎ শরীর খারাপ টারাপ হয়ে যেতে কতক্ষণ। তাই এই ব্যবস্থা। একটু ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। সরমা ও-ঘরের ভেতরে যান না।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁপাকাঁপা গলায় ডাকেন, অ বউমা!

পাশাপাশি ঘর, মাঝখানে দরজা। এ-ঘরে সরমা, ও-ঘরে ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ চা-কোম্পানির হেডঅফিসে চাকরি করে। সন্ধের পর টুইশানি করে একটা। সেও অন্য পাড়ায়। ভাগ্যিস পৈত্রিক বাড়িটা ছিল, তাই রক্ষে। নইলে বউয়ের অসুখে ওষুধে ডাক্তারে জেরবার অবস্থা হলেও এখনও টিকে আছে! তা নীলিমা মেয়েদের অসুখে ভুগেছে অনেকদিন। এখন অনেক ভাল। শরীর স্বাস্থ্যের রং ফিরেছে, একটু একটু করে হেঁশেলে হাঁড়ি খুন্তি নাড়াচাড়া করে। চোদ্দো বছরের নাতনি লক্ষ্মী কোনওরকমে দু'বেলা চালে-ডালে ফুটিয়ে নিচ্ছিল এতদিন। এখনও মাকে সাহায্য করে। ইদানীং অল্প বয়েসি এক ঠিকে ঝি-কে রাখা হয়েছে। সে সন্ধের আগেই বাড়ি চলে যায়।

এ-ঘর লম্বা চওড়ায় কিছুটা বড়। দু'পাশে দুটো বিছানা। একটাতে নীলিমা আর লক্ষ্মী, অন্যটাতে পাঁচ বছরের নাতি সন্তু আর নিত্যানন্দ শোয়। নিত্যানন্দ বিছানায় বসে বসে চশমা চোখে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। সন্তু ঘুমোচ্ছে। লক্ষ্মী শুয়ে আছে, তবে ঘুমোয়নি। নীলিমা বসে ছিল। সরমার কথা শুনে বলল, কী বলছেন মা? উঠে এলেন কেন?

সরমা ঘরের মধ্যে আসেন না। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে দরজার চৌকাঠ ধরে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মাথাটা শুধু কাঁপে। চোখদুটো এদিক ওদিক করতে করতে আটকে রইল টেবিলের ওপর রাখা একটা ওষুধের শিশির দিকে। লক্ষ্মী দুপুরে বলেছিল ওই লাল ওষুধ খেলে নাকি শরীর ভাল থাকে, ফিরে আসে হারানো স্বাস্থ্য। সরমার বুকে নিশ্বাস ঘুরপাক খায়। নীলিমার শরীর ভাল হচ্ছে। তাঁর যা গেছে তা আর ফিরে আসবে না। কানে আসে শ্মশানযাত্রীর গলা। দূর থেকে কে যেন তাঁকে অবিরত ডাকছে।

নিত্যানন্দ বলে, কী হল মা?

দৃষ্টির জোর অনেক কমে এসেছে। কাজের জিনিসও ঠাহর হয় না। চোখ কুঁচকে তাকান সরমা।

ও নেত্য, আমার যে কিছু মনে থাকে না বাবা!

কী আবার মনে থাকে না?

কিছু মনে থাকে না। শরীল তো একেবারে বেহাল হয়ে গেল। তা, ও নেত্য, বলব তোকে, ডাকলাম বউমাকে। নামটাও ভুলে যাই।

নিত্যানন্দ বলল, কার নাম?

ওই যে সেই নামটা, সক্কালবেলাতে তোকে বলতে শুনলাম! নিত্যানন্দ একটু সময় ভাবল। মনে পড়ল না। মা কার নামের কথা বলছে কে জানে। বলল, তা এখন কী! এখন যাও তো, ঘুমাবে যাও। যা তো লক্ষ্মী, ঠামাকে বিছানায় দিয়ে আয়।

সরমা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেন না। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নড়েন না। নীলিমাকে দেখেন। ভাল করে দৃষ্টি যায় না, তবু মনে হয় বউটার শরীরে অনেক চেকনাই এসেছে। হবে না, ভাল ভাল খায় যে! তাঁর মতো নিঃসম্বল নয়।

লক্ষ্মী কাছে এসে বলে, চলো ঠামা, বিছানায় যাবে চলো। সরমা লক্ষ্মীর কথায় কান দেন না।

অ নেত্য, শরীল যায়। ডাক্তার দেখাবি না? নামটা মনে পড়ে না। কার চিঠি এল, তুই পড়লি, নাম বললি—?

নিত্যানন্দের এবার মনে পড়ে যায়। কিন্তু সবকথা তো সবসময় সবাইকে বলা যায় না। এখন রাত, মারও বয়েস হয়েছে, ঠিক এ-সময়ে সকালের চিঠির প্রসঙ্গে কিছু বলতে মন চাইল না। বলল, এখন ওসব কথা কেন।

সরমা মাথা নাড়েন। ভারী অপ্রসন্ন দেখায় তাঁকে। বলেন, তা তুইই তো বললি। সকালে চিঠি এল পোস্টোকাডে, নাম বললি। পোড়া কপাল আমার, সব ভুলে গেচি। ও বউমা, তুমিই বলো না কে গেল। আমার যে ঘুম আসে না ছাই, শরীলে বড় জ্বালা, কেউ নেই একটু দেখে আমাকে।

নিত্যানন্দ ভাবনায় পড়ে যায়। সকালে চিঠি এসেছে কুচবিহারে ব্রজবিহারী মারা গেছেন। সরমা সকালেই শুনেছেন। এখন কী খেয়াল হয়েছে, নামটা জানতে চাইছেন। হয়তো সকালের কথা ঠিক মনে আসছে না। এখন নাম না বলেও উপায় নেই। মা সারারাত ঘুমোবেন না। গজগজ করবেন, গালমন্দ করবেন, হয়তো অসুস্থও হয়ে পড়বেন। এমন ছিলেন না মা। ইদানীং বড্ড বেশি নিজের সম্বন্ধে ভাবেন।

সরমা আবার বলেন, অ নেত্য, বল না কার খবর এল পোস্টোকাডে?

নিত্যানন্দ বলল, অনেক রাত হয়েছে মা এখন ঘুমাও গে।

সরমার মুখটা ঝুলে আসে। বলেন, ঘুমাব রে ঘুমাব, চোখে চন্দন-তুলসী দিয়ে ঘুমাব। তোদের শান্তি হবে, আপদ বিদেয় হবে। নামটা মনে এলে তোকে এমন করে খোশামোদ করতাম না।

একটু চুপ করে থেকে নিত্যানন্দ বলল, ব্রজকাকু মারা গেছে।

কে? কার নাম বললি নেত্য? সরমা চমকানো গলায় জানতে চান।

নিত্যানন্দ উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে।

সরমা মাথা নাড়তে নাড়তে লক্ষ্মীর দিকে তাকান, তোর বাবা কার নাম বলে রে লক্ষ্মী? দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, মাজা ভেঙে যায়। কানেও শুনি না। ও লক্ষ্মী, বল না, তোর বাবা কার নাম বলল?

লক্ষ্মী মৃদুগলায় বলল, ব্রজদাদু।

কিছু বলতে গিয়ে থেমে যান সরমা। শরীরটা আরও যেন বেঁকে যায়, থমথম করে ওঠে বলিরেখায় কুঞ্চিত শিথিল মুখটা। চোখে ছায়া ভাসে ভয়ের। এত জানাশোনা নামটাই ভুলে গিয়েছিলেন? স্বামী শশীকান্তের দূর সম্পর্কের ভাই ব্রজবিহারী। এই শহরেই আলাদা ভাড়া বাড়িতে থাকলেও ব্রজবিহারীর বেশিরভাগ সময় কাটত এই বাড়িতেই। শশীকান্ত আর ব্রজবিহারী ছিল প্রায় সমবয়সি। ঘনিষ্ঠতাও ছিল সেই কারণেই। খুব সুন্দর দেখতে ছিল ব্রজবিহারীকে। স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল, হাসিখুশি। সন্ধে হলেই এ-বাড়িতে বসত তাসের আসর, আরও দু'-চারজন আসত। খেলতে খেলতে ব্রজবিহারী বাড়ি কাঁপিয়ে হাঁক পাড়ত, কই গো বউঠান, এক হাত খেলবে এসো। কখনও, শিগগির পানের বাটা নিয়ে এসো। সংসারে কত কাছের সম্পর্ক দূরে চলে যায়, দূরের সম্পর্ক কাছে আসে। চোখের সামনে সব জেগে থাকে। সেই মুখ, সেই কথা। সেই ব্রজঠাকুরপোও চলে গেল। স্বামীর আমলের শেষ যোগসূত্রটাও ছিঁড়ে গেল। আস্তে আস্তে সব চলে গেল। তাঁরও যেতে হবে। পশ্চিম আকাশের আলো নিভে আসছে একটু একটু করে। ঝুপ করে কখন অন্ধকার নেমে আসবে। সেই অন্ধকার তাঁকে চিরদিনের মতো মুছে দেবে।

লক্ষ্মী বলল, চলো ঠামা, বিছানায় চলো।

সরমা কথা বলেন না। আর কিছু জানবারও নেই তাঁর। চুপ করে বিছানায় ফেরেন। কী মনে হতে থেমে যান। মুখ ফিরিয়ে ছেলেকে খোঁজেন। বলেন, অ নেত্য, ডাক্তার দেখাবি না? কালীঘাটে যাবার সাধ ছিল, কবে থেকে বলচি।

নিত্যানন্দ বলল, শুতে যাও এখন মা।

আগে কথা দে।

কী কথা দেব?

ডাক্তার দেখাবি— এই দ্যাখো, কী বলতে গিয়ে কী বলচি। কথা দে কালীঘাটে নিবি। কদ্দিন ধরে পইপই করে বলচি।

নিত্যানন্দের মনে পড়ে না মা আগে কখনও কালীঘাটে নিয়ে যাবার কথা বলেছেন কিনা। হয়তো আদৌ বলেননি। আসলে মা'র স্মৃতি বলতে কিছু নেই। যখন যা মনে আসে তাই বলে ফেলেন। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাইরে আর কিছু ভাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। যা হোক কিছু বলে এখন মাকে ফেরত পাঠানো দরকার। বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে! এখন শুতে যাও তো।

তা কথা দিলি? ও নেত্য, কবে আছি কবে নেই। কথা দিলি তো?

দিলাম।

আমার গা ছুঁয়ে বল।

নিত্যানন্দ সরমার গা ছোঁয় না। চুপ করে থাকে।

সরমা বলেন, ও লক্ষ্মী, তোর বাবা গা ছোঁয় না যে?

লক্ষ্মী বাবার মুখের দিকে তাকায়। নিত্যানন্দ গম্ভীর গলায় বলে, মুখেই তো বললাম।

সরমা খুশি হন না। মুখের রেখাগুলো কাঁপে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। কিছু না বলে নিজের বিছানার দিকে যান। বুঝতে পারেন ছেলে বিরক্ত হয়েছে। ওকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে আছেন। বলে কয়ে একটু ভালমন্দ খেলে, একটু ওষুধ দুধ ফল মুখে দিতে পারলে, বয়েসের সঙ্গে যুঝতে পারবেন। শেষ জীবনকে ধরে রাখতে ওইটুকুই দরকার তাঁর।

বিছানায় এসে চুপ করে বসে থাকেন সরমা। সময় গড়িয়ে রাত আরও গভীর হয়ে নেমে আসে। নিঃঝুম হয়ে যায় চারপাশ। পাশের ঘরের আলো নিভে যায় একসময়. ছমছমে অন্ধকারে ডুবে যায় রাত। ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে অন্ধকার দেখেন। স্মৃতির মুখগুলো অন্ধকারে ভেসে থাকে। আস্তে আস্তে চারপাশের পৃথিবীটা ছবি হয়ে যাচ্ছে। শুকনো ডাল থেকে খসে পড়ছে সব পাতা। স্বামী শশীকান্ত অনেক আগেই চলে গেছেন। বড় ছেলে শিবানন্দ অকালে গেছে। শাশুড়ি গেছেন, ভাই গেছে, বোন গেছে। আজ চিঠি এসে ব্রজঠাকুরপোও চলে গেছে। বয়েস নতুন করে দেয় না কিছুই, পুরনো জিনিসগুলো কেড়ে নেয় একে একে। সেই কবে থেকে হারানোর পালা শুরু হয়েছে। এবার তাঁকেও যেতে হবে। সরমার বুকে ভয় জাগে। মশারির বাইরে হাত বাড়িয়ে শিয়রের কাছের টেবিল থেকে জলের গেলাসটা খোঁজেন। উঠে বসে জল খান। একটু চোখ বুজে বসে থাকেন। কালীঘাটের কথা ভাবেন। তীর্থ করলে মন শান্ত হবে। ভয় থাকবে না। এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনা আসে। মন শান্ত হয় না। হাত দিয়ে ধরার মতো কোনও অবলম্বন খুঁজে পান না।

রাত আরও বাড়ে। কিন্তু দু'টি পাতা এক হয় না চোখের। চারধার যতই নিস্তব্ধ নিঝুম হয়, ভয়টা যেন আরও বেড়ে যায়। অন্ধকার থমথম করে। গাছের ডালে শকুন পাখা ঝাপটায়। মনে হয় কে যেন তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। মনে মনে দেয়ালে টাঙানো শশীকান্তের ছবির মুখটা ভাবেন। স্বামীর মধ্য বয়সের ফোটো। স্টুডিয়ো থেকে এনলার্জ করে আনা। ভাল মানুষের নির্বিরোধ মুখ। হঠাৎ মনে হয় ছবির মুখ হাসছে। এক চিলতে সরল হাসি যেন পরিহাসের হাসি হয়ে গেছে। শশীকান্ত যেন বলছেন, কী বউ, ফাঁকি দিয়ে এতকাল তো খুব কাটালে। এখন কাকে ঠকাবে। এখন তো ফসকা-গেরো। দেখছ না পেয়াদা এসে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

ভয় পেয়ে সরমা চোখ মেলে তাকান। অন্ধকার। তাকিয়ে থাকতেও ভয়, চোখ বুজে থাকতেও ভয়। তাকিয়ে থাকলে সত্যি বুঝি কাউকে দেখবেন পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ বুজে থাকলে ভয়ের ছবি দেখবেন। আজ কেন যেন বারবার মনে হচ্ছে সত্যি বুঝি তাঁর যাবার সময় এসে গেছে। এত সাধের পৃথিবী থেকে তাঁকে চলে যেতে হবে। এ-ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর বেঁচে থাকার অজস্র চিহ্ন। কতকাল ধরে বেঁচে আছেন। অভ্যেসটা পুরনো হয়ে গেছে। ছাড়তে এতটুকুও ইচ্ছে করে না। দেয়ালের তুলোর তাজমহলে, বালিশের ওয়াড়ের কোণে, সুতোর লাল গোলাপে, বিছানায় পাট করে রাখা কাঁথায় নকশায়, পানের ডিবে, মকরধ্বজের খল-নুড়িতে, মিশে আছে তাঁর প্রথম মধ্য বর্তমান জীবন। সেই কবে ঘোমটা মাথায় নতুন বউ হয়ে এ-বাড়িতে এসেছিলেন— স্বামী, পরিচিত প্রিয়জনদের সঙ্গে সাধ-আহ্লাদের তুমুল দিন রাত্রির সব স্মৃতি মনে পড়ে। সব ছেড়ে যেতে হবে। সময়ের নদী ছুটে চলেছে নিরবধি, আটকাবে কে। বয়েস বাড়ে। বাড়তে বাড়তে বয়েসটাই লাটাইয়ের মতো গুটিয়ে আনে জীবনকে। সেই কবে থেকে দেখে আসছেন মুকুল থেকে গুটি হয়, গুটি বড় হয়ে রং লাগে। টুসটুসে থাকে, তারপর একদিন টুপ করে খসে পড়ে। সব জানেন, সব বোঝেন, তবু মনকে ভোলাতে পারেন না। আরও অনেকদিন থেকে যেতে সাধ হয়।

14537
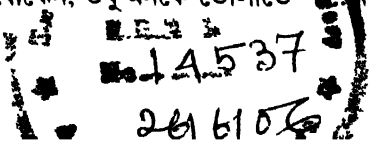
জীবনের সীমানা এখন তো কত বড় হয়ে গেছে। একটু যত্ন পেলে তিনিও হয়তো আশি-নব্বই পার হয়ে যেতে পারেন। তাঁর মনের দুঃখ কে বুঝবে? কী তাঁর অবলম্বন আছে? লাল ওষুধ খেলে শরীর নাকি ভাল হয়। অমনি ওষুধ কে তাঁকে এনে দেবে। ভাবতে ভাবতে ভারী অসহায় মনে হয় নিজেকে। যতদূর চান, শুধু ধূ-ধূ করছে শূন্যতা। একসময় ভাবেন আর ভাববেন না। একটু ঘুমোবেন এখন। না ঘুমোলে কষ্ট পাবেন পরের দিন। এ-পাশ ও-পাশ করেন, চোখ বন্ধ করে থাকেন, কিন্তু ঘুম আর নিজের ইচ্ছাধীন হয় না। আর ঘুম হয় না বলেই ভাবনাগুলো অন্ধকারের গুহা থেকে আবার বেরিয়ে আসে। বালিশের নীচে কী যেন শক্ত ঠেকে। হাত দিয়ে খুঁজে দেখেন। সেই আধ-খাওয়া আপেলটা। চুরি করে আনা স্বাস্থ্য। অন্যমনস্ক হয়ে যান সরমা। তখনই চমকে ওঠেন। অনেক দূর থেকে কীসের শব্দ ভেসে আসছে। শ্মশানযাত্রীর হরিধ্বনি কি? সরমার বুক হিম হয়ে থাকে। শিশুগাছে শকুনের পাখার ঝটপটানি কানে আসে। দূরে কোথায় কুকুর ডেকে ওঠে। কান্নার মতো, একটানা। সরমা ভয়ে গুটিয়ে থাকেন বিছানায়। শেষরাতে ঘুম আসে। একচিলতে শীর্ণ দেহটা পড়ে থাকে বিছানায়। যেন এক অবুঝ শিশু খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে কখন একসময়ে ঢলে পড়েছে ঘুমের কোলে।

পরের দিন সকালে সরমা লাঠি ধরে ধরে এসে ঢোকেন ছেলের ঘরে। চোখ মুখ জবুথবু। চিন্তাভাবনা সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকান। কিছু বলবেন বলে ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপে শুধু। কিন্তু কী বলবেন ভেবেই থই পান না।

নীলিমা ঘরে নেই। সন্তু টেবিলে বই রেখে পড়াশোনা করছে। লক্ষ্মী ঘরের গোছগাছ সারছে। নিত্যানন্দ বাইরে বেরোবে বলে জামা গায়ে দিচ্ছে। সরমার চোখদুটো আটকে থাকে লাল ওষুধের শিশিতে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চেতনা চোত-বোশেখের রুখোশুখো উদোম মাঠের মতো ছটফট করে ওঠে। হঠাৎ ফিরে পান নিজেকে। মনে পড়ে যায় সব কথা।

মা'র যে গায়ের কাপড় নেই, চাদর নেই, বিছানা নেই, এসব তো লাগবে যে নেত্য?

নিত্যানন্দ জামার বোতাম আটকাতে আটকাতে বলল, কেন?

তেখে গেলে লাগবে না? বললি তেখে নে যাবি— কালীঘাটে— বললি না কাল রাতে?

নিত্যানন্দ আয়নার সামনে এসে চুল আঁচড়াবার জন্যে চিরুনি খুঁজতে খুঁজতে বলল, বলেছিলাম নাকি?

সরমা অবাক মেনে মাথায় হাত দেন, হা মরণ আমার। আমি কি তোকে সক্কালবেলায় মিছে কথা বলছি তালে! তুই না কাল রাতে আমার গা ছুঁয়ে দিব্বি গাললি?

নিত্যানন্দ চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, তোমার গা ছুঁয়ে কিছু বলিনি আমি।

বলিসনি? সরমা থরথর করে কাঁপেন। লাঠির ওপর যেন দেহকে ধরে রাখতে পারেন না। বাঁ হাত বাড়িয়ে কিছু আঁকড়ে ধরতে চান। সামনের টেবিলের কোণ ধরে রেখে কোনওমতে নিজেকে সামলান। ভাঙাভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, তুই আমাকে মিথ্যুক বললি নেত্য? তোর গর্ভধারিণী মা মিথ্যুক? যত সত্যিবাদী হল পরের ঘরের মেয়েটা? হায় হায়, যমেও আমাকে টানে না।

নিত্যানন্দ অবাক হয়ে সরমার দিকে তাকায়। বলে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে মা? এসব আবোল-তাবোল কী কথা বলছ? তোমার গা ছুঁয়ে আমি কখন কথা বললাম? যাও তো এখন, আমি বেরোব।

সরমার চোখ বড় বড় হয়ে যায়। মাথাটা কাঁপে। বলেন, তুই আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস? এক মুঠো খেতে দিস বলে এত ঠ্যাটা?

আহঃ চুপ করো তো।

চুপ করব কেন, অ্যাঁ, চুপ করব কেন? আমার কেউ নেই বলে, কিছু নেই বলে কি ছেলের পায়ের লাথি খেতে হবে? আমি মলে তোর হাড়মাস জুড়ায়, তোর শান্তি হয়!

নিত্যানন্দ রাগ করে কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই টেবিল থেকে লাল ওষুধের শিশিটা

কাত হয়ে নীচে পড়ে গেল। কাচের শিশি ভেঙে তরল ওষুধ গড়িয়ে যায় মেঝেতে। ওই টেবিল ধরেই দাঁড়িয়েছিলেন সরমা, উত্তেজিত শরীরের হাতের কাঁপুনিতে সম্ভবত শিশিটা পড়ে গেছে। দামি ওষুধ, নিত্যানন্দ ঠোঁট কামড়ে ধরল।

সরমা তখন থেমে গেছেন। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন মেঝেতে পড়ে-থাকা ভাঙা শিশির দিকে।

লক্ষ্মী বলল, এই যা, মা'র ওষুধটা ফেলে দিলে ঠামা।

নিত্যানন্দ চটিটা পায়ে গলিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে বাইরে ফেলে দে লক্ষ্মী। বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সরমা হতবুদ্ধির মতো মাথা নাড়েন। মাথা নাড়তে নাড়তেই আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফেরেন। তাঁর জন্যেই নীলিমার ওষুধটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। তার দুঃখ, হতাশা, অভিমান রাগ একাকার হয়ে ভারী হয়ে ওঠে মনের মধ্যে।

হঠাৎ কী হয়ে যায়।

ঘরে এসে বিছানার কাছে যাবেন, যেতে পারলেন না। তাঁর পায়ের নীচে মাটি দুলছে, তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, শরীরের মধ্যে এক ব্যাপক ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে তখন। হাত-পা-বুক-মাথা ঝিমঝিম করছে। তিনি চিৎকার করে উঠতে চাইলেন। পারলেন না। মুখের মধ্যে জড়িয়ে গেছে জিব। রাশি রাশি অন্ধকার চোখের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে দৃশ্যমান জগৎকে চোখের সামনে থেকে মুছে দিয়েছে। হাতের লাঠিটা পড়ে গেছে নীচে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার আগে দেখলেন লাঠিটা খুব কাছেই পড়ে আছে। হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে।

কিছুক্ষণ পরে সরমার প্রাণহীন দেহটা আবিষ্কৃত হল। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন তিনি। ডান হাতটা বেতের লাঠিটার দিকে বাড়ানো। প্রসারিত আঙুল আর লাঠিটার মধ্যে ব্যবধান মাত্র ইঞ্চি খানেকের। একটুর জন্যে ছুঁতে পারেননি তাঁর শরীরবাহক লাঠিটাকে।

এক গল্পের তিন দশক

মফস্‌সল শহরটা যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছিল— কিন্তু শেষপর্যন্ত শেষ না হয়ে ইতির পরে পুনশ্চর মতো কিছু বাড়িঘর উঠে শহরের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে রাস্তাটা মাইল দুয়েক গিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছে আরেকটা আধাশহুরে অঞ্চলকে। রাস্তার দু'ধারে কিছু অনাবাদী জমি, বেহিসেবি কিছু গাছ-গাছালি, আগাছার ঝোপঝাড়। লোকবসতি এখানে নেই। সন্ধে হলেই রাস্তাটা নির্জন হয়ে যায়। হাটঘাট পালাপার্বণের দিনগুলোতে অবশ্য আরও একটু রাত্রি গড়ায়। পাইকারদের নিয়ে ট্রাক-লরি-সাইকেল রিকশা, ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে গোরুর গাড়ি, কিংবা লণ্ঠন হাতে কিছু হাটফেরতা পথচারী খুব তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে যায়। একটু রাত হলেই অবশ্য রাস্তাটা নিজের চরিত্রে ফিরে আসে। রাত বাড়ে, রাস্তাটাও আরও নির্জন অন্ধকার আর ছমছমে হয়ে যায়।

আগে ছিল কাঁচা রাস্তা, শক্ত মাটির মেঠো পথ। কয়েক বছর আগে ভোটের সময় পূর্ত বিভাগ থেকে পিচপাথর ফেলে পাকা রাস্তার চেহারা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিন-চারটে বর্ষা সামলাতে গিয়েই দায়সারা কাজটা ভাঙতে শুরু করেছে। জায়গায় জায়গায় পিচ খসে পাথর আলগা হয়ে গর্ত হয়ে গেছে।

এখন সন্ধে পার হয়ে গেছে। আকাশে শুক্লপক্ষের মাঝবয়েসি চাঁদ। ফিনফিনে জ্যোৎস্না গাছপাতার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে এসে জাফরি কেটেছে আপাত নির্দোষ রাস্তায়। যেন একটা নকশাদার কাঁথা গায়ে দিয়ে রাস্তাটা এখন ঘুমাচ্ছে। এখন দেখে মনেও হয় না কখনও কখনও এ-রাস্তা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। মাঝ রাত্তিরে দু'দলের লড়াই বেধে যায় এ-রাস্তায় দখল নিয়ে। কিংবা সন্ধের অন্ধকারে কোনও পথচারীর সামনে আচমকা এসে দাঁড়ায় কোনও শীতল ভয়। অন্ধকারে ঝলসে ওঠে শাণিত ছুরি। ঘড়ি আংটি টাকা পয়সার বদলে জান নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসে ভয়চকিত পথচারী। জনশ্রুতি এই, সামান্য প্রতিবাদের ঔদ্ধত্যের জন্যে একজনকে চরম শাস্তি পেতে হয়েছিল পূর্বেকার কোনও ঘটনায়।

এ-সময় যখন রাস্তাটাকে নির্জন শান্ত আর নির্বিরোধ মনে হচ্ছিল, তরল সোনার মতো চাঁদের আলো যখন ভাসছে, ঠিক তখনই এক যুবককে সেই রাস্তা দিয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল। যুবকের পরনে চাপা প্যান্ট, চওড়া চামড়ার বেল্ট, হাওয়াই শার্ট, মুখে সামান্য দাড়ি। ছুটে আসতে আসতে সে রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছন ফিরে তাকিয়ে অনেক দূরের কিছু দেখার চেষ্টা করল, তারপর আবার ছুটল। ছুটতে ছুটতে এসে এক জায়গায় এক বিশাল শিমুল গাছের ডানদিকে পাশের ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। রাস্তাটা আবার আগের মতো হয়ে গেল। নির্জন, ছায়াছায়া, থমথমে।

শিমুলগাছের পাশ দিয়ে জঙ্গুলে জমিটার পেছনে একটু দূরে কিছু গাছগাছড়ার মধ্যে অনেককাল আগেকার এক ভাঙা শিবমন্দির। এখন মন্দির শুধু নামেই। দেয়াল ভাঙা, ইট পলস্তরা খসা এক পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ। চারপাশের গাছ আর ঘন ঝোপঝাড়ের জন্যে মানুষের চোখেরও আড়ালে চলে গেছে। মন্দিরের প্রশস্ত চাতালে সময়ের আঁচড় পড়লেও এখনও টিকে আছে। সেই চাতালে সামনের পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে মন্দিরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিল তল্লাটের সবচেয়ে ভয়-জাগানো মস্তান কেষ্ট। ঠোঁটের কোণে ঝুলছে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। চোখদুটো গাছের ওপরে ঘোলাটে আকাশে আটকানো। বসে থাকার ভঙ্গি কিছুটা আয়েশি, দৃষ্টিটাও ভাসাভাসা।

আঠাশ-উনত্রিশের ছিপছিপে লম্বা শরীর, মাথায় কিছু এলোমেলো চুল, কালো ফুলপ্যান্ট অ
ছাইরঙা জামা। শক্ত চোয়াল, চোখ নাক চোখালো।

একটা খসখস শব্দ কেষ্টর কানে এল। ঝট করে সে সটান সোজা হয়ে বসল। চোখে মুখে নে
এল সহজাত সতর্কতা। হাতটা আগে কোমরের তলায় চলে গিয়ে স্পর্শ করছে ধারালো ইস্পাতে
বাঁট। কেউ আসছে। সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়ছে কোনও বেকুফ মানুষ।

কেষ্ট তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠল। সেই শিস লাফিয়ে গিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে টেনে আন
কেষ্টর বয়সি তিন যুবককে। তিনটে অন্ধকারের শরীর টানটান হয়ে দাঁড়াল ওস্তাদের সামনে। কে
চাপা গলায় বলল, হুঁশিযার, ইঁদুর ঢুকেছে। রেডি।

শোনামাত্রই তিনজনে মন্দিরের সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে গিয়ে সামনের তিনটে গাছের আড়া
লুকিয়ে পড়ল। কেষ্টও পাশ থেকে টর্চটা হাতে নিয়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে মন্দিরের ডানদিকে
দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ছায়ার মতো মিশে থাকল। যেই আসুক, পুলিশ কিংবা বিলুর দল, অভ্যর্থনা
ব্যবস্থা পাকা হয়ে থাকল। অন্য তিনজনের হাতও তিনটে ধারালো ছুরি ধরে আছে। কেষ্টও সশস্ত্র
বিনা জবাবে কোনও দুশমনকে ফিরে যেতে দেওযা হবে না।

একটু পরেই দেখা গেল ছুটে আসা ছেলেটা মন্দিরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। অনেকটা প
দৌড়ে এসে সে তখন হাঁপাচ্ছে। তার চোখদুটো মন্দিরের সামনে আশপাশে দ্রুত ঘুরে এল। আবছ
অন্ধকার ফুঁড়েও কাউকে দেখল না সে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। মনে হয় না এখানে কেউ কখনও
কোনওকালে ছিল। ছেলেটা তখন মন্দিরের সামনে দাঁড়িযে মন্দিরটাকেই যেন বলল, জানো আমি
দোস্তি করতে এসেছি কেষ্ট।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে টর্চের জোরালো আলো ঝাঁপিযে পডল আগন্তুকের চোখে। সে
চোখের সামনে একটা হাত ভাঁজ করে তীব্র আলোটা আড়াল করলেও কেষ্ট চিনতে পারল তাকে
হারু, বিলুর ডান হাত। টর্চের আলো একবার হারুর চারপাশে দ্রুত ঘুরে লোক খুঁজল। না, আর
কেউ নেই। হারু একাই এসেছে।

হ্যান্ডস আপ। হাত তোলো ওপরে।

হারু দু'হাত ওপরে তুলল।

কেষ্ট দেয়ালের পাশ থেকে সরে এসে হারুর মুখোমুখি হল। তল্লাশি চোখদুটো তখনও
সন্দেহ-মুক্ত নয়। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা শিকারি চিতাব হঠাৎ আক্রমণের পূর্ব
মুহূর্তের। ঠোঁটদুটো ছুঁচোলো করে নিজেকে প্রস্তুত রাখার ভঙ্গি করল।

কী চাই?

হারু উত্তেজিত গলায় বলল, বিলু তোর কাছে দোস্তি পাঠিয়েছে।

কেন?

ওরা আসছে।

বিলু আর কেষ্টর সম্পর্ক এ-অঞ্চলে সুবিদিত। অন্ধকার শহরের একচ্ছত্র দখলদারি নিয়ে
দু'জনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে অনেকবার, ইজ্জতের সওয়ালে রক্ত ঝরেছে বারবার। তবু বিলু
কেষ্টকে সতর্ক করতে লোক পাঠিয়েছে। মানেটা পরিষ্কার। যারা আসছে, তাদের আসাটা থাবা
বসাবে দু'জনের স্বার্থেই। কিন্তু কারা আসছে? দু'জনের মধ্যে এক অভিন্ন শত্রু আছে। পুলিশ। সেই
পুলিশ আসছে? কেষ্ট একটু অবাক হল। পুলিশ। এলে তো গোপন সূত্রে ওর আগেভাগেই জেনে
যাবার কথা!

কে আসছে র‍্যা? আইনের বাপগুলো?

না, পুলিশ নয়। ওরা আসছে।

ওরা কারা?

ওই ওরা, নতুন পল্লির সব লোক।

হারুর চারপাশে তখন কেষ্টর তিন সঙ্গী দাঁড়িয়ে পড়েছে। তিন জনের হাতেই তিনটে ছুরি। ভাবখানা এই, একটু বেচাল দেখলেই তিন জনেই একসঙ্গে হারুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হারুর কথা শুনতে শুনতে কেষ্টর কপালে ভাঁজ পড়ল।

কোথায় আসছে ওরা?

এখানে। এই রাস্তায়। এই শিবমন্দিরে, তোদের কাছে।

হারুর কথাগুলো প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকল কেষ্টর কাছে। কার এত সাহস হল। বাঘের গুহায় পা ফেলতে চাইছে? এ-অঞ্চলের মানুষের মেরুদণ্ড বেয়ে হিমেল আতঙ্ক আসে কেষ্টর নামে। বিশেষ করে এই রাস্তায়, এই ভাঙা শিবমন্দির এলাকায়, সে প্রায় ঈশ্বর অথবা শয়তানের মতো অপ্রতিরোধ্য। এখানে তার ইচ্ছে এবং অনিচ্ছেই শেষ কথা। কেষ্ট যখন যা খুশি তাই করে। সোনা দানা টাকা পয়সা যখন যেমন ইচ্ছে হয় তাই ছিনিয়ে নেয় অন্ধকারের শিকার পথচারীর কাছ থেকে। দয়া মায়া বিবেক, এসব হৃদয়বৃত্তিগুলো তার কাছে অচল পয়সার মতোই অর্থহীন। যেমন আজ আধবয়েসি বুড়োটা কেষ্টর পা জড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল। ওই টাকা নাকি সে জমি বেচে মেয়ের বিয়ের জন্যে সংগ্রহ করেছে। কেষ্ট দয়া না করলে নাকি বিয়েটা তো ভেঙেই যাবে, বুড়োও মহা সর্বনাশে পড়ে যাবে। কেষ্ট বার দুই ধমক দিয়ে বুড়োকে না ভাগাতে পেরে শেষমেষ তার পেটের মধ্যে কঁ্যাত করে লাথি চালিয়ে দিয়েছিল। বুড়ো তাতেও যায়নি। পেটে হাত দিয়ে কেষ্টর পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়েছিল। কেষ্ট দারুণ রেগে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে বুড়োকে তুলে ধরে ছুরির ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে দিয়েছিল ঘাড়ের কাছে। ভাগ শালা বুঢঢা ভাম, ফের প্যানপ্যান করলে দেব পুরো পেটটাই ফাঁসিয়ে। বুড়ো আর থাকেনি। টাকার চেয়ে জীবনের মায়া বেশি মনে করে হাত দিয়ে ঘাড়ের যন্ত্রণাটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে সরে পড়েছিল।

তবু নাকি কারা যেন আসছে। কিছু লোক কি দল বেঁধে সংরক্ষিত এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে চাইছে। কেষ্ট হিসহিসে গলায় বলল, কোন শালা হারামির এত বড় হিম্মত আছে যে আমাকে ভয় পায় না? কে খ্যাপাচ্ছে কে?

হারু বলল, ওই বিধু মাস্টার। স্কুল মাস্টার বিধু নন্দী। শুনলাম কার জানি মেয়ের বিয়ের টাকা ছিনতাই হয়েছে, লোকটা গিয়ে সাত কথা বলেছে। বিধু মাস্টার তাই দল পাকিয়ে আসছে। পুলিশকে বলে নাকি লাভ নেই, ওরাই নিজের হাতে আইন নেবে।

কেষ্টর চোখের সামনে আধপাগলা বিধু মাস্টার ভেসে উঠল। খয়া খয়া, পোকায় কাটা ছোটখাটো চেহারা। কিন্তু তড়পায় খুব। কী সব আদর্শ-টাদর্শের কথাটথা বলে। হাঁটুর ওপরে মোটা খদ্দরের ধুতি আর পায়ে ছেঁড়া চপ্পল, কখনও বা খালি পায়েই, গ্রামেগঞ্জে একা একা ঘুরে বেড়ায়। ভয়ডর বলতে কিছু নেই। অশিক্ষিত গ্রামের মানুষকে সাহসের কথা শোনায়, তাদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে বলে। সেই তিনহাতী মানুষটার স্পর্ধা বাড়তে বাড়তে এতদূর পৌঁছেছে যে কেষ্টর পেছনে লোক খেপিয়ে দেবার সাহস পায়?

কেষ্ট দাঁতে দাঁত লাগিয়ে ঘষল। না, বিধু মাস্টারটার বিষদাঁত আজ ভেঙেই ফেলতে হবে। বিলুও নিশ্চয় তাই চায়। হারুকে পাঠিয়েছে সেইজন্যেই। অন্ধকারের অধিকার নিয়ে অস্তিত্বের লড়াই চলুক নিজেদের মধ্যে। এর মধ্যে বাইরের লোকের খবরদারি ওরা সহ্য করবে না। কেষ্ট আর হারু জুজু দুটো হলেও ভয় একটা। আর একবার ভয়টা ভেঙে গেলে কোনও বাচ্চাই আর মায়ের কোলে বসতে চাইবে না।

কেষ্ট ততক্ষণে পজিশন নিয়ে ফেলেছে।

ননী, তুই এক্ষুনি রেল বাজারে গিয়ে দেবু আর মনাকে খবর দে। ওরা অমলার ঘরে গেছে। শিগগির।

ননী ছুটল মন্দিরের পেছনে, সেখান থেকে সাইকেল নিল, তারপর সাঁইসাঁই করে উলটোপথে সাইকেল চালাল। রেলবাজারে মেয়েমানুষের ঘরে দেবু আর মনাকে খবর দিতে।

সময় খুব বেশি নেই। হারুর খবর, বিধু মাস্টারের দলটা নাকি ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে। কেষ্ট খুব দ্রুত চিন্তা করে নিল। এ-সময় হারুকেও দলে পাওয়া যাচ্ছে। দেবু আর মনা চলে এলে দলে সাতজন থাকছে। বিধু মাস্টারের দলটাকে ভড়কে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বাবু আর হারুকে নিয়ে কেষ্ট এগিয়ে গেল রাস্তায়, দলটা আসছে কিনা দেখতে।

হারু বলল, দলে নাকি অনেক লোক আছে। ত্রিশ-চল্লিশ জন। কেষ্টর চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠল। বলল, ওরা পঁচিশজন, আর আমরা একজন, এই হল সোজা হিসেব। খুব গা চুলকোচ্ছে বিধু মাস্টারের, অ্যাঁ? দেব আজ হারামিটাকে মাইনাস করে। জ্বালিয়ে দেব ওর ইস্কুল, নতুন পল্লির ঘরবাড়ি।

হারু একটু ঝুঁকে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল, ওই, ওই ওরা আসছে। ওই যে—

কেষ্ট সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল। অনেক দূরে ঘোলাটে জ্যোৎস্না গায়ে মেখে একটা ছায়ার দেয়াল যেন এগিয়ে আসছে। হারু বলেছিল ত্রিশ-চল্লিশ, কিন্তু কেষ্টর মনে হল অনেক বেশি। হারুর হিসেবের ঢের বেশি লোক। দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তে কোমর থেকে সে তুলে নিল ছুরিটা। শক্ত মুঠোয় ছুরিটা ধরে রাখতে চাইল। বেশি লোক হলেই বা কী? আসলে সবক'টাই হল ভেড়ুয়ার বাচ্চা। একটাকে ফেলে দিলেই সব ক'টা ল্যাজ তুলে দৌড় দেবে। মনা দেবু এক্ষুনি এসে পড়বে। আজ বিধু মাস্টারেব বেয়াদপি এমনভাবে ঠান্ডা করে দিতে হবে যাতে করে কেউ কোনওদিন আর কেষ্টর নামে জিভ নাড়তে সাহস না পায়।

নিরেট ছায়াটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে। দলটা এখন অনেক কাছে চলে এসেছে। এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। অনেক লোক, কিন্তু নিঃশব্দ, নিরুত্তাপ। একটা বোবা পাহাড় যেন ধীরে ধীরে আরও সামনে এসে যাচ্ছে।

ছুরিটা কেষ্টর হাতে ধরা থাকে, কিন্তু চোখের তারাদুটো হঠাৎ কেঁপে উঠল কি? তার মনে মনে কখন যেন অন্য এক লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এইভাবে সে কোনওদিন এত মানুষের মুখোমুখি হয়নি। বুঝতে পারছে না পুরনো কায়দায় দলটাকে কবজা করা যাবে কিনা।

বাবু বলল, ওস্তাদ, কেটে পড়াই কিন্তু ভাল।

কেষ্ট বিস্ফারিত চোখে এগিয়ে আসা দলটাকে দেখছে। দেবু আর মনা এখনও আসেনি। কী করবে সে? এত লোক। কেষ্টর মনে হল যতগুলো লোক সে দেখছে, তার চেয়ে বেশি লোক দলে আছে। আস্তে আস্তে সংখ্যাটা বেড়েই যাচ্ছে যেন। চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশো, দুশো— মানুষ, মানুষ, মানুষ। বাড়তে বাড়তে মানুষগুলো যেন এক সমুদ্র হয়ে নিঃশব্দে ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে তটভূমি থেকে ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বলে।

কেষ্ট এক পা, দু' পা, তিন পা পিছিয়ে গেল, পিছন ফিরল, তারপর বলল, পালাও।

গল্পটা এইভাবে যখন শেষ হয়েছিল, তখন ষাটের দশক শুরু হয়েছে। তারপর সময়ের বৃন্ত থেকে খসে পড়েছে আরও দশটা বছর। সত্তরের দশকের গোড়ায় বদলে গেল গল্পের শেষটুকু। হারুর মুখে খবর শুনে ঠিক যখন কেষ্ট তার সঙ্গীদের নিয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, বিধু মাস্টারকে সামনে রেখে একদল মানুষ একজোট হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, তখনই শোনা গেল রিভলভারের গুলির অতর্কিত শব্দ! কিছু বোঝবার আগেই দেখা গেল বিধু মাস্টার আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রের নিখুঁত নিশানা তার বুকের সামনের জামা কালো রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছে।

দল থেকে দু'-চারজন এগিয়ে আসতে চেয়েছিল বিধু মাস্টারের কাছে, কিন্তু একটা দুর্বোধ্য প্রশ্ন তাদের থামিয়ে দিল। কে করল গুলিটা? কেষ্ট কিংবা তার দলের কেউ করেনি, কেননা গুলিটা এসেছে বিপরীত দিক থেকে। তবে কি বিধু মাস্টার এদিকে আসবে জেনে আগেভাগে এসে কেউ লুকিয়ে ছিল কোনও ঝোপের আড়ালে? সীমাহীন আতঙ্কের একটা হিলহিলে-সাপ যেন পেঁচিয়ে

পেঁচিয়ে উঠল আগুয়ান মানুষগুলোর শরীরে শরীরে। তবে কি গুলিটা এসেছে সেই সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার নল থেকে, যারা বিধু মাস্টারের মতো আরও অনেক মানুষকে হত্যা করে, দুর্বার করে তুলতে চাইছে তাদের খতমের অভিযান? ইদানীং তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বিধু মাস্টার, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদটা সেই আশঙ্কাকেই কি তা হলে সত্য করে তুলল?

মুহূর্তের মধ্যে ভোজবাজি হয়ে গেল। রাস্তা ফাঁকা, জনশূন্য। কেষ্ট নেই, তার দলও নেই। এগিয়ে আসা মানুষগুলোও নেই। সবাই পালিয়ে গেছে। কেউ নেই। পড়ে থাকল শুধু সেই নির্জন রাস্তা, রাস্তার ওপর ছড়ানো আধখানা চাঁদের ফ্যাকাশে আলো, থমথমে রাত্রি, আর করুণাময়ী ইস্কুলের সেকেন্ড মাস্টার বিধু চক্রবর্তীর রক্তাক্ত নিঃসঙ্গ দেহটা।

গল্পটা দ্বিতীয়বার এইখানেই থেমে গিয়েছিল সত্তরের দশকে। কিন্তু নব্বই দশকে গল্পটা প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে বাঁক নিল, মেজাজ বদলে ফেলল আগাগোড়া। ফলে হারু নয়, ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল কেষ্টর নিজের দলের লোক, দেবু। শহরের কিছু লোক নাকি এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে। পুলিশ নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে আটক করছে না গুন্ডাদের, রহস্যজনকভাবে চুপ করে আছে সব জেনেও। তারই প্রতিবাদে আগামীকাল বাজার বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে জনসাধারণের পক্ষ থেকে।

কেষ্টর ঠোঁটের কোণে চাবুকের মতো লকলকিয়ে উঠল কৌতুকের হাসি।

বাজার বন্‌ধ? কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে চরম পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সর্বাত্মক হরতাল, অ্যাঁ? তা চেল্লাছে কারা রে? অমূল্য সেনের চামচা বিলু আর হারুরা তো? অ্যাই দেবু, ফের আরেকটা ইলেকশন এসে যাচ্ছে— এই কথা বিধুদাকে জানিয়ে আয়।

মনা বলল, চলো গুরু, বাজারটা একবার চক্কর দিয়ে আসি।

কেষ্ট বোতলের অবশিষ্ট তরল নেশাটুকু মুখের মধ্যে উপুড় করে দিয়ে বলল, চল, দেখে আসি কোন শালা শিং নাড়ছে। আমি, আমরাই শালা পাবলিক। আমাদের ইচ্ছেই পাবলিকের ইচ্ছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে টোটাল লোডশেডিং করে দেব সারা টাউন। অ্যাই মনা, তালিয়া বাজা।

মনা জড়ানো গলায় বলল, যুব নেতা কেষ্ট বোস যুগ যুগ জিও। কেষ্ট বোস লাল সেলাম।

তখনও বাজারের সব দোকান পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। গরমের রাত, একটা দুটো করে ঝাঁপ সবে পড়তে শুরু করেছে। কিছু খুচরো কথাবার্তা, ট্র্যানজিস্টারে হিন্দি সিনেমার গান, টাকাপয়সার হিসেব নিকেশ চলছে। হঠাৎ যেন সব থেমে গেল। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল বাজার ফাঁকা, নিশ্চুপ, জড়বস্তুর মতো নিশ্চল। দল নিয়ে কেষ্ট বাজারে এসেছে।

খোলা পিস্তলটা এক হাতে ঝুলিয়ে কেষ্ট টলতে টলতে একটা খোলা দোকানের সামনে দাঁড়াল। তর্জনী নির্দেশ করে দোকানদারকে বলল, অ্যাই শালা, তোর দোকান কাল বন্‌ধ হবে?

দোকানদারের জিভ জড়িয়ে গেল, ননা তো। খো-খোলা থাকবে।

আরেকটা দোকানের সামনে গিয়ে কেষ্ট বলল, তোর দোকান?

খোলা থাকবে।

আর তোর দোকান?

খোলা থাকবে।

তোর দোকান?

খোলা থাকবে।

তোর দোকান?

খোলা থাকবে?

তোর দোকান?

খোলা থাকবে।

টাউন দারোগার চোখে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। পা দুটো টেবিলের তলায় টানটান করে সবে

শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছেন, ক্রিং ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল। মুখ বিকৃত করে একটা কাঁচা খিস্তি দিয়ে বিসিভারটা থাবা দিযে ধরলেন।

হ্যালো? ইসে, ন-নমস্কার স্যার— না না, সেরকম তো কিছু— সে কী— সব বাজে কথা স্যার— আপনি এস ডি ও সাহেবেব সঙ্গে কথা বলেছেন?— বিলু হারু? ওই বরন্‌ ক্রিমিনাল, অ্যান্টিসোশ্যাল এলিমেন্টস— দেখি, আটকাতে পাবি কিনা— হ্যাঁ স্যার, আপনি যা বলবেন— অবশ্যই, অবশ্যই— নমস্কাব স্যার।

ফোনটা ক্রেডেলে নামিযে রেখে সভক্তিতে কপালে জোড়হাত করলেন টাউন দারোগা।

কনস্টেবল নির্মলের মনে হল কোনও ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করছেন টাউন দারোগা। বলল, কে ফোন করছিল স্যাব?

টাউন দারোগাব ভক্তি জানানো তখনও শেষ হযনি। আরও একটু সময কপালে হাত ঠেকিয়ে রেখে দার্শনিকের মতো মুখ করে বললেন, মিস্টার বিধুভূষণ চক্রবর্তী। মেম্বার অব লেজিসলেটিফ এসেম্বলি।

আহ্নিক গতি

মশারির মধ্যে অনেকক্ষণ আগেই মশাটাকে টের পেয়েছিল কুণাল, কিন্তু শালির বিয়েতে তিনটে দিন হইহই করে কাটিয়ে এসে রাজ্যের ঘুম তখন তার চোখে। দ্বিতীয়বার কামড়াতেও কেবল পাশ ফিরে শুল সে। মশাটা আবার কামড়াতে পারে এরকম কিছু ভাববার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বস্তুত তিনটে দিন যেন ঘোড়ার খুরে ছুটে গেছে। এই বাজার ছোটো, জামাই আনো— এই এসোজনকে আসুন, বসোজনকে বসুন। শ্বশুরবাড়িতে একদঙ্গল লোক, আত্মীয়স্বজন। কখন খাওয়া, কোথায় বা শোয়া। কুণাল এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহী বা চটপটে স্বভাবের কোনও কালেই নয়। তবু বড় জামাই বলে বিশেষ দায়িত্বটা এড়িয়ে থাকতে পারেনি। তাকে আরেকটা রাত থাকার জন্যে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল, কৃষ্ণার ইচ্ছেটাও সেরকমই ছিল, কিন্তু কুণাল থাকেনি। যুক্তিটা অকাট্য। রাজ্য সরকারের এক ব্যস্ততম বিভাগের অফিসার সে। ছুটি বাড়ালে অসুবিধেও বাড়বে।

ভবানীপুর থেকে দমদমে আসতে বেশ রাতই হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার খাওয়ার কোনও প্রশ্ন ছিল না বলে বাড়িতে এসেই সোজা বিছানায়।

কিন্তু ঘুমের আরামে ঢুকে গেল এক মশা। মশাটা আবার কামড়াতেই কুণালের ঘুমটা চটকে গেল। কপালের ডানপাশ চুলকাল সে। জ্বালা করছে। একটু পরে আবার কানের কাছে শুনতে পেল মশাটাকে। মশাটা যতক্ষণ মশারির মধ্যে থাকবে ততক্ষণই বিরক্ত করবে, এ-কথা ভাবতেই খারাপ লাগল কুণালের। অথচ উঠে বসে আলো জ্বালিয়ে মশাটাকে যে মারবে, এই ইচ্ছেটাও ঘুমের জড়তার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকল। নভেম্বরের শেষাশেষি, এ-সময়ে অল্প অল্প শীত পড়েছে। চাদরটা ভাল করে টেনে ফের বাড়তি আরাম খুঁজল কুণাল। কিন্তু আবার মশা। আবার ঘুমের দফারফা। ধুত্তোর! এভাবে ঘুমানো যায়! মশাটাকে মারতেই হবে। কৃষ্ণা পাশে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওর মুখ অন্ধকারে দেখা না গেলেও টের পাওয়া যাচ্ছে। কুণাল হাত দিয়ে ঠেলল, এই, এই।

কৃষ্ণা একটু নড়ল। তারপব যেমন ঘুমিয়ে ছিল, তেমনিই রইল।

এই, শোনো না!

কৃষ্ণা এবার ঘুমের মধ্যেই সাড়া দিল, উঁ?

মশা।

উঁ।

মশা। কামড়াচ্ছে।

আচ্ছা।

কী আচ্ছা?

কৃষ্ণা উত্তর দিল না। একটু অপেক্ষা করে কুণাল হতাশ ভঙ্গি করল। কৃষ্ণা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। তখনই কানের কাছে মশার শব্দ শুনল সে। মনে হল একটা নয়, দুটো কিংবা অনেকগুলো। সারারাত জ্বালাবে। মশার অস্বস্তি নিয়ে একটুও ঘুমানো যাবে না। চোখের পাতাদুটো পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে, অথচ সুখের ঘরে কাঁটার মতো মশা ঘুরছে। উঁহু।

এই, এই শোনো না! এই— কী ঘুম রে বাবা।

এবার কৃষ্ণার ঘুমটা কেটে গেল, কী হয়েছে?

মশা ঢুকেছে।

কই? ঘুমঘুম গলায় কৃষ্ণা বলল।

আছে। কামড়াচ্ছে আমাকে।

ইস। দুঃখ প্রকাশ করল কৃষ্ণা। তারপরই ভাল করে ঘুমানোর জন্য পাশ ফিরল।

বাঃ!

আলো জ্বালাবার জন্যে কুণাল হাত বাড়িয়ে বেড সুইচটা খুঁজে নিল। ধুস! লোডশেডিং চলছে। কিন্তু অন্ধকারে তো মশা মারা যাবে না। তো? টর্চটা কোথায় আছে কে জানে। উঠে গিয়ে অন্ধকারে কোথায় বা খুঁজবে সে। বরাবরই ঘুমকাতুরে। একঘুমে কাটিয়ে দেবার মতো এরকম ঠান্ডাঠান্ডা রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে অন্ধকার হাতড়ানোর কিছুমাত্র এনার্জি পেল না সে।

কিন্তু উৎপেতে মশা তো থেকেই যাচ্ছে। কৃষ্ণাও দিব্যি ঘুমাচ্ছে। বেশ যাই হোক, মশার জন্যে সব ভাবনাচিন্তা যেন কুণালেরই একার। মশাটা কি কৃষ্ণাকে কামড়ায়নি? নিশ্চয়ই ওটা স্ত্রী মশা। পুরুষ হলে কৃষ্ণার সুন্দর বলে অহংকারী মুখে অন্তত একটা কামড় নিশ্চয়ই বসাত এবং যত আক্রোশ কুণালের ওপর থাকত না। কেমন ভোঁসভোঁস করে কৃষ্ণা ঘুমাচ্ছে। ঘুম কি খুব আত্মসুখী জিনিস? ঘুম কি মানুষকে স্বার্থপর করে দেয়? না হলে মাঝরাতে কুণাল জেগে আছে, কিন্তু কৃষ্ণা নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমাচ্ছে কেমন করে? অনেক সুখ অনেক তৃপ্তি মানুষ একা একা পেতে চায়, ঘুম কি সেরকম কিছু?

কুণাল টের পেল মশাটা তার সামনে দিয়ে নির্ভয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। একটা না হয়ে অনেকগুলো মশা হলে, একটা আসছে একটা যাচ্ছে। মশারির মধ্যে মশাগুলো এক নতুন খেলা পেয়ে গেছে। কুণালের শরীরের ফুটো দিয়ে ওরা উড়ে যেতে পারে কিনা দেখছে।

কিন্তু মশা ঢুকল কেমন করে। মশারিতে তো ফুটোটুটো থাকার কথা নয়। বিয়েতে পাওয়া বলে কৃষ্ণার সঙ্গে মশারির বয়েসের দূরত্ব একই। তবে কি শোবার সময় বিছানার চারদিক ভাল করে গুঁজে নেওয়া হয়নি। কুণালের বেশ মনে আছে কৃষ্ণাই পরে বিছানায় এসেছে। মশারিটা ঠিকঠাক কবে না নেবার দায়ভাগ তারই নেওয়া উচিত। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে ঠিক তার উলটো। অর্থাৎ কিনা সে জেগে আছে আর কৃষ্ণা পরিপাটি ঘুমোচ্ছে।

কুণালের রাগ হয়ে যায়। কৃষ্ণাকে একা একা আরাম করতে দেবে না। এই ওঠো না, ওঠো। টর্চটা কোথায় আছে?

ঘুম ভাঙাতে কৃষ্ণা বিরক্ত হল, কী আরম্ভ করেছ বলো তো, ঘুমোতে দিচ্ছ না কেন?

আমিও তো ঘুমাচ্ছি না।

ঘুমাও না। কে মানা করেছে?

মশা আছে। মারতে হবে।

মারো।

বা, বেশ বললে তো?

তো খারাপ কী বললাম।

টর্চ কোথায় আছে এনে দাও।

লাইট নেই?

লাইট থাকলে কি টর্চ আনতে বলতাম?

জানি না।

জানোটা কী?

এই মাঝরাতে ঝগড়া করছ নাকি? মশা ঢোকাটা আমার দোষ হয়ে গেল নাকি?

তোমার না হলেও মশারির দোষ। নিশ্চয়ই ছেঁড়া ফুটো আছে কোথায়ও।

ছেঁড়া ফুটো থাকবে কেন, নতুন মশারি।

নতুন? চার বছর বাদেও?
কৃষ্ণা একটু চুপ করে থেকে বলল, চার বছর কি খুব বেশি সময়?
কোনও কোনও ক্ষেত্রে তো বটেই। যেমন বিয়ের পরে ঘর শূন্য থাকার পক্ষে চার বছর এনাফ টাইম।
কৃষ্ণা সঙ্গে সঙ্গে কোনও উত্তর দিল না। একটু পরে হিসহিস করে বলল, সেটাও কি আমার দোষ?
লেটস গো টু ডক্টর। সেই বলে দিক হু ইজ টু ব্লেম ফর দিস।
চমৎকার, এইসব তুমি ভাবো নাকি? নিজের ক্যাপাসিটি বোঝো?
খুব।
বোঝো? সুপ্রিয়ার বিয়েতে ধীমান পাঁচ থেকে ছ' হাজার টাকা স্পেন্ট করেছে। আর তুমি? পাঁচশ টাকা দামের একটা শাড়ি! ফুঃ!
ধীমান হল দ্বিতীয় জামাই। কৃষ্ণা আর সুপ্রিয়ার মাঝখানের বোন মালার বর। দু'বছর হল বিয়ে হয়েছে।
কুণাল দাঁতে দাঁত ঘসল, ধীমান আমার থেকেও কম মাইনে পেয়ে বেশি আর্ন করে। কারণ সে দু'হাতে ঘুষ নেয়। হি ইজ আউট এ্যান্ড আউট করাপটেড, ইম্‌মর‍্যাল আন্ড ডিসঅনেস্ট। তার সঙ্গে আমার তুলনা? ফুঃ!
ধারালো হাসি ভেসে এল কৃষ্ণার কাছ থেকে, অনেস্টি হচ্ছে অক্ষম লোকদের কনসোলেশন প্রাইজ। ফার্স্ট প্রাইজটা ধীমানদের মতো লোকেই পেয়ে যায়।
কুণাল কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কৃষ্ণার নিজের গালে নিজের চড় মারার শব্দ হল। মশা কামড়েছে কৃষ্ণাকে। হিংস্র উল্লাসে মনে মনে হাততালি দিয়ে উঠল কুণাল। শাবাশ মশা। যত পারো শুষে নাও রক্ত। কনসোলেশন প্রাইজ, শালা!
কৃষ্ণা ফোঁস করে উঠল, দমদমের মতো নর্থে কম ভাড়ার বাড়িতে মশাদের অবাধ রাজত্ব তো হবেই।
তা তো হবেই। তোমার প্রাণের ভগ্নিপতি মিস্টার ধীমান সোমের পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে প্রজাপতি ওড়ে। চোরের পয়সা তো।
নোংরা! ইমপোটেন্ট!
স্টুপিড।
তোমার মতো ইতর লোকের সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না লাগে। ননসেন্স, ইডিয়ট!
অতঃপর রাত আরও গভীর হল। দু'জনে দু'দিকে মুখ করে শুয়ে থাকল। মাঝখানে থাকল মশা। মশাগুলো উড়ে বেড়াতে, শব্দ করতে, কামড়াতে লাগল। আপাতত ওরা নিরাপদ। মশারির মধ্যে দু'জন মানুষ শুয়ে আছে, কিন্তু এখন ওদের শত্রু ওরাই। মশা ওদের যতবার কামড়াল, ততবারই আরও বেশি করে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা আর আক্রোশ জমে উঠল। মশা মারার কথা কেউ ভাবল না। তারপর পৃথিবীর প্রাচীন নিয়মে সেই রাতের মেয়াদ শেষ হল। সকাল হল। রাতে ঘুমাতে দেরি হয়েছিল বলে দু'জনেরই উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। গত রাত্রের তুমুল সংঘর্ষের পর চার দেয়ালের রণক্ষেত্র এখন থমথমে। দু'জনেই এখন প্রাতরাশের জন্যে দু'দিকে বসে অপেক্ষা করে আছে। চোদ্দো-পনেরো বছরের যে-মেয়েটা বাড়িতে থাকে, কাজ করে, সেই বাসন্তী একটু পরে চা খাবার নিয়ে ঢুকল। অন্যান্য দিন এ-কাজে কৃষ্ণাকে সাহায্য করে বাসন্তী, আজ নিজেই সব করেছে।
চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করল কুণাল, এঃ!
কৃষ্ণাও চায়ে মুখ দিয়ে বলল, রাবিশ!
বাসন্তী অপ্রস্তুত মুখে বলল, চিনি হয়নি চায়ে?
হয়েছে। কুণাল বলল, কিন্তু এটা চা-ই হয়নি। কাজ না জানলে যা হয় তাই হয়েছে।

কৃষ্ণা বলল, খালি কাঁড়ি কাঁড়ি খাওয়া আর কাজে ফাঁকি দিলে যা হয়। একটা কাজও যদি ভাল হয়।

কুণাল বলল, ঘরদোর নোংরা অপবিচ্ছন্ন। অ্যাই বাসন্তী, সারাদিন কী কাজ করিস? হাজার ডেকেও পাওয়া যায় না। অ্যাঁ?

বাসন্তী ভয়ানক অবাক হয়ে গেল। এই অদ্ভুত অবস্থায় সে আর কখনওই পড়েনি।

কুণাল কিংবা কৃষ্ণা এই ভাষায় কোনওদিনই তার সঙ্গে কথা বলেনি। আজ দু'জনেই অলীক অজুহাতে সম্পূর্ণ উলটোসুরে একযোগে তাকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে।

মৃদু গলায় সে বলতে গেল, কিন্তু আমি তো—

কৃষ্ণা ধমক দিয়ে উঠল, চুপ কর। ছোট মুখে বড় কথা আমি একদম পছন্দ করি না।

কুণাল বলল, খবরদার, মুখে মুখে তর্ক করবি না। যা, কাজ কর গে যা।

হতভম্ব বাসন্তী মাথা নিচু করে চলে গেল।

বাসন্তী চলে যেতেই কুণাল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পরিতৃপ্তির মুখ করল। কৃষ্ণাও চায়ে মুখ দিল। মনে হল তারও ভাল লাগছে চা খেতে। দু'জনেরই মুখ হাসিহাসি। যেন কিছুই হয়নি। যেন এইমাত্র দারুণ এক মজার ব্যাপার হয়ে গেল।

চা খেয়ে কুণাল উঠল, বাজারে যাব। কী আনব?

সবই আনতে হবে। কৃষ্ণা মুখ টিপে বলল, তেল, মাছ, তরকারি। আর হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস কিন্তু অবশ্যি আনবে।

কী?

কৃষ্ণা গম্ভীর মুখের ভান করে বলল, ইয়ে, মানে — একটা মশা মারার স্প্রে।

নিজের ছবি

আমাদের ঘরের দেয়ালে একটা ছবি টাঙানো থাকত। বিয়ের সময়ে তোলা মা'র ফোটো। বছর সাতেক আগে পুরনো বাড়ি বদলে শ্যামবাজারের এই বাড়িতে নতুন ভাড়াটে হয়ে আসবার পর ছবিটা আর দেয়ালে আসেনি, পুরনো টুকিটাকি জিনিসের বাক্সেই থেকে গিয়েছিল। কয়েকদিন আগে অনেক খুঁজে ছবিটা বের করে আলমারিতে শাড়ির ভাঁজে রেখে দিয়েছি। কখনও কখনও ইচ্ছে হলে আমি ছবিটা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি। ঘোমটা মাথায় লাজুক লাজুক মুখে সতেরো-আঠারো বছরের মা তাকিয়ে আছে। মা'র পাতলা পাতলা ঠোঁটদুটো যেন একটু পরেই আরও লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলবে। আমি বিভোর হয়ে তাকিয়ে থাকতাম ছবিটার দিকে।

ছবিতে আমি কিন্তু মাকে দেখি না। সবাই বলে আমি নাকি মায়ের মুখ পেয়েছি। তাই এ-ছবিতে নিজেকেই দেখতে ইচ্ছে করে আমার। ছবির মানুষটার বয়েসটা পার হয়ে এলেও মুখের আদলটা তো বদলায় না। বিয়ের পর ঘোমটা মাথায় ফোটো তুললে আমাকে নিশ্চয়ই ছবির সুখী মানুষটার মতোই লাগবে।

নিজের জন্যে যে এত ভাবাভাবি থাকতে পারে, আগে জানতাম না। ঠিক এই মুহূর্তগুলোর কথাই ধরা যাক না। এই যে আমি, পড়ন্ত বেলায় খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে এক টুকরো কলকাতার দিকে তাকিয়ে আছি, আমার আনত চোখের সামনের দৃশ্যপটে এ-গলির একফালি রাস্তা, দু'-চারজন ব্যস্ত মানুষ, একটা হাতে-টানা রিকশা, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা একটা লোম-ওঠা কুকুর, ডাবের খোলা, মাটির খুরি আর কিছু দৈনন্দিনতার ছবি আঁকা আছে, সেসব আমি কিছুই দেখছিলাম না। আমার কানের কাছে নানান শব্দ জড়াজড়ি হয়ে ভাসছিল। গলির মুখে ছেলেরা হইহল্লা করছে, কে যেন কার নাম ধরে জোরে জোরে ডাকছে, মোড়ের পানের দোকানে ট্রানজিস্টারে হিন্দি সিনেমার গান জোরে জোরে বাজছে— এসব আলাদা করে কিছুই আমার কানে আসছিল না। কিছু দেখার কিংবা কিছু শোনার ছল করে আমি নিজের কথাই ভাবছিলাম। আমার মনের মধ্যে হাজার ভাবনা লঘুছন্দ মেঘেব মতো আসছে, যাচ্ছে, ভেসে বেড়াচ্ছে। আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে, অস্বস্তি হচ্ছে, লোভ হচ্ছে, আবার ভয়ও করছে। একই আমি কতরকম হয়ে যাচ্ছি।

ঠিক এ-সময়, এমনি কোনও বিকেলের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মনের আয়নায় এমনিভাবে নিজের মুখ দেখার কথা নয়। এ-সময়ে বুকের নীচে বালিশ রেখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়া কিংবা আশেপাশের কোনও বাড়িতে আড্ডা মারতে যাবার কথা। কিন্তু এখন আমি বাড়িতেই থাকি সবসময়। এ-সময়ে নাকি আইবুড়ো মেয়েদের বেশি বাইরে যেতে নেই। কত লোকের কুদৃষ্টি আছে, কত খারাপ হাওয়া বয়। মা তাই বারবার করে ঘরের বাইরে যেতে মানা করে দিয়েছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, মা'র সংস্কার-কুসংস্কারগুলো, বিশ্বাস-অবিশ্বাসগুলো আমি মেনে নিয়েছি। আসলে এ-সময়গুলোতে সব মেয়েই নিজেকে নিয়ে, নিজেকে ঘিরে, নিজের মধ্যে অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে চায়। আমিও তাই আছি। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছি, হাসছি, কাঁদছি। ফিরে ফিরে ফোটোর মা'র মতো ঘোমটা মাথায় সুখের ছবি হয়ে যাচ্ছি।

সাতকাহন কথা যখন হল, তখন আসল কথাটা বলেই ফেলি। আর কয়েকদিন পরেই আমার বিয়ে। ছেলের বাড়ি থেকে আমাকে দেখে গিয়ে ওদের পছন্দের কথা জানানোর পরেই দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গেছে। এই চৈত্রমাস গেলেই বৈশাখের এক সন্ধেয় আমাদের গলির এই

অসূর্যম্পশ্যা বাড়ি আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠে উৎসবের বাড়ি হয়ে যাবে।

ভাবতে গেলে বিশ্বাসই হয় না কিন্তু। আমার বাবার অনেক টাকা নেই, দেখতে শুনতে তেমন কিছু আহামরিও নই আমি, আমাদের এ-গলির রাস্তায় ঠেলাগাড়ি ঢুকলে বেরুবার পথ পায় না, তবু আমাকে নাকি পছন্দ হয়েছে। এর আগে যেমন অনেকে আমাকে দেখার পর আমাদের ঘরের চারদিকে তাকিয়ে, খাট বিছানা আলমারি দেখতে দেখতে পরে খবর দেব বলে রুমালে মুখ মুছে চলে গেছে, যথারীতি কোনও খবর দেয়নি, এদের বেলায় তা হয়নি। ওদের পছন্দের কথা শুনে মা'র বিমর্ষ মুখে অনেকদিন পরে হাসির আভাস ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, তোরা তো শাস্ত্রের কথা মানিস না, কিন্তু দেখলি তো প্রজাপতির নির্বন্ধ! যার যেখানে লেখা আছে, সেখানেই যেতে হবে। জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।

দিন ঠিক হয়েছে সাতই বৈশাখ। ইংরিজির কত তারিখ যেন? কুড়ি-একুশ একটা হবে। এই তো কয়েকদিন আগে পাটিপত্র হয়ে গেল। দেনাপাওনার কথাবার্তাও হল। সেটা অবশ্য ছোটখাটো মাপের নয়। ছেলে ব্যাঙ্কে চাকরি করে, ব্যারাকপুরে নিজেদের বাড়ি আছে, আমাদের পালটি ঘর— এই যা। বাবা একটু হ্যাঁ-না করে তাতেই রাজি হয়ে গেল। বাবার প্রধান ভরসা জ্যাঠামণি উত্তর বাংলায় থাকেন। জলপাইগুড়িতে কাঠের বিরাট ব্যাবসা। এর আগে নানান ব্যাপারে টাকাপয়সা পাঠিয়ে বাবাকে সাহায্য করেছেন। নিঃসন্তান জ্যাঠামণি একমাত্র ভাইয়ের এই দারুণ দরকারে উদারহস্ত হবেন, সেই ভরসাতেই বাবা কাজে হাত দিয়ে ফেললেন। গত পুজোতে জ্যাঠামণি যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখনই বলেছিলেন, ধার কী বলছিস সতু, টুকু কি আমারও মেয়ে নয়! আমার কর্তব্য নেই? সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে বাবা জ্যাঠামণিকে চিঠি দিয়েছে। পরপর তিনটে চিঠি। টাকা কিংবা চিঠির উত্তর এখনও আসেনি। আমরা সকলে আশা করে আছি, দু'-একদিনের মধ্যে দুটোই এসে যাবে।

দেখতে দেখতে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে হয়ে গেল। বাইরের ছবিটা আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বাবা তো এই সময়ই অফিস থেকে ফিরে আসে। আজ দেরি হচ্ছে কেন? জানলা দিয়ে গলির রাস্তাটা যতদূর দেখা যায় আমি তাকিয়ে দেখলাম। না, এখনও ভাল করে সন্ধে হয়ে যায়নি। বাবার না-ফেরা নিয়ে ভাবার সময় এখনও আসেনি। আজকাল সব ব্যাপার নিয়েই আমি একটু বেশি বেশি ভাবছি। আগে তো বাবা কখন ফিরল না-ফিরল, সেই নিয়ে মোটেই ভাবাভাবি করিনি!

আসলে বাবার কথা তো নয়, আমি নিজের কথাই ভাবি। আর নিজের কথা ভাবতে গেলে অন্যের কথা এসে যাবেই। এই ক'টাদিন যেমন যাচ্ছে তেমনি যাক। কোনও আপদ-বিপদ যেন বাধা হযে না দাঁড়ায়। আর ক'টাদিন বাকি আছে যেন? সাতই বৈশাখ— আর আজ হল, কী মুশকিল, চৈত্রের কত তারিখ আজ? আজ হল গিয়ে— দূর ছাই, ইংরিজি তারিখটাই ধরা যাক। আজ তেসরা এপ্রিল। তার মানে, কুড়ি-একুশ হলে আর সতেরো-আঠারো দিন বাকি আছে। মাত্র সতেরো-আঠারো দিন? এ ক'টাদিন তো ঘোড়ার খুরে ছুটে যাবে। অথচ বাবার কাণ্ড দ্যাখো, নেমন্তন্নের কার্ড এখনও বাড়িতে এসে পৌঁছোল না। আজই তো বাবার প্রেস থেকে ডেলিভারি নেবার কথা। হয়তো ফিরতে দেরি হচ্ছে সেইজন্যেই। মনটা থম মেরে ছিল, কথাটা মনে হতেই হালকা হয়ে গেল। কার্ডটা কেমন দেখতে হবে কে জানে। মিলিদির বিয়ের কার্ডটা যেমন হয়েছিল, বেশ বড়সড়, ভেলভেট দিয়ে লেখা 'শুভ বিবাহ', দারুণ নকশা-আঁকা, সেইরকম? দূর, বাবা হয়তো অল্প দামের গরিব গরিব কোনও কার্ড ছাপতে দিয়েছে। বাবা এখন পয়সা বাঁচাতেই ব্যস্ত। একমাত্র মেয়ের বিয়ে, কোথায় একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাত খুলে খরচ করবে, তা নয়, খালি নেই আর নেই। তা আছেটা কী বাপু? এতদিন সকাল সকাল পড়ি কি মরি অফিস গিয়ে আর সন্ধেবেলায় ঝড়ো কাকের মতো অফিস থেকে ফিরে কোন মহাকার্য সাধিত হয়েছে হে সুবোধচন্দ্র? এদিকে তো নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। দাদার কাছে ভিখিরির মতো হাত পাততে লজ্জা লাগে না, আর উপরি পয়সা নিতে গেলেই বিবেকবাবু এসে বাধা দেন, তাই না?

এই দ্যাখো, বেহায়ার মতো কেমন নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজেই নাক গলাচ্ছি। এমন ভাব যেন বাবার অবিমৃশ্যকারিতায় বিয়েটা পালিয়ে যাচ্ছে আর আমি পেছন পেছন ছুটছি ধরে আনতে। ভাবতে গিয়েই আমার মিলিদির ওপর ভীষণ রাগ হয়ে গেল। শেয়ালকে ভাঙা বেড়া দেখিয়েছে ওই মিলিদিই তো! বিয়ের পরের নানানরকম রগরগে রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়ে আমাকে বিগড়ে দিয়েছে। অথচ দেড় বছর আগে সে আমার মতোই এ-পাড়ার একজন আইবুড়ো মেয়ে ছিল। বিয়ের সম্বন্ধ হতেই একেবারে লজ্জাবতী লতাটি হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মাস দুয়েক হল ধুমসো পেট নিয়ে বাপের বাড়িতে এসেছে। একেবারে পাকা গিন্নি। মাঝেমাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। যত কথা বলে তার চেয়ে বেশি হাসে। আর সব কান লাল-হয়ে-যাওয়া কথা বলে। ওর বর কী বলে, কী করে, দস্যুর মতো কেমন করে বিছানা ধামসায়! ভাট, সব অসভ্য অসভ্য কথা। ছেলে হলে কী নাম রাখবে, মেয়ে হলেই বা কী রাখবে, এসব তো বলেই— আবার বলে কিনা, তোর বরের নাম তো অতনু, অতনু মানে জানিস? আমি মাথা নাড়লাম। কী পাজি মিলিদিটা, কথা বলবে কী, হেসেই অস্থির। বলল, তোর কোনও উপায় নেই রে টুকু, তুই গেছিস। তোর হয়ে গেছে। আমি যতই জিজ্ঞেস করি কী হয়ে গেছে, মিলিদি ততই হাসে। হেসে একেবারে কুটিকুটি। শেষে আমার কানেব কাছে মুখ এনে বলল, অতনু মানে আমি ডিকশনারিতে দেখেছি। অতনু মানে চিকা চিম চিদে চিব। কামের দেবতা রে! মানেটা বিছানায় টের পাবি। তোকে ছিঁড়ে খাবে। আমি এক ধাক্কায় মিলিদিকে সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে এসে বাঁচি। একটু পরেই অবশ্য অন্য কাজের ছুতো করে ফিরে এলাম। ভয়ও আছে, মিলিদিটা যদি চলে যায়! রাগও হয়, আবার মনও কাঁদে।

পরে আমিও ডিকশনারি দেখেছি। আমাদের বাড়িতে বাংলা ডিকশনারি নেই। নীচেরতলার ভাড়াটেদেরটাতে অতনু মানে দেখেছি। অতনুর আরেকটা মানে আছে। যার তনু নেই, অর্থাৎ দেহহীন। এ কেমন বিদঘুটে নাম রে বাবা। একদম বিচ্ছিরি। একটা যদিও বা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু অন্যটা? ধ্যাত, ভারী অসভ্য নাম। বিয়ের পর নামটা বদলে নিতে বলব। ওই যে পেপারে দেখি, আমি অমুকচন্দ্র তমুক, কোর্টে এফিডেফিট করিয়া অদ্য হইতে অমুকচন্দ্র তমুক হইলাম, সেইভাবে তো অতনু নামটাও বদলানো যায়। অবিশ্যি নামের মানে নিয়ে কেই বা মাথা ঘামায়।

হাসি পায়। কী ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে এসেছি। ধান ভানতে শিবের গীত। এদিকে বাইরের সন্ধেটা আস্তে আস্তে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। কুয়াশার মতো অন্ধকার নেমে এসেছে। এখন বোধহয় লোডশেডিং চলছে। রাস্তার আলো এখনও জ্বলেনি। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম মা কখন হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে ঘরে। দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেলাম। বাবা এসে গেছে নাকি? না, পল্টু। আমার ভাই। কোথায় এতক্ষণ দস্যিপনা করে একেবারে নেয়েঘেমে এসেছে। শার্ট খুলতে খুলতে বলল, বুঝলি দিদি, লাইটের ব্যবস্থা করে এলাম। সমস্ত বাড়ি একেবারে তুবড়ির মতো জ্বলবে। ঘ্যাম দেখাবে মাইরি। টুনি বাল্‌ব। বিজনদা দেবে বলেছে।

বিজনদাকে ভাল করেই চিনি। এ-পাড়ারই ছেলে। সামনের রাস্তার ধারে ইলেকট্রিক্যাল জিনিসের চালু দোকান আছে। ফরসা, লম্বা, সিনেমা সিনেমা চেহারা। পল্টুর সঙ্গে খুব খাতির। আমি কলেজে যাবার সময় দু'-একদিন সেধে সেধে কথা বলেছে। আমি সেরকম পাত্তাটাত্তা দিইনি।

যদিও জানি কী জন্যে টুনি বাল্‌ব জ্বলবে, তবু না-জানার ভান করে বললাম, কেন রে?

পল্টু সোজাসুজি জবাব দিল, তোর বিয়েতে।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, কিন্তু বাবা তো বেশি খরচ করবে না বলেছে!

পল্টু গেঞ্জি খুলে একটু বাতাসের জন্যে ছোট মাপের পুরনো সিলিং ফ্যানটার দিকে হতাশ মুখে তাকাল। তারপর গেঞ্জিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলল, বাবা কিছু পারবে না। সারাজীবন শুধু বলই করে যাবে, একটা উইকেটও পাবে না।

আমি আশায় আশায় বললাম, পয়সা লাগবে না?

পল্টু অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, পয়সা লাগলে ম্যানেজটা করলাম কী! ন্যাকামি করছিস কেন, তোরও তো বিজনদার সঙ্গে ইয়ে ছিল। কথাটথা বলেছিস।

ভাগ। ওই তো সেধে সেধে কথা বলেছে।

পল্টু এই বয়েসেই অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। আমার কথার কোনও উত্তর দিল না, কিন্তু বিছানায় বসে এমন মুখ করে জানলার দিকে তাকিয়ে রইল যেন আমি কী বললাম না বললাম, সেটা জানার দরকার নেই। আসল ব্যাপারটা তার ভাল করেই জানা আছে। অথচ আসল ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই তো তা নয়। বিজনদাই তো গায়ে পড়ে দু'-একটা কথাটথা বলেছিল। আমি হেসে হেসে উত্তর দিয়েছি— এই মাত্র। তা পাড়ার ছেলে, পল্টুর খুব খাতিরের লোক, তাকে তো আর দুম করে অপমান করা যায় না। যাক গে, এসব কথা এখন না তোলাই ভাল। পল্টু চুপ করে আছে, আমি কিন্তু হাল ছাড়লাম না। বললাম, আমার চাইনিজ পেনটা তোকে দিয়ে দেব পল্টু।

সেবার জ্যাঠামণি কলকাতায় এলে এসপ্লানেড থেকে একটা ইমপোর্টেড ফাউন্টেন পেন কিনে দিয়েছিল আমাকে। পল্টুর অনেকদিন লোভ ছিল পেনটার ওপর। আজ কিন্তু না চাইতেই পেনটা ওকে দিয়ে দেব শুনেও পল্টুর কোনও ভাবান্তর হল না। পেনটার ব্যাপারে কোনও গরজই নেই। ইস, ভারী ডাঁট! সারাদিন গুন্ডামি আর হইহল্লা করে বেড়ালে লেখাপড়ার জিনিস ভাল লাগবে কেন! কিন্তু সত্যি কথাগুলো এখন তো ওকে সত্যি সত্যিই বলা যায় না। ওকে পটাতে হলে চটানো চলবে না। বাবার যা চিত্তির দেখছি, এখন সাগর পারাপারে কলার ভেলাই ভরসা।

একটু ইতস্তত করে কথাটা বলেই ফেললাম, এই পল্টু, তোর বিজনদার দোকানে তো মাইকও আছে!

সানাই?

মানে, ইয়ে বলছিলাম কী –

ঠিক বলেছিস। মাইকে সানাই— ফ্যানটাস্টিক হবে কিন্তু। বলেই পল্টু এমনভাবে মাথা দোলাতে লাগল যেন সত্যি সত্যি সানাই বাজছে আর পল্টু শুনছে।

মা এসে ঘরে ঢুকে পল্টুকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে বলল, কোথায় থাকিস, কাজের সময় পাওয়া যায় না! বলতে বলতে মা ঘড়ির দিকে তাকাল। সাতটা বেজে গেছে। আমি দেখলাম মা'র চোখে ভাবনার ছায়া পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই বাবা এল। ইদানীং বাবার মুখ সবসময় অপ্রসন্ন হয়ে থাকে। আজ দেখলাম মুখটা থমথম করছে। আজ হয়তো কাজের চাপটা বেশিই পড়েছে।

মা একটু সময় বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কার্ড এনেছ? প্রেসে গিয়েছিলে?

বাবা গম্ভীর মুখে বলল, না।

বাবার কথা মা'র পরিষ্কার শুনতে পাবার কথা। তবু মা আরেকবার জিজ্ঞেস করল, বিয়ের কার্ড এনেছ?

বাবাও সেইভাবেই আবার বলল, না।

মা ভয়ানক অবাক হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বাবা বলল, আজ দাদার চিঠি পেয়েছি। আসতে পারবে না।

টাকা?

পাঠাচ্ছে। তবে অত টাকা নয়। বিজনেসে এবার নাকি খুব লস খেয়েছে। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে টাকা পেয়ে যাব।

মা অধীর গলায় বলল, কত টাকা পাঠাচ্ছেন?

আমরা সবাই বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। বাবার বিব্রত চোখদুটো আমাদের সবক'টা মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। বাবাকে খুবই পরিশ্রান্ত আর হতাশ দেখাচ্ছিল। একটু সময় চুপ

করে থেকে বাবা বলল, এ বিয়ের শেষপর্যন্ত কী হবে জানি না। ছেলের বাবা আজ দেখা করেছিলেন। টিভি চাইছেন। তার মানে আরও কয়েক হাজার। টুকু, এক গেলাস জল দে তো মা।

বাবাটা যেন কী। কত টাকা আসছে, কিংবা ছেলেকে টিভি দেবার কী ব্যবস্থা হবে এখনও শোনা হয়নি, আর বাবা কিনা এমন সময়ে জল দিতে বলল।

আমি পাশের ঘরের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে তাড়াতাড়ি এনে দিলাম বাবাকে। ঘরে ঢুকেই মাকে বলতে শুনলাম, বলছ কী, মাত্র দু'হাজার? দু'হাজারে কী হবে?

বাবা আমার হাত থেকে গেলাস নিয়ে ঢকঢক করে সবটুকু জল খেয়ে নিয়ে বলল, চোদ্দো আর দুই, ষোলো। এর বেশি আমাকে কেটে ফেললেও হবে না।

মা বলল, তা হলে টুকুর বিয়ে হবে না?

এই টাকাতেই হওয়াতে হবে।

ষোলো হাজারে? এ-টাকায় তোমার মাথা হবে, মুন্ডু হবে। ষোলো হাজারে আজকাল একটা বস্তির বিয়েও হয় না। কেন, আর লোন নিতে পারবে না?

বাবা মাথা নাড়াল, না, আর পাওয়া যাবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ওই টাকাই পাওয়া গেল। এ ছাড়া পোস্টঅফিস আর তোমার গয়না বিক্রির টাকা—

মা বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তবে রাজি হয়েছিলে কেন? রাত পোয়ালেই মেয়েব বিয়ে আর উনি এখন নাকে কাঁদছেন। জানি না, যেমন করেই হোক আরও টাকা জোগাড় করতে হবে।

বাবা অসহায়ের মতো মুখ করে বলল, যা হয় না, তা কেমন করে হওয়াব আমি! আমি তো কোনও ম্যাজিক জানি না।

মা ধমকে উঠল, চুপ করো তুমি। একটাই মেয়ে, তার বিয়ে দিতেই তোমার কাছা খুলে যাচ্ছে। সারাজীবন করেছ কী?

পল্টু ফস করে বলে বসল, ব্ল্যাংক ফায়ার করেছে।

বাবা চমকে উঠে পল্টুর দিকে তাকাল। আমাকেও দেখল। শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন বাবা। আমাদের নিষ্ঠুর মুখগুলো বাবাকে বিদ্ধ করবে বলে তীক্ষ্ণ তিরের মুখ হয়ে বাবার দিকে তাক করা। আমার কিন্তু আজ বাবার জন্যে একটুও কষ্ট হল না। উলটে রাগই ধরে গেল। মিলিদির বাবাও তো এমন কিছু হাতিঘোড়া কাজ করে না। বাবার মতোই অফিসে কাজ করে। অথচ কী ঠাটে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। মা'র মুখে শুনেছি মিলিদির বাবা খুব চালু লোক। মাইনের চেয়ে ঢের বেশি উপরি পায়। আর বাবার তো ওই মাইনেই সব। ডাইনে আনতে বাঁয়ে টান পড়ে। এদিকে আমি আবার বিয়ের স্বপ্ন দেখছি। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার!

মা'র সঙ্গে বাবার একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। অবশ্য ঝগড়া ঠিক নয়। মা বলে গেল, বাবা শুনে গেল। বাবার বলবারই বা কী আছে! মা তো সব সত্যি কথাই বলল। বাবা কোথা থেকে টাকা পাবে, তা তো মা'র জানার কথা নয়। মা'র যা গয়না ছিল সবই তো বিয়েতে দিয়ে দিয়েছে। সোনার ব্যাপারে বাবাকে এক পয়সাও খরচ করতে হচ্ছে না। বরং কিছু টাকা হাতে এসে যাচ্ছে। তা ছাড়া, ঠিকই তো, মেয়ে যখন বড় হয়েছে তখন বাবার আগে থেকেই তৈরি থাকা উচিত ছিল। মা ঠিকই বলেছে, ছেলেপক্ষ এমন হাতিঘোড়া কিছু চায়নি। গয়না, আসবাবপত্র, এ তো না চাইলেও সবাই মেয়েকে সাজিয়ে দেয়। নগদ তো ওরা নামমাত্র নিচ্ছে। আর টিভি চেয়ে ওরা এমন কিছু আকাশের চাঁদ চেয়ে বসেনি। আজকাল তো ঘরে ঘরে টিভি। কিন্তু বাবার ওই একই টেপ-করা কথা। যা আমার ক্ষমতার বাইরে, তা আমি কেমন করে করব। আমি তো কোনও মিরাক্‌ল করতে পারি না। মা রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুখ দেখে

মনে হল, দেয়ালে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করছে যেন মা'র।

বাবা একটা ধ্বংসস্তূপের মতো বিছানায় বসে রইল। জবুথুবু মুখ। বাবা চিরকালই ওইরকম। কোনওদিকই সামলে সুমলে চলতে পারে না। সামান্য সংসার চালাতেই হিমসিম খেয়ে যায়, তো মেয়ের বিয়ে। আগে বাবার জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হত, কান্না পেত। এখন কিছু হয় না। এখন আমি স্পষ্ট বুঝে গেছি বাবার এই অবিবেচনার জন্যে, অক্ষমতার জন্যে, আমাদের জীবনটাই ছোট মাপের হয়ে গেছে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সাধ-আহ্লাদ সবই কমিয়ে আনতে হয়েছে।

মা বেরিয়ে যাবার একটু পরে আমিও মুখ ভার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। রান্নাঘরে এসে মা'র পাশে দাঁড়ালাম। মা উনুনের সামনে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। আমি মা'র পাশে বসলাম। এই বিরাট পৃথিবীতে আমার দুঃখের সঙ্গে একমাত্র মা'র দুঃখ একাকার হয়ে আছে।

আমি যে মা'র পাশে বসলাম, আমাকে না দেখেও মা ঠিক বুঝতে পারল। একটু পরে মাকে বলতে শুনলাম, পকেটে নেই কানাকড়ি, হরিদাসী দরজা খোল, হুঁ! মেয়ের বিয়ে দেবার শখ হয়েছে। ঝাঁটা মারি অমন শখের মুখে।

মা'র কথাগুলোর মানে বোঝার বয়েস আমার নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু তখন বাবার অক্ষমতা নিয়ে কোনও কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইছিলাম না। ওই যে বলে না, শিয়রে শমন! আমারও সেই অবস্থা। জ্যাঠামণি যে টাকাটা পাঠাচ্ছেন না, সেই টাকাটা পাবার একটা রাস্তা তো বের করতে হবে। টাকা না হলে তো বিয়েটাই পণ্ড।

আমি একটু ইতস্তত করে প্রায় লজ্জার মাথা খেয়ে শেষটা বলেই ফেললাম, মা, আমাদের জলপাইগুড়ির বাড়িতে কিছু জমি আছে না? ওতে তো বাবারও অংশ—

মা সঙ্গে সঙ্গে মুখঝামটা দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিল। থাম তো তুই! শকুনের চোখ কিছু বাকি রেখেছে নাকি? সে কবেই বেচে দিয়েছে। জানতাম নাকি ছাই! আমি বলাতে সেদিন বলল।

আমি যেন এক অতলান্ত খাদের সামনে এসে থেমে গেলাম। আমি জানতাম জলপাইগুড়িতে আমাদের কিছু শরিকানা জমি আছে। ঠেকায় পড়লে বাবা নিশ্চয় সেই জমি বিক্রি করে দেবে। কে জানত সেখানেও শূন্য! শেষ আশাটাও গেল।

আমার সামনে তখন এক অন্ধকার সমুদ্র দিকচক্রবাল ছাড়িয়ে গেছে। এখন উপায়? বাবার ওপর অন্ধ রাগে ফুঁসতে লাগলাম। লোকটা কী! ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েই খালাস? আর কোনও দায়িত্ব নেই? পক্ষীরাজে চড়ে অচিনপুরের রাজপুত্তুর তো সাতসুমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে আমাকে বিয়ে করতে আসছে না, সামান্য এক ব্যাঙ্কের চাকুরে, তাও আমার কাছে অলীক স্বপ্ন হয়ে থাকবে?

মরিয়া হয়ে বললাম, পল্টু তো এখন অনেক বড় হয়ে গেছে!

তো কী?

ওকে জলপাইগুড়ি পাঠালে হয় না? জ্যাঠামণিকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলত?

মা বিরক্ত হয়ে বলল, যা তো, এখান থেকে যা। যেমন পোড়াকপাল নিয়ে এসেছিস, তেমনি হবে না! মরণও হয় না আমার।

কারা যেন কলরব করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছিল। কাছে আসতেই ছোটমাসির গলা শুনলাম, একী, বিয়েবাড়ি এত চুপচাপ কেন! উত্তরে ছোটমেসো যেন কী বললেন। আবার ছোটমাসির গলা শুনলাম, না, ওই তো দিদি বসে আছে। বলতে বলতে ছোটমাসি রান্নাঘরের দরজায় এসে হাজির। বলল, ও বলছিল তোমরা নাকি বিয়ের মার্কেটিংয়ে গেছ। তা ও দিদি, কেমন বেনারসি কিনলে, কী রঙের?

আমি তাকিয়ে দেখলাম দরজার সামনে ছোটমাসি, ছোটমেসো, মাসতুতো বোন টিঙ্কু দাঁড়িয়ে

আছে। আমাকে দেখেই ছোটমাসি খলখল করে বলল, এই টুকু, যা তো, জামাইবাবুকে ফাউল কাটলেট আনতে বল। আজ মিষ্টি খাব না।

ছোটমেসো বললেন, এই দ্যাখো, দু'দিন পরে ওর বিয়ে, ওকে আবার খাটাচ্ছ কেন!

ছোটমাসি বলল, এই দু'দিনই তো মেসো-মাসির সেবা করবে। বিয়ে হলে ত্রিভুবনে বর ছাড়া আর কাউকে চিনবে ভেবেছ? এই টুকু, ঠিক বলিনি?

আমি বললাম, ভ্যাট!

ছোটমেসো হা হা করে হেসে উঠলেন।

আমি সেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

আমরা, মেয়েরা, সময়ে সময়ে কী আশ্চর্য অভিনয়ই না করতে পারি। বুকের মধ্যে যখন কান্নার সমুদ্দুর উথালপাথাল, তখন কেমন লজ্জা পাওয়ার মুখ করে পালিয়ে এলাম। ওই যে বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, সেই অবস্থা। অথচ তখন আমি কোথায় যাব, কাকে বলব, কোনওই কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। ঘরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রান্নাঘর থেকে ছোটমাসির কথা শোনা যাচ্ছিল। যেন একটা ভরন্ত নদী ছলছল করে বয়ে যাচ্ছে। এখন ওদের সময়টা ভাল যাচ্ছে। ভবানীপুরের বাড়িতে টিভি ফ্রিজ সবই গেছে। সবাই তো বাবার মতো তালিমারা লোক নয়।

হঠাৎ আমার বিজনদার কথা মনে পড়ল। বিজনদার তো একটা বাম্পার অবস্থা চলছে। বিজনদাকে বললে হয় না? এমনিতে তো আর নেব না, বাবা মাসে মাসে শোধ করে দেবে। চার-পাঁচ হাজার, কীই বা এমন টাকা। তা ছাড়া একসময় আমার প্রতি বিজনদার যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। আমি যদি গিয়ে একটু রংঢং দেখিয়ে একটু গায়ে পড়ে— ওই যে ছেনালি না কী বলে— বুকের কাপড় একটু সরিয়ে দিয়ে কিছু বলি, বিজনদা কি ফিরিয়ে দেবে? পল্টুর সঙ্গে এ-ব্যাপারে একটু কথা বলে নিলে ভাল হত। শরীর স্বাস্থ্য ভাল বলে পাড়ার ছেলেদের মধ্যে পল্টুর পুরো আধিপত্য। ওর কথা বিজনদা নিশ্চয় ফেলবে না।

আমার তখন বানের তোড়ে খড়কুটো ধরে পার পাবার অবস্থা। হ্যাংলার মতো নিজের বিয়ের চিন্তা-ভাবনা নিজেই করছি। কী করব, গরজ যে বড় বালাই। যার জ্বালা, সেই জানে।

আমি মরিয়া হয়ে ঠিক করলাম, পল্টুকে সব বলব। তাতেও যদি কিছু না হয়, তবে লজ্জার মাথা খেয়ে ছোটমাসিকেই না হয় বলব। কিছু একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে বিয়েটা যদি বন্ধ হয়ে যায়— কী লজ্জা, কী লজ্জা!

তা হলে আসল কথাটা না হয় বলেই ফেলি। বলতে বলতে যখন সাতকাণ্ড রামায়ণই হয়ে গেল, তখন আসল কথাটাই বা চেপে রাখা কেন' মেঘে মেঘে তো কম বেলা হল না। বি এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তাও পাঁচ বছর হয়ে গেল। অবশ্য পাশ করতে পারিনি। কিন্তু বয়সের গুনতিটা তো ধরা যায়। খুব কম করেও এখন আমার সাতাশ-আঠাশ চলছে। মা যতই কুড়ি-একুশ বলে চালিয়ে দিক না, আমি তো জানি এখন আর কচি খুকিটি নই। বিয়ের ইন্টারভিউ দিতে দিতে যে সুয্যিঠাকুর পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। আবার গায়েও কিছু দুধে-আলতা নই, রংটা বরং বেশ চাপাই। মুখে রং মেখে প্যাড লাগানো ব্রেসিয়ার পরে সময়কে তো আর ধরে রাখতে পারছি না৷ বেলা যে গড়িয়ে যায়! টলোমলো নায়ের হাল নিজেরই ধরতে হয়। বাবা তো নামেই বাবা, তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। শরীরের যা হাল, কোনওদিন ফুটুস হয়ে গেলে তো বিশ বাঁও জলের তলায় তলিয়ে যাব। সুখ যে আমার সতিন!

কী কাণ্ড, ঘরের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ঘরটাকে এতক্ষণে চোখে দেখলাম। পল্টু নেই। কোথায় গেল; এই তো কিছুক্ষণ আগেই ঘরে ছিল। এ-ঘরে না থাকলে পাশের ঘরে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু পাশেব ঘরেও পল্টুকে পেলাম না। দেখলাম শুধু বাবাকে। বাবা চোখে চশমা দিয়ে নোটবই দেখছে। আমার দিকে তাকাতেই আমি দুমদুম করে চলে এলাম।

আমি তখন বারান্দায় একা একা দাঁড়িয়ে আছি। ছোটমাসিরা কথা বলতে বলতে ঘরে আসছিল। আমাকে দেখেই ছোটমাসি বলল, এই মেয়ে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন রে?

টিঙ্কু দৌড়ে আমার কাছে এসে বলল, এই টুকুদি, তোমার বর নাকি খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে!

আমি বললাম, আমার খুব মাথা ধরেছে রে টিঙ্কু।

টিঙ্কু মুখ ফুলিয়ে বলল, বাবা বাবা! বরের কথা বললাম, অমনি রাগ হয়ে গেল। খুব বেশি বেশি, না!

ঘরের মধ্যে মেসোকে কী বলতে বলতে শব্দ করে হেসে উঠতে শুনলাম। বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের রসিকতায় একা একাই হাসছিলেন।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে ছোটমাসিরা যখন চলে গেল, তখন রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ছোটমাসিরা আসন্ন উৎসবের যে-মেজাজ নিয়ে এসেছিল, সেটা ক্রমশ একপেশে হয়ে আস্তে আস্তে শীতল আর অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল। আমি বাবাকে ফাউল কাটলেট আনার কথা বলিনি, শেষপর্যন্ত কী হল তাও জানি না। আমি দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে ছোটমাসি মেসোমশায় আর টিঙ্কু ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। ওরা কেউ কথা বলছিল না।

আমি তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। একটু পরে মা এসে বলল, চুল খুলে ভূতের মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। ঘরে যা।

আমি পল্টুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মাকে সেই কথা বললাম না। মা'র কথার কোনও উত্তরই দিলাম না।

একটু পরে মা ঘর থেকে আবার আমাকে ডাকল। আমি ঘরে গিয়ে চুপ করে বিছানায় বসে রইলাম। বাবা চোখ তুলে আমাকে দেখল। বাবার কিছু বলবার নেই, বললও না। আমি মুখ বেঁকিয়ে বসে থাকলাম।

মা বলল, চুল বাঁধবি না?

আমি বললাম, না।

বাঁধবি না? পেতনির মতো চেহারা হয়েছে। যেমন কপাল, তেমনি হবে না।

তাতে তোমাদের কী এসে যায়? আমার কপাল তো তোমরাই তৈরি করে দিয়েছ।

চুপ কর। মুখে মুখে কথা বলবি না।

তুমি কথা বলতে পারো, আমি বললেই দোষ, না?

টুকু, তুই চুপ করবি না?

না।

মা হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার চুলের মুঠি ধরে ঝাকাতে ঝাঁকাতে বলল, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারিস না পোড়ারমুখি!

বাবা বিব্রতমুখে উঠে দাঁড়াল, আহা, করো কী, করো কী! ওকে ছেড়ে দাও।

বাবার কথা শুনে মা'র রাগ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। চুলের মুঠি টেনে, তালপাতার পাখা দিয়ে পাগলের মতো আমাকে এলোপাথাড়ি মারতে লাগল।

মর, মর, আজ রাত্তিরেই তুই মরে যা। আমাদের জ্বালা মিটুক, হাড়-মাস জুড়োক। ধিঙ্গি মাগি, তুই বিদেয় হোস না কেন।

পল্টু দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাবা হতভম্ব হয়ে স্থির ছবির মতো দাঁড়িয়ে। লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে আমি দিশেহারা হয়ে ছুটে পালালাম ঘর থেকে।

সে রাতে আমি আবার কখন ঘরে এলাম, কী খেলাম, কী করলাম, কখন বিছানায় শুতে গেলাম, কিছু আমার আলাদা করে মনে ছিল না। আমার মা আমাকে আগে কখনও এমন করে মারেনি। আমি যতখানি কষ্ট পেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি দুঃখ হয়েছিল। যতখানি দুঃখ হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলাম।

আমি ঘোরের মধ্যে চোখ বুজে শুয়েছিলাম, কে যেন আমার গায়ে হাত রাখল। আমি চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলাম। আমার কাছে মা দাঁড়িয়ে আছে।

মা'র দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। এ কাকে দেখছি আমি? এই কোটরাগত হতাশ চোখ, এই শীর্ণ বিষণ্ণ শ্রীহীন মুখ, এই ক্লান্ত বিধ্বস্ত দুঃখিনী অবয়বটি কি আমার মা? নববধূর লাজুক লাজুক মুখের সুখের ছবিটা তবে কার? সবাই বলে আমি নাকি মা'র মুখ পেয়েছি। তবে? এই অবশ্যম্ভাবিতার জন্যে আমি নিজেকে দেউলিয়া করে হন্যে হয়ে মরছি?

আমি মা'র দিকে তাকিয়েছিলাম অপলক। মা অবাক হয়ে বলল, কী রে, কী দেখছিস?

আমি বিড়বিড় করে বললাম, সুখের ছবি।

আমার কথাটা মা বোধহয় শুনতে পেল না। আমার তাকিয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে একটু ভয়ও পেয়ে গেল যেন। বলল, এই টুকু, কী হয়েছে তোর? অমন করে তাকিয়ে কী দেখছিস?

আমি বললাম, আমাকে।

এই প্রবাস

ঠিক কলকাতাতেই বাড়ি পাওয়া গেল না, একটু দূরই হয়ে গেল। তা হলেও খুব অসুবিধে মনে হল না বিভাসের। বরং একদিক থেকে ভালই লাগল। নতুন উপনগবী গড়ে উঠেছে। শান্ত, ছিমছাম পরিবেশ। তিনঘরের আধুনিক স্থাপত্যের একতলা বাড়ি। সামনে এক টুকরো সবুজ জমি। প্রচুর আলো বাতাস। কলকাতার গায়ে গা লাগানো, ভিড হট্টগোল নেই, কিন্তু পঁচিশ-তিরিশ মিনিটের মধ্যে দিব্যি কলকাতার সুযোগ সুবিধেগুলো পাওযা যায়। পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পরে পরেই ট্রেন, বাস। একটু অসুবিধে এই যে, সোদপুব থেকে কলকাতা রোজ যেতে আসতে হবে। তা হোক, একসঙ্গে তো সব সুবিধেগুলো পাওয়া যায় না।

কলকাতায অবশ্য পৈত্রিক বাড়ি আছে একটা কিন্তু সেখানে ভিড, জায়গা কম। বয়স্ক বাড়িটার একতলা দোতলায় অবশ্য অনেকগুলো ঘব আছে, একটা দুটো ঘরে তিনি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। কিন্তু থাকলেন না। তা ছাড়া চাকরিসূত্রে দীর্ঘদিন দিল্লিতে থাকতে হয়েছে বলে বিভাসের স্বভাবের মধ্যে একটা একাকিত্ব এসে গিযেছিল। একটু ছাড়াছাড়া থাকতে ভালবাসতেন। চার ভাইয়ের সঙ্গে অসদ্ভাব না থাকলেও যোগসূত্রটা ওই চিঠিপত্রেই ছিল। তিনি চেযেছিলেন ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক যতটুকু আছে তাই থাকুক, একসঙ্গে থেকে প্রতিদিনের ব্যবহারে তা যেন মলিন না হয়ে যায়।

অবশ্য কলকাতাব বাইবে আসতে হল বলে স্ত্রী জযাব মুখটা একটু ভাবভার হয়েছিল, কিন্তু বাড়ি দেখে আর চারপাশের পরিবেশ দেখে ভারী খুশি হয়ে গেল সে। মেয়ে বান্টির অবশ্য ফাঁকাফাঁকা লাগছিল। দিল্লিতেই ওর পডাশোনা, একরাশ বন্ধু সেখানে। নতুন জায়গায় সম্পূর্ণ একা হযে গেল সে। কিন্তু সেই একা থাকাটা সোদপুরে না হযে কলকাতায় থাকলেও হত। দিল্লির বাইরে যে-কোনও জায়গাতেই হত। তার সমস্যা হল নতুন জাযগা নয, নতুন মানুষ। তবু সবকিছু মানিয়ে নেবার বয়েসটা বান্টিকে কখনও মন খারাপ কবে থাকতে দিল না।

জায়গাটা ভাল লাগার পেছনে আর একটা কারণ ছিল বিভাসের। একটা গোপন ইচ্ছে তাঁর মনে দীর্ঘদিন ধবে লালিত হচ্ছিল। বাঙালি জাতির বিপন্ন অস্তিত্বের ওপর সুদীর্ঘ বই লিখবেন। দিল্লিতে থাকতেই পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন সমস্যা নিয়ে, বাঙালিব পতন ও অবক্ষয় নিয়ে, কিছু কিছু আর্টিকেল লিখেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায। কিন্তু সে-সমস্ত খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন লেখা, কোনও সামগ্রিক আলোচনা হয়নি। তা ছাড়া দিল্লিতে যা লিখেছেন সব ইংরিজিতে। এবার লিখবেন বাংলায়, বাঙালির জন্যে, বাংলার পত্র-পত্রিকায়, অনেক বেশি মানুষের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারার জন্যে। একসময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন তিনি, তাঁর সতীর্থ অধ্যাপক বন্ধুরা অনেকেই এখন কলকাতায় আছেন। তাঁদের কাছ থেকে লেখার ব্যাপারে সাহায্য পাবেন। তিনি মনে করলেন এই উপনগরীর নিরিবিলি পরিবেশে লেখার ব্যাপারে তিনি স্বচ্ছন্দ হতে পারবেন।

কাজেই জায়গা তাঁর ভাল লাগল, বাড়িটাও। এই ভাল লাগাটা নিয়ে তিনি আরও একটু ভাবলেন। সবদিক থেকে কমিয়ে বাড়িয়ে ভাল লাগাটুকু স্থিতিশীল করে রাখতে চাইলেন। চাকরি থেকে অবসর নেবার সময়ও তো কযেক বছর পরেই এসে যাবে। ভাবলেন এখানেই জমি কিনবেন কিংবা এই বাড়িটাও কিনে নিতে পারেন। এ-বাড়ি যাঁর, সুবিধেমতো দাম পেলে তিনি নাকি এ-বাড়ি

বিক্রি করে দেবার কথা ভাবছেন। কিন্তু যেহেতু বিভাস এসব ব্যাপারে নিজের পছন্দ আর ইচ্ছেটাই শেষ কথা বলে মনে করেন না, সেইজন্যে, এবং যেহেতু চারজনের সংসারকে একটা যৌথ ব্যবস্থাপনা বলে মনে করেন, স্ত্রী কিংবা মেয়ের মতো ছেলের মতামতটাও জানা দরকার মনে করলেন। সুজয় দিল্লিতেই শেষ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। আপাতত বিভাসের এক বন্ধুর বাড়িতে আছে, জায়গা পেলেই হস্টেলে চলে যাবে।

কিন্তু বাড়ির ব্যাপারে সুজয়কে চিঠি লেখা হল না। যেদিন চিঠি লিখবেন ভাবলেন, সেই রাতেই দরজায় টোকা পড়ল।

ঘরের মধ্যে বিভাস তখন ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে চোখ বুজে একটু আরাম খুঁজছেন। তাঁর লেখালেখি নিয়ে এতক্ষণ ভেবেছেন, আরম্ভটুকু মনে মনে সাজিয়ে নিয়েছেন, এখন হালকা চিন্তায় সরে এসেছেন। জয়া একটা নীল সোয়েটার শেষ করে আনার জন্যে তাড়াতাড়ি উলটোসোজা ঘর সাজাচ্ছে, আর বান্টি বুকের নীচে বালিশ দিয়ে বিছানায় শুয়ে ইংরেজি থ্রিলারের একটা দম আটকানো পর্বে পৌঁছে গেছে, তখনই বাইরের দরজায় টোকা পড়ল।

বিভাস সোজা হয়ে বসলেন। জয়ার হাতের নাড়াচাড়া বন্ধ হয়ে গেল। বান্টি বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে দরজার দিকে তাকাল। ঘড়ির কাঁটায় এখন রাত সাড়ে দশটা। কে ডাকে এখন?

টোকাটা তিন-চারবার পড়েই বন্ধ হয়ে গেছে। বিভাস বললেন, কে?

কেউ উত্তর দিল না। অথচ একটু পরেই শব্দটা আবার হল। দরজায় টোকা দিচ্ছে কেউ।

কে? বিভাস এবার গলা উঁচু করলেন।

এবারও কোনও উত্তর নেই। বিভাস জয়ার মুখের দিকে তাকালেন, বান্টির দিকেও। দু'জনেই দরজাব দিকে তাকিয়ে আছে। কে ডাকছে? বিভাস উঠলেন। দরজা খুলে দেখতে হয়। কিন্তু জয়ার মনে চকিতে অন্য একটা চিন্তা এসে গেছে। হাত নেড়ে সে বিভাসকে দরজা খুলতে মানা করল। নতুন জায়গা, এখনও সবকিছু জানা হয়নি, কে-না-কে, এত রাতে হুট করে দরজা খোলা ঠিক হবে না।

বিভাস দরজা খুললেন না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আরও একটু জোরে বললেন, কে? কে বাইরে?

উত্তর নেই। শব্দটাও আর হল না। একটু পরেই শোনা গেল বাড়ির সামনের রাস্তায় তুমুল হাসাহাসির শব্দ, যেন এইমাত্র দারুণ একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল। সব ক'টাই অল্প বয়সি ছেলেদের গলা। কতকগুলো খারাপ খারাপ শব্দও বিভাসের কানে এল। একজন শিস দিয়ে উঠল, একজন হিন্দি সিনেমার রগরগে গান গেয়ে উঠল। হাসছে সবাই হো হো হো হো হো হো। গলাগুলো আস্তে আস্তে দূরে চলে গেল। বোঝা গেল দলটা চলে যাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে বিভাস কিংবা জয়া কিংবা বান্টি তিনজনেই ফ্রেমে আটকানো তিনটে ছবি হয়ে গেছে। তিনজনেই চুপ, কেউ কারও দিকে তাকিয়ে নেই। এইমাত্র যে-ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা এতই অশালীন আর অমার্জিত, আর তিনজনের আচরিত জীবনের সঙ্গে এতই বেমানান যে তিনজনেই একটা জায়গায় মুহূর্তকালের জন্যে থেমে থাকল। সেই মুহূর্তগুলোতে দেয়ালঘড়ির টিকটিক শব্দ স্পষ্টতর হয়ে ঘরটা দারুণ নিস্তব্ধ করে রাখল। একটু পরে জয়াই প্রথম কথা বলল, আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।

জয়া কী বুঝতে পেরেছিল সেটা এখন বিভাসের জানা হয়ে গেছে। বিভাস নিজেও কিছু ভেবেছিলেন, কিন্তু সে ভাবাটা কুয়াশা কুয়াশা অস্পষ্ট ছিল, এত খোলামেলা তিনি ভাবতে পারেননি। ছেলেগুলো যে অন্য চেহারায় অন্য রাস্তায় এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে, তিনি বুঝতে পারেননি। তথাপি তিনি রাগকে সংযত রাখলেন। আহত গলায় শুধু বললেন, পুয়োর বয়েজ।

বান্টি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বইটা আর পড়া সম্ভব নয়। কী করবে সে ঠিক করতে পারছিল না। হিংস্র চোখে একটু সময় বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। তার সতেরো বছরের ধারালো

গড়নটা যে ছেলেগুলোকে আরও খেপিয়ে দিয়েছে, সেটা সে বুঝতে পেরেছে। তার নাম ওরা কোথা থেকে জেনেছে কে জানে। কতকগুলো আদিরসাত্মক মন্তব্যের সঙ্গে ওর নামটা ওরা অনেকবার উচ্চারণ করে গেল এইমাত্র। এ-ধরনের কথা সে আগে কখনও শোনেনি, বিশেষ করে বাবা কিংবা মা'র সামনে। খুব অসুস্থ মনে হচ্ছিল তাকে। এগিয়ে গিয়ে রেডিয়োটা চালু করে দিল। স্টেশনগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরল। গান, সংবাদ, সেতার, পশ্চিমি বাজনা। ধুস্! রেডিয়োটা বন্ধ করে দিল। গল্পের বইটা হাতে নিয়ে দুটো পাতা উলটিযেই আবার বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিল।

জয়া বোনাটা একপাশে সরিয়ে রেখে দেখল বান্টি পাশের ঘরে চলে যাচ্ছে। পাশাপাশি দুটো ঘরের একটা বড়, একটা মাঝাবি। মাঝারি ঘরে বান্টি শোয়। বড ঘরে দুটো আলাদা বিছানায় বিভাস আর জয়া। এপাশে সামনের দিকে আরেকটা ঘর আছে অবশ্য। সেটা বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হবে। হিসেব করে পছন্দমতো ঘর এখনও সাজানো হয়নি। এক সপ্তাহ হল ওরা এসেছে। জিনিসপত্রও এখনও সব আনা হয়নি। কিছু এখনও দিল্লিতে, কিছু কলকাতার বাড়িতে। একটু থিতু হয়ে বসলে আস্তে আস্তে সব গুছিয়ে নেওয়া যাবে।

বান্টি চলে গেলে জয়ার কপালে ভাঁজ পড়ল। বলল, এই তা হলে তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল? এভাবে এখানে থাকা যাবে?

বিভাস হতাশ ভঙ্গি করলেন। বললেন, কোথায় যাবে?

অন্তত এ-বাড়িটা ছেড়ে দাও, এ-পাড়াটাও।

যেখানেই যাও, ক্যালেন্ডারের সময় তো একই থাকবে। এগোনোও যাবে না, পিছোনোও যাবে না। আমাদের চারপাশে এখন জঙ্গল, ডেনস ফরেস্ট।

'তা বলে এইসব যা তা হবে? যা খুশি তাই হবে? ছি ছি, কী সব বলছিল বলো তো? কী নোংরা ভালগার সব কথাবার্তা। মেয়েটার সামনে মুখ দেখাতেই লজ্জা করছে।'

মেয়ের কথা বিভাসও ভাবছিলেন। সকালবেলায় ছেলেগুলো যখন এসেছিল তখনই মনে হয়েছিল ওরা দু'মুখো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। ক্লাবের চাঁদার নাম করে কিছু টাকা আদায় করা আর বান্টিকে ঘাঁটাঘাঁটি করা। বান্টির পশ্চিমে ঢঙের বাডন্ত গডন, ফরসা কাটাকাটা চোখ মুখ, আঁটসাঁট সালোয়ার কামিজে সুস্পষ্ট যুবতী শরীব যে এ-ধরনের ছেলেদেব চোখে অত্যন্ত বিপজ্জনক, তা নিজের মেয়ে হলেও বিভাস বেশ বুঝতে পাবতেন। দিল্লির চোখ আর এ-অঞ্চলের চোখেব একটু ইতরবিশেষও থাকবে বই কী, তা ছাডা ইদানীং সব জায়গাতেই মেয়েদের সম্বন্ধে জঙ্গুলে আইনটা ফের চালু হয়ে গেছে। দিল্লিতেও তো কত কাণ্ড হয়। কাগজ খুললেই দেখা যাবে দেশের কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ ধর্ষিতা কিংবা অন্য কোনও ভাবে পুরুষের লোভের শিকার হচ্ছে। নিজের মেয়ের সম্বন্ধে একটু ভাবনা হয় বই কী।

আট-দশজন ছেলে একসঙ্গে এসেছিল। পোশাক পবিচ্ছদে, আজকাল যেমন হয়, বেলবটস পলিয়েস্টার, গেঞ্জি, এইসব। প্রথম প্রথম হাবভাবে যে একটু বিগলিত ভাব, হেঁ হেঁ এই এলাম একটু। টাউনশিপ কিংবা আশেপাশের ছেলেরা সব। নতুন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে। বিভাসের ভালই লেগেছিল। নতুন এসেছেন তিনি। এখানকার লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হওয়া দরকার বই কী। বিপদ আপদ, এটা সেটা দরকার অদরকার আছে, তা ছাড়া এদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে এদের কথা লিখবেনই বা কেমন করে! হাজার হোক বাঙালি ছেলে তো সব। ইচ্ছে থাকলেও এতদিন সে সুযোগ পাননি। এখানকার বাড়িগুলো আলাদা আলাদা, বেশ কিছুটা জমি নিয়ে একলা একলা। আলাপ করতে হলে অনেকটা জায়গা পার হয়ে যেতে হয়।

তা বেশ তো, খুব খুশি হলাম। বসো বসো, রিল্যাক্স করে বসো।

ওদের মধ্যে একজন বলল, আমরা একটা ক্লাবের সবাই।

ক্লাব? বাঃ। দিল্লিতেও আমাদের একটা বেঙ্গলি ক্লাব ছিল। তা কী নাম তোমাদের ক্লাবের?

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু উত্তরটা এল না। কোনও উত্তরও ছিল না বোধহয়। একটু পরে একজন বলল,

ইয়ে, মানে, আমাদের ক্লাবের কোনও নাম নেই। দরকার টরকার পড়লে কোনও নামটাম নিয়ে নিই।

ও। যদিও বিভাস ওদের কথার সঠিক অর্থ বুঝলেন না, তবু অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়লেন। তখন পর্যন্তও ওদের সম্বন্ধে ধারণাটা ভালই রাখার চেষ্টা করলেন। ক্লাব বলতেই একটা ঘর, সাইনবোর্ড, খেলাধুলা, বইপত্র থাকতে হবে, তা তো সর্বক্ষেত্রে না-ও হতে পারে।

এবার পয়লা জানুয়ারি আমরা একটা ফাংশন করব, তাই— কী রে জনি, বল না জেন্টলম্যানকে।

জনি যার নাম, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে জুলপি, হাতে শিখদের মতো লোহার বালা, সে-ই বোধহয় দলটাকে চালায়। পঁচিশ- ছাব্বিশ বছর বয়সের জনি এতক্ষণ দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল, চোখদুটো ঘুরঘুর করছিল ভেতরের দরজার পরদার আশেপাশে। এতক্ষণ সে কোনও কথা বলেনি, এবার বলতে হবে। পরিষ্কার বোঝা গেল সে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলার ধার ধারে না। তার হিসেব সোজাসুজি। দাঁত থেকে হাতটা নামিয়ে বলল, সে ফাংশন কবে হবেটবে বলতে পারব না। তবে চাঁদা আপনার অ্যাডভান্স দিতে হবে। আর নো চেক পেমেন্ট, ক্যাশ টাকা দিতে হবে। রসিদ চাইবেন না। অ্যাই হুলো, টাকাটা নিয়ে নে মিস্টারের কাছ থেকে।

বিভাস গম্ভীর হয়ে গেছেন তখন। যদিও খুব অবাক হননি তিনি, এ-ধরনের সামাজিক উপদ্রবের কথা তিনি শুনেছেন। কাগজে ম্যাগাজিনে সবসময় পড়েন। তবু একটু নিরাশ মনে হল তাঁকে। আর একটু সময় নিয়ে ছেলেগুলোর সম্বন্ধে ধারণা ভেঙে গেলে কী ক্ষতি ছিল। এদের তিনি জানেন, কিন্তু জানতেন না এত তাড়াতাড়ি এদের থাবা থেকে নখ বেরিয়ে আসে। তা ছাড়া এ-জায়গা তাঁর ভাল লেগেছিল, পরবর্তী জীবনে এখানেই বাড়ি করে থাকবেন এরকম একটা ইচ্ছেসুখ যখন দানা বাঁধছে মনে, তখন আশাভঙ্গের আঘাতটা ছড়িয়ে গেল অনেক দূর পর্যন্ত।

হুলো একটু হাসিমুখ করে বলল, তা হলে স্যার, পাঁচশো এক টাকা— ক্যাশ, নো চেক পেমেন্ট, নো রসিদ।

ভেতরের দরজার পরদা নড়ে উঠল। বান্টি ঘরে ঢুকেই ছেলেগুলোকে দেখে থমকে দাঁড়াল। জনি একটু নড়েচড়ে বসল। বান্টিকে দেখেই ওর চোখে মুখে একটা লোভের খুশি চকচক করে উঠল। অকারণে একবার জিব দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেটে নিল সে। ততক্ষণে বান্টির চোখ পড়ে গেছে জনির দিকে। অপ্রসন্ন মুখটা বিরক্ত হয়ে উঠল।

বিভাসও বিরক্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ করলেন না। এসব ছেলেদের বেশি ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। গম্ভীর গলায় বললেন, পাঁচশো এক টাকা কিন্তু মোটেই রিজনেবল কথা নয়। বেশ তো, ফাংশনের আগে এসো, নিশ্চয়ই কিছু দেব।

ওদের দলের কে যেন শব্দ করে হাসল, যেন ভারী মজার কথা বলেছেন তিনি। হুলো বলল, ছি, এসব কথা বলতে নেই স্যার।

একটা ছেলে বলল, আমরা একজনের কাছে দু'বার আসি না স্যার। যা বলি, তাই নিই। পাঁচশো এক টাকা, নো চেক পেমেন্ট, নো মানি রিসিট।

জনি প্যান্টের পকেটে হাত দিল। বোধহয় একটা সিগারেট খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কী ভেবে হাতটা বের করে আনল। বান্টি এ-ঘরে আসবার পর একবারও সে অন্যদিকে চোখ সরায়নি। বলল, আরেকটা কথা মিস্টার, আমাদের ফাংশনে আপনার মেয়ে গান গাইবে। রবীন্দর সংগীত। ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে একটু প্রাইভেটলি কথা বলতে চাই।

এ তো বান্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সরাসরি প্রস্তাব। বিভাসের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। ঘড়ির দিকে তাকালেন। অফিস যাবার সময় হয়ে এসেছে, এক্ষুনি স্নান করতে ছুটতে হবে। অথচ ছেলেগুলো যাচ্ছে না। একটু কড়া হবেন ভাবলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই বান্টি তীব্র গলায় বলে উঠল, দশ-পাঁচ টাকা দিয়ে ওদের যেতে বলে দাও বাপি। ওদের কোনও ফাংশনে পার্টিসিপেট করতে আমি ভীষণভাবে ডিসএগ্রি করি, সে-কথাটাও ওদের জানিয়ে দাও।

জনির মুখ দেখে বোঝা গেল সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অপমানটা সামলে রাখল। এ তল্লাটে

এরকম অপমানের ভাষায় কেউ কথা বলবে, এরকম সামনাসামনি সে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে, সেটা সম্ভবত তার ধারণার বাইরে। চোয়াল শক্ত করে সে বান্টির দিকে তাকাল। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বা, বেশ ডায়লগ দিতে জানো তো।

বান্টি চিৎকার করে উঠল, বাপি তুমি এখনও উঠে আসছ না? এইসব হিউম্যান বিস্টদের গেটের রাস্তা দেখতে বলে দাও।

জনির চোখদুটো জ্বলে উঠল। বান্টিব দিকে তাকিয়ে বলল, কেউ যদি নিজের ইচ্ছেয় জনি দত্তের কাছে না আসে, তবে জনি দত্তের ইচ্ছেয় তাকে আসতে হয় সুন্দরী।

বিভাস উঠে দাঁড়ালেন। ছি ছি, এত নীচে নেমে গেছে এখানকার ছেলেরা? বাড়ির মধ্যে ঢুকে বাপের সামনে মেয়েকে এই ভাষায় কথা বলছে? মনে মনে একটা খারাপ গালাগাল উচ্চারণ করে তিনি বললেন, আমি আর এক মুহূর্ত সময় দিতে পারছি না। প্লিজ, লিভ দিস প্লেস।

বলেই তিনি আর দাঁড়ালেন না। দ্রুতপায়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। বান্টিও গেল বাবার পেছনে পেছনে। এরপর ছেলেগুলো কী বলল, কী করল, তিনি জানেন না। জানার ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। শুধু স্নান হয়ে যাবার পর আবার এ-ঘরে এসে তিনি ওদের কাউকেও দেখলেন না। সেইসঙ্গে দেখলেন টেবিলের ওপব রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা, গ্যাস লাইটারটা, চিনেমাটির সুদৃশ্য অ্যাশট্রেটা, দেয়ালের সুদৃশ্য ক্যালেন্ডারটা, ইংরেজি সাপ্তাহিকটা— ছেলেগুলোর সঙ্গে সেগুলোও চলে গেছে। আর কী গেছে, এখনই এখনই জানা গেল না। বুঝলেন ছেলেগুলো শুধু বেপরোয়া আর অভদ্রই নয়, ওদেব রুচির চারপাশে কোনও নৈতিক পাহারাও নেই। খুবই ছোট মাপের মানুষ এরা। অফিসে বসেও তিনি এসব কথা ভেবেছেন। ভেবে ভেবে শুধুই হতাশ হয়েছেন। চারপাশে নৈরাশ্য ছড়িয়ে গেছে অথই সমুদ্রের মতো। তিনি কী করবেন একা একা। চারদিকে সমস্ত শিক্ষা সংস্কৃতি চরিত্রকে পোকায় কাটছে। শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোক হয়ে থাকতে গেলে এসব জিজিয়া কর দিতেই হবে। পাঁচশো এক টাকা ক্যাশ, নো চেক পেমেন্ট, নো মানি রিসিট।

অন্য একটা কারণও তাঁকে ভাবিত করে তুলেছিল। বান্টি হঠাৎ ছেলেগুলোর সম্বন্ধে কথা বলতে গেল কেন? মেয়েকে তিনি জানেন। নিজের জগৎ নিয়েই সে থাকতে ভালবাসে, কোনও জটিল অশান্তির মধ্যে থাকে না। বাড়বাডন্ত শরীর হলেও সে শরীর যেন ভরা বর্ষার নদীর অতিরিক্ত জল। সে জল কূল ছাপায়, ঢেউ তোলে, উতলা হয়, কিন্তু দু'পারের বন্ধনীর মধ্যেই সে নদী একই ভাবে বয়ে চলে। বান্টি যদিও বড় হয়েছে, সতেরো বছবের সীমানায় যদিও তাকে ধরে রাখা যায় না, চোখের মাপে আরও কয়েক বছরের বড় মনে হয়, কিন্তু তবু বিভাস জানেন মনের দিক থেকে শৈশবাবস্থা পার হতে পারেনি সে। ছেলেদের সঙ্গে সে দিল্লিতে মেলামেশা করেছে অবাধে, কিন্তু যে-সচেতনা নারী পুরুষের সম্পর্ককে এক জটিল অসরল পথে নিয়ে যায়, তা এখনও বান্টির মধ্যে আসেনি। জীবনের সবকিছু এখনও তার কাছে খেলার মতো। খেলার আনন্দই তার কাছে বড় কথা। তাই এ ছেলেগুলোর সম্বন্ধে বান্টির কথাবার্তা বিভাসকে অবাক করে দিয়েছিল। বান্টি হঠাৎ এরকম রেগে গেল কেন? একটু সহ্য করে থাকলে ব্যাপারটা হয়তো এত তাড়াতাড়ি এতদূর এগোত না।

সহ্য? হোয়াট ডু য়্যু সে, বাপি? এদের সহ্য করব, এই অসভ্য নুইসেন্সদের? সন্ধেবেলায় বিভাসের সামনে বসে বান্টির চোখমুখ রাগে লাল হয়ে গেল, এদের চেনা আমার আগেই হয়ে গেছে। এদের জন্যে রাস্তায় বেরোতে পারি না। কী সব ফিলদি নোংরা বাতচিত। আর ওই যে ডেভিলটা, জনি না কী নাম. ওটাই দলটার রিং লিডার আছে। ওটাই সবচেয়ে ট্রাবল দেয়, টিজ করে, গায়ে পড়ে কথা বলতে আসে। হি ইরিটেটস মি। ওদের ইনডালজেন্স দিলে ওরা আরও বেড়ে যাবে।

কিন্তু সত্যিই ওরা আরও বেড়ে গেল। চূড়ান্তভাবে বেড়ে গেল। পরের দিনও ঠিক একই সময়ে, রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে ঠিক একরকমভাবেই দরজায় আবার শব্দ হল, আবার সেই তুমুল হাসাহাসির ধুম, নোংরা কথাবার্তা, বান্টিকে জড়িয়ে অশ্লীল মন্তব্য, শিস, চটুল গান। শুধু

রাতেই নয়, স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছেন কিংবা বাজারে যাচ্ছেন বিভাস, পেছন থেকে কটু কথা, হুমকি কানে এসেছে। রাস্তায় বেরিয়েছেন মেয়ে বউকে নিয়ে, পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে ওরা গল্প করেছে, কান-গরম-করা কথা বলেছে। জয়ার সঙ্গে বান্টি কেনাকাটা করতে দোকানে গেছে, সেখানেও ওরা পিছু নিয়েছে। এমনকী শুধু বান্টি নয়, চল্লিশোর্ধ ঢলঢলে চেহারা জয়াও ওদের লালসার শিকার হয়েছে।

শালা দেখেছিস, স্পঞ্জের গদি মাইরি।

স্টেশনারি দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওদের টের পাচ্ছে বান্টি। দোকানে তাকিয়ে দেখল, এখানে কোথায় স্পঞ্জের গদি কে জানে! আড় চোখে মা'র দিকে তাকাতেই বান্টি থমকে গেল। জয়ার মুখ লাল হয়ে গেছে। তক্ষুনি কথাগুলোর মানে পরিষ্কার হয়ে গেল বান্টির কাছে।

দোকানের ভদ্রলোক সম্ভবত ছেলেগুলোকে বিলক্ষণ চেনেন এবং জানেন এদের ব্যাপারে কিছু করার নেই। তিনি যেটা পারেন, সেটাই করলেন। জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি প্যাক করে ওদের হাতে তুলে দিলেন। অর্থাৎ কিনা ওদের বেশিক্ষণ আটকে রাখলেন না।

ছেলেগুলো জনি দত্তের দলের হলেও জনিকে কিন্তু দেখা গেল না। খুব সম্ভব এসব হালকা ব্যাপারে সে থাকে না। তার পজিশন অন্যরকম। রাস্তাঘাটে নিজেকে সস্তা করতে চায় না। সর্বজনস্বীকৃত মস্তান সে। তার ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলো বাস্তবায়িত করে দলের ছেলেরা। নিজের হাতে কিছু করার দরকার হয় না, তার অনেক কাজ আছে। তার হাত অনেক দূর বিস্তৃত। এ-অঞ্চলের ছায়াচ্ছন্ন জগৎটার সে একচ্ছত্র অধিপতি।

রাতে জয়া বলল, 'তা হলে কিছুই করা যাবে না? একটু ভদ্রভাবে থাকবারও কি অধিকার থাকবে না?

বিভাস গম্ভীর গলায় বললেন, থানার ওসিকে বলেছিলাম।

তো?

তিনি আমাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বললেন। ওদের ব্যাপারে নাক গলালে নাকি বিপদে পড়তে হবে।

একথা বলল?

ঠিক একথা অবশ্য বলেনি, ভাবটা ওইরকম। তা ছাড়া পুলিশই বা করবে কী! কিছু করতে গেলেই পলিটিক্যাল প্রেশার আসবে নাকি। ইলেকশনের সময় এদের হাত দিয়েই মেজর পোরশন ভোট আসে। রিগিং ফলস ভোট তো আছেই।

অন্তত মেয়েদের সিকিউরিটি বলতে কিছুই নেই? ছেড়ে দাও এ জায়গা।

কোথায় যাবে?

দিল্লিতেই ফের ফিরে চলো।

আমি কি ইচ্ছে করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসেছি। ট্রান্সফার হয়ে এসেছি।

হঠাৎ জয়ার রাগ হয়ে যায়। বলে, তুমি ইচ্ছে করে ট্রান্সফার নিয়েছ, তোমার সাধের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসতে চেয়েছিলে। কিন্তু কেন, কেন আমাদের এই জঙ্গলের মধ্যে টেনে আনলে?

জয়া এভাবে কোনওদিন কথা বলে না। বিভাস বিস্মিত চোখ তুলে তাকান। ছেলেগুলো শুধু নিজেরা নোংরা নয়, নোংরা করে দিচ্ছে অন্যের পারিবারিক সম্পর্ক। আবিল পরিবেশ ছোট করে দিচ্ছে চারপাশের মানুষের মনের হৃদয়ের জীবনের প্রসারতা। এটাই ভয় পান বিভাস। আলো নিবিয়ে দিয়ে সবকিছু গভীর অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে একদল মানুষ। সেই অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছে সুস্থ স্বাভাবিক অন্য মানুষগুলো। বাইরের পচা জল বন্যার মতো এসে ঢুকেছে ঘরে। সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কলকাতায় বদলি চেয়েছিলেন বিভাস নিজেই, জয়ার এই অনুযোগ অনেকখানি সত্যি। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন পদস্থ কর্মচারী তিনি। বলতে গেলে চাকরি জীবনের সবটাই বাইরে কাটিয়েছেন,

ওই দিল্লিতেই। ভাবলেন চাকরির শেষ পর্যাযটা কলকাতায় কাটাবেন। দিল্লিতে চেনাজানা একটা জগৎ গড়ে উঠেছিল ঠিক, ছেলেমেয়ে দুটোও ওখানকার জল বাতাসে মানুষ, তবু নিজের দেশ সম্বন্ধে অদ্ভুত এক স্পর্শকাতরতা তাঁর বরাবরেরই। দিল্লিতেও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঙালিয়ানা বজায় রেখেছেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন অখণ্ড বাংলার নামকরা স্বাধীনতা সংগ্রামী। জীবনে বহুবার কারাবরণ করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির মানুষ ছিলেন। সারাজীবন দেশের মানুষের অফুরন্ত শ্রদ্ধা ভালবাসা পেয়েছেন। তাঁর ছেলে, অর্থাৎ বিভাসের বাবা বিরজামোহন ছিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত প্রাচীন কলেজের অধ্যক্ষ। খাঁটি মানুষ, শর্তহীন চরিত্র, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। অন্যান্য ভাইদের মতো বিভাস পিতা কিংবা পিতামহের কিছুই পাননি। এবং পাননি বলেই স্মৃতিজীবী হয়ে থাকতেন। যদিও বিভাস বিশ্বাস করেন উত্তরাধিকারের ধারাটি বেগবতী না হলেও একেবারে অপসৃত হয়ে যায়নি। দেশজোড়া এই নীতিহীনতার সঙ্গে তিনি যুদ্ধরত না হলেও দুর্নীতির পথটা এড়িয়ে গেছেন। এবং যেহেতু পিতা এবং পিতামহের স্মৃতি তার কাছে অপরিমেয় শ্রদ্ধার ছিল, সেজন্যে দিল্লিতে বহুকাল থাকলেও নিজেকে প্রবাসী বলে মনে করেই সুখী থাকতেন। চরিত্রের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল বলেই তিনি প্রবাসের সঙ্গে কখনও একাত্ম হতে পারেননি। সুখের হোক, দুঃখের হোক, স্বমহিমাতেই নিজেকে দেখতে ভালবাসতেন।

অবশ্য জয়ারও যে কলকাতায় আসার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না, তাও নয়। দিল্লি কিংবা ভারতের যে কোনও জায়গায় মানুষ এখন সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মমুখী হয়ে গেছে। বৃহৎ পরিবার ভাঙছে। প্রাদেশিকতাবাদ মাথা তুলছে ধীরে ধীরে। কলকাতায় এলে আর কিছু না হোক নিজেকে গুটিয়ে রাখতে হবে না, নিজেকে ছড়িয়ে রাখতে পারবেন। তা ছাড়া দিল্লিতে সরকারি কোয়ার্টারেই কেটে গেল এতকাল, নিজস্ব বাড়ি এখনও হয়নি। জমি বাড়ির এখন যা বাজার, এই সময়ের মধ্যে না করে নিলে পরে অসুবিধেতে পড়তে হবে। কলকাতার শরিকী বাড়িতে নিজের অংশের কথা চিন্তা করতেই খারাপ লাগত। এদিকে দিল্লিতে বাড়ি করা কিংবা ফ্ল্যাট কেনার কথাও বিভাস ভাবতেন না। কাজেই নিজেকে গুছিয়ে নেবার চিন্তাটাই জয়ার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল।

ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। বিভাস সিগারেট ধরালেন। সিগারেট খেতে খেতে বললেন, এত কথা আমি জানতাম না জয়া।

ঢং করে ঘড়িতে সময় বাজল। বিভাস দেখলেন রাত সাড়ে ন'টা। সঙ্গে সঙ্গে চারটে দেয়াল যেন কাছে সরে এসে ঘরটাকে অনেক ছোট আর থমথমে করে দিল। সময় হয়ে এসেছে। যেন একটা ডোরাকাটা বাঘ ওত পেতে বসে লেজ নাড়ছে। একটু পরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। দরজায় আবার সেই নখের আঁচড় পড়বে, বিকৃত উল্লাসের শব্দ উঠবে, কিছু সময়ের মধ্যে নরক গুলজার করে আবার ওরা ফিরে যাবে।

বিভাস তাকিয়ে দেখলেন জয়াকে। মুখের রং বদলে গেছে। বহুদিন ধরে অসুখে ভুগছে এমন মুখ। বিরক্তি, ভয়, ঘৃণায় আক্রান্ত এমন একজন মানুষের মতো তাকিয়ে আছে।

মেয়েটার জন্যে এত ডিসগাসটিং লাগছে। জয়া ঠোঁট কামড়ায়।

শুধু মেয়ে নয় বিভাস ভাবছিলেন জয়ার কথাও। এখন বোধহয় তেতাল্লিশ চলছে। অথচ বয়েস শরীরকে একটুকুও ভাঙতে পারেনি। দুপুরের প্রখর রোদ্দুর এখন হয়তো ঝলসায় না, কিন্তু বিকেলের সোনা রংই বা কম কীসের। ছেলেগুলো আগে বান্টিকে জড়িয়ে খারাপ কথা বলত, এখন জয়ার নামেও বলে। নীতিহীন অন্ধকারে মা আর মেয়ের কোনও আলাদা সীমারেখা নেই।

বিভাস বললেন, কিন্তু কী করা যাবে। ফট করে তো এখুনি আবার দিল্লিতে ফিরে যাওয়া যাবে না। এক কলকাতার বাড়িতে কষ্ট করে থাকা যায়।

কলকাতার বাড়ি? কী নোংরা বাথরুম।

তা হলে চোখ কান বন্ধ করে এখানেই থাকতে হবে।

জয়া সভয়ে বলে, এখানেই থাকতে হবে?

হ্যাঁ। আপাতত এখানেই।

আর রোজ এইসব টলারেট করতে হবে?

হবে। আরও বাড়তে পারে।

কিন্তু এখানে তো আরও অনেক বাড়ি লোকজন আছে। তারা কিছু করবে না? কেউই প্রতিবাদ করবে না?

বিভাস ম্লান হাসলেন, এদের কাছে সবাই অসহায় জয়া। অভিজ্ঞতাই মানুষকে স্বার্থপর করে দিয়েছে। এখানে থাকতে হলে এদের কাছে সারেন্ডার করেই থাকতে হবে। পাঁচশো এক টাকা, নো চেক পেমেন্ট, নো মানি রিসিট। ওরাই এখন সমাজেব অভিভাবক।

জয়া কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল। দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দশটা বাজছে। সময় হয়ে এসেছে। অল্প পরেই শুরু হবে রোমহর্ষ নাটক। কঠোরভাবে প্রাপ্তবযস্কদের জন্যে। যবনিকা কম্পমান।

পরদা সরিযে বান্টি ঘরে এসে ঢুকল। ঘণ্টার শব্দ শুনল। ঘডির দিকে তাকাল। এই কয়েকদিনেই বান্টির বয়েস যেন আরও কয়েক বছর এগিযে গেছে। সেই হাসিখুশি সরল মেয়েটা এখন বড্ড সিরিয়াস। অসম যুদ্ধে তাকে অবিরাম যুঝতে হচ্ছে। জযা হাত ধরে মেয়েকে পাশে বসাল।

তখনই দরজায শব্দ হল। আজ একটু আগেই এসেছে। শব্দটাও বেশি জোরে।

বিভাস দাঁতে দাঁত ঘষলেন, কোনওদিন বলেননি, এমন শব্দ উচ্চারণ করলেন, বাস্টার্ড।

ততক্ষণে ওদের হুলোহুলি আরম্ভ হয়ে গেছে। উল্লাস আজ মাত্রাহীন। ভাষা আরও অশ্রাব্য। গতকাল বিভাস থানাব অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, নিজস্বসূত্রে সে-খবর ওদের কাছে যথারীতি পৌঁছে গেছে।

শান্তিপ্রিয নাগরিক থানায় রিপোর্ট কবেছে বে হো হো হো।

পুলিশের বাপের নাম জনি দত্ত, হো হো হো।

চিমা চিকে চিখা চিব, হো হো হো।

চিমে চিয়ে চিকে চিখা চিব, হো হো হো।

ডাঁশাও খাব, পাকাও খাব, হো হো হো।

ডুডুও খাব, টামুকও খাব, হো হো হো।

ইউ ডার্টি বিস্ট। বান্টির আর সহ্য হল না। লাফ মেরে উঠে টেপটা চালু করে দিল। তুমুল ইংরেজি বাজনা। পূর্ণশক্তিতে বাজতে থাকল যন্ত্রটা। ছেলেগুলোর উল্লাস ডুবে গেল সেই শব্দের মধ্যে। আর তখনই আলো নিবে গেল ঘরের, বাইরেবও। লোড শেডিং। সেই হঠাৎ অন্ধকার ছেলেগুলোকে থমকে দিল কযেক মুহূর্ত। তারপরই ওরা অন্ধকারে নেমে পড়ল। শব্দগুলো রাস্তা থেকে উঠে এল একেবারে দরজায়। হো হো হো, হো হো হো। সঙ্গে সংকীর্তনের ঢঙে হাততালি। যতক্ষণ বিলিতি বাজনা বাজল ততক্ষণ হো হো হো চলতে থাকল। শব্দে অন্ধকারে নরক সম্পূর্ণ হল।

পরের দিন ছুটির দিন। রবিবার। ঠিক বেলা এগারোটার সময় কলিং বেল আর্তনাদ করে উঠল। পাগল হয়ে যাবার অবস্থা। যা হয় হোক, বিভাস আজ একটা এসপার ওসপার করে ছাড়বেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে সপাটে দরজা খুলে দিলেন।

কিন্তু দরজার বাইরে যাকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, তাকে সোদপুরে এই বাড়িতে একেবারেই আশা করতে পারেননি বিভাস। বান্টির দিল্লির বন্ধু রাকেশ, চব্বিশ-পঁচিশ বছরের তাজা ছেলে। ফরসা, উন্নত চেহারা।

বহুত সারপ্রাইজ দিলাম।

বহুত হ্যাপি সারপ্রাইজ রাকেশ। সুজুর খবর কী?

বিলকুল ঠিক।

ভেতরে এসো। অ্যাড্রেস পেলে কোথায়?

বান্টির চিঠি পেলাম তো। লেকিন বহুত হয়রানি হল।

জয়াও খুব খুশি হল। রাকেশ সুজয়ের চিঠি নিয়ে এসেছে। সে ভালই আছে। বান্টির তো কথাই নেই। অবরুদ্ধ নদী যেন মুক্তধারায় ছুটে চলল অনেকদিন বাদে। নিজে যেমন তেমনি রাকেশকেও এক মুহূর্তও চুপ করে বসে থাকতে দিল না। অবিরাম কথা, হাসি, দিল্লির গল্প। রেকর্ডের বাজনার তালে তালে পা মেলাল, গান করল গুনগুন করে। বহুদিন পরে অঝোর বৃষ্টি এসে যেন ধুইয়ে দিল সব আবিলতা। বিভাসের খুব ভাল লাগল। নিরুদ্দেশ থেকে বান্টি ফিরে এসেছে।

রাকেশ বিকেল কিংবা সন্ধের কোনও সময় কলকাতায় ফিরে যাবে। কোনওমতেই তার আর বেশি সময় সোদপুরে থাকার উপায় নেই। কালই তাকে দিল্লিতে ফিরতে হবে। বাবার ব্যাবসা সংক্রান্ত কাজে কলকাতায় এসেছিল, সঙ্গে ছিল বান্টির চিঠি। একটা দিন সময় পেয়ে চলে এসেছে।

সন্ধেবেলায় রাকেশ ফিরে যাবে, বান্টি বলল, চলো, তোমাকে সি অফ করে আসি।

জয়া কিন্তু কিন্তু করছিল। বলল, রাত হয়ে যাবে, একা একা ফিরবি।

বান্টি হাসল, নতুন করে কী হবে?

রাকেশ এসব কথা বুঝল না, তাকে এখানকার কথা জানানোও হয়নি। হাতঘড়িতে সময় দেখে বলল, লেটস প্রসিড বান্টি।

এক ঘণ্টাও হযনি, বান্টি প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরল। ফিরেই নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

কী হয়েছে বিভাস কিংবা জয়ার জানা নেই, কিন্তু বিপদেব গন্ধ ভেসে এল। এই তো হাসতে হাসতে রাকেশকে এগিযে দিতে গেল, কিন্তু ফিরে এল সম্পূর্ণ বিপরীত চেহাবায।

দরজা ধাক্কান বিভাস, দরজা খোলো বান্টি।

বান্টি দরজা খুলল না। জয়া ডাকল, বান্টি, মামণি, দরজা খোলো।

কিন্তু কাবও ডাকেই দবজা খুলল না বান্টি। কী হযেছে কেউ জানে না। জয়া ভয-পাওয়া গলায ডাকল, বান্টি, দরজা খুলছ না কেন?

বান্টি, ডোন্ট বি সিলি, দরজা খোলো? বিভাসের গলায়ও উদ্বেগ। শব্দ করে দরজা ধাক্কালেন আবার।

এবার দরজা খুলল বান্টি। চোখ লাল, এলোমেলো চুল, অবিন্যস্ত পোশাক। কামিজের একটা জায়গায় অনেকখানি ছেঁড়া। শরীরের অনাবৃত অংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিভাস চোখ ফিরিয়ে নিলেন। সম্পূর্ণ পাগলের মতো লাগছে বান্টিকে।

জয়ার গলা কেঁপে গেল, কী, কী হয়েছে?

কিছু বলবে বলে বান্টির ঠোঁটদুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। তার পরেই দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল।

পশুটা আমাকে অপমান করেছে, আমাকে টাচ করেছে, টরচার করেছে, ওই ডেভিলটা আরও এক্সট্রিমে চলে গিয়েছিল।

রাকেশ, রাকেশ কোথায়?

রাকেশ চলে গেছে। ওকে ওরা মেরেছে। আনকলড ফর। ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল।

কে মেরেছে? জনি দত্তের দল?

দল ছিল না, জনি দত্ত একাই ছিল তখন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল একটা দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসার মতো। রাস্তা এখানে কিছুটা স্বল্প পরিসর, অন্ধকার, লোক চলাচল কম। ঢোলা প্যান্ট, লাল গেঞ্জি, ঠোঁটের

কোণে ঝুলছে সিগারেট, জনি দত্ত দাঁড়িয়ে ছিল একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে। নির্বিকার মুখ, কিন্তু এক অনিবার্য নিয়মের মতো।

রিকশায় কিংবা বাসে তাড়াতাড়ি স্টেশনে যাওয়া যায়। কিন্তু বান্টি বলল, চলো হেঁটেই যাই। অনেকক্ষণ সময় পাওয়া যাবে, অনেক বাতচিত হবে।

এইচ বি টাউন থেকে হেঁটে স্টেশনে যেতে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। রাকেশেরও ভয়ংকর কোনও তাড়া ছিল না, রাতের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছোলেই হল। ওরা বিজয়নগর টাউন ক্লাবের মাঠের পেছনের পথে অমরাবতীর রাস্তা ধরল। একটু এগিয়ে বাঁ হাতি রাস্তা ধরতেই জনি দত্তকে দেখল। তখন সন্ধে ফুরিয়ে গেছে, ছায়াছায়া অন্ধকার নেমেছে, রাস্তায় তখনও আলো জ্বলেনি।

ওরা কাছে আসতেই জনি ঠোঁট ছুঁচোলো করে আকাশের দিকে ধোঁয়া পাঠাল। খুব কাছে যখন এসে গেছে, জনি হাতের টুসকিতে সিগারেটটা ছিটকে ফেলল। তারপর সাঁ করে রাস্তার মাঝখানে চলে এল। দু'হাত কোমরে রেখে পা দুটো ফাঁক করে মধ্যযুগের নাইটদের মতো দাঁড়াল। রাস্তা বন্ধ।

রাকেশ দাঁড়িয়ে পড়েছে। বান্টি তীব্র গলায় বলল, একী অসভ্যতা, রাস্তা ছেড়ে দিন শিগগির।

জনি চোখদুটো তীক্ষ্ণ করে তাকাল, আগে বলো এ-রাস্তার মালিক কে? আমি না ওই ইমপোর্টেড মালটা?

মুখ সামলে কথা বলুন।

খুব ঘ্যাম দেখছি তোর, কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস?

বাকেশ বলল, লিভ ইট বান্টি, দোসরা রাস্তায় চলো।

জনি বোধহয় এই সুযোগটা খুঁজছিল। ঝট করে এগিয়ে এসে রাকেশের বুকের সামনে জামাটা চেপে ধরে বলল, শালা খগেনের বাচ্চা, দেখছিস না স্বামী ইস্ত্রিতে আলাপ হচ্ছে? তুই এর মধ্যে ডায়লগ দিচ্ছিস কেন?

বান্টি চিৎকার করে উঠল, ওকে ছেড়ে দাও, শিগগির ছেড়ে দাও।

বোঝা গেল জনি রাস্তায় জাল বিছিয়ে অপেক্ষা করছিল। হয়তো ওদের এদিকে আসতে আগেই দেখেছে। আশেপাশে কোথায় দু'জন ঘাপটি মেরে বসে ছিল, লাফ মেরে চলে এল রাকেশের সামনে। একজন এসেই পেছন দিক থেকে রাকেশকে লাথি মেরে বলল, আমরা একে বানাচ্ছি গুরু, তুমি অপারেশনে নেমে পড়ো।

জনি রাকেশকে ছেড়ে দিতেই অন্যজন প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুষি মারল রাকেশের মুখে। অকারণে, সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায়। রাকেশ মুখ দিয়ে যন্ত্রণার একটা অস্ফুট শব্দ করল। স্বাস্থ্যবান সবল ছেলে সেও। কিন্তু অপরিচিত জায়গা, সংঘর্ষে আসার কোনও সুযোগও তাকে দেওয়া হয়নি। সম্ভবত বান্টির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা এদের ভীষণভাবে তাতিয়ে দিয়েছে। সে জানে সামান্য কিছু অজুহাত পেলেই তাকে শেষ করে দেওয়া হবে। এরা প্রস্তুত এবং সম্ভবত সশস্ত্র।

জনি এগিয়ে এসে বান্টির হাত ধরেছে। টেনে নিয়ে যেতে চাইছে অন্ধকার ঝোপের আড়ালে। বান্টি প্রাণপণ শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে চাইছে, হাত পা ছুড়ছে, খামচে দিচ্ছে। জনি তবু টানছে, জৈবিক লালসায় হাঁপাচ্ছে সে। এবং যেহেতু বান্টি বাধ্য মেয়ের মতো আসতে চাইছে না, জনির একটা হাত বিদ্যুৎ গতিতে আছড়ে পড়ল বান্টির গালে। বান্টির গাল জ্বলে উঠল।

ছেড়ে দাও আমাকে, ডোন্ট টাচ মি, ছেড়ে দাও বলছি।

সামান্য সুযোগ পেয়ে একটু পরে জনির থাবার বাইরে বান্টি যখন বেরিয়ে এল, তখন তার জামা ছিঁড়ে গেছে, ঘাড়ে হাতে কামড়ের দাগ, ঠোঁটদুটো বিষের জ্বালায় জ্বলছে। বান্টি দৌড়ে পালাতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। রাকেশকে তখনও আটকে রেখেছে ছেলেদুটো, আসতে দিচ্ছে না বান্টির কাছে। বান্টিকে পালিয়ে যেতে দেখে ওরা রাকেশকে ছেড়ে দ্রুত রাস্তার পাশের

অন্ধকারে নেমে গেল। বান্টি চিৎকাব করে বলল, 'বাকেশ, তুমি চলে যাও, চলে যাও, আমি বাড়ি যাচ্ছি।

বাকেশ ফাঁকা বাস্তায় দৌড়াল।

একটু পবে ঘবেব দবজা বন্ধ কবছিল জযা, বিভাস বিছানায বসে, বললেন, থাক না, কী দরকার ওটা বন্ধ কবাব?

তাব মানে? দবজা বন্ধ কবব না? জযা অবাক হয।

বিভাস ম্লান হাসেন, বন্ধ কবার কী দবকাব! বাইবেব লোক তো ভেতরে ঢুকেই গেছে।

জযা ঠোঁট কামড়ে বিষণ্ণ চোখে তাকায।

তুমি যাবে না? যাবে না এই নবক থেকে?

যাব। দিল্লিতে আবাব ফিবে যাবাব চেষ্টা কবছি। বাঙালি হযে থাকতে হলে বাংলাব বাইবেই থাকতে হবে।

তোমাব বই লেখা?

লিখব। দিল্লিতে গিযে লিখব। তবে পশ্চিম বাংলাব প্রেজেন্ট প্রবলেম নিযে লিখব না।

কী লিখবে তবে?

একটু সময চুপ কবে থাকলেন বিভাস। তাবপব অনেক দূবে যেন তিনি দাঁড়িযে আছেন, এমনি গলায বললেন, ইতিহাস লিখব। বাঙালি জাতিব ইতিহাস। যে জাতি সম্পূর্ণ তলিযে গেছে, তাব ইতিহাসই তো লিখতে হয, সমকালীন সমস্যা নয। তাই না?

খেলনা

ঘরে ঢুকেই বাবাইয়ের হাতের ছোট্ট ধাতব বস্তুটা দেখে কৃষ্ণা থেমে গেল।

এই, ওটা কী রে তোর হাতে?

বাবাই ক্যালেন্ডারের ছবির দিকে রিভলভারটা তাক করে দাঁড়িয়ে ছিল। অস্ত্রটার মুখ কৃষ্ণার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, হ্যান্ডস আপ!

কৃষ্ণার হাত তোলার উপায় নেই। এক হাতে জলের গেলাস, অন্য হাতে খাবারের ডিশ। একটু আগেই দেবাশিস অফিস থেকে ফিরেছে। হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হতে এখন কলঘরে।

টেবিলের ওপর ডিশ আর গেলাসটা নামিয়ে রেখে কৃষ্ণা বলল, বা, বেশ তো দেখতে। দে তো একটু দেখি।

অফিস-ফেরত দেবাশিস ছেলের জন্য মাঝেমাঝেই কিছু কিনেটিনে আনে। রঙিন ছবির বই, খেলনা, চকোলেট, এটা-সেটা। কৃষ্ণার জন্যেও আনে। কখনও কখনও বেশ দামি জিনিসও এসে যায়। আর জিনিসগুলো দেখেই কৃষ্ণা বুঝতে পারে সেদিন দেবাশিসের হাতে কেমন পয়সা এসেছে। আগে কৃষ্ণার লজ্জালজ্জা লাগত, সংকোচ হত, নীতিবোধটা খচখচ করত মনে। এখন কিছু মনে হয় না। অন্য সবকিছুর মতো এসবও অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন বরং ভালই লাগে। মাস মাইনের গোনাগুনতি টাকায় এত জিনিসে ঘর ভরানো যেত? কালার টিভি, ফ্রিজ, দক্ষিণ কলকাতায় তিন কাঠা জমি-- এত অল্প সময়ে আয়ত্তের মধ্যে এসে যেত? নাকি ব্যাঙ্কের বইয়ের জমার ঘরটা এত লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যেত। শখ যে কখন সুখের স্বপ্ন হয়ে গেছে কৃষ্ণা নিজেই জানে না।

বাবাইয়ের হাতের রিভলভারটা তেমনি তাক করা কৃষ্ণার দিকে। ভ্রূ-কুঞ্চন করে বাবাই বলল, কই মা, তুমি তো হাত তুললে না? এক্ষুনি কিন্তু গুড়ুম করে দেব।

কৃষ্ণা রিভলভারটা দেখছিল। দারুণ দেখতে। অবিকল আসল জিনিসের মতো। কৃষ্ণার ছোটকাকা পুলিশের ইন্সপেক্টর। ছোটকাকার রিভলভারটাও ঠিক এইরকমই দেখতে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা বিদেশি মাল, ইমপোর্টেড। এসপ্লানেডের খুচরো দোকান থেকে নিশ্চয়ই দেবাশিস কিনে এনেছে বাবাইয়ের জন্যে। কে বলবে ওটা সত্যিকারের রিভলভার নয়, টয় রিভলভার।

জানো মা, বাবার অফিসের ব্যাগে এটা ছিল। আমি বের করে নিয়েছি।

বাবাইয়ের জন্যে কিছু আনলে বাড়ি এসে দেবাশিস আগেই ব্যাগ থেকে জিনিসটা বের করে বাবাইয়ের হাতে দেয়। আজ হয়তো ভুলে গেছে। আর বাবাইও, যখন দেবাশিস ঘরে নেই, তখন নিজেই ব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছে। কিন্তু দেবাশিসের অফিসের ব্যাগে হাত দেওয়া বাবাইয়ের মোটেই উচিত কাজ হয়নি। ব্যাগে কতরকম দরকারি কাগজপত্র থাকে। আট বছরের ছেলের কাছে ওসবের মূল্যই বা কী! নষ্ট করে কিংবা হারিয়ে ফেললে দেবাশিসকে খুব অসুবিধেতে পড়ে যেতে হবে।

এই, তুই বাবার ব্যাগে হাত দিয়েছিস?

বাবাই মাথা নাড়ল। দিয়েছে।

দিয়েছিস? না না, আর কখনও হাত দেবে না। বাবা জানতে পারলে তোমাকে মোটেই ভালবাসবে না কিন্তু।

ইস। বাবাই ঠোঁট ওলটাল।

ইস? দাঁড়াও, বাবা ঘরে আসুক, বলে দিচ্ছি।

বাবাই তখন তার রিভলভার নিয়েই মহাব্যস্ত। কৃষ্ণার কথা তার কানেই গেল না বোধহয়। আর কানে গেলেও তার কিছু যায় আসেও না যেন। মা-বাবাকে ভয়ই পায় না সে। কে রাগ করল, না করল, তার বয়েই গেছে। রিভলভার হাতে নিয়ে সে লক্ষ্যভেদের বস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছে। কৃষ্ণা ছেলের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ছোট আলমারিটার ওপরে তাকাল। ওই আলমারির ওপরেই দেবাশিসের ব্যাগ থাকে। ব্যাগটা দেখে কিন্তু ভারী অদ্ভুত লাগল তার। দেবাশিস প্রত্যেকদিন যে-ব্যাগটা নিয়ে অফিসে যায় আর অফিস থেকে ফিরে আসে, এটা যেন সেই ব্যাগটা নয়। ব্যাগটাকে যেন আরও একটু পুরনো, আরও রং-হারানো মনে হচ্ছে। কিন্তু অন্য ব্যাগই বা আনতে যাবে কেন দেবাশিস। হয়তো কৃষ্ণাই অনেকদিন পবে ব্যাগটাকে নজর করে দেখছে। কথাটা ভাবতেই কৃষ্ণা মনে মনে হাসল। ভেতরের জিনিস দেখতে গিয়ে ব্যাগের বাইরেটা চোখেই পড়ে না আজকাল। কিন্তু হাসলেও কৃষ্ণা ঠিক খুশি হতে পারল না যেন। সত্যিই কি এই ব্যাগটাই দেবাশিসের সেই ব্যাগটা? দেবাশিস ঘরে ঢুকেই বাবাইয়ের রিভলভারের মুখে পড়ে গেল।

হ্যান্ডস আপ বাবা।

দেবাশিস ভয় পাওযার মুখ করে দু'হাত ওপরে তুলে বলল, সারেন্ডার। বাবাই একটু সময় দেবাশিসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। হাত নামাতে পারো। দেবাশিস, যেন খুব বেঁচে গেছে, হাত নামিয়ে চেয়ারে এসে বসল। কৃষ্ণা হাসিমুখে বাবা আর ছেলের কাণ্ড দেখছিল। বলল, রিভলভারটা কিন্তু দারুণ বানিয়েছে তাই না?

দেবাশিস রিভলভারটা দেখল। সতি, দারুণ বানিযেছে। একেবারে আসলি জিনিস মনে হয়। আচমকা কেউ সামনে ধরলে একটু গা শিরশির করে উঠবে, দামও নিশ্চয় ঠুকে নিয়েছে। অল্প দামের জিনিসে এখন বাবাইযের মন ভরে না। বাজারের সেরা জিনিসটাই তার দরকার। যখন যা বায়না ধরে, সেটি তার চাইই চাই। না দিলে কেঁদেকেটে একেবারে অনর্থ বাধিয়ে বসবে। কযেকদিন ধবে পিস্তল পিস্তল করছে। ফ্ল্যাটবাড়ির অন্য কোনও ঘরেব কোনও ছেলের হাতে নিশ্চয়ই দেখেছে। আজ হয়তো বাধ্য হয়েই কৃষ্ণা কিনে এনে দিযেছে। একমাত্র সন্তানের এই সাধ আবদার মেটাতে এখন অসুবিধে হচ্ছে না, তাই। কৃষ্ণাও ইচ্ছেমতো কেনাকাটা করতে পারছে। হাত খুলে খরচ করতে পারছে। না হলে দেবাশিসকে ভীষণ অসুবিধের মধ্যে পড়ে যেতে হত। অমল, কমল কিংবা বিমলের মতো দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে থাকতে হত।

দেবাশিস লুচি তরকারি মুখে পুরে বলল, দাম দিয়ে জিনিস কিনলে দারুণই দেখতে হবে। কাজের বউ আরতি চা দিয়ে চলে গেল। তেইশ-চব্বিশের বউটার ঢলঢলে শরীরের মধ্যে একটা স্বাস্থ্যবতী চটক আছে, যা কিনা দেখার চোখকে একটু সময়ের জন্যে অন্যমনস্ক করে দেয়। দেবাশিস বাড়িতে থাকলে কৃষ্ণা নিজেই এটাসেটা করে দেয়। আরতি দেবাশিসের সামনে বেশি সময় থাকুক, এটা কৃষ্ণাব মোটেই পছন্দ নয়। কাছেই কোথায় যেন আরতিরা থাকে। বাড়িতে একটা বাউন্ডুলে বর আছে, একটা মেয়েও আছে বোধহয়। সকালে আসে, দুপুরে বাড়ি যায়, আবার বিকেলে এসে ন'টা-সাড়ে ন'টায় চলে যায়। কৃষ্ণা অবশ্যই তার আগেই আরতিকে ছেড়ে দেয়। ইদানীং মাঝেমাঝে দেবাশিস বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে নেশা করে আসে। সে-সময় দেবাশিস অন্যরকম হয়ে যায়, ঠিক স্বাভাবিক থাকে না। আরতিকে সামনে পেয়ে কোনদিন কী করে বসবে, বিশ্বাস নেই। এমনিতেও আরতির প্রতি দেবাশিসের একটা লুকানো দুর্বলতা আছে— এটা কৃষ্ণা আজকাল বেশ বুঝতে পাবে।

আরতি চলে গেলে দেবাশিস বলল, ওকে একটা শাড়িটাড়ি কিনে দিতে হয়।

কৃষ্ণা দেবাশিসের দিকে তাকাল। এই তো পুজোব সময় শাড়ি কিনে দিয়েছি। আবার কেন!

দেখলাম শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে।

ছিঁভুক গে। কৃষ্ণা একটু চুপ করে থেকে বলল, ঝি-চাকরদের নিয়মই এই।

কী নিয়ম?

ভাল থাকলেও ছেঁড়াটা পরে আসবে।

কেন? দেবাশিস হাসল।

কেন আবার, যাতে দরদ দেখিয়ে নতুন একটা কিনে দিই। এই শোনো, তোমার ব্যাগটা আজ অন্য রকম লাগছে কেন বলো তো? খুব পুরনো মনে হচ্ছে যেন।

সিগারেট ধরিয়ে দেবাশিস হালকা গলায় বলল, পুরনো হলেই সবকিছু অন্যরকম লাগে কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা তেরছা চোখে তাকাল। যেমন আমি?

দেবাশিস হাসল, আমিও তো হতে পারি। দশ বছর হল, একটু পুরনো তো হবই।

বাবাই রিভলভার হাতে ঘরের মধ্যে কল্পিত শত্রুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাট, আলমারি, বুক সেলফ, টিভি— সব জায়গায় সে রিভলভারটা নিশানা করছে, কিন্তু কিছুই মনঃপূত হচ্ছে না। এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে, লাফ মেরে বিছানায় উঠছে, আবার নামছে। কী জিনিসকে সে গুলিবিদ্ধ করবে, এখনও ঠিক করতে পারেনি। তবে গুলি ছুড়বে, এখুনি ছুড়বে, যা খুঁজছে তা পেয়ে গেলেই। চোখে মুখে সে এমন এক নিষ্ঠুর আততায়ীর বন্য চেহারা আনতে চাইছে, যা কিনা মজার ব্যাপার হলেও, দেবাশিস কিংবা কৃষ্ণা কেউই মজা পাচ্ছিল না। ওরা অবাক হয়ে বাবাইকে দেখছিল।

দেয়ালঘড়িতে ঢং করে সময়ের ঘণ্টা বাজল। রাত সাড়ে আটটা। এ-সময় বাবাই রোজ পড়াশোনা করে। সামনের বছরে নামকরা এক ইস্কুলে ভরতি করানোর জন্যে এখন থেকে তাকে প্রস্তুত করতে হচ্ছে। যদিও ভরতির ব্যাপারে টাকাপয়সা খরচ করে অন্য পথে কিছু সুরাহা করা যায় কিনা, দেবাশিস সেইরকমও ভাবছে। পয়সা অনেক দুর্গম পথকেও সহজ করে দেয়।

কৃষ্ণ বলল, বাবাই, আর কিন্তু খেলা নয়। এখন পড়তে বসতে হবে।

বাবাই বলল, ভ্যাট। আমি পড়াশোনা করব না।

সেকী? পড়াশোনা করবি না কেন?

আমি তো ব্যাঙ্ক ডাকাত। ব্যাঙ্ক ডাকাতরা কি ইস্কুলে পড়ে।

তুই ব্যাঙ্ক ডাকাত? কৃষ্ণা মুখ টিপে দেবাশিসের দিকে তাকাল? বাবাই অদৃশ্য ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের দিকে রিভলভার ছোড়ার ভঙ্গি করে বলল, এই যে ম্যানেজার, টাকা দাও। একশো, দুশো, লক্ষ, হাজার— সব টাকা দিয়ে দাও। না দিলে এই মারলাম কিন্তু। এক, দুই—

দেবাশিস হা হা করে হেসে উঠল।

ঠিক বলেছিস বাবাই। একটা পাঁচ টাকা দামের টয় রিভলভার দেখিয়েই যদি পাঁচ মিনিটে পাঁচ লাখ চলে আসে, তো কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে কী লাভ।

কৃষ্ণা বলল, কিন্তু ধরা পড়লে যে জেল।

দেবাশিস বলল, ধরা পড়ে বোকারা। পাঁচ লাখের অর্ধেক পুলিশের, অর্ধেক নিজের— ফিফটি ফিফটি শেয়ার। ব্যস, খাও, দাও, আরামে ঘুরে বেড়াও। কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। এ-যুগে ট্যাক্টফুল না হলে পস্তাতে হয়।

কৃষ্ণা নাক সিটকে বলল, কী জানি বাপু, আমার কিন্তু ডাকাতি টাকাতি শুনলে ভীষণ ভয় করে। এই, তোমার যে একটা বড় পেমেন্ট পাবার কথা ছিল, কী হল?

দেবাশিস একটু সময় নিঃশব্দে সিগারেট টানল। তারপর সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বলল, শালা ল্যাজে খেলাচ্ছে।

দেবে না?

দেবে না কেন, দেবে।

তো?

দেব-দিচ্ছি করে এখন ঘোরাচ্ছে। শালা না দিয়ে যাবে কোথায়। এই তো শেষ কাজ নয়। তখন? তখন শালাকে চিবিয়ে সব রস টেনে নেব। শুয়ারের বাচ্চাকে তো আমার কাছে আসতেই হবে।

সত্যি, লোকগুলো এত খারাপ না। কৃষ্ণা দুঃখিত মুখ করল।

বাবাই লাফ মেরে বিছানায় উঠে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় রিভলভারের লক্ষ্য স্থির করে বলল, এই শালা ম্যানেজার, শুয়ারের বাচ্চা, ভল্টের চাবি কোথায় আছে, শিগগির দে।

দেবাশিস অবাক হয়ে বাবাইয়ের দিকে তাকাল।

এসব কী কথা বলছে বাবাই?

বাবাই অমনি বলে উঠল, কার বাপের কী? আমি যা খুশি করব, কার তাতে কী? গুলি মেরে সবাইকে শেষ করে দেব।

কৃষ্ণা চোখ ঘুরিয়ে বলল, শুনলে তো ছেলের কথা? একেবারে কার্বন-কপি।

দেবাশিস বাইরে যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরেছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়িয়ে নিতে নিতে বলল, হ্যাঁ, সিপাই কা ঘোড়া। বাবাই মহা উৎসাহ পেয়ে গেল। দেবাশিসের রাত্রিবেলায় বিশেষ অবস্থায় বাড়িতে ফেরা নকল করে বলল, আরতি, অ্যাই আরতি, আই ওয়ান্ট ইউ।

কৃষ্ণা ভয়ানক চমকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। ডোরবেলাটা বাজছে। কেউ বাইরে অপেক্ষা করে আছে। দরজা খুলে দিতে বলছে।

দেবাশিস বিরক্ত হবার মুখ করল।

ধুস শালা, একটু বেরুব ভাবছি, কে আবার এখন এল।

বাইরে একজন মাঝবয়সি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। হাওয়াই শার্ট কালো রঙের ফুলপ্যান্ট। লম্বা চওড়া, পেটানো শরীর। লোকটাকে দেখেই দেবাশিস থেমে গেল। কে যেন লোকটা? কোথায় যেন দেখেছে? স্মৃতির চাকা ঘুরে গেল সেই মুহূর্তে। আজ অফিস থেকে ফেরার পথে শেয়ারের ট্যাক্সিতে যে-লোকটা তার পাশে বসেছিল, এক রকমই ব্যাগ যার হাতে ছিল, দেবাশিসের মতোই যে পায়ের কাছে ব্যাগটা রেখেছিল, সেই লোকটাই না? কিন্তু লোকটা এখানে কেন? এত রাতে দেবাশিসের কাছে ওর কী দরকার?

লোকটা লম্বা বারান্দায় দু'পাশে তাকিয়ে দেখল। কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হল যেন। তারপর নিচু গলায় বলল, নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারছেন স্যার?

লোকটার ভাবভঙ্গি, কথা বলার ধরন, দেবাশিসের ভাল লাগল না। দিনকাল ভাল নয়। লোকটা কে, কী উদ্দেশ্যে এসেছে, সে জানে না। নিঃসন্দেহ হওয়া যায় এমন চেহারা শরীরও নয় লোকটার। ওর পেছনে যে আরও কেউ নেই তাই বা বলতে পারে কে। ঘরে ঢুকে পড়ে ভয় দেখিয়ে, চাই কী খুনখারাপি করে সবকিছু ডাকাতি করে নিয়ে গেছে— আজকাল এ-ধরনের ঘটনা তো হামেশাই শোনা যাচ্ছে। তা ছাড়া ঘরে দেবাশিসের বেশ কিছু নগদ টাকা লুকানো আছে, লোকটা কোনও সূত্রে জেনে যায়নি তো? কথাটা মনে হতেই দেবাশিসের ঘাড়ের কাছে একটা ঠান্ডা আতঙ্ক ছমছম করে উঠল। তবু জোর করে মনে সাহস এনে বলল, চিনতে পেরেছি। কী দরকার বলুন তো?

লোকটা ডান হাতটা উঁচু করে একটা ব্যাগ দেবাশিসের সামনে তুলে ধরে বলল, এটাও নিশ্চয় চিনতে পারছেন?

এতক্ষণে দেবাশিসের খেয়াল হল লোকটার হাতে একটা ব্যাগ রয়েছে। ব্যাগটা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। ঠিক তার ব্যাগটাই যেন।

এটা কার ব্যাগ?

লোকটা হাসল, আপনার ব্যাগ। ফেরত দিতে এসেছি।

দেবাশিস বুঝল কোথায়ও নিশ্চয় একটা গোলমাল হয়ে গেছে। তার মানে, তাড়াহুড়ো করে নামবার সময় ব্যাগ অদলবদল হয়ে গেছে। দেবাশিসই আগে নেমেছিল। সেই-ই কি তবে একই

রকম দেখতে বলে লোকটার ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়েছিল? এতক্ষণে দেবাশিসের মনে হল তাই ব্যাগটা একটু হালকা হালকা আর অন্যরকম লাগছিল। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে সে বেশি ভাবাভাবি করেনি বলেই ব্যাগের ভেতরটা আর খুলে দেখা হয়নি। কী কাণ্ড! ব্যাগে একগাদা জরুরি কাগজপত্র রয়েছে যে।

আর যাই হোক, দেবাশিসের আগের ভয়টা তো কেটে গেল। বলল, তা হলে আপনার ব্যাগ কি আমার কাছে?

লোকটা একটু কাছে সরে এসে প্রায় ফিসফিস করে বলল, ব্যাগটা খুলেছিলেন?

দেবাশিস মাথা নাড়ল, না।

কেউ জানে না তো?

দেবাশিস আবার মাথা নাড়ল, না।

ঠিক বলছেন তো?

দেবাশিস অবাক গলায় বলল, ঠিক বলব না কেন?

তা হলে আমার ব্যাগটা আমাকে দিয়ে দিন। লোকটা ঢুকবে বলে ঘরের ভেতরে তাকাল, আপনার ব্যাগের মধ্যেই আপনার নাম ঠিকানা পেয়ে গেলাম। না থাকলে খুব মুশকিল— হঠাৎ লোকটা থেমে গেল। বাবাইয়ের হাতের রিভলভারটা দেখতে পেয়েই যেন লাফ মেরে ঘরের ভেতরে ঢুকে বলল, এই খোকা, ওটা রিভলভার আছে, লোডেড রিভলভার, ওটা ধরবে না।

এবার ভয়ানক চমকে ওঠার পালা দেবাশিসের। তবে কি ওটা খেলনা নয়? ওটা কি কৃষ্ণা কিনে দেয়নি বাবাইকে? বাবাই কি এতক্ষণ একটা গুলি-ভরা রিভলভারের ট্রিগারে আঙুল রেখে মারণাস্ত্র নিয়ে অবলীলাক্রমে খেলছে?

সেকী কৃষ্ণা, তুমি ওটা কিনে দাওনি বাবাইকে?

না তো। ওটা তোমার ব্যাগেই ছিল। বাবাই বের করেছে। আমি ভাবলাম তুমি কিনে এনেছ।

না না, আমি কিনিনি। ওটা আমার ব্যাগও নয়। ওটা এঁর, এই ভদ্রলোকের ব্যাগ।

কৃষ্ণা বাবাইয়ের দিকে তাকিয়ে ভয়-পাওয়া গলায় বলল, এই বাবাই, ওটা ধরিস না, ফেলে দে। ওটা সত্যি সত্যি রিভলভার। এই বাবাই, এই, ওটা খেলার জিনিস নয় কিন্তু। এক্ষুনি গুলি বেরিয়ে আসবে।

বাবাই পিছিয়ে গিয়ে ঝট করে রিভলভারের মুখ সামনে বাগিয়ে ধরে বলল, খবরদার।

বাবাই শোন, ওটা ফেলে দে হাত থেকে।

বাবাই আবার বলল, খবরদার। কেউ এক পা এগোলেই গুলি চালিয়ে দেব।

দেবাশিস বিস্ফারিত চোখে দেখছিল রিভলভারের ট্রিগারে বাবাইয়ের নিশপিশে আঙুল ছটফট করছে। ওর হাতে খেলনা নয়, একটা আসল রিভলভার আছে, একথা জানতে পেরেই যেন বাবাই এক নতুন খেলা পেয়ে গেছে। দারুণ মজা করার জন্যে যে-কোনও মুহূর্তে ট্রিগারটা টেনে দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে শোচনীয় দুর্ঘটনা।

কৃষ্ণা পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছিল বাবাইয়ের দিকে, দেবাশিস যেতে দিল না। হাত ধরে টেনে রাখল। অবোধ বাচ্চাকে বিশ্বাস করাটা শেষপর্যন্ত চরম হঠকারিতা হয়ে যেতে পারে।

আগন্তুক লোকটাও বাবাইয়ের সামনে যেতে পারছিল না। সতর্ক চোখে বাবাইয়ের দিকে তাকিয়ে ঝটপট কিছু ভেবে নিচ্ছিল যেন। খুব সম্ভব রিভলভারটা কেমন করে বাগিয়ে নেওয়া যায়, সেরকম কোনও বুদ্ধি মনে মনে খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে নিচ্ছিল সে। এক পা দু'পা করে সে সরে সরে যাচ্ছিল বাবাইয়ের দিকে।

দেবাশিস কঠিন গলায় ধমক দিয়ে বলল, বাবাই, কী হচ্ছে? কথা শুনছ না কেন? ওটা শিগগির টেবিলের ওপর রেখে দাও। ওটা তোমার জিনিস নয়, এই ভদ্রলোকের। নিতে এসেছেন।

বাবাই উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘাড বেঁকিয়ে বলল, ইস। বললেই যেন দিয়ে দেব। এটা সত্যিকাবেব বিভলভার। আসল গুলি আছে এর মধ্যে। এক্ষুনি গুলি ছুডব। ওয়ান—

কৃষ্ণা কাতব গলায় বলল, বাবাই, লক্ষ্মীসোনা, আমাব কথা শোন মানিক। আমি তোকে কালকে একশো টাকাব খেলনা কিনে দেব— দাৰুণ একটা সাইকেল কিনে দেব।

বাবাই দেবাশিসেব দিকে স্থিব দৃষ্টি বেখে বলল, টু—

কৃষ্ণা কান্নাব গলায় বলল, বাবাই বাবাই—

থ্রি বলবাব জন্যে বাবাইযেব ঠোঁট কেঁপে উঠল। আগন্তুক লোকটা বাবাইকে মোটেই বুঝতে না দিয়ে একটু একটু কবে বাবাইযেব আবও কাছে চলে গিযেছিল। বাবাই উচ্চাবণ কবাব আগেই একটা বাগী চিতাবাঘেব মতো ওব ওপবে ঝাঁপিযে পডল। অতর্কিত আক্রমণে বাবাই ছিটকে পডল দেযালেব গাযে। লোকটা শক্ত হাতে ওব সশস্ত্র হাতটাকে মুচডে ধবেছে। দাৰুণ যন্ত্রণাব শব্দ কবে উঠল বাবাই।

লোকটা বিভলভাব হাতে উঠে দাঁডাল। ওব চুলগুলো এলোমেলো হযে গেছে। এক আসন্ন সংঘর্ষেব উত্তেজনায ওব মুখেব জটিল বেখাগুলো কাঁপছিল। হাতেব পাতা দিযে লোকটা মুখের ঘাম মুছল। যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবিব কাচেব ধুলোগুলো মুছে নিল। তাবপব বাবাইকে এক পলক দেখে নিযে বাগী বাগী চোখে দেবাশিসেব দিকে তাকিযে বলল, আপনি মিছে কথা বললেন। ব্যাগ খোলা ঠিক হযনি। আগুনে হাত দেওযা বিলকুল খতবনাক কাম আছে।

বলেই লোকটা আব দাঁডাল না।

নিজেব ব্যাগটা হাতে নিযে তাব মধ্যে বিভলভাবটা পুবে চট কবে দবজাব বাইবে চলে গেল। বাবাই কেঁদে উঠল, আমাব বিভলভাব।

দেযালঘডিতে তখন বাত্রিব বযেস বাডাব ঘণ্টা বাজছিল।

রক্তাক্ত সম্পর্ক

সিঁড়ির নীচে অন্ধকার জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে সীতাংশু নিশ্চিত হলেন কেউ তাঁকে দেখছে না। এখান থেকে কাউকে দেখাও যাচ্ছে না। স্ত্রী মীরা রান্নাঘরে, ঠিকে-ঝি কমলা কলতলায়, মেয়ে কৃষ্ণা সম্ভবত কোনও বন্ধুর বাড়ি, ছেলে তাপসকে একবার যেন দেখেছিলেন ঘরে বসে ম্যাগাজিন দেখছে, তারপর কোথায় গেছে কে জানে। যে যার কাজে আছে এখন। ঠিক এ-সময়ে কেউ যে এদিকে আসবে সেরকম কোনও সম্ভাবনাও নেই।

সীতাংশু উবু হয়ে বসে প্যাকিং বাক্সটা আস্তে আস্তে এক হাতে ঠেলে কাত করলেন। অন্য হাতটা বাক্সটার নীচে ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর বুক কাঁপছিল উত্তেজনায়। হ্যাঁ, ঠিকই একটা জিনিস ঠেকল তাঁর হাতে। হাতটা বের করে এনে জিনিসটা দেখলেন। দেখে তাঁর ভীষণভাবে চমকে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি চমকালেন না। তিনি আগেই নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এ-ধরনের কিছু দেখবেন বলে। হাতুড়িটা খুঁজতে এসে যখনই দেখলেন প্যাকিং বাক্সটা নড়বড় করছে, তখনই কেন যেন তাঁর মনে হয়েছিল বাক্সটার নীচে সম্ভবত কেউ গোপনে কিছু রেখে গেছে। সন্দেহটা একটা ছমছমে আতঙ্ক হয়ে শরীরে ছড়িয়ে গিয়েছিল। দু'দিন আগে হালদারদের পুরনো বাড়ির পেছনের জংলা বাগানে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত জগদীশবাবুর ছেলে বকার রক্তাক্ত লাশটা আবিষ্কৃত হওয়ার ঘটনাটা তাঁর মনের পরদা জুড়ে ভেসে উঠেছিল। দেখলেন তিনি হাতে ধরে আছেন একটা শার্ট। শার্টটার এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো কালচে দাগগুলো নিশ্চিতভাবে রক্তের দাগ। ভয়টা হঠাৎ ছলাত করে উঠলেও তিনি অবাক হয়ে গেলেন না। শুধু মনে হল এতক্ষণ তাঁর শরীরের মধ্যে যে-শীতল নদীটা বইছিল, সেটা আরও শীতল, শীতলতর হয়ে বরফ জলের নদী হয়ে গেছে।

জামাটা অন্য কারও নয়, তাঁর একমাত্র ছেলে তাপসের। তিন-চার দিন আগেও তাপসকে পরতে দেখেছেন। বিশেষ রং আর নকশার জামা। ভুল হবার প্রশ্নই আসে না। সীতাংশু নিঃসন্দেহ হলেন জামার এই রক্তের দাগ আর দু'দিন আগে হালদারদের বাগানে বকার হত্যাকাণ্ড দুটো ঘটনা নিঃসম্পর্কিত নয়। এক অজানা কারণে খুনটা হবার পরে এ-দু'দিন ধরে এক থমথমে কুয়াশায় মন ঢেকে ছিল। কেন যেন মনে হয়েছে তাপস এত সময় কোনওদিনও বাড়ি থাকে না, তাপস বড্ড বেশি চুপচাপ কিংবা গম্ভীর হয়ে আছে— কোথায় যেন একটা ছন্দপতন হয়ে আছে। এখন বুঝতে পারলেন সত্যটা তখন থেকেই সন্দেহের আগে আগে হাঁটছিল।

মীরার গলা শুনলেন। কমলাকে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে শার্টটা তিনি প্যাকিং বাক্সের মধ্যে ঝুপ করে ফেলে দিলেন। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। না, কেউ এল না এদিকে। কিন্তু আরও বেশি সময় এখানে থাকা উচিত নয়। কেউ না কেউ দেখে ফেলবে, তিনি কী করছেন জানতে চাইবে। তাপস শার্টটা রেখে থাকলে সেও নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ভুলে যায়নি, মাঝেমাঝে লক্ষ রাখছে। খুব তাড়াতাড়ি আবার তিনি শার্টটা বাক্সের নীচে যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিলেন।

ঘরে এসে সীতাংশু একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলেন, আসবার সময় তাপসকে দেখলেন না। খুব সম্ভবত বাড়িতে নেই। তিনি মনে করার চেষ্টা করলেন খুনটা হবার পর এই দুটো দিন তাপসকে কোন জামা পরে বাইরে যেতে দেখেছেন। ঠিক মনে করতে পারলেন না। মনটা এখন কোনও সরলরেখায় ধরে রাখতে পারছেন না। এলোমেলো, কিছুটা চঞ্চল। তবে ওই জামাটা তাপসের গায়ে দেখেননি, সে-বিষয়ে কোনও ভুল নেই। কিন্তু তিনি যা ভাবছেন, সত্যিই কি

ব্যাপারটা তাই? তিনি ভুলও তো ভাবতে পারেন? অন্য কোনও কারণেও তো জামাটা ওখানে থাকতে পারে কিংবা ওগুলো রক্তের দাগ না হয়ে অন্য কিছুর দাগও তো হতে পারে?

মীরা এসে ঘরে ঢুকল। কোনও জিনিসটিনিস নিতে এসেছে। তার ভাব দেখে সীতাংশু বুঝলেন রান্নার কাজ এখন মধ্যপথে। আজ ছুটির দিন। দু'-একটা পদ বেশিই রান্না হবে। মীরাও একটু বেশি ব্যস্ত থাকবে।

ছোট আলমারিটা খুলতে খুলতে মীরা বলল, খুঁজে পেলে?

কী? সীতাংশুর গলার স্বরটা একটু কেঁপে গেল যেন।

বা রে, এতক্ষণ হাতুড়ির জন্যে এত হাঁকডাক করলে, বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে।

হাতুড়ি খোঁজার কথা এতক্ষণে মনে পড়ল সীতাংশুর। চটি জুতোর একটা পেরেক উঠে এসেছে ডান পায়ের ঠিক বুড়ো আঙুলের সামনে। কাল সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরার সময়ই পায়ে লাগছিল। মুচির কাছে গেলে পেরেকটা বসিয়ে দিয়ে একটা আধটা নতুন পেরেক মেরে দিয়ে পঁচিশ ত্রিশ পয়সা চেয়ে বসবে। পাঁচ দশ পয়সায় আজকাল কোনও কাজ হয় না, কেউ বলেও না। আজ অফিস নেই। ভেবেছিলেন নিজেই হাতুড়ি মেরে ঠিক করে নেবেন পেরেকটা। কিছুদিন দিব্যি চলে যাবে। কিন্তু ঠিক সময়মতো হাতুড়িটা হাতের কাছে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। সিঁড়ির নীচে এক টুকরো ফাঁকা জায়গাতে বাজের টুকিটাকি জিনিস থাকে, খুঁজতে খুঁজতে চলে গিয়েছিলেন সেখানে। হয়তো হাতুড়িটা ওখানে কেউ রেখেছে।

মীরা আলমারি বন্ধ করে বলল, পাওনি হাতুড়ি?

ভাবছি মুচির কাছেই স্যান্ডেলটা সারিয়ে নেব, স্ট্র্যাপটা খুলেই এসেছে। সীতাংশু অন্য কথায় এলেন, কৃষ্ণাকে দেখছি না, কোথায় গেল?

আছে কোথায়ও।

সীতাংশু ভেবেছিলেন তাপসের কথাও জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু চুপ করে গেলেন। কে জানে তাপসের প্রসঙ্গ এলে কোন কথা কোথায় চলে যাবে, কা বলতে গিয়ে কী বলে বসবেন। চুপ করে থাকাই ভাল। কথাটা মীরা শুনলে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে বসা বিচিত্র কিছু নয়। দেয়ালও নাকি কথা শোনে। খুনখারাপি বলে কথা! তার ওপর এসব চনমনে কথা তো চড়ুই পাখির মতো পাখা মেলেই বসে আছে মুখ খুলে একটু হুস করলেই ফড়ুত করে বাড়ির বাইরে পালিয়ে যাবে।

এমন একটা মানসিক অবস্থায় চটিজুতোটা সারিয়ে আনার জন্যে বাইরে যেতে খুব ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু গেলেন। বাড়িতে বসে স্থির হয়ে কিছু ভাবতে পারছিলেন না, বাইরেই একটু ঘুরে আসব ভাবলেন। দশ বারো পা হাঁটলে গলির মুখেই একটা মুচি বসে বহুদিন। সেখানেই দেখা হয়ে গেল রাখালবাবুর সঙ্গে। তিনিও জুতো সারাতে এসেছেন। সীতাংশুকে দেখে বললেন, আরে দাদা যে, আসুন আসুন। পুরনোটাকেই একটু সারিয়ে সুরিয়ে নেওয়া যাক, কী বলেন? নতুন জুতো কেনা এখন তো মানে পায়ের দামের চেয়ে জুতোর দাম বেশি, হা হা।

রাখালবাবু হাসলেন। কাজেই সীতাংশুকেও হাসিমুখ করতে হল। মুচির হাতে চটিজুতোটা দিয়ে বললেন, দাও তো ভাই, একটু ঠিকঠাক করে।

রাখালবাবু একটু কাছে সরে এসে নিচুগলায় বললেন, কেমন বুঝছেন বলুন তো?

কী? সীতাংশু না জানার ভান করলেন।

বুঝলেন দাদা, এখন আমরা ওয়ার ফিল্ডের মাঝখানে বাস করছি। চারদিকে খালি লড়াই আর হত্যা। কে কখন কোথায় মারা পড়ব কেউ জানি না।

ঘুরেফিরে সেই একই কথা এসে পড়ল। রকার খুনের প্রসঙ্গ। এই ভয়টাই করছিলেন সীতাংশু। বাড়িতে ভাল লাগছিল না বলে বাইরে এলেন, কিন্তু ভয়টা ঠিক পিছুপিছু চলে এসেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল চুপ করে থাকবেন। কিন্তু দু'-একটা কথা বলতেও তো হয়। না বললে চুপ করে থাকার হয়তো অন্য

মানে করে নেবেন রাখালবাবু। শুকনো হাসি টেনে এনে বললেন, যা বলেছেন। মুচিকে বললেন, এই, তোমার দেরি হবে নাকি? একটা কাজ ছিল, পরে আসব?

এক মিনিট বাবু।

রাখালবাবু বললেন, আরে মশাই, ছুটির দিনে কাজ আবার কী? ছুটির দিনে যত সব অকাজ করবেন। যাবেন কোথাও?

না, তেমন কাজ অবশ্যি, মানে—

এদিকে শুনেছেন তো, শীতলের ছেলে, কী যেন নামটা, হ্যাঁ মানিক, ওকে আজ ভ্যানে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ।

কেন?

কেন আবার, ইন্টারোগেট করবে। দুর মশাই, আমরা কি কিছু বুঝি না? রিয়েল কালপ্রিট বসে আছে গ্যাঁট হয়ে, পুলিশ একে তাকে ধরে কাজ দেখাচ্ছে। ইচ্ছে করলে কি পুলিশ ধরতে পারে না খুনিকে?

সীতাংশু চুপ করে থেকে কথাগুলো শুনলেন। একবার মনে হল রাখালবাবু হয়তো প্রকারান্তরে তাপসের কথাই বলছেন। বলে দেখছেন সীতাংশুর চোখে মুখে কী প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু একটু পরেই রাখালবাবু অন্য কথায় এলেন। লোডশেডিং, বাজারদর, গরম, এইসব। আজকাল আর পাঁচটা দৈনন্দিন ঘটনার মতো মামুলি হয়ে গেছে এসব খুন জখমের ঘটনা। টাটকা টাটকা লোকে একটু আধটু বলেটলে, এই মাত্র। সময়ের স্রোতে ঢেউ ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। সমস্যার কি অন্ত আছে জীবনে।

সীতাংশুর কানে কিন্তু সারাদিন ধরে রাখালবাবুর কথাগুলোই বাজতে থাকল। পুলিশ কি ইচ্ছে করলেই অপরাধীকে ধরতে পারে? যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তারা নয়। আসল কালপ্রিট অন্য জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। বুকের মধ্যে ভয়টা ছলকে ছলকে ওঠে। পুলিশ যদি বাড়িতে আসে? খুঁজতে খুঁজতে যদি প্যাকিং বাক্সের তলা থেকে দলামুচড়া শার্টটা পেয়ে যায়? সীতাংশু কী করবেন বুঝতে পারলেন না। বুকের ঝাঁপিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে বিষধর সাপ। হাত পা অসাড় হয়ে আসে। প্যাকিং বাক্সের তলাটা ভাল করে তিনি দেখেননি। ওখানে কি ওই শার্টটাই শুধু আছে? অন্য কিছু নেই? একটা ছোরা, ধারালো, শুকনো রক্তের দাগ লাগা, যদি থেকে থাকে? সীতাংশু ঠিক করলেন তাপসকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। শার্টটা অবিলম্বে অন্য কোথায় সরিয়ে রাখতে বলবেন। কিন্তু তাপসের মুখ দেখে কিছু বলার ভরসা পেলেন না। ছেলেটা এমনিতেই কথাবার্তা কম বলে। সবসময় একটা তেজি ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়েই আছে, ঢিলেঢালা বাপকে হিসেবের মধ্যেই আনে না। সারাদিন তো বাড়িতেই থাকে না, মেলামেশাটাও কতকগুলো রাগী ছেলের সঙ্গে। তা ছাড়া একটা কথা মনে হল সীতাংশুর। এ-ধরনের কোনও কথা তাপসকে জানানো মানেই দু'জনের মধ্যে সারাজীবন ধরে এক মানসিক গ্লানির লুকোচুরি খেলা চলবে। এক গোপন সত্যের অদৃশ্য দেয়ালের দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

তোমার আবার কী হল, চুপচাপ হয়ে আছ? মীরা একসময় জানতে চাইল।

না, কী আর হবে। ভাবছি তপু কয়েকদিন জলপাইগুড়িতে দেবেনের কাছ থেকে ঘুরে আসুক।

কেন বলো তো?

যায়ও না তো অনেকদিন কোথায়ও। তা ছাড়া পুলিশ যাকে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ডিস্যাডভ্যান্টেজাস এজ। মিছেমিছি হয়রানিতে পড়তে পারে।

কিন্তু হঠাৎ চলে গেলে লোকে সন্দেহ করবে না? ভাববে না ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে? বোঝা গেল ব্যাপারটা নিয়ে মীরাও ভাবাভাবি করেছে। সীতাংশু চুপ করে গেলেন। এ-দিকটা তিনি ভাবেননি। ঠিকই, তাপসকে বাইরে কোথায়ও পাঠানোটা ঠিক দেখাবে না। আর তিনি বললেই কি তাপস সুবোধ বালকের মতো সে-কথা শুনবে? সীতাংশু বুঝলেন যা কিছু করতে হয়, তাঁর একাই

কবতে হবে। বাড়িতে এ-ব্যাপাবে বলাবলি কবলে হিতে বিপবীত হবে। তাব চেযে চেপে যাওয়াই ভাল। তিনি সাবাদিন চোখে চোখে আগলে বাখলেন সিঁড়িব নীচটা। কে জানে কেউ হঠাৎ কোনও কাজে ওখানে যেতেও পাবে। ভেবেছিলেন তাপস হযতো একসময চুপিচুপি জিনিসটা নিয়ে অন্যত্র সবিযে কিংবা নষ্ট কবে বাখবে। কিন্তু একবাবও তাপসকে ও-দিকে যেতে দেখলেন না। অবশ্য সত্যিই যদি সে ঘটনাব সঙ্গে জড়িত থাকে, এবং যতই নিপুণ আব প্রমাণ চিহ্নহীন হত্যা হোক না, অনভ্যস্ততাই নার্ভাস কবে দিতে পাবে। বাইবে যতই লম্ফঝম্ফ দেখাক না, খুন পুলিশ বলে কথা, অতি বড় বীবপুরুষেবও বক্ত ঠান্ডা হয়ে যায। তা ছাড়া বাইবে ওসব জিনিস তাপসেব সঙ্গে না থাকাই ভাল, আড় চোখে অনেকেবই নজব থাকবে তাব ওপবে। বাড়িতে আগুনে পুড়িযে বা অন্যভাবে নষ্ট কবাব সুযোগ নেই, কাবও চোখে পড়ে যাবে। তিনি নিজেই নিযে যাবেন বাইবে। কোনও এক সময চুপ কবে খববেব কাগজে মুড়ে বাজাবেব ব্যাগেব মধ্যে ভবে নিয়ে বাইবে কোথাযও ফেলে আসবেন। বাড়িটা যত তাড়াতাড়ি পাপমুক্ত হয় ততই ভাল। বলা তো যায় না, পুলিশ যাদেব ধবেছে, তাদেব মধ্যে কেউ তাপসেব নাম বলে বসতে পাবে। তাবপব বাড়ি সার্চ কবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেযে গেলে পুলিশ বাঘেব মতো ঝাঁপিযে পড়বে তাপসেব ওপব। এবং যেহেতু তাঁব বাড়ি, তাপসও তাঁব ছেলে, সীতাংশুকেও ছাড়বে না।

ট্রামে দেখা হযে গেল সোমদেবেব সঙ্গে। ঠিক পেছনেব আসনে বসে আছেন।

কী হে সীতাংশু, কদ্দূব?

এই একটু ধর্মতলায।

ভাল হল, আমিও তো তাই যাচ্ছি। হাতে ব্যাগ কেন? সন্ধেবেলায বাজাবটাজাব কববে নাকি?

না, তেমন কিছু নয। বড্ড গবম পড়েছে আজ।

পড়বে না? বৃষ্টি কোথায! জুলাই চলে গেল। তা তোমাব ছেলেটা কী কবে হে?

মনে মনে প্রমাদ গোনেন সীতাংশু। বললেন, এখনও কবে না কিছু।

পাশটাশ?

ওই কোনওবকমে কবেছে একটা।

তা হোক। চেষ্টাচবিত্র কবে ঢুকিযে ঢাকিযে দাও কোথাযও। করুক কিছু একটা। একেবাবে বসে থাকা ভাল নয হে। আইডল ব্রেন ইজ ডেভিলস ওযার্কশপ।

চেষ্টা তো কবছি।

কবো। এই বযসে ব্যাগ হাতে কবে কতকাল ঘুববে।

তোমাব সল্ট লেকে বাড়ি কদ্দূব?

হচ্ছে।

ধর্মতলায সোমদেবেব সঙ্গে বাধ্য হযে নামতে হল সীতাংশুব। আসলে ধর্মতলায় নামবাব কোনও কথাই ছিল না তাঁব। মুখে এসে গিযেছিল, বলে দিযেছিলেন সোমদেবকে। একটা বড় দোকানেব শোকেসেব সামনে সোমদেব থামলেন। সুযোগ হাতছাড়া কবলেন না সীতাংশু। একটু পিছিযে ভিড়েব মধ্যে মিশে গেলেন। অনেকটা হেঁটে গিযে পেছন ফিবে দেখলেন। না, সোমদেবকে দেখা যাচ্ছে না। কথা ছিল কাজটাজ সেবে দু'জনে আবাব একসঙ্গে ফিববেন। সীতাংশু ভেবে বাখলেন অন্য সময দেখা হলে যা হোক একটা অজুহাত দিযে দেবেন।

হাঁটতে হাঁটতে চৌবঙ্গীতে এলেন। বাস্তা পাব হয়ে মযদানেব দিকে গেলেন। ভিক্টোবিয়া মেমোবিযালেব কাছে নির্জন অন্ধকাবে একটা জাযগা পছন্দ হল তাঁব। এখানে কাগজের প্যাকেটটা ফেলে দিলে কেউ দেখবে না। সামনে দূবে কাউকেও দেখা যাচ্ছে না, তাঁকেও নিশ্চয়ই কেউ দেখছে না। হ্যাঁ, এখানেই ফেলে দেবেন বক্তাক্ত পাপটা।

এদিক ওদিক তিনি আবাব ভাল কবে দেখে নিলেন। তাবপব ব্যাগেব মধ্যে হাত ঢোকালেন প্যাকেটটা বেব কববেন বলে।

এই যে দাদা, ম্যাচিস হবে?

সীতাংশু চমকে উঠে দেখলেন, তাঁর সামনেই একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে। অন্ধকার ফুঁড়েই উঠে এসেছে।

সীতাংশু তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভেতর থেকে হাতটা তুলে নিলেন। তিনি সিগারেট খান না, পকেটে দেশলাইও নেই। মাথা নেড়ে বললেন, নেই।

যাচ্চলে, নেই? তা হলে পাঁচটা টাকা দিন, ম্যাচিস কিনি। পকেট বিলকুল সাফ।

লোকটা সীতাংশুর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। আবছা অন্ধকারে মুখটা ভাল করে না দেখা গেলেও আকার আয়তনে বোঝা যাচ্ছিল পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের একটা পেটানো শরীর। নিঃসন্দেহে অন্ধকার রাজ্যের বাসিন্দা। কাছেপিঠে লোকজন নেই, টাকা না দিলে এক্ষুনি ওর হাতে উঠে আসবে চকচকে ছোরা। সীতাংশুর হাতের ব্যাগটাও কেড়ে নিতে পারে। ব্যাগের ভেতর কাগজে মোড়া একটা পুরনো শার্ট দেখলে লোকটার সন্দেহ হবে। ঠিক ভেবে নেবে এই শার্টটাই এখানে ফেলতে এসেছেন সীতাংশু। তার ওপর শার্টের গায়ে রক্তের দাগ! ওই শার্ট নিয়ে নিশ্চয়ই ভীষণ বিপদে ফেলে দেবে সীতাংশুকে। এখন কোনও উচ্চবাচ্য না করে ভালয় ভালয় টাকাটা দিয়ে দেওয়াই সমীচীন মনে করলেন তিনি। পকেটে কয়েকটা টাকা ছিল, তার মধ্যে থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট লোকটার হাতে তুলে দিলেন।

খুব সহজেই টাকাটা এসে যাওয়াতে লোকটার লোভ বেড়ে গেল। বলল, শালা, পাঁচ টাকা মাত্তর? আরও কিছু ছাড়ুন। ব্যাগে কী আছে? মাল?

সীতাংশুর মুখ শুকিয়ে গেল। ব্যাগটা শক্ত করে ধরে রেখে বললেন, কিছু নেই। খালি।

ভাগ শালা, বুড়ো লোকে এখানে মজা লুটতে আসে মেয়েমানুষ নিয়ে। পকেটে শ পঞ্চাশ থাকে। কই ছাড়ুন, জলদি।

কারা যেন এদিকে আসছে। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। লোকটা প্রায় ছোঁ মেরে সীতাংশুর হাত থেকে টাকা তুলে নিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল চট করে, ঠিক যেমনভাবে এসেছিল। সীতাংশু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পকেটে খুচরো মিলিয়ে তিন-চার টাকা রইল। বাড়িও তো ফিরতে হবে।

হনহন করে ময়দান পেরিয়ে সীতাংশু চলে এলেন। এসব জনবিরল স্থান ভাল নয়। শেষপর্যন্ত কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। বদলোক ঘুরছে, কোথা থেকে কী হয়ে যাবে শেষপর্যন্ত। সঙ্গে রয়েছে সাংঘাতিক এক জিনিস, রক্তমাখা শার্ট, খুনের জলজ্যান্ত প্রমাণ। সব থেকে ভয়ের কারণ সেটাই। হঠাৎ যদি কোনও পুলিশের লোক এসে বলে, এই যে মশাই, অনেকক্ষণ ধরে তো ঘুরঘুর করছেন দেখছি, চলুন থানায়। সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে কী আছে দেখি? ব্যস, তা হলে আর দেখতে হবে না। ঢাকিসুদ্ধ বিসর্জন।

অনেকটা হেঁটে এসে একটা ট্রামে উঠলেন। শিয়ালদা হয়ে শ্যামবাজার যাচ্ছে। ভিড় থাকলেও দিনের বেলার মতো অতটা নয়। একটা বসবার জায়গাও পেয়ে গেলেন। পাশে বসে আছেন এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক। চোখে চশমা, বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ট্রামে বাসে যেমন হয়, পাশে বসেও অনেক দূরের মানুষ হয়ে থাকে। সীতাংশুর চোখ ট্রামের ভেতরটা ঘুরে এল। কেউ তাঁকে লক্ষ করছে কিনা দেখলেন। নিশ্চিত হয়ে ব্যাগটা পাশে রাখলেন। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাগটা এক হাত দিয়ে ঠেলে পায়ের কাছে ফেলে দিলেন। যেন কখন তাঁর অজান্তে পড়ে গেছে। না, কেউ তাকিয়ে নেই তাঁর দিকে। পাশের ভদ্রলোক আগের মতোই নির্বিকার মুখে বাইরে তাকিয়ে আছেন। এই সুযোগ, সীতাংশু এবার নেমে যাবেন ঠিক করলেন।

ট্রামটা মৌলালির মুখে থামতেই সীতাংশু ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন। নামবেন বলে ভিড় কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আর তখনই শুনলেন পেছন থেকে কে যেন ডাকছে, ও দাদু, এই যে, ও দাদু!

অবশ্যই তাঁকে ডাকছে। উপায় নেই, পেছন ফিবে তাকাতেই হয। তাকিযেই দেখলেন তাঁব পাশেব সিটেব সেই ভদ্রলোক তাঁব দিকে তাকিযে আছেন।

আপনাব ব্যাগ।

ভদ্রলোক হাত তুলে ব্যাগটা দেখালেন। যেন সীতাংশুব খুব উপকাব কবেছেন, এমনি ভাব চোখ মুখেব।

শুকনো মুখে ধন্যবাদ জানিযে সীতাংশু এগিযে এসে ব্যাগটা হাতে নিলেন।

দু' দু'বাব চেষ্টা কবেও কাগজেব প্যাকেটটা কোথাযও ফেলতে পাবলেন না। কলকাতা শহবে শুধু লোক আব লোক। কোথাযও এক ফোঁটা নিবিবিলি জাযগা নেই। সীতাংশুব ঠোঁটেব কোণে একটি হাসিব দাগ কাটল। কলকাতায শুধু দুঃখ নেই, ঠাট্টাও আছে। কোনও অপকর্ম কবাব মতোও ফাকা জাযগা পাওযা যায না।

সীতাংশু নেমে পড়েছিলেন। একটু সময বাস্তাব পাশে দাড়িযে বইলেন। এই মুহূর্তে কী কববেন, কোথায যাবেন, ভাবলেন। এ পাশে শিযালদাব দিকে জনস্রোত যাচ্ছে। একটা লোকাল ট্রেনে উঠে গেলেও হয। দু' একটা স্টেশন বাদে কোথাযও নেমে যাবেন। তাবপব সেই স্টেশনেব বাইবে এসে কোনও নালা নদমা ডোবা পুকুবে টুপ কবে ব্যাগটা ফেলে দেবেন। কেউ টেবও পাবে না। ভাবলেন, কিন্তু কিছু ঠিব কবতে পাবলেন না। একটু একটু কবে বাত বাড়ছে। আবও বাত হযে যাবে ফিবতে। বাড়িব লোক ভেবে ভেবে অস্থিব হবে। এমন তো তিনি কোনওদিনই কবেননি, এত বাত কবে কোনওদিনই বাইবে থাকেননি। তা ছাড়া যাব বললেই তো যাওযা যায না। বাইবে গেলে কোথায অচেনা মানুষ সেখানকাব লোকেব চোখে লেগে থাকে। লোকে ভাবে কে লোকটা? হঠাৎ যদি কাবও চোখে পড়ে যায তিনি জলে কিংবা কোথাযও কিছু ফেললেন, তবে মহা বিপদে পড়ে যাবেন। বক্তমাখা শার্ট নিযে হইচই হবে, লোকে বহস্যেব গন্ধ পাবে শেষপর্যন্ত থানা পুলিশ খোঁজ খবব হবে। ব্যস, তা হলেই তো ষোলো কলা পূর্ণ। বকাব খুনেব দাযভাগ সমস্ত এসে পড়বে তাঁব এবং তাপসেব ঘাড়ে। হাত ধবে তিনি বিপদকে ঘবে ডেকে আনবেন।

কিন্তু কিছু একটা কবতেই হবে, কোথায ফেলবেন প্যাকেটটা? কাছে কোথাও আবর্জনা ফেলাব জাযগায সুযোগ বুঝে ফেলে দেবেন? সীতাংশু বাস্তাব এদিক ওদিক তাকিযে দেখলেন। কিন্তু কোথাযও সেবকম কিছু চোখে পড়ল না। পথে মানুষই আঁটছে না, ডাস্টবিন বাখাব জাযগা কোথায! সামনে কোনও পার্ক থাকলে সেখানে যাবেন? পার্কেব কোনও অন্ধকাব কোণে ফেলে দেবেন প্যাকেটটা। কিন্তু কাছে কোনও পার্ক আছে কিনা তিনি জানেন না, এত বাতে খুঁজবেন কোথায? মহা মুশকিল হল তো!

তিনি দাড়িযে আছেন ফুটপাথেব এক পাশে, ভাবছেন একটা লোক নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়াল। নিচু গলায বলল, ফোটো নেবেন স্যাব?

ফোটো মানে?

যে বকম ইচ্ছে, সেবকম ফোটো।

কীসেব ফোটো?

সববকম বযেসেবই পাবেন। ইচ্ছে হলে যাব ফোটো তাকেও পেযে যাবেন। আসুন না, এই তো কাছেই, সামনেব গলিতে।

লোকটা যে কোনও নিষিদ্ধ ব্যবসাব দালাল, সেটা বুঝতে দেবি হল না সীতাংশুব। তাঁকে প্রলোভন দেখাচ্ছে। কোলকাতায যে কত বকমেব লোক থাকে? একটু বাত কবে বাস্তাব ধাবে চুপ কবে দাঁড়িযে থাকলেই মাছিব মতো ভনভন কববে কাছে কাছে। সীতাংশু শুনেছেন তাঁব বযেসেব অনেক লোকও এসব খাবাপ মতলবে বাস্তায ঘোবে।

না, লাগবে না। বলেই সীতাংশু পা বাড়ালেন। সামনে একটা বেস্টুবেন্ট দেখলেন। দা ক্যালকাটা কেবিন। ঢুকে পড়লেন সেখানে। কিছু না ভেবেই তিনি দোকানে ঢুকে পড়েছিলেন, ভাবলেন এক

কাপ চা খেলে মন্দ হয় না। কোনওদিন তিনি এভাবে বেপাড়ার দোকানে একা একা চা খান না, কিন্তু আজ অন্য কথা। চিন্তা ভাবনায় মাথাটা দপদপ করছে। গরম গরম এক কাপ চা খেলে হয়তো ভাল লাগবে। তা ছাড়া ওই বাজে লোকটাকেও তো এড়ানো দরকার। কে জানে হয়তো পেছন পেছন যেত।

এক কোণে একটা চেয়ার টেনে বসে এক কাপ চা দিতে বললেন। দু'-চারজন লোক দোকানে বসে চা খাবার খাচ্ছে। অচেনা সবাই। এ-অঞ্চলে তিনি থাকেনও না, আসেনও কালেভদ্রে, তাঁর মতো সাধারণ লোককে চিনবেই বা কে।

তিনি যেখানে বসে ছিলেন, সেটা দোকানের এক কোণ, আলোও খুব কম। এক পাশে কিছু থালা বাসন, আনাজপত্র। সীতাংশুর মাথায় চকিতে চিন্তাটা আবার খেলে গেল। ব্যাগটা ভুল করে এখানে ফেলে গেলেও তো হয়। ফেলে গেলে সদ্য সদ্য কেউ টের পাবে না। যখন কেউ ব্যাগটা দেখবে, তখন তিনি অনেক দূরে চলে যাবেন। দোকানে কত লোকই তো আসে, কে কখন ফেলে গেছে, কে বলবে।

সীতাংশু ঠিক করলেন এই দোকানেই কাগজের প্যাকেটটা ফেলে যাবেন। টেবিলের নীচে ব্যাগটা এনে ভেতর থেকে প্যাকেটটা বের করে চেয়ারের পাশে রাখলেন, সুযোগ বুঝে ফেলে দেবেন। কেউ এদিকে তাকিয়ে আছে কিনা দেখতেই দেখলেন একটা লোক তাঁকে দেখছে। সীতাংশুর দিকে মুখ করে একটু দূরের একটা চেয়ারে বসে সেও চা খাচ্ছে। দাড়ি গোঁফ কামানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা, বয়েসও খুব একটা বেশি নয়। সীতাংশুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে চোখ ফিরিয়ে নিল।

সীতাংশুর বুক কেঁপে উঠল। বেশ বুঝতে পারলেন লোকটা তাঁকে লক্ষ করছে। লোকটাকে তিনি চেনেন না, দেখেনওনি কোনওদিন। তবে তাঁর দিকে লোকটা কী দেখছে? চেহারায় বেশবাসে চরিত্রে তিনি তাকিয়ে দেখার মতন কোনও বিশেষ ব্যক্তিত্ব নন, লোকটা তাঁকে দেখবে কেন? ব্যাপারটা তিনি ভুল বুঝছেন ভেবে নিতে পারতেন, কিন্তু একটু পরেই দেখলেন লোকটা আবার মুখ ফেরাল তাঁকে দেখবে বলে। কিন্তু সীতাংশু ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে আর তাকাল না। সীতাংশু খুব ভয় পেয়ে গেলেন। হঠাৎ একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল তাঁর মনে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে পুলিশের পোশাক পরিয়ে দিলেন। প্যান্ট, শার্ট, টুপি। হ্যাঁ, নিখুঁত মানিয়ে গেছে। সীতাংশুর হাত পা জমে গেল। লোকটা অবধারিত পুলিশের লোক। সাদা পোশাকে ফলো করছে তাঁকে। সভয়ে তাঁর মনে হল লোকটা অনেকক্ষণ ধরে, সেই সন্ধেবেলা থেকেই তাঁকে ফলো করছে। তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই ছায়ার মতো তাঁর পেছন পেছন গেছে, তিনি কী করছেন সব লক্ষ করেছে। এখন হাতেনাতে তাঁকে ধরবে বলে অপেক্ষা করছে। যেই প্যাকেট সমেত ব্যাগটা ফেলে দেবেন, অমনি এগিয়ে এসে খপ করে তাঁর হাত ধরে গম্ভীর গলায় বলবে, এই যে মশাই, কী ফেললেন দেখি? চলুন থানায়।

সীতাংশু নির্ভুল হলেন যে তিনি জালে আটকা পড়েছেন। এমনতরো অবস্থায় তিনি কোনওদিনই পড়েননি, জটিল চিন্তাভাবনাও কখনও করতে হয়নি। ছোটখাটো সুখদুঃখের মানুষ তিনি, ভাবনা চিন্তাও সহজ সরল। কাজেই চট করে ঠিক করতে পারলেন না এমনি অবস্থায় তাঁর কী করা উচিত। চলে যাবেন? না যেমন আছেন তেমনি বসে থাকবেন? দোকানের দেয়ালের ঘড়িতে সময় দেখলেন। অনেক রাত হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট বাকি ন'টা বাজতে। চলে যাওয়াই ঠিক করলেন। উঠে গিয়ে তিনি চায়ের দাম মিটিয়ে দিলেন। একবারও তাকালেন না লোকটার দিকে। দোকানের বাইরে পা দিয়েই কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন লোকটা ঠিক তাঁর পেছন পেছন আসছে। এইবার ঠিক তাঁকে ধরবে। রাস্তার মাঝখানে হাজার লোকের সামনে এক হাতে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে অন্য হাতে তাঁকে থানায় টেনে নিয়ে যাবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির এত নং এবং এত নং ধারা, হত্যা এবং হত্যার প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা। আজকের রাতের মতো ঢোকো হাজতে।

সীতাংশু মরিয়া হয়ে খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাবেন, লোকটা পেছন থেকে ডাকল, শুনুন।
অমনি সীতাংশুর মুখটা লম্বা হয়ে ঝুলে গেল। আর উপায় নেই, খেল খতম। কিন্তু থামলেন না। যেন তাঁকে কেউ ডাকেনি, যেন তিনি কিছুই শোনেননি, এইভাবে পা চালিয়ে গেলেন।
লোকটা আবার ডাকল, শুনুন, এই যে—
এবার থামতে হল। পেছন ফিরে দেখলেন, তিনি যা ভেবেছিলেন, সেই লোকটাই। আমাকে? নিজের কানেই নিজের গলা খসখসে শোনাল।
লোকটা আরও এগিয়ে এসে বলল, হ্যাঁ। অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু আমি আপনাকে দেখছি।
সীতাংশুর বুকের মধ্যে গুমগুম করে উঠল। বললেন, কেন?
আপনি শ্যামবাজারে থাকেন না?
থাকি, ইয়ে, মানে, কেন বলুন তো?
সীতাংশু পালিত?
হ্যাঁ।
তবে ঠিকই চিনেছি আপনাকে। অনেক দিন পরে দেখছি তো, মুখটা খুব ক্লিয়ার মনে ছিল না।
আপনি-- ?
আমি পিন্টু।
পিন্টু, মানে সুধার ছেলে? জলপাইগুড়ির? সুধা সীতাংশুর দূর সম্পর্কের বোন। জলপাইগুড়ি ছাড়ার পর বহুকাল যোগাযোগ নেই ওদের সঙ্গে।
পিন্টু হাসল। বলল, কলকাতায় এসেছি কয়েক দিন হল। এখন দুর্গাপুরে আছি।
কথা বলতে বলতে পিন্টু অনেকখানি হেঁটে এল সীতাংশুর সঙ্গে। একসময় বলল, তা মামা, তোমার হাতে ব্যাগ কেন? এদিকে কিছু কিনতেটিনতে নাকি?
সীতাংশু শক্ত হাতে ব্যাগটা ধরলেন। না না, তেমন কিছু নয়। তা হলে পিন্টু, তুমি একদিন বাড়িতে এসো, কেমন? বলতে বলতে অতি ব্যস্ততার সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। শ্যামবাজার যাবার বাস আসছে। পিন্টু কিছুটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মীরা দরজা খুলে সীতাংশুকে দেখল। একটা ধ্বংসস্তূপের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। জবুথবু মুখ।
তোমার কাণ্ডটা কী বলো তো? এত রাত অবদি কোথায় ছিলে? হাতে ব্যাগ কেন? মীরার গলায় উদ্বেগ।
সীতাংশু কোনও কথা না বলে ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখলেন, স্—স্—স্।
মীরা চুপ করে গেল। সীতাংশু ঘরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস গলায় বললেন, ওরা কোথায়? কৃষ্ণা, তপু?
মীরা ভয়-পাওয়া গলায় বলল, ঘরে। কেন?
সীতাংশু আবার ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে মীরাকে চুপ করতে বললেন। তারপর বিস্মিত স্ত্রীকে দাঁড় করিয়ে রেখে দ্রুত পায়ে সিঁড়ির নীচে গেলেন। ব্যাগ থেকে প্যাকেটটা বের করে কাগজ খুলে শার্টটা হাতে নিলেন। তারপর উবু হয়ে বসে প্যাকিং বাক্সটা কাত করে তার নীচে শার্টটা যেমন আগে ছিল, রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মীরার কাছে এসে বললেন, চলো।
মীরা অবাক গলায় বলল, কী রাখলে ওখানে?
ঠিক জায়গাতেই ঠিক জিনিস রেখেছি।
কী?
সীতাংশু শূন্য গলায় বললেন, আমাদের রক্তের সম্পর্ক।

লাল রঙের বল

ড্রেসিং টেবিলের একমানুষ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুপর্ণা নিজেকে ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল। সাজগোজ হয়ে গেছে, এখন যাকে বলে ফাইনাল চেকিং। শাড়ির আঁচলটা আরও একটু টেনে দিয়ে ঠোঁট বাড়িয়ে দেখল রংটা কম বেশি হয়েছে কিনা। তারপর কপাল থেকে কিছু খুচরো চুল সরিয়ে দিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে দেখল।

প্রণবেশ বিছানার ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে দেখছিল। হাসিমুখে বলল, এদিকেও একটু তাকাও, অন্য লোকেও একটু দেখুক।

সুপর্ণা ঘুরে দাঁড়িয়ে আদুরে গলায় বলল, এই বলো না, কেমন দেখাচ্ছে?

ফ্যানটাস্টিক।

ইয়ারকি হচ্ছে, না? এই সত্যিই বলো না?

বললামই তো, সুপার ফ্যানটাস্টিক। কিন্তু সিনেমা হলের অন্ধকারে এই রূপ এই সাজ কাকে দেখাবে বলো তো?

সুপর্ণা ঠাট্টার গলায় বলল, কেন, নায়ককে।

বিছানায় প্রণবেশের পাশে তিন বছরের মেয়ে সোনিয়া ঘুমাচ্ছে। ঘুমাতে ঘুমাতেই পাশ ফিরল। সুপর্ণা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটু সময়। ঘুম ভেঙে যদি দেখে মা সেজেগুজে তৈরি, তা হলে আর দেখতে হবে না। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসবে, তারপর মা'র সঙ্গে যাবার জন্যে তুমুল কান্নাকাটি শুরু করে বাড়ি মাথায় করবে।

প্রণবেশ ঘুমন্ত মেয়েকে দেখতে দেখতে বলল, না, এখনও অনেকক্ষণ ঘুমাবে। তোমার তো ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধে, হুঁ?

সুপর্ণা মণিবন্ধের ছোট্ট ঘড়িতে সময় দেখল। আড়াইটে বেজে গেছে। এখনও মণিমাসি এল না। তিনটেয় সিনেমা। ভবানীপুর যেতেও কিছুটা সময় লাগবে, অবশ্য মণিমাসির নিজের গাড়ি আছে, টিকিটও কাটা আছে আগে থেকে। তবু সময় হাতে নিয়েই যাওয়া দরকার। কলকাতার রাস্তায় ইচ্ছে থাকলেও সঠিক সময়ে পৌঁছানো যায় না সবসময়। সুপর্ণা মুশকিল মুশকিল মুখ করল, একটু আগে এলে যে কী হয়! মণিমাসিটা যেন কী।

প্রণবেশ বলল, যাচ্ছেতাই।

সুপর্ণা চোখ পাকিয়ে বলল, এই, মণিমাসি এলে বলে দেব কিন্তু।

প্রণবেশ চেয়ে চেয়ে দেখছিল সুপর্ণাকে। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ধোঁয়া ধোঁয়া নীল রঙের সিন্থেটিক শাড়িটা ওর ফরসা নরম শরীরটার আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। লাল ভেজাভেজা ঠোঁটদুটো প্রণবেশকে ভীষণভাবে লোভী করে তুলছিল।

আমি কিন্তু এক্ষুনি তোমার মেয়েকে জাগিয়ে দেব। এই সোনিয়া, ওঠ! প্রণবেশ সত্যি সত্যিই যেন সোনিয়াকে জাগিয়ে দেবে এমনি ভাব করল।

সুপর্ণা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল, এই এই, কী পাগলামি করছ, সত্যি উঠে যাবে যে!

তা হলে বলো আমার কথা শুনবে?

কী?

কাছে এসো। কানে কানে বলব।

সুপর্ণা হাসিমুখে বলল, উঁহু, ওখান থেকে বললেই বেশ শুনতে পাব।

তখনই নীচে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। মণিমাসি এসেছে। সুপর্ণা বিছানার ওপর থেকে ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলল, মনে আছে তো কী করবে? সোনিয়া উঠলে একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখো। বিস্কুট আছে, মিটসেফে দুধ আছে, অলকাকে বোলো খাইয়ে দেবে।

পরদা সরিয়ে মণিমাসি ঘরে ঢুকে বললেন, এই যে খুকু, তোর হল? বাঃ, আজ দেখছি তোর আগেই হয়ে গেছে! রেডি স্টেডি গো?

যেন সুপর্ণা বরাবরই দেরি করে এবং সেজন্যে মাঝেমাঝে মণিমাসির খুবই অসুবিধের পড়তে হয়।

প্রণবেশের দিকে চেয়ে সুপর্ণা হতাশ ভঙ্গি করল। শোনো কথা! যে জন্যে একটু আগেই মণিমাসির সম্বন্ধে অভিযোগ করেছে সে, সেই অভিযোগটা তারই ঘাড়ে এসে পড়েছে।

মণিমাসি সুপর্ণার আপন মাসি। টালিগঞ্জে থাকেন। প্রেস ট্রেস কী সব আছে। ভাল অবস্থা। বছর চল্লিশেক বয়েস। খুব ফরসা আর গোলগাল শরীরের মানুষ। সুরসিকা এবং খোলামেলা মনের মহিলা। কিন্তু মণিমাসি মুখটাকে সবসময় গম্ভীর করে রাখেন। তিনি যে একজন সিরিয়াস ভদ্রমহিলা সে ব্যাপারে কেউ যেন ভুল না করে। প্রণবেশের দিক থেকেও মণিমাসির অন্যরকম আত্মীয়তা আছে। বীরেশ্বর মিত্র, মানে মণিমাসির স্বামী, প্রণবেশের বউদির কীরকম ভাই হয় যেন।

মাথাটা একটু নামিয়ে গোলাকার চশমার ভেতর থেকে মণিমাসি প্রণবেশকে দেখলেন, এই যে, খুব তো গুডবয় সেজে বসে আছ, সেই ছেলেটার ব্যাপারে খোঁজ নিতে যে বলেছিলাম, তার কী হল? খবরও তো দিলে না।

প্রণবেশ কাচুমাচু মুখ করে মাথার পেছনে হাত রেখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মণিমাসি হাত তুলে থামিয়ে দিলেন, থাক। আমি জানি তুমি কী বলবে।

না, মানে

মানে তুমি একদম সময় করে উঠতে পারোনি, এইবার অবশ্যই খোঁজ নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে আমাকে জানাবে, আমি যেন নিশ্চিন্তে থাকি, এই তো? তা যা খবর দেবার দিয়ো, এখন আমরা যতক্ষণ না ফিরি মেয়েকে পাহারা দাও।

বড় জায়ের মেয়ে রিঙ্কুর জন্যে প্রণবেশকে একটা ছেলের খোঁজ নিতে বলেছিলেন মণিমাসি। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, শ্যামবাজারে বাড়ি। যে অফিসে সে কাজ করে সেটা প্রণবেশের অফিসের খুব কাছেই। করব করব করে খোঁজখবর নেওয়া যদিও হয়ে ওঠেনি, প্রণবেশের ইচ্ছে আছে একদিন সত্যিই খোঁজ নেবে। আসলে যা হয়, প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত কেউ নয় বলেই প্রণবেশ এ-ব্যাপারে খুব বেশি একটা গা গরজ করেনি।

তা খুকু, তুইও তো একটু মনেটনে করিয়ে দিতে পারিস। পুরুষমানুষ, সারাদিন খেটেখুটে আসে, সব জিনিস অতশত মনেও থাকে না। তা প্রণবেশ, একদিন সময় করে যেয়ো, কেমন? এই দ্যাখ, তুই আবার হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? মণিমাসি তাড়া দিলেন সুপর্ণাকে, চল চল, তিনটে তো বাজতেই চলল।

মণিমাসি দরজার বাইরে যেতেই সুপর্ণা এগিয়ে এসে বিছানার ওপর ঝুঁকে সোনিয়ার কপালে আলতো করে চুমু খেল। তারপর প্রণবেশের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, তোমারটা ডিউ রইল। লক্ষ্মীটি, সোনিয়া যদি কাঁদে তবে একটু বাইরে থেকে ঘুরিয়ে টুরিয়ে নিয়ে এসো।

বাইরে থেকে মণিমাসির গলা শোনা গেল, কই রে, তুই আসবি?

সুপর্ণা যেতে যেতে বলল, আসছি।

দরজা বন্ধ করে প্রণবেশ সবে ঘরে এসে বসেছে, সোনিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, মা কোথায়?

হিসেবমতো সোনিয়ার আরও অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার কথা। সাড়ে তিনটে চারটে পর্যন্ত ও

দিব্যি ঘুমায়। তা ছাড়া সিনেমায় যাবে বলে আজ ইচ্ছে করেই দেরি করে ঘুম পাড়িয়েছে সুপর্ণা।

মনে মনে প্রমাদ গুনল প্রণবেশ। কাছে গিয়ে আবার শুইয়ে দিয়ে চাপড় দিতে দিতে বলল, ঘুম, ঘুম, আয় ঘুম।

কিন্তু সোনিয়া আবার উঠে বসে বলল, মা কোথায়?

বোঝা গেল সে আর ঘুমাবে না। মুশকিলে পড়ে গেল প্রণবেশ। এখনও মণিমাসির গাড়ির শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যায়নি, এর মধ্যেই সনিয়া জেগে গেছে। এখনও তিন-চার ঘণ্টা ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে হবে। এসব ব্যাপার প্রণবেশের খুব আসেটাসে না। সারাদিন অফিসেই থাকে। ছুটিছাটায় বাড়িতে শুয়ে বসে বইটই পড়েই কাটিয়ে যায়। সিনেমা-টিনেমা খুব একটা দেখে না। সেজন্যে সুপর্ণারও সিনেমা দেখা হয়ে ওঠে না। সোনিয়াকে কার কাছে রেখে যাবে? লোক বলতে তো ওরা তিনজনই। আবার সোনিয়াকে নিয়েও সিনেমা দেখা যায় না। মেয়ে অন্ধকার ঘর মোটেই পছন্দ করে না। দু'-চার মিনিট হয়তো চুপ করে থাকবে, তারপরেই শুরু করবে বিরক্ত করা। মা, চলো না, বাড়ি চলো না। আজ তাই রবিবার ছুটির দিনে প্রণবেশের কাছে সোনিয়াকে রেখে সুপর্ণা সিনেমায় গেছে। মণিমাসিই জোর করে নিয়ে গেছেন। অবশ্য প্রণবেশও কোনও আপত্তি করেনি। যাক ঘুরে আসুক। সারাদিন কাজের মধ্যে থাকে, একটু সাধ আহ্লাদ না দেখলে একঘেয়েমি এসে যাবে।

প্রণবেশ বলল, মা তো চান করতে গেছে মামণি। বলেই বুঝতে পারল কথাটা ঠিক জুতসই বলতে পারেনি। বাচ্চা মেয়ে হলেও সময়টা যে স্নান করার মতো সময় নয়, সেটা সোনিয়া ঠিক বুঝতে পারবে।

সোনিয়া বাথরুমের দরজার দিকে তাকাল। সেখান থেকে স্নান করার কোনও সাড়াশব্দ আসছে না। ব্যাপারটা তার ঠিক পছন্দ হল না। প্রণবেশের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি বলল, মা চান করছে না।

হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনি ভাব করে প্রণবেশ বলল, তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম। মা তো তোমার জন্যে চকলেট কিনে আনতে গেছে।

সোনিয়া বলল, আমি যাব।

দুর বোকা মেয়ে, তুই যাবি কেমন করে? মা তো অনেক দূরের দোকানে গেছে। কত্ত চকলেট আনবে বল তো? এই এত্ত চকলেট আনবে। বিস্কুট খাবে একটা?

চকলেট খাব।

সে তো খাবেই। মা আসুক আগে, তারপরে তো। এখন বসে বসে একটা বিস্কুট খাও, কেমন?

সোনিয়া বোধহয় বুঝতে পেরেছে প্রণবেশ ওকে ভুলাচ্ছে। পা ছড়িয়ে বসে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, আমি চকলেট খাব।

চকলেট খেতে হলেই তো মাকে চলে আসতে হবে। কেননা মা তো চকলেটই আনতে গেছে। এইটুকু মেয়ে, কিন্তু ক্যালকুলেশনটা নিখুঁত।

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে নিতে চাইল প্রণবেশ। সোনিয়ার মুখের অবস্থা সুবিধের নয়। কাঁদার জন্যে সে তৈরিই হয়ে আছে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

এই এত্ত বড়। প্রণবেশ চোখ বড় বড় করে দু'পাশে দু'-হাত বাড়িয়ে কত বড় তাই দেখাল।

সোনিয়া বাবার কথায় রহস্যের গন্ধ পেল। বাবার সঙ্গে সেও চোখ বড় বড় করল। বলল, কী?

প্রণবেশ সুযোগটা ছাড়ল না, বিস্কুট এনে বলল, বিস্কুটটা খেতে থাকো, বলছি।

সোনিয়া বিস্কুট হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসু মুখে তাকাল প্রণবেশের মুখের দিকে। এত্ত বড় জিনিসটা কী, সেটা এখনও তার জানা হয়নি এবং সেটা জানার জন্যেই সে বাধ্য মেয়ের মতো বিস্কুট হাতে নিয়েছে।

দরজায় ঠকঠক শব্দ হল। অলকা এসেছে। আঁটসাট চেহারার মাঝবয়েসি অলকা এ-বাড়িতে

ঠিকে কাজ করে। সবসময়ের জন্যে কাজ করবে এ-ধরনের কোনও অল্পবয়েসি মেয়ের কথা সুপর্ণা মাঝেমাঝে বলে। প্রণবেশও দু'-চারজনকে বলেছে। কিন্তু আজকাল চাইলেই কি সব জিনিস সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে?

প্রণবেশ দরজা খুলে দিল। অলকা সোনিয়ার দিকে একটু হাসিমুখে চেয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। টুকিটাকি অনেক কাজ আছে। রান্নাঘরের কল থেকে জল পড়ার শব্দ শুনল প্রণবেশ।

এখন একটু দুধ খাও মামণি।

সোনিয়া এবার প্রবলভাবে আপত্তি জানাল। চকলেটের কথা ভুলেছে, বিস্কুট হাতে নিয়েছে, গল্প বলার নাম নেই, এখন বিতিকিচ্ছিরি দুধ খেতে বলছে। সোনিয়ার হাবভাব দেখে প্রণবেশও আর দুধ খেতে বলল না। চুপচাপ আছে মেয়েটা, বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে আবার কোন বিপত্তি বাধিয়ে বসবে।

ও বাবা, বলো না?

কী বলব মামণি?

এই এত্ত বড় -- সোনিয়াও প্রণবেশের মতো হাত বাড়িয়ে দেখায়।

প্রণবেশ হেসে ফেলল। তারপর চোখে মুখে ভয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, তুমি যখন ঘুমু করছিলে না, তখন না, ঘরের মধ্যে না, ইয়া বড় এক, মানে এত্তবড়—

বাবা বলো না, কী?

শেয়াল।

সোনিয়া শেয়াল দেখেনি। ছবিতে দেখেছে, কিন্তু শেয়ালের আয়তন কত বড় হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই তার নেই। তবু একটু ভয় হল তার। শেয়ালটেয়াল মোটেই ভাল জিনিস না। ভয়েভয়ে প্রণবেশের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমি শেয়াল দেখব না বাবা।

ওটা তো পালিয়েই গেছে। যেই না ঘরে ঢুকেছে, অমনি না আমি, প্রণবেশ হাতের আঙুলে বন্দুক ফোটাবার ভঙ্গি করে বলল, বন্দুক দিয়ে গুড়ুম করে দিয়েছি। আর শেয়ালটা এক ছুট্টে শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়িতে চড়ে— প্রণবেশ চোখে মুখে মজার ভাব করল।

সোনিয়া বড় বড় চোখ করে রোমহর্ষ ঘটনাটা শুনছিল। শেয়ালটা বাবার কাছে ভীষণ জব্দ হয়েছে শুনে ওর ফোলাফোলা মুখে হাসি ফুটল। প্রণবেশ নিশ্চিন্ত হল। বাচ্চারা বাচ্চাই। কিন্তু তারপরেই সোনিয়া বলে বসল, আমাকে বন্দুক দাও বাবা।

প্রণবেশ বিপদে পড়ে গেল। কাল্পনিক শেয়ালের একটা গতি করেছে, কাল্পনিক বন্দুকের কী ব্যবস্থা করবে ভাবতে হচ্ছিল তার। তারপরে একটু ভেবে নিয়ে বলল, এই যা, বন্দুকটা তো শেয়ালটা নিয়ে গেছে।

এবার সোনিয়া সন্দিগ্ধ মুখে বাবার দিকে চেয়ে রইল। শেয়ালের বন্দুক নিয়ে যাবার কথাটা মোটেই পছন্দ হল না তার।

অলকা ঘরে এসে বলল, চা দেব তো দাদাবাবু? সোনিয়া তো এখন দুধ খাবে। কী সোনিয়া, কার কাছে দুধ খাবে? আমার কাছে না বাবার কাছে?

কিন্তু সোনিয়ার কারও কাছেই দুধ খাবার ইচ্ছে নেই। মুখ ফিরিয়ে ওর তীব্র অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করল।

প্রণবেশ বলল, থাক গে। একদিন দু'-এক ঘণ্টা পরে দুধ খেলে কিছু হবে না। তুমি বরং চা-ই এনে দাও আমাকে।

সোনিয়া অলকার চলে যাওয়া দেখল মুখ ফিরিয়ে। তারপর প্রণবেশের দিকে চেয়ে জেদি গলায় বলল, মা আসছে না কেন?

প্রণবেশ তাক থেকে একটা ছোট্ট লাল রবারের বল এনে সোনিয়ার দিকে ছুড়ে দিল। সোনিয়া সেটা বিছানায় পড়ে যাবার পর ধরার জন্যে হাত বাড়াতেই প্রণবেশ বলল, এ রাম, ধরতে পারে না।

সোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে একটা মজার খেলা পেয়ে গেল। সেও বলটা প্রণবেশের দিকে ছুড়ে দিল। প্রণবেশ হাত বাড়িয়ে ইচ্ছে করেই বলটা ধরল না।

সোনিয়া হাততালি দিয়ে বলল, এ রাম, বাবা ধরতে পারে না।

যেন খেলায় পারছে না, এমনি মুখের ভাব করে প্রণবেশ আবার বলটা গড়িয়ে দেয় সোনিয়ার দিকে।

দেয়ালঘড়িতে ঘণ্টা বাজল। জলতরঙ্গের টুংটাং শব্দের মতো চারটে ঘণ্টার শব্দ। প্রণবেশ ঘড়িটাকে দেখে। অনেকদিন হয়ে গেল ঘড়িটা দেয়ালে আছে। হালকা সবুজ ডায়াল, উজ্জ্বল কাঁটা। বছর দুয়েক আগে সুপর্ণাই পছন্দ করে কিনেছিল। অন্য জিনিস কিনতে গিয়ে চৌরঙ্গীর একটা দোকানে হঠাৎ পছন্দ হয়ে গেল ঘড়িটা। সঙ্গে সঙ্গে কেনাও। অবশ্য সুপর্ণার এধরনের কোনও শখ মেটাবার মতো আর্থিক অবস্থা যে প্রণবেশের নেই তাও নয়। এক নামকরা মার্কেন্টাইল ফার্মের পদস্থ কর্মচারী সে। নানান দিক থেকে সে সফল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ, বাড়িতে সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রী, তিন বছরের ফুটফুটে মেয়ে, আনন্দে সুখে ভালবাসায় এক পরিপূর্ণ নিটোল সংসার। দক্ষিণ কলকাতার এই ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলার এই সাজানো অ্যাপার্টমেন্টে সুখের আয়োজন যা কিছু আছে সবই সুপর্ণার ইচ্ছেতেই এসেছে।

সোনিয়া লাল বলটা নিয়ে এখন নিজেই খেলছে। বলটা গড়িয়ে দিচ্ছে বিছানায়। প্রণবেশ হাত বাড়িয়ে বলটা ধরতে যাবার ভঙ্গি করতেই সে খিলখিল করে হাসতে হাসতে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে এসে বলটা ধরে ফেলছে, বাবা হেরে গেল, বল ধরতে পারে না।

সোনিয়ার খুশি যেন হালকা হাওয়ার মতো প্রণবেশের শরীরে শরীরে হেঁটে যায়। সোনিয়া যেন দু'হাত বাড়িয়ে প্রণবেশ আর সুপর্ণাকে ধরে রেখেছে এক মেলবন্ধনে। স্ত্রীর ভালবাসার দিক থেকে প্রণবেশ সুখী। কোনও অসীম অতলান্ত সুখ সে চায়নি বলেই তার ইচ্ছেগুলো সাধ্যের মধ্যে থেকে যায়। ছোট্ট সংসার, মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা, বুক সেলফে কিছু ভাল কালেকশন, অনেক রাত্রে সবুজ আলোয় টেপ রেকর্ডারে সেতারের আলাপ, নরম বিছানায় যুবতী শরীরের বিশ্বস্ত সান্নিধ্য, সোনিয়ার ফোটা ফুলের মতো হাসি— চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে এক বিরোধহীন সম্পূর্ণতা।

সোনিয়া হাতের একটা আঙুল দেখিয়ে বলল, বাবা ফিঙ্গার।

প্রণবেশ বলল, গুড। তোমার হাতে কী?

সোনিয়া নিজের হাত ভাল করে দেখল। দেখতে দেখতে যেন ভাবল উত্তরটা কী হতে পারে।

প্রণবেশ আবার বলল, বলো, তোমার হাতে কী আছে?

হ্যান্ড আছে।

দুর বোকা মেয়ে, হ্যান্ড তো হাত। হাতে কী আছে?

বল আছে।

ভেরি গুড। কী রঙের বল ওটা?

সোনিয়া মহা সমস্যায় পড়ে গেল। অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখেও বলতে পারল না কী রঙের বল ওটা।

প্রণবেশ বলল, ওটা লাল রঙের বল। লাল ইংরেজি কী যেন?

সোনিয়া একটু ইতস্তত করে বলল, গ্রিন।

প্রণবেশ দু'পাশে মাথা নাড়ল, উঁহুঁ, রেড। তোমার হাতে রেড বল আছে। গ্রিন হচ্ছে সবুজ।

সোনিয়া অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় বসে আছে। অলকাকে ডাকল প্রণবেশ, ওকে একটু বাথরুম করিয়ে নিয়ে এসো তো।

সোনিয়া লাল বলটা বাবার হাতে জমা দিয়ে অলকার সঙ্গে বাথরুমে গেল।

প্রণবেশ টেবিলের ওপর থেকে একটা ইংরিজি সাপ্তাহিক এনে বিছানায় বসল আরাম করে। পাতা ওলটাতে ওলটাতে ভাবছিল এখনও দু'-আড়াই ঘণ্টা সোনিয়াকে সামলাতে হবে। ঘণ্টার পর

ঘন্টা সুপর্ণা কেমন করে সামলায় কে জানে। মাত্র এক ঘন্টাতেই প্রণবেশের স্টক শেষ। হয়তো মায়ের সান্নিধ্যটাই বাচ্চারা সবচেয়ে মজা মনে করে, সে মজা কখনও শেষ হয় না।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে সোনিয়া বলল, মা আসছে না কেন বাবা?

জবাব না দিয়ে প্রণবেশ বিছানার ওপর থেকে লাল বলটা সোনিয়ার দিকে ছুড়ে দিল।

সোনিয়া বলটা ধরল না। বলটা তার হাতের পাশ দিয়ে দেয়ালে গিয়ে লাগল। দেয়ালে লেগে গড়িয়ে গেল মেঝেতে।

সোনিয়া বিছানা থেকে নেমে এদিক ওদিক দেখে বলটা খুঁজে না পেয়ে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, বল নেই।

বাধ্য হয়ে প্রণবেশকে বলটা খুঁজতে হল। কিন্তু এখানে ওখানে কোনওখানেই সেও বলটা খুঁজে পেল না। সোফার পাশে, আলমারির পেছনে, খাটের নীচে, কোথায়ও নেই।

সোনিয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, বল দাও বাবা।

অলকা চা নিয়ে এসেছিল। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রণবেশ ভাবল বলটা কোথায় থাকতে পারে। অন্য কোথাযও যখন নেই, তখন খাটের নীচে কোনও কোণেটোনে নিশ্চয়ই বলটা আছে। একবার ভাবল অলকাকে ডাকবে। কিন্তু ডাকল না। লম্বা চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে নিজেই হাঁটু গেড়ে বসল খাটের নীচে ঢুকবে বলে। সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়া এক মজার খেলা পেয়ে গেল। বাবাকে ওইভাবে দেখে দৌড়ে এসে প্রণবেশের পিঠের ওপর দু' পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে বলল, এই ঘোড়া হ্যাট হ্যাট।

কিন্তু এ খেলায় প্রণবেশ খুব উৎসাহ পেল না। এইভাবে হাঁটু গেড়ে সারাঘর ঘোড়া হয়ে ঘোরাটা খুব আরামপ্রদ মনে হল না। কাজেই চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘোড়াটা মানুষের গলায় বলল, বলটা বোধহয় শেয়ালটাই নিয়ে গেছে।

সোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রণবেশের পিঠ থেকে বলল, তুমি ঠিক বলছ না বাবা, শেযাল বল নেযনি।

অগত্যা বলটা খুঁজতে প্রণবেশ খাটের তলায় ঢুকল। খাটের নীচে ছাযাছাযা অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায় না। পাযার পেছনে দেযালের কোনাকুনি জাযগাটা দেখল। কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ তো, লাল বলটাই তো। হাত বাড়িয়ে বলটা আনতে গিয়েই দেখল একটা কাগজ আটকে আছে সেখানে। কী কাগজ দেখার জন্যে কাগজটা সে তুলে নিল। তারপর বাইরে এসে বলটা সোনিয়ার হাতে দিয়ে কাগজটা দেখল। ধুস. একটা পোস্টাপিসের খাম। ঠিকানাটা দেখল। সুপর্ণার ঠিকানা লেখা। বাপের বাড়ি থেকে হযতো কোনও চিঠি এসেছিল।

সোনিয়া বলটা নিয়ে এবার কিন্তু বেশিক্ষণ খেলল না। প্রণবেশের কাঁধে মুখ গুঁজে কান্নার গলায় বলল, মা'র কাছে যাব বাবা।

অলকা কী কাজে এসেছিল। সোনিযাকে কাঁদতে দেখে কাছে এসে বলল, হাতি দেখবে? রান্নাঘরের কৌটোর মধ্যে লুকিযে আছে। চলো চলো দেখবে চলো, মস্ত বড় হাতি।

হাতির কথা শুনে সোনিযার কান্না থেমে গেল। মস্ত বড় একটা হাতির ছোট্ট কৌটোর মধ্যে লুকিয়ে থাকাটা তার কাছে মস্ত এক মজার ব্যাপার মনে হল। বলল, আমি বল দিয়ে হাতিকে মারব।

সোনিয়া বল হাতে করে অলকার সঙ্গে রান্নাঘরে গেল হাতিকে মারতে। প্রণবেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ ঝাড়া হাত-পা থাকা যাবে। অলকার কথা মনে করে সে কৌতুক অনুভব করল। রান্নাঘরে কৌটোর মধ্যে যখন হাতিটাকে দেখাতে পারবে না, তখনকার অবস্থার কথা মনে করে প্রণবেশ হেসে ফেলল। অবশ্য এসব ব্যাপারে মেয়েরা বাড়তি বুদ্ধি ধরে। কিছু একটা আবোল-তাবোল বুঝিয়ে ঠিক হাতিটার অন্তর্ধানের ব্যবস্থা করে ফেলবে।

একটা সিগারেট ধরাল প্রণবেশ। তখনই আবার বিছানার ওপর রাখা খামটা চোখে পড়ল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খামটা খুব বেশিদিন আসেনি। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে মনে

করার চেষ্টা করল এই খামের মধ্যে কোন চিঠিটা এসেছিল। কিন্তু কাছাকাছি কোনও সময়ের মধ্যে কোনও চিঠির কথা মনে পড়ল না।

প্রণবেশ সিগারেট টানতে টানতে জানলার বাইরে তাকাল। পাশের বাড়ির ছাতে টিভির এন্টেনায় বসে একটা কাক ডাকছে। ধূসর কাকটা ডেকেই যাচ্ছে। কর্কশ, একটানা, নিঃসঙ্গ। ডাকতে ডাকতে থেমে গিয়ে কাকটা ঘাড় ফিরিয়ে গম্ভীর মুখে এদিক ওদিক দেখল, তারপর উড়ে গেল।

কাকটা দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের ছাই মেঝেতে পড়ে গেল। পরিস্কার মেঝে। অ্যাশট্রে সামনে না রেখে সুপর্ণার সামনে ঘরে বসে সিগারেট খাওয়া চলবেই না। ঘর এতটুকু নোংরা দেখলে সুপর্ণার ভয়ানক রাগ হয়ে যায়। আয়নার কাচে এতটুকু দাগ নেই, সেলফ সুবিন্যস্ত সাজানো, পরদার কাপড় টানটান, মেঝে ঝকঝকে তকতকে, কোথায়ও একটু ধুলো কিংবা ময়লা থাকা চলবে না। এই নিয়ে প্রণবেশ একদিন ঠাট্টা করেছিল, মানুষ না হয়ে টেবিল চেয়ার হলেই ভাল হত। তা হলে করকমলের একটু স্পর্শ পেয়ে ধন্য হতাম। সুপর্ণা ঘাড় বেঁকিয়ে বলেছিল, তার কিছু বাকি আছে নাকি? দস্যুটা! মাথা নিচু করে ফুঁ দিয়ে ছাইগুলো উড়িয়ে দিল সে। যাক, সুপর্ণা বুঝতে পারবে না। খামটা বিছানার ওপরে পড়ে আছে। ওটা হাতে নিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে গিয়ে কী মনে করে তারিখটা দেখল। সিলমোহরের তারিখটা স্পষ্ট না হলেও বোঝা যায়। তারিখটা দেখে কিন্তু একটু অবাক হল প্রণবেশ। মাত্র এক সপ্তাহ আগে এসেছে চিঠিটা। প্রণবেশ মনে মনে চিন্তা করল। কিন্তু না, এই সময়ের মধ্যে কোনও চিঠির কথা সুপর্ণা তাকে বলেনি। গত এক সপ্তাহের সময়গুলো ভেবে নিল সে। সোম, মঙ্গল, বুধ অফিসের কাজের চাপ ছিল। বোর্ডের মিটিঙের জন্যে কাগজপত্র প্রস্তুত করতে হয়েছে। খুব সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে। সুপর্ণার সঙ্গে ভাল করে কথা বলারই সময় পায়নি। বৃহস্পতিবার কী যেন হয়েছিল? হ্যাঁ, বৃহস্পতিবারে সুপর্ণাকে নিয়ে মার্কেটিঙে বেরিয়েছিল। না, ওদিনও এই চিঠির কোনও কথা সুপর্ণা বলেনি। কালকের কথা তো পরিষ্কার মনে আছে। উঁহুঁ, কোনও চিঠির কথা তো মনে পড়ছে না।

তবে কি এ-চিঠিটার কথা বলতে সুপর্ণা একদম ভুলে গেছে? তাই হবে। ইচ্ছে করে এ-চিঠির কথা তাকে বলেনি, এমন তো আর নয়। সবসময়ই যে সব জিনিস মনে রাখতে হবে তার কোনও মানে নেই। মানুষ তো কত সময় কত জরুরি জিনিস ভুলে যায়, এ তো সামান্য এক চিঠি।

প্রণবেশ জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। নভেম্বরের বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। পাশের ফ্ল্যাটে টেপ বাজছে। বিলিতি বাজনা। বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পা ফেলার শব্দও আসছে কানে। মিসেস ধীলনের কনভেন্টে পড়া মেয়ে রীতা নাচছে। চড়া সুরের চনমনে বাজনা। জ্যাজ মিউজিক। প্রণবেশের কপালে হিজিবিজি রেখা ফুটল। জানলার কাছ থেকে সরে এল। বিছানার ওপর থেকে অন্যমনস্ক ভাবে খামটা তুলে নিল। আসলে ঠিকানায় প্রণবেশের কোনও নাম লেখা হয়নি বলেই এই নিয়ে ভাবনাগুলো যাওয়া আসা করছে। অথচ ভাবার মতো তেমন কিছুই তো নয়। হয়তো আসানসোল থেকে সুপর্ণার বাবা লিখেছেন। ছোট বোনের বিয়ে হয়েছে পাটনায়। সেও লিখতে পারে।

চিঠিটা কোথা থেকে এসেছে দেখতে সিলমোহরটা আবার দেখল। পোস্টঅফিসের কালো সিল ধেবড়ে গেছে। কিছু ভাল করে বোঝা যায় না। দিনের আলো কমে এসেছে। ভাল করে দেখার জন্যে ঘরের আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখল আলো নেই। লোডশেডিং চলছে। মনে মনে বিরক্ত হয়ে জানলার কাছে গিয়ে খামটা দেখল। প্রথম দিকের অক্ষরগুলো কিছুই বোঝার উপায় নেই। শেষের তিনটে অক্ষর কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। যেখান থেকে চিঠিটা এসেছে তার শেষে বাদ কথাটা আছে। বাদ দিয়ে কী কী জায়গা হতে পারে ভাবল। আমেদাবাদ, মোরাদাবাদ, মুর্শিদাবাদ, কত জায়গাই তো আছে। কাছেই হাসনাবাদও আছে। কিন্তু এসব জায়গায় সুপর্ণার কেউ আছে বলে সে জানে না। তবে কে লিখল চিঠি? একেবারে সরাসরি সুপর্ণার নামে?

ধুত! নিজের ওপর বিরক্ত হল প্রণবেশ। যেই লিখুক আর যেখান থেকেই লিখুক এত ভাবছে কেন সে! আসলে এও বুঝি এক খেলা। সোনিয়ার মতো সেও এক মজার খেলা পেয়ে গেছে। একা একা থাকতে থাকতে একজন কখনও দু'জন হয়ে যায়, নিজেই নিজের খেলার সঙ্গী হয়ে যায়।

অথচ ভাবতে না চাইলেও ভাবনাগুলো নিজের থেকেই এসে যায়। মনের ফোকরে ফোকরে কুয়াশার মতো ভাবনাগুলো জমে থাকে। সিগারেট খাওয়া, হাঁটা-চলা, সিনেমা-নাটক দেখার মতো ভাবনা তো আর মনের ইচ্ছাধীন নয়। ওগুলো নিজের থেকেই আসে, কেউ না চাইলেও আসে।

খামটা বিছানার ওপর ছুড়ে রেখে ইংরিজি ম্যাগাজিনটা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাল। সিনেমা, সাহিত্য, খেলা। খেলার পাতায় বিখ্যাত হকি খেলোয়ার ধ্যানচাঁদের ওপর আর্টিকেল। সিলমোহরের নামটা ধানবাদ নয় তো? খামটা আবার ভাল করে দেখল। হ্যাঁ, ধানবাদই তো মনে হচ্ছে। এলাহাবাদ, আমেদাবাদ, মোরাদাবাদের মতো লম্বা বানান নয়। ধানবাদের মতো অল্প অক্ষরের নাম। পুলক, পুলক সেন ধানবাদে থাকে না? ধানবাদ না দুর্গাপুর? না, ধানবাদই।

কী আশ্চর্য, প্রণবেশের অস্বস্তি হচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল না এ-ধরনের কোনও কথা ভাবতে, অথচ ঘুরে ফিরে ভাবনাটা এসেই যাচ্ছে। কিন্তু পুলক সেনই যে চিঠিটা লিখেছে তাই বা সে ভাবছে কেন? আর যদি লিখেই থাকে, তাতেই বা কী? সুপর্ণার খুব পরিচিত কোনও মানুষ যদি চিঠি লিখে যোগাযোগ রাখে, তাতে কোনও নিয়মের ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে না। তবে কি চিঠি নয়, ধানবাদ নয়, পুলক সেনও নয়, আসলে সুপর্ণার কথাই সে অন্যভাবে ভাবছে?

প্রণবেশ ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল। ঘর জুড়ে সুপর্ণার শরীরের গন্ধ ভাসছে। যেন ঘর সাজাতে গিয়ে নিজের মনটাকে সাজিয়ে রেখেছে সুপর্ণা। ওই স্টিলের আলমারি, ফ্রিজ, টেপ রেকর্ডার, দেয়ালের ক্যালেন্ডার, ফুলদানির ফুল, সবকিছুর মধ্যে মিশে আছে সুপর্ণার স্বপ্নের ইচ্ছেগুলো। প্রণবেশের শরীর শিরশির করে উঠল। মনে হল সুপর্ণার সম্বন্ধে সে আড়ি পেতে কিছু শুনছে, অনুচিত কিছু ভাবছে, আর সমস্ত ঘর যেন স্তব্ধ হয়ে দেখছে এক বিশ্বস্ত ভালবাসা কেমন করে আস্তে আস্তে থাবা খুলছে।

পুলককে প্রণবেশ দু'বার দেখেছে। একবার বিয়ের সময় আসানসোলে, আরেকবার কলকাতার এই ফ্ল্যাটেই বিয়ের তিনমাস পরে। বিয়ের সময়ে দেখা পুলককে ভাল করে মনে নেই। অনেক মানুষের মধ্যে ভিড়ের ছবি হয়ে আছে। কিন্তু কলকাতার দেখাটা আলাদা করে ছিল বলেই পরিষ্কার মনে আছে। সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে তখন। আসানসোলে সুপর্ণাদের পাশের বাড়ির ছেলে। সম্পর্কটাও ঘনিষ্ঠ। ফরসা, লম্বা, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, মোটা ফ্রেমের চশমার নীচে নীল চোখের অতলান্ত দৃষ্টি, সব মিলিয়ে দারুণ রোমান্টিক চেহারা। এমন ছেলের সঙ্গে, প্রণবেশ সেই মুহূর্তে ভাবছিল, মেয়েদের একটাই সম্পর্ক হতে পারে, সেটা প্রেমের সম্পর্ক।

যদি পুলকই চিঠিটা লিখে থাকে তবে সেটা সুপর্ণা তাকে জানাল না কেন? ভুলে গেছে, না জানানো যায় না? সেইজন্যেই কি এমন ঠিকানা লেখা যা কিনা প্রণবেশের অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র সুপর্ণার হাতেই পৌঁছোবে? প্রণবেশের মনে হল কে যেন তাকে এক আলোহীন বাতাসহীন বন্ধ ঘরে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সে পাগলের মতো দরজা ধাকাচ্ছে, কিন্তু দরজা খুলছে না।

রান্নাঘর থেকে সোনিয়ার কান্নার শব্দ ভেসে এল। বেশ জোরে জোরেই কাঁদছে মেয়েটা। পশ্চিমি সংগীত ছাপিয়ে সেই কান্না শোনা যাচ্ছে। প্রণবেশ একটু অপেক্ষা করল, কিন্তু কান্না থামল না।

প্রণবেশ গলা তুলে ডাকল, অলকা, অলকা!

সোনিয়াকে কোলে নিয়ে অলকা তাড়াতাড়ি ঘরে এল।

সোনিয়া কাঁদছে কেন? একটু ভুলিয়ে রাখতে পারছ না। অপ্রসন্ন শোনাল প্রণবেশের গলা।

অলকা চুপ করে রইল। প্রণবেশকে এইভাবে কোনওদিন বলতে শোনেনি। মৃদু গলায় বলল, ওর বলটা খেলতে খেলতে নীচে পড়ে গেছে।

সোনিয়ার কান্না একটু থেমে ছিল, বলের কথায় আবার শুরু করল। একদিকে ঝালাপালা বিদেশি বাজনা, অন্যদিকে সোনিয়ার চিলচিৎকার। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল। প্রণবেশ প্রায় ধমক দিয়ে বলল, আঃ, সোনিয়া!

বাবার বকুনি খেয়ে সোনিয়ার কান্না আরও বেড়ে গেল। প্রণবেশ কী করবে বুঝতে পারছিল না। অল্প সময়ের জন্যে হলেও সোনিয়াকে বাইরে থেকে একটু ঘুরিয়ে আনা যায়। সে বেশ বুঝতে পারছিল লাল বলটার জন্যে সোনিয়ার যতটা কান্না, তার চেয়ে বেশি অনেকক্ষণ মাকে ছেড়ে আছে বলে। বাইরে নিয়ে গেলে মেয়েটা হয়তো চুপ করবে, প্রণবেশও কিছু সময়ের জন্যে শান্তি পাবে। বলল, অলকা, তুমি বরং ওকে একটু বাইরেই, এই কাছাকাছি কোথাও, বেশি দূর যেয়ো না কিন্তু, এই সামনেটাই একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।

অলকা সোনিয়াকে নিয়ে বাইরে গেল। তারপর আরও সময় গড়াল। তবু প্রণবেশ চুপ করে বসে রইল। অপরাহ্নের ছায়া নামছে। একটু পরে আরও অন্ধকার হয়ে আসবে। এখনও লোডশেডিং অব্যাহত। কখন আলো আসবে কে জানে। তবু প্রণবেশের ইচ্ছে করল না উঠে গিয়ে মোমবাতি জ্বালাতে। কিছুই ইচ্ছে করছিল না। কোনও বিরাট দুঃখ, শোক কিংবা আশাভঙ্গ নয়, কিছু অস্বস্তি, কিছু বিষণ্ণতা ওই এতাবৎ সুখী মানুষটার অনিবার্য ভাবনার মধ্যে উদাস অপরাহ্নের মতো নিঃশব্দে নেমে আসছিল। সে জানে অলকার সঙ্গে সোনিয়ার বাইরে যাওয়া সুপর্ণার একদম পছন্দ নয়। কোনও কাজের লোকের সঙ্গেই বাইরে পাঠাতে সুপর্ণার সাহস হয় না। খবরের কাগজে এ-ধরনের অনেক অঘটনের কথা শোনা যায়। তবু প্রণবেশের কারও ইচ্ছে অনিচ্ছে নিয়ে এতটুকু ভাবতে ভাল লাগছিল না।

আবার উঠে দাঁড়ায় সে। তার বুকের মধ্যে মনের মধ্যে চেতনার অনেক গভীরে কী যেন ভাঙছে, ভেঙেই চলেছে নিঃশব্দে। এমনি করে সে নিজেকে নিয়ে ভাবেনি কখনও। তার ভাবনাগুলো কখনও এত জটিল হয়ে যায়নি। হয়তো সবই অর্থহীন, তবু ভারী অসহায় মনে হয় নিজেকে। দেয়ালগুলো যেন পিছু হটে অনেক দূরে সরে গিয়ে ঘণ্টার চারপাশে আদিগন্ত সীমানা টেনে দিয়েছে, মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, নিঃসঙ্গ, তার চারদিকে নিঃসীম শূন্যতা। সেই শূন্যতা দুরারোগ্য ব্যধির ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে তার রক্তে রক্তে।

এইমাত্র কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেল কিংবা ঘটতে যাচ্ছিল— এমনিভাবে নীচে রাস্তায় কোনও গাড়ির হঠাৎ ব্রেক কষে থেমে যাবার শব্দ হল। প্রণবেশ চমকে ওঠে। সোনিয়াকে নিয়ে অলকা রাস্তায় গেছে অনেকক্ষণ, এতক্ষণ ফিরে আসা উচিত ছিল। তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে নীচের রাস্তা দেখল। না, কিছু হয়নি। লোকজন যেমন যায় তেমনি আসছে যাচ্ছে। কোথাও অস্বাভাবিকতার চিহ্ন নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে এল সে। দেয়ালঘড়িতে সময় বাজছে। সন্ধে ছ'টা। সুপর্ণার ফিরে আসার সময় হল। হঠাৎ হেসে ফেলল প্রণবেশ। নাটকের অভিনয় করতে করতে এতক্ষণ যেন সে পাট ভুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, উইংসের পাশ থেকে প্রমটারের উত্তেজিত কথা শুনতে পাচ্ছে, এই যে থেমে রইলেন কেন, বলুন বলুন, তোমার মেয়ে কিন্তু একটুও বিরক্ত করেনি সুপর্ণা। তা কেমন দেখলে সিনেমা? নীল শাড়িটা পরে তোমাকে কিন্তু ফ্যানটাস্টিক দেখাচ্ছে।

ঈশ্বরের হাসি

এখানে বৃষ্টি নেই এখন, কোথাও আছে। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। সামনের মুক্তাঞ্চল মাঠ থেকে, চারপাশের ছড়ানো ছিটানো গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির গন্ধ নিয়ে ভেসে আসছে ভেজা বাতাস। সে বাতাস পায়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে মণিময়ের শরীরে। সেচ দপ্তরের ইন্সপেকশন বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িযে তিনি আকাশ দেখলেন। রাত্রির রাজ্য এখন সন্ধের সীমানায় সম্প্রসারিত। আকাশ, মাটি, গাছ— কিছুই আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না। তবু আভাসে মনে হল অনেক দূরে আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘের কালো রং লেগে আছে। সেই রং আরও গভীর হয়ে সমস্ত আকাশটার দখল নিয়ে টুপটাপ বৃষ্টি হযে ঝরে পড়বে অনেক রাতে। এই ইন্সপেকশন বাংলোর চারপাশে নেমে আসব শীতল নির্জনতা। গুমোট গরমের জন্যে কাল রাতে ভাল করে ঘুমাতে পাবেননি। আজ হযতো পারবেন।

এখন একটু ভাল লাগছে। যে নিরুপায রাগটা এতক্ষণ মনেব মধ্যে ফুঁসছিল, তাও কিছুটা কমে এসেছে। তাঁর চোখের সামনে এখন অন্ধকার অস্পষ্ট তিস্তাব্যারেজ প্রকল্পের বহুদূব বিস্তৃত ক্যানেলের অর্ধসমাপ্ত রূপরেখা, খোলা আকাশ, অবাধ হাওয়া, কিছু মেঘ, বৃষ্টির সম্ভাবনা, নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামীণ রাত। একটু আগে পর্যন্ত মাথাটা টিপটিপ করছিল, এখন একটু আরাম লাগছে। আসলে সারাদিন অনেক ঝক্কি পোযাতে হযেছে, অনর্গল কথা বলতে হয়েছে একদল অবুঝ তিরিক্ষে মেজাজের স্থানীয় লোকের সঙ্গে। তাদের বোঝাতে হয়েছে, শুনতে হযেছে অনেক অপ্রিয় অশালীন কথা, আব সেইসঙ্গে গরমে ঘেমে শবীরের ধকলটা মণিময়কে অস্বস্তি এনে দিযেছিল। একটু আগে তার কপালে অপ্রসন্নতার রেখাগুলো জটিল হযে আঁকা ছিল। এখন অবশ্য তিনি অন্য মানুষ। এখন ববং সবকথা ভেবে মনে মনে কৌতুকই অনুভব করছেন। একটু হাসিও ভাসিয়ে রাখলেন ঠোঁটের কোনায। সত্যিই তো পুরো ব্যাপাবটাই তুমুল হাসির। এই হাসির নাটকটা সম্পূর্ণ করতেই কাল বিকেলে তিনি এখানে এসেছেন। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের জন্যে চাষের জমি অধিগ্রহণ করা হযেছে। ক্ষতিপূরণের টাকাও পাচ্ছে জমির মালিক। কিন্তু যাদের জমি নেওয়া হয়েছে তাদের দাবি, ব্যারেজ-অফিসে চাকরি চাই। এক জীবিকার বিকল্প অন্য জীবিকা। অবশ্যি সবকারি নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের একজন চাকবি পাবে ব্যারেজের অফিসে। সময়ে সময়ে, যখন যেমন শূন্যপদ সৃষ্টি হবে। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের দাবি সেই চাকবি এখনই চাই। নইলে খাল কাটার কাজ এখানেই শেষ, এক কোদালও আর এগোবে না। লোকজন জোট বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। খবর পেয়ে মণিমযকে স্পেশাল অফিসার হয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসতে হয়েছে। তাদের আশ্বাস দিয়ে, তাদের হতাশ চোখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্ন এঁকে দিয়ে আপাতত নিবৃত্ত করতে হবে। কথাটা মনে হতেই মণিময়ের গলার কাছে একরাশ হাসি সুড়সুড়ি কেটে উঠল। ধাপ্পাবাজিতে এখনকার মতো তিনি সফল হয়েছেন। সম্ভাব্য চাকরির মধুর স্বপ্ন শ দুয়েক লোককে কিছুদিনের জন্যে আরামে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। ততদিনে খাল কাটার কাজ ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। মনে মনে শাবাশ জানালেন তিনি। কী সুচতুর অভিনয় করেছেন আজ! ওদের দুঃখে কখনও বিগলিত প্রাণ, কটুবাক্যে কখনও স্মিতমুখ, গভীর আশ্বাসে কখনও গম্ভীর। হাসিটা এবার আর চেপে রাখতে পারলেন না। হেসেই ফেললেন। আর হঠাৎ হাসতে পেরে খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন তিনি। কিছুদিন আগে একটা আর্টিকেলে পড়েছেন

যে, হাসি নাকি শরীরের পক্ষে দারুণ স্বাস্থ্যপ্রদ। যতই হাসবেন ততই শরীর টাটকা থাকবে। প্রত্যেকদিন অন্তত ত্রিশ মিনিট অনাবিল হাসতে পারলে খিদে পাবে, রাতে ঘুম হবে, কর্মক্ষমতা বাড়বে। ওষুধে আর ডাক্তারে নিয়মিত যে পয়সাটা যাচ্ছে, তার থেকে রেহাই পাবেন।

মণিময়ের দুটো হাতের দশটা আঙুলের ছ'টাতে ছ'রকমের আংটি। কুপিত গ্রহের মতিগতিকে বশীভূত রাখতে বিভিন্ন সময়ে ওগুলো ধারণ করেছেন। তাঁর জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা অর্ধেক অর্ধেক। চাকরির ক্ষেত্রে কিছুটা সফল হলেও সাংসারিক জীবনে সুখ-শান্তি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আছে। পদমর্যাদা থাকলেও আযের উৎস মুখটা প্রশস্ত নয় বলে স্ত্রী বরাবরই অপ্রসন্ন, ছেলেমেয়েরাও তাঁর ইচ্ছাধীন নয়। মণিময় মনে করেন ভাগ্য কখনও তাঁর সহায়ক হয়নি। শরীর স্বাস্থ্যও কিছুদিন ধবে ভাল যাচ্ছে না। এটা সেটা লেগেই আছে। ভাগ্যকে ধরে রাখতে হলে সুস্থ শরীরেরও দরকার। নানানরকম ওষুধ খাচ্ছেন, কিন্তু ফল পাচ্ছেন না কিছুই। আর্টিকেলটা পড়ার পরই ইদানীং ভাবছেন হাসি আনন্দ আর লঘু পরিবেশই ওষুধের কাজ করবে। আর সেজন্যে, হাসিকে সুলভ করার জন্যে, নিজেকে খোশমেজাজে রাখতে হবে।

আসলে আজও নিজেকে সংযত রাখারই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চাকরির দাবিদার লোকগুলো তাঁর মেজাজের রাশ ঢিলে কবে দিয়েছে। বিশেষত তাদের খেপিযে এনেছে যে নেতাগোছের ব্যক্তিটি, তার চাঁচাছোলা মেজাজি কথাবার্তা হজম করতে হয়েছে দাঁতে দাঁত চেপে।

আরে আপনি তো মশাই পাবলিক সার্ভেন্ট। আপনি ডিসিশন নেবার কে? জনগণের সরকার, জনগণই ডিসিশন নেবে। মাস মাস মোটা টাকা মাইনে নিচ্ছেন, কাজ তো কিছুই হচ্ছে না।

শালা! মণিময নেতার মুখখানা মনে মনে চিবিয়ে নিলেন। মনের রাগটা আবার থাবা খুলছে। পাজামা পাঞ্জাবি, উলুঝুলু চুল, কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ, ফকড়ে গাঁইয়া ছোকরা নেতা হয়েছে। জ্ঞান দিতে এসেছে মণিময মুখার্জিকে। নকল মুখে চুপ করে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারেননি। জমানা বদলে গেছে। মুখ খুললেই বিপদ।

পশ্চিম দিগন্তে দূরে কোথাও চমকে উঠল বিদ্যুৎ। কিছু পরে গুমগুম করে উঠল মেঘ। হাওয়া এখন আরও অবাবিত। বাংলোর পিছনে পূব আকাশে বুঝি কৃষ্ণপক্ষেব চাঁদ উঠেছে। এখান থেকে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছেন। সামনের জমাট অন্ধকার ভাঙছে। ফিকে আলোয় বাইরেটা কিছুটা দৃশ্যমান। দূরে দূরে ছড়িযে ছিটিয়ে আছে গ্রাম। বসত বাড়ির ইতস্তত টিমটিমে আলো। জোনাকির জ্বলা নেভা। ঠিক জঙ্গল না হলেও জঙ্গলেব মতো। চারপাশে অনেক গাছগাছালি। দিনের আলোয দূরের পাহাড়ও দেখা যায়। ফিরে গিয়ে জমিয়ে গল্প করা যাবে। বনভোজনের পক্ষে দারুণ জাযগা। বেড়িযে যাবার বিউটি স্পটও বটে।

মণিময নাক দিয়ে বাতাস টানলেন। কী একটা গন্ধ তখন থেকেই ভেসে আসছে। এখন খেয়াল হল রান্নাঘরে রাতের খানা তৈরি হচ্ছে। তিনি শুনছেন মুবগির মাংস হবে আজ। এসব ব্যবস্থা তাঁর সঙ্গে যে-কর্মচারীটি এসেছে, সেই হরিদাসের। সে এখন বাংলোর চৌকিদারের সঙ্গে রান্নার কাজে ব্যস্ত। এসব ব্যবস্থা হরিদাস কোথা থেকে কবে মণিময় জানেন না, জানতেও চান না। অবশ্য দু'-একটা চাকবির দরখাস্তে তিনি সুপারিশ করেছেন। হরিদাসই সকালে নিরিবিলিতে একফাঁকে করিয়ে নিয়েছে। তা ওকে একটু-আধটু সুবিধে না দিলে এই বিজন গ্রামগঞ্জ জায়গায় এসব ভালমন্দ ভোজনের ব্যবস্থাই বা হবে কেমন করে। বরাবরই তিনি একটু খাইয়ে লোক। মণিময় আবার গন্ধটা চাখলেন। আঃ, দারুণ খোশবু ছেড়েছে। চৌকিদারের রান্নার হাত মনে হয় ভালই। খিদেও পেযেছে। দুপুরে ভাল করে খাওয়াই হয়নি। এখন একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সোজা বিছানায় চলে যাবেন। কাল সকাল সকাল ফিরে যাবেন। জিপের ড্রাইভার মন্মথকে সেইভাবেই বলে দেওয়া হয়েছে।

একটু দূরে এক জায়গায় মনে হল অন্ধকার নডছে। ঠাহর করে তাকিয়ে বুঝলেন অন্ধকার দিয়ে একটা ছায়াশরীর বাংলোর দিকে আসছে। কাছে আসতেই দেখলেন একটা রোগারোগা চেহারার

মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কোনও চেনা লোকের মতো মনে হল না। কে? লোকটার আসার ভঙ্গিটা মণিময়ের ভাল লাগল না। বিদেশ বিভূঁই জায়গা, কার মনে কী আছে কে জানে। চোর গুন্ডা লোকও তো হতে পারে। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ডাকলেন, হরিদাস, হরিদাস।

হরিদাস রান্নাঘর থেকে জবাব দিল, যাচ্ছি স্যার।

বিছানায় বসে মণিময় সিগারেট ধরালেন। দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে রাখার সময় দেখলেন লোকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় একপলক দেখে লোকটার মধ্যে ভয় পাবার মতো কিছু খুঁজে পেলেন না। নিতান্তই নিরাপদ চেহারার ছাব্বিশ-সাতাশের এক সাধারণ যুবক। একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, শুকনো চোখ মুখ, কমজোরি শরীর। দেখে মনে হল অনেক ভেবেচিন্তে, অনেক সাহস সঞ্চয় করে সে এখানে এসেছে।

মণিময় গম্ভীর গলায় বললেন, কে? এখানে কী দরকার?

ছেলেটি মনে হল জিবটা ভিজিয়ে নিল, বলল, আজ্ঞে স্যার, আপনার কাছে একটু এসেছিলাম।

তখনই হরিদাস ঘরে ঢুকল ভিতরের দিকের দরজা দিয়ে। মণিময় বললেন, দ্যাখো তো, কী বলছে?

হরিদাস ছেলেটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, এই যে, কী চাই আপনার?

ছেলেটি কী চাইছে, মণিময় অবশ্য আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তার অপরাধীর মতো হাবভাব, হাতে ধরা গোল করে পাকানো কাগজের পাতাই দুঁদে সরকারি অফিসারের অভিজ্ঞতার চোখকে বলে দিচ্ছিল যে সে দরখাস্ত হাতে চাকরির জন্যে আবেদন-নিবেদন জানাতে এসেছে। আর তার মুখ থেকে ঠিক সেই কথাই শুনে হরিদাস তখনই তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মণিময়ের চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠেছে তখন। হাত তুলে হরিদাসকে থামতে বললেন। একটা দুর্দান্ত লোভকে তিনি চোয়ালের মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরেছেন তখন। দুপুরে চাকরির দাবি জানিয়ে একদল মানুষ তাঁকে অনেক খারাপ কথা শুনিয়েছে, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁকে অপমানিত করেছে, এ ছেলেটি তো সেই স্থানীয় অধিবাসীদেরই একজন। শোধ তুলবেন এর ওপর দিয়েই। তিনি খেলার অনিশ্চয়তাকে বিশ্বাস করেন এবং জানেন সুবিধেজনক অবস্থাটা এখন তাঁর দিকেই চলে এসেছে। ছেলেটিকে দেখেই বোঝা যায় তার খাওয়া পরা ভাল করে জোটে না। ছেলেটিকে নিয়ে প্রচণ্ড মজা করলে খানিকটা হেসে নেবার সুযোগ পেয়ে যাবেন। আর্টিকেলে বলেছে নিয়মিত হাসাটা স্বাস্থ্যের জন্যে একান্তই দরকার। মনের ঝালও মেটাবেন, হেসেও নেবেন— এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন।

ছেলেটিকে তিনি ভেতরে আসতে বললেন। হরিদাস চলে যাচ্ছিল, তাকেও থামতে বললেন। একটু সময় ভুরু কুঁচকে তিনি ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে কল্পিত কৌতুকে তাঁর চোখের তারাদুটো চকচক করে উঠল। বললেন, খাবার তৈরি হয়েছে হরিদাস?

হরিদাস বলল, এই তো স্যার, গিয়েই ভাতটা নামাব।

মণিময় ছেলেটির দিকে চোখ রেখে বললেন, ভাত হয়ে গেলে নিয়ে আসবে। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। খুব টায়ার্ড ফিল করছি।

ঠিক আছে। হরিদাস রান্নাঘরে চলে গেল।

মণিময় আরাম করে বসলেন। ছেলেটির মুখ দুপুরবেলায় যারা এসেছিল তাদের মধ্যে দেখেছেন কিনা মনে করার চেষ্টা করলেন। অবিকল মনে করতে না পারলেও মনে হল দেখেছেন। আর এ থাকুক বা না থাকুক, এর মতো অনেকে তো ছিল। এর প্রতিনিধিত্ব করেছে অন্য কেউ। তখন তিনি আক্রমণ ঠেকিয়েছিলেন, এখন আক্রমণ করবেন। খেলার বল এখন তাঁর কোর্টে। তারিয়ে তারিয়ে এখন তিনি পালটা মার দেবেন। শহর থেকে অনেক দূরে এই নির্জন গ্রামাঞ্চলে ভিন্নতর পরিবেশে তার রণকৌশলও হবে অভিনব। দুপুরবেলায় তো আপনাকে দেখেছিলাম। মণিময় আন্দাজে ঢিল ছুড়লেন।

ঢিলটি ছেলেটির গায়ে লাগল কিনা বোঝা গেল না। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না সে।

যা বলবার, তখনই তো বলে দিয়েছি আপনাদের লিডারকে। আমি হলাম পাবলিক সার্ভেন্ট, জনসাধারণের ভৃত্য, আমি ডিসিশন নেবার কে বলুন? মণিময়ের ঠোঁটের দু'প্রান্তে শানিত হল ধূর্ত হাসি।

ছেলেটি এবারও চুপ করে রইল।

মণিময় ছেলেটির আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিলেন।

কী নাম আপনার?

বয়েস এবং অবস্থার রকমফেরে তিনি অনায়াসেই ছেলেটিকে তুমি বলে সম্বোধন করতে পারতেন। ছেলেটি এখন নিঃসন্দেহে দুর্বলপক্ষ এবং এই পরিস্থিতিগত সুযোগটা তিনি অনায়াসেই নিতে পারতেন। কিন্তু তাতে খেলার আসল মজাটা থাকত না। তাকে অহেতুক মর্যাদা দিয়ে তিনি মজার খেলাটাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে নিয়ে যেতে চান।

আজ্ঞে স্যার, আমার নাম শ্রীভূপতিরঞ্জন সরকার।

এখানেই থাকেন?

হ্যাঁ, স্যার। লোকাল লোক। বাবার নাম ঈশ্বর বিভূতিরঞ্জন সরকার। বয়েস পঁচিশ বছর তিন মাস।

সেকী, বাবার বয়েস মাত্র পঁচিশ বছর? তা হলে আপনার কত? মণিময় সকৌতুকে বললেন।

ভূপতি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। বুঝতে পারল মণিময় রসিকতা করছেন। একটু সময় চুপ করে থেকে সে নিরুত্তাপ গলায় বলল, ওটা আমার বয়েস, বাবার নয়। আমার বাবার বয়েস এখন সত্তর-বাহাত্তর হত— গত বছর মারা গেছেন।

মণিময় হাসিমুখ করার চেষ্টা করে বললেন, তাই বলুন। আমি ভাবলাম— হা-হা— আপনার বাবার বয়েস— হা হা।

ভূপতি হাতের কাগজটা মণিময়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এর মধ্যে সব লেখা আছে।

মজাটা ভাল করে জমল না। ছেলেটিকে যেমন ভেবেছিলেন, এখন ঠিক তেমনটি মনে হচ্ছে না। ছেলেটির এভাবে এসময় এখানে আসা, তার বিষণ্ণ মুখ, শূন্য দৃষ্টি, শুকনো চেহারা মণিময়কে ভাবিয়ে ছিল যে চাকরি পাওয়ার জরুরি দরকারটা তাকে কোণঠাসা করে রেখেছে এবং সেই কারণেই মণিময়ের যে-কোনও সকৌতুক আচরণই জো-হুকুম মেনে নেবে। কিন্তু এখন ছেলেটির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তাকে অত সহজে কবজা করা যাবে না।

দরখাস্তটিতে তিনি চোখ বোলালেন। লো ভোল্টেজের অপ্রচুর আলোয় ভাল করে লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য পড়ে দেখবার মতো নতুন কীই বা থাকবে এ-ধরনের চাকরির আবেদনে। সেই একই মামুলি ভাষা, সেই একই ধরাবাঁধা ফিরিস্তি। জমি অধিগ্রহণের জায়গাটা দেখলেন। সেখানেও কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নেই। জমি নেওয়া হয়েছে মোট এক একর। সেই এক একর জমির মোট দশজন অংশীদারের একজন ছেলেটি। তার মানে ছেলেটি মাত্র দশ ডেসিমেল জমির মালিক। খুবই সামান্য জমি, সেটা নিয়ে কাউকে নতুন কোনও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না। যা হোক কিছু একটা বলেটলে ছেলেটিকে তখনই চলে যেতে বলতে কোনওই অসুবিধে ছিল না, হাসি-মশকরাও তেমন জমাতে পারছেন না, কিন্তু মণিময় আরও একটু সময় নিতে চাইলেন। টোপ-গেলা মাছটা আরও একটু খেলুক। খেলাতে খেলাতে তাকে তীরে নিয়ে আসা যাবে। পারিবারিক জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁর হাসির অবকাশ কম। নেই বললেই চলে। বাড়িতে স্ত্রীর বিমর্ষ মুখ, স্বেচ্ছাচারী ছেলেমেয়ে। অফিসে একদল মারকুটে কর্মচারী। ইচ্ছে করে যে হাসবেন, তারও উপায় নেই। এখানে চেষ্টাচরিত্র করে কিছুটা হেসে নিতে পারলে সেটা নিশ্চয়ই তাঁর শরীরের উপকারে আসবে। সেই আর্টিকেলে বলা হয়েছে, যখনই সুযোগ পাবেন হেসে নেবেন। হাসি শরীরকে সুস্থ রাখবে, ফুসফুসকে তরতাজা রাখবে। শিরা-উপশিরার বহমান রক্তকে নির্মল

রাখবে। হাসি মনকে শিশুর মতো বিশুদ্ধ রাখবে। কাজেই, মণিময় ঠিক করলেন, তিনি হাসবেন।

তা ছাড়া অন্য একটা দিকও আছে। এখনও তিনি মনের আক্রোশকে পোষ মানাতে পারেননি। এই ভূপতির মতোই কতকগুলো অমার্জিত চাষাভুষো লোক তাঁকে বিপাকে পেয়ে অনেক অকথ্য কথা শুনিয়ে দিয়েছে। দলের মধ্যে নিশ্চয়ই ভূপতিও ছিল। এখন ভালমানুষ সেজে চাকরির উমেদারি করতে এসেছে। না, ভূপতি এখন থাকুক। খেলাটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখা যাক না কোথায় পৌঁছায়।

দরখাস্তটা টেবিলে রেখে মণিময় বললেন, কিন্তু আপনার ভাগের জমি তো খুবই কম। মাত্র দশ ডেসিমেল।

ভূপতি বলল, জমি কম বলেই আমি বেশি গরিব স্যার।

মণিময় হাসলেন, বেশি গরিব বলে চাকরির দাবিটা বেশি হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু।

কিন্তু স্যার, আমার সবটুকু জমিই তো চলে গেছে। আমি এখন কী করব?

কেন, কমপেনসেশন তো পাবেন।

ভূপতি দু'পাশে মাথা নাড়ে, পাচ্ছি না।

কেন?

দালালের কাছে আগেই স্ট্যাম্পে সই করে অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়েছি।

ভালই করেছেন। শুনুন, গভর্নমেন্টের নিয়ম হচ্ছে প্রজেক্টের জন্যে যার যত বেশি জমি রিকুইজিশন করা হবে, তাকে সেইরকম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বলে ধরা হবে এবং চাকরিব ক্লেইমটাও সেই কারণেই তার ক্ষেত্রেই বেশি বলে ভাবা হবে। এখানে গরিব বড়লোকের কোনও প্রশ্ন নেই। লেখাপড়া কদ্দূর করেছেন?

ক্লাস টেনে উঠেছিলাম।

ভূপতি হাসলেন, মানে রেড আপটু ক্লাস টেন। কিন্তু মিস্টার সরকার, এই বিদ্যের জাহাজ নিয়ে চাকরির সমুদ্র পার হওয়া খুবই মুশকিল।

ভূপতি বলতে গেল, কিন্তু স্যার—

মণিময় মাথা নাড়লেন, উঁহু, কোনওভাবেই চাকরিটা ভীষণভাবে দাবি করার মতো কিংবা রেকমন্ড করার মতো কিছুই দেখছি না।

ভূপতি হঠাৎ ভেঙে পড়ল। বলল, কিন্তু স্যার, সত্যিই আমি ভীষণ গরিব। বাবা মারা যাবার সময় ওই এক একর জমি ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। তাও ভাইবোন সকলের সমান অংশ। বিশ্বাস করুন. দুপুরে একবাটি মুড়ি ছাডা সারাদিন আর কিছুই খাইনি।

রান্নাঘর থেকে মশলাদার রান্নার সুগন্ধ ভেসে আসছে। মণিময়ের জিভ ভিজে উঠল। আবেশে চোখ বন্ধ করে একটু সময় সেই ভাসমান গন্ধের আঘ্রাণ নিলেন। একটু পরিহাস-তরল পরিবেশে খাওয়াদাওয়াটা সেরে নিলে জমবে ভাল। ভোজনবিলাসী লোক তিনি, একটু আনন্দ ফুর্তির মধ্যে থাকলে খাওয়াটাও ভাল হবে, হজমও সহজ হবে। সেই আর্টিকেলে এ-ধরনের কথাও লেখা আছে। হ্যাঁ, মনে মনে একটু আমোদ করার ইচ্ছেটা ডালপালা মেলতে চাইছে এখন। ভূপতির এই ভেঙে-পড়া ভাবটা তাঁকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে মণিময়ের মনে হল ভূপতি এখন শুধু ভূপতি নয়। তিনি চোখ বুজে দেখছিলেন তাঁর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে কখনও তাঁর স্ত্রী, পুত্রকন্যা, কর্মক্ষেত্রের পরিচিতজনেরা। বকেয়া হিসেবটা আজ একটু মিটিয়ে নিতে পারবেন। হিংস্র আক্রোশে তিনি হাঁক পাড়লেন, হরিদাস, একটু হাত চালিয়ে।

একটু পরেই হরিদাস আর চৌকিদার খাবার নিয়ে এল। টেবিল পরিষ্কার করে রাখা হল রাতের আহার। মণিময় হাত ধুয়ে খেতে বসলেন। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত কালো নুনিয়া চালের সুগন্ধী ভাত, মুগের ডাল, পটলভাজা, তরকারি, একটা মস্ত বাটিতে ধূমায়িত মুরগির মাংস। রান্নার চেহারা দেখে

খুশিমুখ করলেন মণিময়। ভূপতি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বসতে কিংবা যেতে বলা হয়নি। সে একপাশে একটু সরে দাঁড়িয়েছে শুধু। তার দিকে তাকিয়ে একটা পটলভাজায় কামড় দিয়ে মণিময় বললেন, খালি পেটে থাকাটা কিন্তু স্টমাকের পক্ষে খুব খারাপ।

ভূপতির চোখদুটো জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। মণিময় তখন ভাতের থালায় হামলে পড়েছেন। এক এক গ্রাসে নিঃশেষ করে দিচ্ছেন ভাত, তরকারি, ভাজা। জানলার দিকে তাকাবার ছলে আড়চোখে একবার দেখেও নিলেন সারাদিন ধরে আধপেটা থাকলে একটা মানুষের মুখ কেমন দেখায় এখন। যতটুকু দেখলেন তাতেই তাঁর শরীর ফুরফুরে হয়ে উঠল। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন একটা ঘোড়ার লম্বা মুখ দেখে লঘু হাসি স্বচ্ছন্দ হচ্ছে তাঁর মনে।

তা হলে ভালমন্দ খাওয়া-পরার খুব অভাব চলছে আপনার?

মণিময় ভাতে ডাল ঢালতে ঢালতে বললেন।

বিশ্বাস করুন স্যার—

এবং সেজন্যে চাকরিটার খুবই দরকার, কী বলেন?

আপনি স্যার, একটু সুপারিশ করলেই স্যার, পিয়োন টিয়োন যা হোক একটা চাকরি পেয়ে যেতে পারি স্যার। নিজের জন্যে ভাবি না। নিজের জন্যে হলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। কিন্তু— ভূপতি কথা শেষ করে না। কিছু ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায় সে। ভাত মুখে হাসা যায় না। হাসির মতো মুখ করলেন মণিময়। বললেন, বিয়ে করেছেন?

ভূপতি একটু চুপ করে থেকে বলল, করেছি।

কতদিন হল? হাত বাড়িয়ে মাংসের বাটিটা টানলেন মণিময়। ডান হাতের পাঁচটা আঙুলই দেখা গেল তখন। তিনটে আঙুলের তিনটে রত্নখচিত আংটি জ্বলজ্বল করে উঠল লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয়।

ভূপতির যেন উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে নেই। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল সে। শেষপর্যন্ত যেন নিজের সঙ্গে শেষবারের মতো আপস করে নিয়ে বলল, বছরখানেক। সেইজন্যেই মুশকিলে পড়ে গেছি।

তা তো পড়বেনই। শঙ্করাকে যে শুতে ডেকে এনেছেন।

ভূপতি চুপ করে রইল।

খেতে খেতে মণিময় মিটিমিটি হাসছিলেন। একটু শব্দ করে হাসতে পারলে ভালই হত। কিন্তু খেতে খেতে বেশি হাসা যায় না। একটা মুরগির ঠ্যাং দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কুতকুতে চোখে তাকালেন ভূপতির দিকে। মনে হল ভূপতির দুটো হিংস্র চোখ ভাতের থালা থেকে সরে গেল। অমনি দারুণ মজা পেয়ে গেলেন তিনি। মাংসের বাটি থেকে কিছুটা ঝোল শব্দ করে টেনে নিয়ে বললেন, তারও শাড়ি কাপড় আছে, পাউডার স্নো আছে। মানে আপনার স্ত্রীর কথা বলছি।

ভূপতির মুখে এখন পরিষ্কার বিরক্তি। একটু হতাশার ভাবও। সে হয়তো এখুনি চলে যাবে। কিন্তু মণিময়ের মনে একরাশ হাসি সবে তৈরি হয়েছে। ছেলেটিকে আরও খোঁচাতে হলে তাকে একটা শক্ত খাঁচার মধ্যে পুরে ফেলা দরকার।

শুনুন, এমনিতে আপনার চাকরির কোনও স্কোপ দেখা যাচ্ছে না। কিছু করতে হলে অন্যকে সুপারসিট করতে হয়। দেখা যাক, কোনও রাস্তা বের করা যায় কিনা। একটা লম্বা হাড়ের মধ্যে থেকে সুস্বাদু মশলাটুকু জুত করে টেনে নিতে নিতে মণিময় বললেন।

সবই আপনাব হাত স্যার। এতক্ষণে ভূপতিকে বিভ্রান্ত মনে হল।

আমার হাত কী বলছেন? হাত হচ্ছে এই মাংস যে রেঁধেছে, সেই চৌকিদারের! সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো হাত মশাই। ফ্যানটাস্টিক রেঁধেছে। মনে হচ্ছে গ্রান্ড হোটেলে বসে মুর্গমুসল্লম খাচ্ছি। খুব মজার কথা বানিয়ে ফেলেছেন, এমনিভাবে হা হা করে হেসে উঠলেন মণিময়।

ভূপতি যেন কষ্ট করে নিজেকে শাসন করে নিয়ে বলল, আপনি একটু দয়া করলেই আমি বেঁচে যেতে পারি।

আমার দয়া? আমি দয়া করলেই আপনি বেঁচে যাবেন? হা হা হা, বলেন কী মশাই, স্রেফ আমার দয়া? হা হা হা। একটা অর্ধেক চিবানো মাংসের টুকরো মুখে রেখেই মণিময় তুমুল হাসিতে অনর্গল হলেন, তা হলে আপনার বেঁচে থাকা কিংবা না-থাকা আমার দয়ারই ওপর নির্ভর করছে, কী বলেন? হা হা হা। মুক্তধারায় হাসির বন্যা আসছে। আহ, কী আরাম। সমস্ত শরীর যেন ডানা মেলতে চাইছে। অবিরাম হাসি মানেই অফুরান স্বাস্থ্য, অফুরন্ত জীবন।— তার মানে আপনার কাছে আমিই হচ্ছি অলমাইটি গড, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর? কেবল আমি দয়া করলেই আপনি বেঁচে থাকবেন। হা হা হা, হো হো হো, আঁক— হঠাৎই থেমে গেলেন মণিময়। বাষ্পীয় হাসি একটা জমাট বস্তুপিণ্ড হয়ে আটকে গেছে তাঁর গলায়। নিশ্বাস নিতে পারছেন না। তাঁর মুখে ছড়িয়ে গেল লাল রক্ত, চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল, নিরালম্ব শূন্যতায় ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরে রাখতে চাইলেন পৃথিবীর বাতাস। কিন্তু পারলেন না। ছ'আঙুলের ছ'টা রত্ন তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। ছটফট করতে করতে তিনি চেয়ার থেকে কাত হয়ে পড়ে গেলেন নীচে। তাঁর শ্বাসনালীতে আটকে রইল এক টুকরো মাংসের হাড়।

সমস্ত ঘটনা সিনেমাব ছবির মতো ঘটে গেল ভূপতির চোখের সামনে। দারুণ অবাক হয়ে সে তাকিয়ে ছিল স্পেশাল অফিসার মণিময় মুখার্জির দিকে। এইমাত্র নিস্পন্দ হয়ে গেছে শরীরটা। চৌকিদারের সঙ্গে ড্রাইভার মন্মথ ছুটে গেছে ডাক্তার আর লোকজন ডাকতে। হরিদাস হতবুদ্ধির মতো ঘরবার করছে। মুখার্জি সাহেবের প্রাণহীন দেহটা এখন ঘরের মেঝেতে শায়িত অবস্থায়। গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারার মানুষটা হাঁ মুখ করে ঘরের সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের মণি স্থির, হাতদুটো দু'পাশে ছড়ানো। হাতের মোটা মোটা আঙুলের ছ'রকমের আংটির ছ'টা মুখই মেঝেতে গোঁজা। এই মুহূর্তে মণিময়কে মেথর বস্তির মদ্দা শুয়োরের মতো দেখাচ্ছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ ভীষণ হাসি পেয়ে গেল ভূপতির। এই বেঢপ হোঁতকা চেহারার স্থূলকায় লোকটার কাছেই সে জীবন ভিক্ষা করতে এসেছিল? আবছা আলোয় রেস্ট হাউসের সাদা দেয়ালে এর ছায়াই অতি মানবের মতো দেখাচ্ছিল একটু আগে?

হাসি চাপতে কষ্ট হচ্ছিল ভূপতির। মুখে একটা হাত রেখে অবাধ্য হাসিটা কোনওমতে চাপতে চাপতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে নিজেকে আর সামলাতে পারল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হি হি করে হেসে ফেলল সে। হাসতে হাসতে তার রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে রক্ত লাল হয়ে গেল, তবু ভয়ানক মজায় সে হি হি করে হেসেই চলল।

হরিদাস পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এল। ভূপতিকে ওভাবে হাসতে দেখে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। ভূপতি কথা বলবে কী, হাসতে হাসতে কোনওরকমে ঘরের ভেতরে, যেখানে মণিময়ের স্থূল শরীরটা স্থির হয়ে পড়ে আছে, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

কিন্তু বেশিক্ষণ হাসতে পারল না ভূপতিও। হঠাৎই শরীরে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। শূন্য জঠর থেকে উঠে আসতে চাইল আগুনে উদ্‌গার। মুখে হাত দিয়ে বসে পড়ল সে।

শেষ হাসিটা ঈশ্বরই হাসলেন।

মাননীয় জনগণ

শেষ রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন অবনী। তিনি একা একা হেঁটে যাচ্ছেন এক ধূসর-রুক্ষ জনহীন পথ দিয়ে। হঠাৎ নেমে এল তুমুল বৃষ্টি। তাঁর চারপাশের দৃশ্যপট মুছে দিল বৃষ্টির ঘন কুয়াশা। কিন্তু এ কী! এত অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু ভিজছেন না কেন? বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে তিনি আরও বৃষ্টির দিকে দৌড়োলেন। দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দেখলেন সামনেই এক অন্ধকার খাদের অতলান্ত নিষেধ।

তখনই ঘুম ভেঙে গেল অবনীর। নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি। ভোর হয়েছে। বুকটা এখনও ধড়াস ধড়াস করছে। অদ্ভুত স্বপ্ন।

স্ত্রীর বিছানার দিকে তাকালেন। তৃপ্তি বিছানায় নেই। এত সকালে কোথায় গেল? বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল কোনও হালকা গাড়ি। কী যেন, কী যেন, ভাবতেই মনে পড়ে গেল আজ ভোট গণনার দিন। যে-যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছিল গত দেড় মাস ধরে, সম্পূর্ণ হয়েছে গত পরশু, আজ তার ফলাফল। আজ নির্বাচকমণ্ডলীর পছন্দের আঙ্কিক হিসেব।

স্বপ্নটা ফের ফিরে এল মনে। উদ্বেগ উত্তেজনায় গত রাতে তিনি ভাল করে ঘুমোতে পারেননি। আততায়ী-ভয় হানা দিয়েছিল মস্তিষ্কের কোটরে কোটরে। দুশ্চিন্তা ডালপালা ছড়িয়েছে— যদি হেরে যান? শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তখনই স্বপ্নটা দেখেছিলেন। ওরকম স্বপ্ন দেখলেন কেন?

ডিসেম্বরের আলসে-ভোরের লেপের উষ্ণ আরাম কেড়ে নিল ফোনের ধাতব শব্দ। তাঁর ইলেকশন এজেন্ট ফুলু দত্ত ফোন করছে, গুড মর্নিং অবনীদা।

দিনের প্রথম উচ্চারিত শব্দ শুনে অবনী জানলার কাচের দিকে চোখ ফেরালেন। ঘষা-কাচে মুখ চেপে আছে প্রসন্ন সকালের রক্তিম আলো। বললেন, গুডমর্নিং— সুপ্রভাত ফুলু।

ফুলু দত্ত বললেন, আজ তো কাউন্টিং। আমি রাত থাকতেই ক্যাম্পে চলে এসেছি। কাউন্টিং-এজেন্টরাও অনেকে এসে গেছে। টাকাপয়সার ব্যাপার আছে। আপনি কখন আসছেন?

ভাল লাগার পেছনে আসছে টাকাপয়সার জটিল পাটিগণিত। পার্টি ফান্ডের টাকা ইতিমধ্যে প্রায় শেষ, এখন অবনীর পকেটের টাকা যাবে। আজকের দিনটাও কি একটু দায়মুক্ত থাকতে পারবেন না? বললেন, ফুলু, আজ এসব তুমিই মিটিয়ে নাও, পরে আমি দেখছি। বুঝতেই পারছ আজ—

ওক্কে অবনীদা। কয়েকটা বুথ সম্বন্ধে একটু চিন্তা থাকলেও সাত-আট হাজারের মার্জিন থাকবে— রেস্ট অ্যাশিয়োর্ড। রাতেও আপনাকে শুভরাত্রি জানাব। ছাড়লাম।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে অবনী টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিলেন। একটা কিং সাইজ দামি সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। যে-দুশ্চিন্তা তাঁকে কাল সারারাত হামলা করেছে, সেটা আবার ফিরে আসছে। মাত্র সাত-আট হাজারের মার্জিন? তাও কয়েকটা বুথের অনিশ্চয়তা মাথায় নিয়ে? উঁহু, সংখ্যাটা খুব নিরাপদ দূরত্বে নেই। নিশ্চিন্ত থাকার মতো নয়।

তৃপ্তি ঘরে ঢুকলেন। লালপাড় গরদের শাড়ি, হাতে শালপাতার ঠোঙায় ফুল বেলপাতা। বোঝা গেল প্রতিবার যেমন যান এবারও খুব ভোরে কালীবাড়িতে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। প্রসাদী ফুল অবনীর মাথায় ছুঁইয়ে আশ্বাসের গলায় বললেন, মনে তো হয় জিতে যাবে।

শুধু মনে হয়? ওভার শিয়োর নয়? দেখা যাক। আর তো কয়েক ঘণ্টার মামলা! অবনী ঘড়ি

দেখলেন। হাতে সময় খুব কম। সবকিছু চটপট সেরে নিয়ে কাউন্টিং ক্যাম্পে যেতে হবে। নিজের মতো করে একটু ভাববেন, তার সময় কই?

স্নান করে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে যখন তিনি তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসলেন, তখন সকালের রোদ্দুর চনমন করছে চারপাশে। এখন তিনি আলাদা করে রাখা কমদামি সাধারণের পোশাক পরেছেন, পায়ে কমদামি চপ্পল, দামি ব্র্যান্ডের বদলে কম দামের সিগারেট খাবেন। জনসাধারণের চোখ-মুখ-চেহারা-আচার-আচরণ নকল করে, মিশে যাবেন তাদের মধ্যে। বিলাসী গৃহসুখ থেকে যখন তিনি বাইরে আসেন, তখন তিনি জনগণের নেতা। তিনি তাদের জীবনের শরিক হন, সামিল থাকেন তাদের অধিকার অর্জনের মিছিলে। জনতা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেয়, তাঁকে জয়যুক্ত দেখতে চায়।

গাড়ির জানলার বাইরে প্রাপ্তবয়স্ক সকাল, লোকজন, সাইকেল, সাইকেল রিকশা, দেয়ালে দেযালে সচিত্র নির্বাচনী প্রচার 'মেহনতি মানুষের সংগ্রামী সাথী কমরেড অবনীকান্ত সান্যালকে ভোট দিন।' অবনীর মুখ ঝুলে গেল। এখন দেয়ালের লেখায় প্রদীপ রায়ের নাম দেখতে পাচ্ছেন। যুব নেতা প্রদীপ রায়কে জিতিয়ে দেবার সপক্ষে যেমন উদ্দীপক স্লোগান লেখা হয়েছে, তেমনি পরিসংখ্যান দিয়ে বিগত বছরগুলিতে সরকার পক্ষের চূড়ান্ত ব্যর্থতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রদীপ বায় বিজয়ী হলে বামপন্থী সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে যুবশক্তির লাগাতার প্রতিবাদই নাকি জযযুক্ত হবে।

অবনী গাড়ির জানলার কাচ তুলে দিলেন। সকালের ঠান্ডা হাওয়ায় শীত লাগছে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে নির্মল। নির্মল শুধু পার্টির ফুলটাইম ওযার্কারই নয়, অবনীর অঘোষিত দেহরক্ষীও বটে। যে-কোনও সশস্ত্র আক্রমণের মোকাবিলার জন্যে সবসময়ই সে প্রস্তুত। নির্মল পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে, অবনী স্বস্তিতে বসে থাকতে পারছিলেন না। গত দেড মাসের এত তুমুল পরিশ্রম, গ্রামে গ্রামে মিটিং করা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, প্রশাসনিক সুবিধে কাজে লাগিয়ে রাতের অন্ধকারে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীব মাতব্বরদের হাত করা, সবই ব্যর্থ হবে? আরও একটু শক্ত মাটি পায়ের নীচে থাকলে নিশ্চিন্ত হতে পাবতেন। আগের কৌশলগুলোর ধার এখন নেই। বেশ কিছু ভোট তাই থেকে যাবে হিসেবের বাইরে। গতবার সাড়ে বারো হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছিলেন। হিসেবটা ছিল পনেরো হাজারের। এবারের হিসেব মাত্র সাত-আট হাজারের। তা ছাড়া গতবারের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায-বৃদ্ধ নেতার বদলে এবার এসেছেন তরুণ নেতা। অন্য চেহারা, অন্য গলা, অন্য মেজাজ। যদিও অবনী জানেন, এতদসত্ত্বেও তিনিই জিতবেন। তাঁর কমিটেড ভোট আছে, অফিসে-কারখানায় ইউনিযনের ভোট ব্যাঙ্ক আছে, মজবুত সংগঠনের ভোট আছে।

সবচেয়ে বড কথা, তাঁর দল শাসন ক্ষমতায় আছে বলে কিছু দায়বদ্ধ ভোটও আছে। শহর-সংলগ্ন পঞ্চায়েতগুলোর ব্লক ভোটও তাঁরই অনুকূলে আসবে। এতগুলো বাধা টপকে জিততে পারবেন প্রদীপ রায? প্রদীপ রায এবার বামবিরোধী হাওযার বাড়তি সুযোগ পাবেন ঠিকই, কিন্তু জিততে পারবেন না। ভোট তো দেবে ভোটারলিস্টের ভোটাররা, জনসভার মানুষের সংখ্যা নয়। জ্বালাময়ী বক্তৃতায় চমৎকৃত হযে যে হাততালি দেয়, পোলিং বুথে সে-ই অন্য মানুষ। তা ছাড়া গত পাঁচ বছর ধরে তিনি এই কেন্দ্রের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। এ-শহরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন। বেকার ছেলেদের চাকরি, শহরের উপকণ্ঠে শিল্প কারখানা স্থাপন, এলেমদার লোককে লাইসেন্স-পারমিট পাইযে দেওয়া, পঞ্চায়েতগুলোর রাস্তাঘাট— এসব কি ভোটারদের মনের দখল নেয়নি?

কাউন্টিং হলের সামনে যখন তাঁর গাড়ি থামল, তখন প্রথম রাউন্ড গণনা চলছে। বাইরে বিশাল মাঠে লোকের ভিড় বাডছে। আরও তিনজন আছে প্রার্থী অবশ্য, কিন্তু যেহেতু পোলারাইজেশনের বিভাজন-রেখা দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের মধ্যে সেজন্যে বাকি তিনজনকেই খরচের খাতায় রাখা

হয়েছে। এর মধ্যে প্রদীপ রায়ের শিবির থেকে উল্লাসের শব্দ ভেসে এল, কোনও চোরাপথে খবর পাচার হয়েছে বুঝি।

অবনীর ক্যাম্পেও তখন বেশ ভিড়। এ-ক্যাম্পে উত্তেজনা থাকলেও উল্লাস নেই। সবাই চোয়াল শক্ত করে উত্তেজনা চেপে আছে। অবনী একটা খালি চেয়ার টেনে বসলেন, ইয়ে, কেমন বুঝছ ফুলু?

ফুলু দত্ত বললেন, যা রিপোর্ট পাচ্ছি, মনে হয় ইলেকশন ট্রেন্ডটা ওরা পুরো কাজে লাগিয়েছে। টাউনের বেশ কয়েকটা সেক্টর ট্রাবল দেবে মনে হয়। কনশাস সিটিজেন, অথচ ইমোশন্যাল ভোট হচ্ছে। স্ট্রেঞ্জ!

অবনী বললেন, মিডলক্লাসরা চিরদিন গণআন্দোলনকে বিট্রে করে এসেছে, এতে স্ট্রেঞ্জ হবার কিচ্ছু নেই ফুলু।

ফুলু দত্ত বললেন, লোডশেডিং আর দু'-চারটে লেবার-ট্রাবলই শালার মেইন ইসু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য স্টেটগুলো যেন স্বর্গরাজ্য। তবে মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে ফিফটি-ফিফটি হলেও মফস্‌সল আর লেবার বেল্টে আমরা সুইপ করে বেরিয়ে যাব।

অবনী তখন ভাবছিলেন। প্রথম রাউন্ড গণনাটা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হলেই বুক থেকে শীতল ছায়াটা সরে যাবে। তারপর হিসেবটা সরল অঙ্কের নিয়মে করতে পারবেন।

কিছুক্ষণ পরেই হলের বাইরের অ্যামপ্লিফিয়ারটা সরব হল। সরকারিভাবে ভোটগণনার প্রথম রাউন্ডের ফলাফল জানানো হচ্ছে। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হয়নি। দ্বিগুণ ভোটে এগিয়ে আছেন প্রদীপ রায়। তুমুল উল্লাসে বিপক্ষের শিবির ফেটে পড়ল।

কে যেন বলল, এ কি ভোট হয়েছে নাকি? হাওয়া, স্রেফ হাওয়া।

অবনী ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। শহরের মানুষের মনের দরজা থেকে তিনি অনেক দূরে থেমে আছেন। মফস্‌সলের ভোটেও যদি এই ঝড়ো হাওয়া লাগে? সাত-আট হাজারের নড়বড়ে মার্জিনটা দ্রুত নেমে আসবে না?

ফুলু দত্তের মুখ শুকনো লাগলেও বোঝা গেল এখনও হাল ছেড়ে দেননি। বললেন, গ্রামের দিকে এসব হাওয়া টাওয়ার ব্যাপার নেই। ওখানে ডিফারেন্সটা ঠিক কভার করে ফেলব।

অবনী হাসলেন, আমরা মার্কসবাদীরা চিরদিনই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি।

ফুলু দত্ত আড়চোখে অবনীর হাসিটা দেখে নিয়ে ভোটার-লিস্টটা হাতে নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, সেকেন্ড রাউন্ডটা দেখা যাক।

কিন্তু সেকেন্ড রাউন্ডে স্থিতাবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। সেই একই অচলায়তনে দাঁড়িয়ে আছেন অবনী। দু'হাজারের ব্যবধানটা বেড়ে দাঁড়াল চার হাজারে। হিসেব ছিল বিয়োগ ফলটা এক হাজারের নীচে থাকবে। যতই হাওয়া উঠুক, বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র আর রেডিয়োর প্রচার থাকুক, শিক্ষিত ভোটাররা অভিজ্ঞতার চেতনায় নিজের মতাদর্শকে বিজয়ী দেখতে চাইবে। কিন্তু দেখা গেল বামপন্থী প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেছে শিক্ষিতের শহর।

ফুলু দত্তের মুখের চেহারা বদলে গেছে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস প্রতারণা করেছে তাঁকে। ব্যবধানটা যেখানে ঠেলে পাঠিয়েছে, সেখান থেকে ফিরে আসা সহজসাধ্য নয়।

তৃতীয় রাউন্ডের ফলাফলে জানা গেল অবনী সাড়ে ছ'হাজারে পিছিয়ে আছেন।

অবনী উঠে দাঁড়ালেন। বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন। নির্মল সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। মানা করলেন। এখন আর তিনি মহার্ঘ নন। ঈশানকোণের কালো মেঘ হাওয়া নয়, ঝড় আসছে। সেই ঝড় দুমড়ে-মুচড়ে তাঁকে আরও সামান্য করে দেবে।

তৃপ্তি আগেই খবর পেয়েছেন। বললেন, এটা কী হল বলো তো?

একঘণ্টা পরপর চতুর্থ পঞ্চম রাউন্ডের ফলাফল এসে গেল বাড়িতে। ব্যবধান আট হাজারের। পরাজয় সুনিশ্চিত। পাঁচ বছরের রাজ্যপাট ছেড়ে দিতে হবেই। এখন থেকে তিনি রামা-শ্যামা-যদু-মধু হয়ে যাবেন।

অবনী দোতলার ঘরের জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিষাদের মতো শোকের মতো শূন্যতার মতো আস্তে আস্তে সন্ধের অন্ধকার নামছে। শীতশীত হাওয়া আসছে বাইরে থেকে। হাতের রেখাগুলো দেখার চেষ্টা করলেন। কী যেন বলেছিল সেই জ্যোতিষীটা? বৃহস্পতি তুঙ্গে? ননসেন্স!

ফোন বাজছে। শুনলেন আট হাজারের তফাতটা পাঁচ হাজারে নেমেছে। তার মানে এখনও তিনি প্রদীপ রায়ের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছেন। এখন নবম রাউন্ডের গোনা চলছে। শহরের বাইরে থেকে ব্যবধানটা কত আর কমাতে পারবেন। তিন, চার, পাঁচ হাজার? তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার ভোটে প্রদীপ রায়েব জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আসলে এটা তিনিও সন্দেহ করেছিলেন। বিশ্বাসঘাতক ভোট ডুবোপাহাড়ের মতো কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে। তিনি তো জানেনই ছোট মাপের ভাবনাচিন্তার মানুষগুলো নির্বাচনকে গণ-আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার বলে মনে করে না, বড় মাপের মানুষের প্রতিষ্ঠাকে, সাফল্যকে এরা হিংসার চোখে দেখে। বড়কে নীচে নামিয়ে দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতার আক্রোশ মেটায়। 'উপস্থিত মাননীয় জনগণ, গণসংগ্রামের মহান সৈনিকগণ—' শালা! ভোটের আগে এইসব ভূতের মতো ইতর দুর্গন্ধী লোককে ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিলেন অবনী। তাদের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াতে হয়েছিল।

কিছু কিছু ব্যর্থতা অবশ্যই ছিল তাঁর দলের, কিন্তু সাফল্যও তো কম নয়।

তবু তিনি জিততে পাবছেন না। নিজের পছন্দ-অপছন্দ নয়, অর্জিত অভিজ্ঞতায় নয়, শুধুমাত্র হাওয়াই ইডিয়টগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল? শালা, বেইমানের দল।

অবনী মনে মনে শহরের মানুষদের টেনে আনলেন বধ্যভূমিতে, সারি সারি দাঁড় কবিয়ে দিলেন ফাযারিং স্কোয়াডের রাইফেলের সামনে, সীমাহীন ক্রোধে এক এক করে সবাইকে শুইয়ে দিলেন রক্তাক্ত ভূমিশয্যায়।

রাত দশটায় সর্বশেষ খবর এল। তখন তাঁর পাশে স্ত্রী তৃপ্তি, বড় মেয়ে নীতা, জামাই আর পার্টির দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বসে ছিল। ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখল নীতা। তিনহাজার চারশো চোদ্দো ভোট বেশি পেযে প্রদীপ রায় নির্বাচিত।

খবরটা নতুন কিছু নয়। আগে থেকেই জানা ছিল। সবাই চুপ করে থেকে খবরটা শুনল, শোনার পরেও চুপ করে রইল।

হারা-জেতা আমাদের রি-অ্যাক্ট করে না। ক্ষমতা দখলের অল্টারনেটিভ স্ট্রাটেজি ছাড়া আমাদের কাছে ইলেকশনের কোনওই মুল্য নেই, একটু পরে দলীয় বন্ধু বললেন। সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন তিনি কিছু নির্বাচিত শৌখিন শব্দ সাজিযে গুছিয়ে উচ্চারণ করলেন।

রাত বারোটার সময় ঘুমন্ত পাড়াকে সচকিত করে পটকা ফাটার শব্দ, অনেক উল্লসিত কণ্ঠ শোনা গেল। প্রদীপ রায়ের বিজয় মিছিল আসছে। অবনীর বাড়ির সামনে বলেই বোধহয় সে মিছিল আরও উচ্চকিত।

শব্দ শুনে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন অবনী। নীচে কিছু দূরে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। শব্দ, আলো, উল্লাসে প্রদীপ রায়ের জয়কে অভিনন্দিত করে এগিয়ে আসছে মিছিল।

তৃপ্তি পাশে এসে তীব্র চাপা গলায় বললেন, এসব দেখার কী আছে! ঘরে চলো।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে অবনী লঘুগলায় বললেন, বা রে, মজার জিনিস দেখব না? আগামী ইলেকশনে প্রদীপ রায়কে যারা হারিয়ে দেবে, তারাই আজ তার বিজয় মিছিল করছে। মূর্খ ছোকরা জানে না, এই জনগণ কাউকে জেতায় না, একজনকে হারিয়ে দেয় শুধু। এরা কাউকে বড় করে কাউকে ছোট করে দেবার জন্য। তৃপ্তি, তুমি ঠিক দেখে নিয়ো, একদিন প্রদীপ রায়ও হেঁটে যাবে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, কিন্তু একফোঁটা বৃষ্টির জলও তার গায়ে লাগবে না।

হিমঘর

প্রকৃতিতে ভারসাম্য বলে একটা নিয়ম চালু আছে। স্বাভাবিক হিসেবের এক জায়গায় যতটুকু বাড়তি হবে, অন্য জায়গায় ততটুকু কমে যাবে। মানুষের জীবনেও সেরকম কিছু হয় কিনা আমার ঠিক জানা নেই। তবে কিছুদিন ধরে এক অদ্ভুত ব্যাপার টের পাচ্ছিলাম। আমি যতই ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে চলতি বাজারে নিজেকে আরও বিস্তৃত করছিলাম, ততই আমার মানবিক অনুভূতির ধারগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল! বিশেষ করে গন্ধ না-পাওয়ার ব্যাপারটা। বেশ কিছুদিন ধরে আমি লক্ষ করছিলাম আমার ঘ্রাণশক্তি কমে যাচ্ছে। তেমন কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না বলে সেটা সাময়িক ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ইলিশমাছটা কিনে ফেলেই জানতে পারলাম ব্যাপারটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। একটু বিশদ হই। ইদানীং আমি, যাকে বলে তোফা ছিলাম। অফিসের বিল সেকশনে বদলি হবার পর নগদা-নগদি সুযোগটা গোড়াসুদ্ধ তুলে নিচ্ছিলাম। এদিক সেদিক থেকে যতই দলছুট পয়সা আসছিল, গৃহিণীর মুখের কালো মেঘের ধারে ধারে সোনালি রেখা ততই উজ্জ্বল হচ্ছিল। সত্যি বলতে কী, হাত খুলে চলতে পেরে বেশ শরিফ মেজাজেই ছিলাম। এই অবস্থায় বাজার করতে এসে দেড় কেজি সাইজের ইলিশমাছটা দুম করে কিনে ফেললাম। তখনও ব্যাপারটা বুঝিনি। মাছটা দেখতে শুনতে যে খুব তরতাজা ছিল, তা অবশ্যি নয়। তা টানটান স্বাস্থ্যবতী মাছ আর এ-বাজারে কোথায় পাব! এমন তো আর নয় যে কেউ গঙ্গার জলে হাত ডুবিয়ে একটা ঝকমকে রুপোর পাত আমার হাতে তুলে দিয়ে বলবে, এই নিন দাদা ইলিশ মাছ। বরফ-দেওয়া মাছ একটু কমজোরি হবেই। আসলে মাছটা দেখেই পদ্মাপারের স্মৃতি ওটাকে ব্যাগে ঢোকানোর জন্যে আমাকে উসকে দিয়েছিল। মাছটা পেয়েও গেলাম বেশ সস্তায়। কিন্তু বাড়িতে এনেই বুঝলাম কোথায়ও বিরাট রকমের ছন্দপতন হয়ে গেছে।

গিন্নি নাকে কাপড়-চাপা দিয়ে বলল, এটা কী এনেছ?

গিন্নির মুখের ভাব দেখে আমার উৎসাহ কমে এল। জিব ভিজিয়ে নিয়ে বললাম, কেন, ইলিশ মাছ?

কী হবে এটা দিয়ে?

বলতে যাচ্ছিলাম, কেন দই-ইলিশ হবে, ইলিশ-পাতুরি হবে, কিন্তু কথাটা গিলে ফেলতে হল। মিনমিন করে বললাম, মাছটা খুব টাটকা নয় বলছ?

গিন্নির নাকে তখনও কাপড়-চাপা। বলল, আমি বলব কেন, মাছটার পচা গন্ধই বলে দিচ্ছে। বাপ রে বাপ, অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছে। ওয়াক থু!

আমি মাছটা নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলাম। কিন্তু কোনও পচাগন্ধ নাকে এল না। পচা গন্ধ কেন, কোনও গন্ধই আমি পেলাম না। মাছটা রেখে দিয়ে বললাম, কই, কোনও গন্ধ তো পাচ্ছি না!

গিন্নি ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, ঢং। তারপর ছলাকলার ভঙ্গি করে বলল, ওগো বলো না, মাছটা কেন এনেছ— মশা তাড়াবে বলে?

কাজের মেয়েটা রান্নাঘরে ঢুকছিল। কিন্তু দরজার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত দিয়ে নাকটা চেপে ধরল। এবার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকল আমার কাছে। সত্যি সত্যি মাছটার দারুণ পচা গন্ধ আছে কি? থাকলে আমি পাচ্ছি না কেন? আসলে কোনওই গন্ধ আমি পাচ্ছি না। ভাল হোক, মন্দ হোক, কম হোক, বেশি হোক, কিছু গন্ধ তো আমার নাকে আসবে।

গিন্নি সন্দিগ্ধ চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, দিব্যি মাছটার কাছে দাঁড়িয়ে আছ দেখছি। সত্যি বলো তো, কোনও গন্ধ পাচ্ছ না?

বললাম, সত্যিই গন্ধ আছে নাকি মাছটার?

গিন্নি মুখ-নাড়া দিয়ে বলল, সর্দিটা ভালই বাধিয়েছ। দুটো নাকই বন্ধ।

আমি জোরে জোরে নাক দিয়ে নিশ্বাস টেনে দেখলাম। দুটো নাক দিয়েই বাতাস পুরোদমে যাওয়া-আসা করছে। নাক ঠিকই আছে। আর নাকের ভেতরে তেমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে ঠিকই টের পেতাম। কিন্তু ঘটনা নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। কিছুদিন ধরে সন্দেহ করছিলাম, আজ হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেছে। গিন্নিকে কিছু বললাম না। চিন্তাটা কিন্তু মাথায় রয়েই গেল। সেই অবস্থাতেই স্নান-খাওয়া করে অফিস ছুটলাম। ইলিশমাছটা ভাতের পাতে না এসে কাজের মেয়েটার হাত দিয়ে বাইরে কোথায় চালান হয়ে গেল জানতেও পেলাম না।

অফিসে প্রথম প্রথম মনে থাকলেও কাজের চাপে কিছুক্ষণ পরেই ঘটনাটা ভুলে গেলাম। মনে পড়ল টিফিন আওয়ার্সে বনমালীবাবু এসে আমার পাশে বসে যথারীতি আর পাঁচজনের নিন্দেকেচ্ছা করার পর। বনমালীবাবু উঠে যেতেই সেই ভয়াবহ সত্যটা আবিষ্কার করলাম— সত্যিই আমি কোনও গন্ধ পাচ্ছি না। বনমালীবাবুর স্বভাবের মতো তাঁর মুখের দুর্গন্ধও অফিসের সর্বজন আতঙ্কিত ব্যাপার। পারতপক্ষে তাঁর ত্রিসীমানায় দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলে না। সেই বনমালীবাবু একেবারে আমার পাশে বসে নাকের ডগার সামনে মুখ এনে এত কথা বলে গেল, অথচ আমি বিন্দুমাত্র গন্ধ পেলাম না? সত্যি বলতে কী, এবার আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। তা হলে কি আমি গন্ধহীনতার কোনও মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গেছি? বাকি সময়টুকু আমি এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকলাম যে মন দিয়ে কোনও কাজই করতে পারলাম না। ভাগ্যিস সেই শাঁসালো পার্টির বিলটার পেমেন্টের ব্যবস্থা টিফিনের আগেই শেষ করে ফেলেছিলাম, নইলে কড়কড়ে তিনটে একশো টাকার পাত্তিও আমার করায়ত্ত হত না। আমি দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে অফিসের ফাইল শুঁকলাম, জামা জুতো কলম কালি চেয়ার টেবিল সবকিছুরই গন্ধ শুঁকে শুঁকে দেখলাম, কিন্তু কোনও গন্ধই আমার নাকে এল না। শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে কাজের অছিলায় স্টেনোটাইপিস্ট মিসেস বসুমল্লিকের কাছে গিয়ে একেবারে তার ধার ঘেঁষে দাঁড়ালাম। ত্রিশ বত্রিশের মিসেস বসুমল্লিক নানাবিধ সুগন্ধী পারফিউমে সর্বদা আকর্ষণীয়া হয়ে থাকে। প্রায় তার শরীরে নাক ডুবিয়ে গন্ধ টানলাম। কিন্তু সেখানেও হতাশ হলাম। কোনও গন্ধ পাচ্ছি না। ব্যাপারটা টের পেয়ে মিসেস বসুমল্লিক মনোহরা ভঙ্গিতে অপাঙ্গে তাকিয়ে একটা আঙুল দিয়ে আমার পেটে খোঁচা মেরে বলল, যাঃ অবনীদা, আপনি নিশ্চয়ই ইয়ারকি দিচ্ছেন। গন্ধ শোঁকাশোঁকির ব্যাপারটা মানুষের মধ্যেও আছে নাকি!

অন্য সময় হলে মিসেস বসুমল্লিকের শানিত নখের এমন লোভনীয় খোঁচা খেয়ে আমি যথারীতি পুলকিত বোধ করতাম। কিন্তু তখন অন্য কোনও চিন্তা আমার মাথায় ছিল না। গন্ধ না-পাওয়ার দুর্ভাবনা গলায় ফাঁস লাগিয়ে আমাকে টানছিল। আমি টলতে টলতে নিজের চেয়ারে এসে বসলাম।

এইরকম অবস্থায় সবাই যা করে, আমিও তাই করলাম। বাড়িতে ফিরে সোজা চলে গেলাম ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তার তিলক গুপ্ত আমার সহপাঠী বন্ধু। শহরের ব্যস্ততম এলাকা কদমতলায় তার সুসজ্জিত চেম্বারে বসে একটা সাদা কাগজে ডটপেনের রিফিলটা ঘোরাতে ঘোরাতে সে আমার ঘটনাটা শুনল। কথা বলতে বলতে আমি সাদা কাগজটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পরে বুঝতে পারলাম একটা মাছের ছবি আঁকছে ডাক্তার? মাছটাকে কিন্তু চিনতে পারলাম না আমি। ওরকম অদ্ভুত দেখতে মাছ আমি আগে কখনও দেখিনি। মুখটা তিরের মতো তীক্ষ্ণ আর চোখালো। লেজটা আবার পাখির পালকের মতো, তিরের পেছনে যেমন থাকে। পেটটা গোলমতন, চোখ নেই। চোখ অবশ্য হবে। আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকলাম ডাক্তার কখন চোখ আঁকে।

ডাক্তার এমনিতেই গম্ভীর হয়ে ছিল, আমার কথা শেষ হতেই আরও গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ

কোনও কথা না-বলে মনোযোগ দিয়ে মাছটাই আঁকতে থাকল। এইবার চোখ আঁকছে ডাক্তার। কিন্তু চোখটা দেখেই আমি ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। অবিকল মানুষের চোখের মতো। তা ছাড়া অতটুকু মাছের অত বড় চোখ হয় নাকি? ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, অদ্ভুত।

ডাক্তার বলল, ঠিক বলেছ। অদ্ভুতই বটে।

আমি বললাম, এরকম কোনও অদ্ভুত—

ডাক্তার আমাকে শেষ করতে না দিয়ে বলল, আমারও এরকম কোনও অদ্ভুত অসুখের কথা জানা নেই। খুব সম্ভব এটা কোনও স্নায়ুর অসুখ, নার্ভাস ডেবিলিটি। আমার মনে হয় কোনও নিউরোলজিস্টকে দেখানো উচিত। বলেই ডাক্তার খসখস করে নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের জনৈক খ্যাতনামা স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞের নাম ঠিকানা লিখে কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বলল, এঁর কাছে যাও।

ডাক্তারের আরও রোগী অপেক্ষা করে আছে। এবার আমার উঠতে হবে। আমি তিনটে একশো টাকা নোটের একটা পকেট থেকে বের করো আলগোছে টেবিলের ওপর রাখলাম। ভয় ছিল ডাক্তার ভীষণ আপত্তি জানিয়ে হাঁ হাঁ, করো কী, করো কী, এসব কী হচ্ছে করে উঠবে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা নিয়ে সে এতই চিন্তিত ছিল যে টাকার ব্যাপারটা আমলই দিল না। কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে কুড়ি টাকা বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর একশো টাকার নোটটা পকেটে ভরতে ভরতে বলল, এনি ওয়ে, ডাক্তার বাসু কী বলেন আমাকে অবশ্যই জানাবে। তুমি আমার বাল্যবন্ধু, ন্যাচারালি খুবই চিন্তার মধ্যে থাকব।

সেই বিশেষজ্ঞের কাছে কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি গেলাম না। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কোনও জানাশোনা অসুখে আমি আক্রান্ত হইনি। কিংবা হয়তো কোনও অসুখই আমার হয়নি। তা হলে তিলক ডাক্তার আমার ওপর হামলে পড়ত। আর যা-ই হোক না কেন, আমার তো হাত-পা ছড়াতে ছিটাতে কোনওই অসুবিধে হচ্ছে না। মিছিমিছি ডাক্তারের শিকার হতে যাই কেন।

স্থিতাবস্থা বেশ কিছুদিন চলল। গৃহিণী একটু আধটু ভাবল কিছুদিন। কিন্তু তারপর যখন দেখল আমি আমিই আছি, চাকরিবাকরি ঠিকই চলছে, দু'নম্বরি পয়সাও যথারীতি আসছে, তখন ভাবাভাবিটা ছেড়ে দিল। আমিও ব্যাপারটায় আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। দেখলাম ঘ্রাণশক্তিরহিত হয়ে আমার কোনওই অসুবিধে হচ্ছে না। নাকে গন্ধ না-পাওয়াটা কানে শোনা, চোখে দেখা কিংবা কথা বলার মতো কোনও অপরিহার্য ব্যাপার বলেই মনে হল না আমার। গন্ধ না পেয়েও আমি যেমন ছিলাম, তেমনি থেকে যাচ্ছি।

আরও কিছুদিন পরে দেখলাম গন্ধ না পেয়ে অসুবিধে হওয়া তো দূরের কথা, বরং সুবিধেই হচ্ছে আমার। আমি ময়লা নোংরা জায়গা দিয়ে স্বচ্ছন্দে আসা-যাওয়া করলাম, অনায়াসে বনমালীবাবুর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললাম, বাজারে শুঁটকিমাছের দোকানে সময় নিয়ে ইচ্ছেমতো দরদস্তুর করলাম, এমনকী মিসেস বসুমল্লিকের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শরীরে কোনও অবাধ্য উত্তেজনা টের পেলাম না। গোলাপফুল বেসন দিয়ে ভেজে কিংবা রজনীগন্ধার স্টিক দিয়ে ডাঁটাচচ্চড়ি করে নতুন কোনও খাদ্যবস্তু তৈরি করা যায় কিনা ভেবে দেখলাম। গন্ধ যেসব জিনিসকে মহার্ঘ করে, সেসব জিনিসের কোনওই মূল্য ছিল না আমার কাছে। দেখতে দেখতে আমার মধ্যে ঘেন্নাপিত্তিও কমে গেল। মুক্তপুরুষ হয়ে আমি স্থানে অস্থানে যথেচ্ছ বিচরণ করতে থাকলাম।

এমনি সময়ে একদিন সন্ধেবেলায় দরজার কড়া নড়ে উঠল। তার আগে বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি এসে থামার শব্দ পেয়েছিলাম।

আমি তখন ঘরে বসে গিন্নির সঙ্গে আমার বড় ছেলে সন্তুর বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। সন্তু কয়েকদিন ধরে বাড়িতে নেই। অবশ্য মাঝেমাঝেই সে বাড়িতে আসে না। কোথায় যায়, কী করে, কিছুই জানতে পারি না। বাড়িতে কখনও সখনও তাকে পেলেও জিজ্ঞাসা করেও কোনও উত্তর পাই না। কানাঘুষায় অনেক কথা শুনি। সেসবের জন্যে মনখারাপ হয়ে যায়, এইমাত্র। কিন্তু তা হলেও

এক দিন, বড়জোর দু'দিন, এর বেশি কোনওদিনই সে বাড়ির বাইরে থাকেনি। এবার পাঁচ দিন হয়ে গেল। গিন্নির মুখে ভয়ের ছায়া ভাসতে দেখলাম। আমিও চিন্তিত হয়ে ভাবলাম খোঁজখবর করব কিনা। এমন সময়ে দরজার কড়ানাড়ার শব্দে আমার বুক কেঁপে গেল।

ঠিক যা ভেবেছিলাম। ছোটো ছেলে দরজা খুলে দেখে এসে বলল, বাবা, পুলিশ!

থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছেন। আমাকে বললেন, আপনি অবনী মজুমদার?

আমি কোনওমতে ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

সন্তোষ মজুমদার ওরফে সন্তু আপনার ছেলে?

ঢোঁক গিলে বললাম, হ্যাঁ।

দারোগাবাবু বললেন, আপনাকে একটু থানায় আসতে হবে।

আমার জিব জড়িয়ে গেল, কেন বলুন তো?

দারোগা গম্ভীর গলায় বললেন, থানায় গেলেই জানতে পারবেন। ইয়ে, দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন।

অমঙ্গলের আশঙ্কায় গিন্নি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

থানায় গেলাম। থানা থেকে গেলাম হাসপাতালের পোস্টমর্টেম রুমে। মণ্ডলঘাটের কাছে এক ডোবায় এক গলিত মৃতদেহ পাওয়া গেছে আজ। সন্দেহ করা হচ্ছে সেটিকে তিন-চারদিন আগে খুন করে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকায় আজ ডোবার কচুরিপানা সরিয়ে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। মৃতব্যক্তির পকেটের চিরকুটের সূত্রে অনুমান করা যাচ্ছে যে সেটি এই শহরের অমুক পাড়ার অমুক বাড়ির অবনী মজুমদারের পুত্র সন্তোষ মজুমদার ওরফে সন্তুর।

দারোগা পোস্টমর্টেম রুমের ভিতরে নিয়ে গেলেন আমাকে। সেখানে আরও তিনটে মৃতদেহের সঙ্গে একটি মৃতদেহ শায়িত অবস্থায় রাখা ছিল। দারোগা নাক টিপে ধরে সেই মৃতদেহটি আমাকে দেখালেন। মুখ দেখে চেনার উপায় নেই। ফুলে ফেঁপে সেটি বেঢপ হয়ে গেছে। কিন্তু আনুমানিক বয়েস, গায়ের রং, আকৃতি, প্যান্ট জামা দেখেই আমার বুকের মধ্যে তুষার ঝড় বইতে শুরু করল। হ্যাঁ, আমার সামনে নির্ভুলভাবে পড়ে আছে আমাব বড় ছেলে সন্তুর প্রাণহীন দেহ। আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম।

দারোগার সঙ্গে একজন কনস্টেবল এসেছিল। সেও নাকে হাত দিয়ে মুখ টিপে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। এমনকী মর্গের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীটিকেও নাক টিপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। নিশ্চয়ই সেখানে এমন এক দুর্গন্ধ ছিল যা অসহনীয়। কিন্তু আমিই কোনও গন্ধ পাচ্ছিলাম না, জীবিত এবং মৃতের মধ্যে গন্ধের কোনও বিভাজক রেখা আমার কাছে ছিল না।

দারোগা বললেন, চলুন।

সেদিন গভীর রাতে আমি বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। ঘরের শোকাহত মানুষগুলো এখন ঘুমে আচ্ছন্ন। আমি বাড়িতে ফেরার পর থেকে এ-ঘর উচ্চকিত ছিল প্রিয়জন হারানোর কান্নায় কান্নায়, এখন শীতার্ত পৌষের মধ্যরাতে হিমশীতল কবরের নৈঃশব্দে অতলে তলিয়ে আছে যেন। আমি পুত্র কন্যা আর স্ত্রীর ঘুমন্ত শরীরগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর আরও কাছে গিয়ে তাদের শরীরের গন্ধ শুঁকলাম। কোনও গন্ধ নেই। নিজের শরীরের গন্ধ শুঁকলাম। কোনও গন্ধ পেলাম না। হাসপাতালের মর্গের শরীরগুলোতে কোনও গন্ধ ছিল না, এ-ঘরের শরীরগুলোতে নেই। হঠাৎ আমার মনে হল আমি এক হিমঘরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনে তিনটে মৃতদেহ শুয়ে আছে।

আমাকে যোগ করে সংখ্যাটা চার হবে।

নিলয় না জানি

ছবিটাকে একটু বেশি সময় দিতে হল সুমিত্রার। অথচ এ-ছবির সামনে দিয়ে যাওয়া-আসার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। খুব অল্প লোকই প্রয়োজনের বেশি সময় এখানে দাঁড়াচ্ছে। আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ প্রখ্যাত শিল্পী বিভাস রায়ের একক শিল্প প্রদর্শনীতে খুব বেশি মনোযোগ দেবার মতো প্রাণপ্রাচুর্য এ-ছবিতে হয়তো পাননি রসিক জন। আরও বিখ্যাত ছবি আছে, ভিড় সেখানেই। উচ্ছ্বাস, প্রশংসাও।

অথচ সুমিত্রার মনে হল একমাত্র এ-ছবিই অনেক ছবির মধ্যে এক আলাদা সৃষ্টি। এ-ছবির সঙ্গে শিল্পী সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদিত। সুমিত্রা কিছুকাল আর্ট কলেজে পড়েছে, ছবিটবিও এককালে কিছুকিছু এঁকেছে। এখন সেসব ছেড়ে দিলেও কলাশিল্পের এই মাধ্যমটি এখনও তাকে আকর্ষণ করে। ওর স্বামী সোমনাথ তার ব্যাবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও স্ত্রীর এই সুখের শখটিকে স্বচ্ছন্দ রেখেছে এবং এ-ব্যাপারে উৎসাহিতও করে। সুমিত্রা যদিও নিজে ছবি আঁকে না এখন, কিন্তু ছবির জগৎ থেকে নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করেনি। আর্ট একজিবিশন হলেই ঘুরে যায়। ওর মনে পড়ল না কাছাকাছি সময়ের মধ্যে অন্য কোনও ছবি এরকমভাবে তাকে আবিষ্ট করেছে কিনা।

জলরঙে আঁকা এক বিমূর্ত ছবি। ক্যানভাসের বিশাল পটভূমিতে আলম্বিত এক নীলাভ আকারকে যেন গ্রাস করে নিতে চাইছে এক মৃত ধূসরতা। সেই নীল রঙে আভাসিত কিছু ঘরবাড়ি গাছগাছালি যেন অসীম শূন্যতায় একটু একটু করে মুছে গেছে। কয়েকটি প্রবাহমান ব্যাকুল রেখা পটভূমি ঘুরে ঘুরে খুঁজে পেতে চাইছে কোনও রূপবন্ধকে। সেই মায়াময় রেখাও ক্রমশ হারিয়ে গেছে কিছু নিরাসক্ত শীতল রঙের মধ্যে। শিল্পভাষায় উচ্চারিত এক গম্ভীর ব্যঞ্জনা গভীর সমুদ্রের কল্লোলোচ্ছ্বাসের মতো রঙের বনটে শুধু অনুভূতিকেই স্পর্শ করে। কী এই ছবির মানে? আমাদের আক্রান্ত সমকাল? ধূসর ধ্বংসের মধ্যে বিলীয়মান মায়াময় এই পৃথিবী? জীবনের প্রতি কোনও বিষণ্ন নান্দনিক মমতা যেন সব ছবির মধ্যে কেবল এই একটি ছবিই ধরে রেখেছে সুমিত্রার তৃষিত চোখকে।

ঠিক তখনই দেখা হয়ে গেল শুভব্রতর সঙ্গে।

শুভব্রত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া শিল্পী। এখন তার বিরাট নাম ডাক। দেশ-বিদেশের অনেক একক কিংবা গ্রুপ প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছে হামেশাই, ছবি আছে বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে। এখন দিল্লিতে স্থায়ীভাবে থাকে। কলকাতায় আসে মাঝেমাঝে। বিভাস রায়ের প্রদর্শনীতে এসে কয়েকজন শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিল। সুমিত্রাকে দেখে তখনই। দেখেই বন্ধুদের কাছ থেকে কয়েক মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে ওর কাছে চলে এল। সুমিত্রার সঙ্গে একসময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল শুভব্রতর। আর্ট কলেজে পড়েছে একই ইয়ারে, হইচই করেছে প্রচুর। সেই অন্তরঙ্গ স্মৃতিকে ঝাপসা করে দেবার পক্ষে বারো-তেরো বছরের ব্যবধানটা খুব বেশি সময় নয়।

হাই সুমিত্রা!

সুমিত্রা মুখ ফেরাতেই দেখল শুভব্রতকে। আসল মানুষটিকে অনেককাল বাদে দেখলেও এই বিখ্যাত ব্যক্তিটির ছবি মাঝেমাঝে চোখে পড়ে কাগজে, ম্যাগাজিনে। দেখেই ওর মুখ চতুর্দশীর চাঁদ হয়ে গেল। বলল, কী আশ্চর্য, তুই? শুভব্রত সেন?

শুভব্রত কপট বিরক্তি দেখাল, আহঃ, শুধু শুভ, নো শুভব্রত সেন, বলেই ছবিটির দিকে তাকাল,

ভেরি বোল্ড কম্পোজিশন। একেবারেই আলাদা স্টাইল। বিভাস দারুণ আঁকছে এখন।

সুমিত্রা বলল, অথচ আমরা এখনও শুধু চোখ দিয়েই ছবি দেখি। এ-ছবি লোক টানছে না।

শুভব্রত তার শিল্পী বন্ধুদের দিকে তাকাল। সামান্য ভাঁজ পড়ল কপালে। বলল, ছবির কথা এখন থাক। চল, বাইরে কোথাও একটু জমিয়ে বসি, নিজেদের কথা বলি।

সুমিত্রা বুঝল, শুভব্রত একটু সময় খোলামেলা থাকতে চাইছে। বরাবর সে এইরকম। সাজানো জগতের মধ্যে থাকতে তার একটুও ভাল লাগে না। মাপা রাস্তা, মাপা কথা একটুতেই ওকে হাঁপ ধরিয়ে দেয়। বন্ধ ঘর থেকে পালিয়ে এসে অবাধ হাওয়াতে এলোমেলো হয়ে যেতেই যে ভালবাসে তার নামই শুভ, শুভব্রত সেন নয়।

বাইরে এসে সুমিত্রা বলল, চলে এলি, ওঁরা ভাববেন না?

শুভব্রত বলল, ভাবুক গে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসে ময়দানের ঘাসে পা রাখল ওরা। সুমিত্রা মজা পাওয়ার গলায় বলল, বিখ্যাত শিল্পী শুভব্রত সন্ধের অন্ধকারে ময়দানে এইভাবে কোনও মহিলার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে— ওঁরা না ভাবুন, লোকে তো ভাববে।

শুভব্রত শব্দ করে হাসল, নিশ্চিন্তে থাকতে পারিস একজিবিশনের বাইরে ছবি আঁকিয়েকে এ-দেশের লোক কেউ চেনে না। ফিল্ম কিংবা খেলার মাঠের লোক হলে অবশ্যি লোকে আঙুল তুলে দেখাত। চল কোথাও একটু বসা যাক। খুব ভাল লাগছে রে। চারপাশে বয়ে যাচ্ছে কল্লোলিনী কলকাতা, মাঝখানে এক সবুজ দ্বীপের মধ্যে আমরা।

দারুণ, সুমিত্রা লঘু গলায় বলল।

ময়দানের মাঝখানে এক অবারিত জায়গায় এসে ওরা থামল। জায়গাটা ঠিক অন্ধকার নয়, অন্ধকারের মতো। ঠিক নির্জন নয়, নির্জনের মতো। তা হোক। ফুলদানির ফুলগুলো না হয় কাগজেরই হল, তবু তো ফুলের মতো। শুভব্রত ঠিক করল এখানেই বসবে। খুব আশেপাশে কেউ নেই, অস্বস্তি পাবার মতোও কিছু নেই। মানুষ, শব্দ, আলো— ব্যস্ত শহরের ধারালো নখগুলো এখানে থাবার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে রাত্রি।

শুভব্রত ঘাসের ওপর বসে পড়ে দু'হাতের ভরে শরীর এলিয়ে দিয়ে দূরের কলকাতা দেখতে দেখতে বলল, এত প্রবলেম, এত দুঃখ, তবু ইটস স্টিল ক্যালকাটা। পৃথিবীর কত জায়গায় ঘুরি, কিন্তু কোথায়ও দেখিনি ধ্বংসও জীবনের গান গায়।

শুভব্রতর পাশে বসে সুমিত্রা বলল, শুভব্রত সেনের পাশে ময়দানের নির্জন অন্ধকারে বসে আছি, ভাবতেই রোমাঞ্চিত হচ্ছি।

আঃ, সুমিত্রা! শুভব্রত রাগ দেখাল, তোরা এখনও সেই একশো বছরের পুরনো নোনাধরা বাড়িতে আছিস। বাইরে এসে একটুও ফ্রি হতে জানিস না? তোকে পেয়ে পালিয়ে এলাম আমার সেই প্রিয় শহরকে, শহরের কোনও প্রিয় মানুষকে খুব সরলভাবে কাছে পাব বলে। কিন্তু এখানেও সেই সাজানো শব্দ। ভাল্লাগে? ফল্‌স ভ্যালুসগুলোকে এত মূল্য দিস কেন বল তো?

সুমিত্রা বলল, তোর মতো করে জীবনকে দেখতে পারি না তাই।

শুভব্রত পাঞ্জাবি-পাজামা পরেছে। চোখে চশমা। লম্বা, ফরসা, ধারালো চেহারা। পকেট থেকে দামি ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট নিয়ে বলল, ভাগ্যবান ভদ্রলোকটি কী করেন?

সুমিত্রা হাসল, অবশ্যই ছবি আঁকে না।

তো?

ব্যাবসা করেন।

সুমিত্রার বলার ভঙ্গি শুভব্রতকে হাসিয়ে দিল। তখনই চোখে পড়ল সুমিত্রাকে একটু আড়ষ্ট দেখাচ্ছে। ওদের সামনের অন্ধকার দিয়ে তখন শিস দিতে দিতে কে যেন চলে যাচ্ছিল।

লম্বামতন কোনও মানুষ; সুমিত্রা কাঁধের আঁচলটা ঠিকঠাক করে নিল। বসলও সোজা হয়ে।

শুভব্রত সিগারেট ধরিয়ে বলল, কী হল? এনিথিং রং?

সুমিত্রা দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন যেন লাগছে। জায়গাটা বড্ড বেশি নির্জন।

শুভব্রত বলল, ভালই তো। এই বড্ড বেশি নির্জনতাটুকুই তো চাইছি।

সুমিত্রা বলল, তুই কলকাতা বহুদিন ছেড়েছিস, বারোমাস থাকতে হয় না, তাই একথা বলতে পারছিস। ময়দানে নির্জনতা মানে বধ্যভূমি। রাতও বাড়বে, এ-জায়গাও চলে যাবে অন্ধকার রাজ্যের বাসিন্দাদের দখলে! বাইরে থেকে দেখে কলকাতার কিছুই জানা যাবে না এখন।

শুভব্রত উদাসভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, পৃথিবীর কোনও শহরকেই বাইরে থেকে জানা যায় না। আমি জানি কলকাতার অনেক কিছুই নেই, ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটছে সে। লন্ডন প্যারিস টোকিওর মতো মুক্ত শহরও সে নয়, তবু কলকাতার কোথায় যেন এমন এক অদ্ভুত ভাললাগা আছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও আমি পাই না। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে সেই ভাললাগার কলকাতার ছবি আঁকব। দিল্লিতে সেটেলড হলেও আমি আদ্যন্ত বাঙালি। কলকাতার কথা ভাবি, কলকাতা আমাকে হন্ট করে।

শুভব্রত নিঃশব্দ হল। চুপ করে কিছুক্ষণ সিগারেট খেল। কলকাতাকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে, তাই ভাবল দূরের দৃশ্যমান আলোকিত শহরের দিকে তাকিয়ে। গাড়ি, মানুষ, বিজ্ঞাপনের আলোর অক্ষর, আকাশ-ছোঁয়া বহুতল বাড়ি। তার রোমাঞ্চিত যৌবনের আলোড়িত দিনরাত্রিগুলো মিশে আছে এই স্মৃতির শহরে। সেই উপেক্ষিত নির্বাসিত শহরের ছবি আঁকবে সে। অনেকদিন ধরে এই ছবি আঁকার কথা ভাবছে সে। রঙে রেখায় সম্পূর্ণ করবে প্রাণময়তার এক শাশ্বত শিল্পকে।

অন্ধকার একটু একটু করে ডালপালা ছড়াচ্ছে। মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ। উড়ে আসছে চকিত হাওয়া। সময় গড়াচ্ছে নিঃশব্দে। এখন দু'-চারজন মানুষ দেখা যাচ্ছে ওদের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে। অস্পষ্ট আর নিঃশব্দ মানুষ। যুবক-যুবতী, ফুচকাওয়ালা, নিঃসঙ্গ মহিলা। শুভব্রত শুনেছে এসব জায়গায় রাত হলেই শরীরের সুখ বেচাকেনা হয়। ওরা অবশ্য বেশিক্ষণ এখানে থাকবে না। আর একটু বসেই চলে যাবে। রাতে বিশেষ পরিচিত একজনের বাড়িতে শুভব্রত যাবে বলে কথা দেওয়া আছে। আসলে তার স্বল্পকালীন কলকাতা কিছু পরিমিত আর শীতল মানুষের ভালবাসা আর উচ্ছ্বাসে প্রায় অঙ্কের মতো মনে হয়। এখানে এলেই তার চেনা শহরটিকে সে খুঁজে বেড়ায়। আজ তাই সুমিত্রাকে নিয়ে সে ময়দানে এসেছে কিছু অন্তরঙ্গ সময়কে ঝড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে।

হঠাৎই সামনের অন্ধকার যেন কথা বলে উঠল, ম্যাচিস হোবে স্যার?

শুভব্রত দেখল দুটো শরীর অন্ধকারে মিশে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটা একটু লম্বা চওড়া, অন্যটা মাঝারি মাপের। কী আশ্চর্য, এরা কখন এল? অন্ধকার ফুঁড়েই কি দুটো মানুষ উঠে এসেছে? আবছা অন্ধকারে ভাল করে দেখা না গেলেও লোকদুটোর হঠাৎ উপস্থিতি, কথা বলা আর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি, বয়েস, পরনের প্যান্ট আর গেঞ্জি, সবকিছু মিলিয়ে নির্ভুলভাবে বলে দিচ্ছিল ওরা আইন শৃঙ্খলার জগতের নাগরিক নয়, অন্ধকারের ফসল। শুভব্রত আশেপাশে তাকিয়ে কাউকেও দেখল না। অবশ্য কেউ থাকলেও সাহসী হবার মতো কোনও কারণ থাকত না। একটু আয়েশ করে নিজের মতো বসবে ভেবেছিল, তাও হল না।

নেই। শুভব্রত গম্ভীর গলায় বলল।

নেই? লম্বা লোকটি চুকচুক করে আপশোসের শব্দ করে বলল, তো কী আছে?

শুভব্রত আগের মতোই বলল, কিছুই নেই। আপনারা এখান থেকে যান।

খুব রোয়াব দিচ্ছে বে। দ্যাখ তো মালটা কোথাকার ফিনিশ আছে।

সঙ্গে সঙ্গে মাঝারি মাপের লোকটার হাতের মুঠোর ছোট্ট টর্চের আলো জ্বলে উঠল। আলোটা

এক মুহূর্তের জন্য সুমিত্রার মুখ দেখে নিয়ে ঘুরে এসে থামল শুভব্রতর মুখে এবং নিভে গেল। লোকটা বলল, ধুস শালা, বাঙালি পার্টি আছে। পঞ্চাশ পয়সার বাদামভাজা নিয়ে গড়ের মাঠে মিনি মাগনায় লগদালগদি করে আরাম কাড়তে এসেছে। বউনিটাই আজ খারাপ দেখছি।

লম্বা লোকটা বলল, অন্যের তাওয়ায় নিজের রুটি গরম করছে লোকটা। ছুকরিটা ঘরের মাগ মনে লিচ্ছে। অন্যের বিল্লিকে ভাগিয়ে এনেছে হুলোটা।

শুভব্রত ঠোঁট কামড়ে ধরল, সে বেশ বুঝতে পারছিল সুমিত্রা ভয় পেয়ে গিয়ে ওর আরও কাছে সরে এসেছে। মানুষের ইতরতা তার কাছে নতুন কিছু বিষয় নয়। সব শহরেরই কিছু অঞ্চল মস্তানদের জন্যে অরক্ষিত থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটাকে হালকাভাবে ধরে নেওয়া যাচ্ছে না, বিশেষ করে সুমিত্রার কথা ভেবে। বাধ্য হয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতে হল। সুমিত্রাকে বলল, চল।

সুমিত্রা আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে। শুভব্রতর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা লোকটার হাতের লম্বা ছুরির ধারালো ফলা অন্ধকার কেটে ছোবল তুলে দাঁড়াল। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় সে বলল, এই, এই মিস্টার, কোথায় যাবে? এখানে এতক্ষণ কী করা হচ্ছিল অ্যাঁ?

ভুল নেই, যাবার রাস্তা আটকে দিয়েছে। শুভব্রত বুঝতে পারল লোকদুটো ওদের নোংরা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে সামাজিক মর্যাদার মূল্য আদায় করে নেবার মতলব আঁটছে। ব্যাপারটা ভয়ের। কিন্তু ভয় পেয়েছি এই ভাবটা ওদের পাশবিকতা আরও বাড়িয়ে দেবে। দুর্বলতাই দুর্জনের সাহস আনে। পথ ছেড়ে দিন, আমরা যাব।

ইল্লি, পথ ছেড়ে দেব! তা এখানে বসে বসে কী হচ্ছিল মশাই, গা এঁটো করছিলেন?

কী করছিলাম সেটা আমাদের প্রাইভেট ব্যাপার। শুভব্রত সুমিত্রার দিকে তাকাল, আয়।

লম্বা লোকটা একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছুরিটা বাড়িয়ে দিল, এক কদম এগিয়েছ কি বিলকুল খরচের খাতায় নাম তুলে দেব। খুব ডায়লগ দিচ্ছ দেখি। পেরাইভেট ব্যাপারগুলো সেরে নেবার জন্যে তো আলাদা ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, এখানে কেন? এটা পাবলিকের জায়গা, সোনাগাছি নয়। জেন্টলম্যানদের জায়গায় ওসব নটখটি চলবে না।

মাঝারি লোকটি বলল, ছুঁড়িটাকে আবার তুই তুই করে বলছে।

সুমিত্রা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার রাগত গলায় বলল, এসব আজেবাজে কথা বলছেন কেন? রাস্তা ছাড়ুন, যেতে দিন। দেশে আইন কানুন কিছু নেই নাকি?

মাঝারি লোকটা ফিক করে হেসে উঠল। বলল, খুবসুরত মেয়েছেলে চোপা করবে, তবেই না প্রেম মহব্বত জমবে। আমাদের মর্জিই হচ্ছে দেশের আইন কানুন ডার্লিং।

লম্বা লোকটা দাঁত বের করে বলল, আমরাই গড়ের মাঠের গোবরমেন্ট আছি মেমসাব।

উপভোগ করার মতো ঘটনা নিশ্চয়ই নয়। শুভব্রত চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু ভরসা পাওয়ার মতো কিছু চোখে পড়ল না। একটু আগে মনে হয়েছিল খুব কাছে না হলেও দূরে দূরে কিছু মানুষ আছে, কিছু জীবনের অস্তিত্ব আছে, ওরা একেবারেই কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এখন মনে হচ্ছে কেউ নেই, কিছু নেই, সবকিছু যেন এক তুষার ঝড়ের নীচে চাপা পড়ে আছে। হাজার চিৎকার করলেও কেউ শুনবে না, কেউ আসবে না। এখান থেকে চলে যাবে, তারও উপায় নেই। সশস্ত্র লোকদুটো ওদের পথ আগলে রেখেছে। খ্যাতি যার দেশের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে, সেই শিল্পী এখানে এক অসহায় ক্ষুদ্র মানুষ। সে জানে এরা মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে না।

কী, কী চাই আপনাদের? শুভব্রত টের পেল তার গলার স্বর একটু কেঁপে গেল যেন।

লম্বা লোকটা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাঝারিটা সুমিত্রার কাছে এগিয়ে এসে টর্চের আলো ফেলল। আলোটা যেন লোলুপ জিব বের করে সুমিত্রার শরীর চেটে নিল। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে মাঝারি লোকটা বলল, গলার হারটা কি আসলি মাল, না রোল্ডগোল্ড আছে? দেখি?

লোকটা সুমিত্রার দিকে হাত বাড়াতেই সুমিত্রা পিছিয়ে গেল। ঝাঁঝালো গলায় বলল, এ কী হচ্ছে, আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? অসভ্য ইতর।

ইস রে আমার সতী সাবিত্রী! শোন খানকি, বেশি চেল্লালে শাড়ি বেলাউজ খুলে মাঠের ওপর শুইয়ে দেব। বলতে বলতে লোকটা ঝট করে এগিয়ে সুমিত্রার একটা হাত চেপে ধরে বলল, তড়পাবি না, তড়পালে ইজ্জতের সঙ্গে জানও চলে যাবে।

সুমিত্রা হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল, এ কী হচ্ছে, ভাল চান তো শিগগির আমার হাত ছাড়ুন।

স্কাউনড্রেল, ব্রুট! শুভব্রত দাঁতে দাঁতে ঘষে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। তখনই একটা প্রচণ্ড শক্তির চড় আছড়ে পড়ল ওর গালে। আগুনের ছ্যাঁকার মতো গালটা জ্বলে উঠল। লম্বা লোকটা হিসহিস করে বলল, একদম এগোবি না। বিলকুল চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থাকবি।

এমন সময় কে একজন হন্তদন্ত হয়ে এসে থামল ওদের সামনে। আবছা অন্ধকারে পোশাক দেখে বোঝা গেল পুলিশের লোক। পুলিশ অফিসার। তিনি সামনের দিকে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে শুভব্রত আর সুমিত্রাকে দেখার চেষ্টা করলেন। নাক দিয়ে বাতাস টেনে কোনও নিষিদ্ধ গন্ধ আছে কিনা জানতে চাইলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, ইললিগ্যাল অ্যাক্টিভিটি একদম বরদাস্ত করা হবে না। এখানে কী হচ্ছে?

লোকদুটো তখন ভালমানুষের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে। মাঝারি লোকটা হাত ছেড়ে দিয়েছে সুমিত্রার। এতক্ষণে যেন শুভব্রত পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পেল। উত্তেজিত গলায় বলল, এদের ধরুন অফিসার, এরা আমাদের অ্যাসাল্ট করছে।

অফিসার দু'পাশে মাথা নেড়ে বললেন, ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড, খুব অন্যায় কাজ।

সুমিত্রা রাগে ফুঁসছিল। বলল, এদের এতদূর অডাসিটি যে মহিলাদের গায়ে হাত দিতে পর্যন্ত পরোয়া করে না।

পুলিশ অফিসার আবার মাথা নেড়ে বললেন ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড। দেখি কার কাছে টর্চ আছে। ব্যাপারটা নিজের চোখেই দেখে নিই।

মাঝারি লোকটা অফিসারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, এই যে স্যার, এই লিন টর্চ।

অন্ধকার মাঠে ডিউটিতে আসা পুলিশ অফিসারের কাছে টর্চ নেই কেন বোঝা গেল না। অফিসার টর্চ জ্বালিয়ে চারজনকেই দেখলেন। আলোটা সুমিত্রার গলার হারটার উপর দ্বিতীয়বার এসে নিভে গেল। গলায় গাম্ভীর্য এনে তিনি বললেন, আমাদের সোর্সের খবর অনুযায়ী খুব নোংরা কাজ করেছেন আপনারা। প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীল আচরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, ময়দানের সরকারি জমিকে বেডরুমের বিছানা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অত্যন্ত পানিশেবল অফেন্স।

শুভব্রতর কপালে ভাঁজ পড়ল। ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছে সে। বলল, সেকী কথা? আপনি কি আমাদেরই এসব কথা বলছেন?

পুলিশ অফিসার শুভব্রত কথার উত্তর না দিয়ে সুমিত্রার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই মহিলা কে? আপনার ওয়াইফ?

না। ইনি আমার বন্ধু।

তার মানে নিজের ওয়াইফ নয় তো? তা অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে ইয়ে করাটা কি ভাল ব্যাপার হল? ছি ছি, ভদ্র সমাজে এসব কী চলছে আজকাল।

মাঝারি লোকটা খিক করে হেঁসে উঠে বলল, লোডশেডিং চলছে স্যার, বিলকুল আন্ধার।

শুভব্রত ঠোঁট কামড়ে ধরে। বলল, কী আশ্চর্য, স্ত্রী না হয়ে কি বন্ধু হতে পারে না কোনও মহিলা?

পুলিশ অফিসার হাত তুলে বললেন, থামুন মশায়, নলেজ দিতে আসবেন না। স্ত্রী-পুরুষের একটাই সম্পর্ক, সেটা হচ্ছে সেক্সের সম্পর্ক। বন্ধু-বান্ধবী ওসব তাপ্পি মারা কথা বলবেন না।

সুমিত্রা বলল, শুনুন অফিসার, নাম শুনেছেন কিনা জানি না, ইনি হচ্ছেন শুভব্রত সেন। বিখাত আর্টিস্ট। ইন্টারন্যাশনাল ফেম আছে এঁর।

পুলিশ অফিসার বাধা দিয়ে বললেন, ওসব আমার জানা আছে। বিপদে পড়লে সবাই আর্টিস্ট

বনে যায়। আমরা আইনের লোক, আইনের বাইরে কিছু বুঝি না। আর আর্টিস্টদের জন্যে কি গভর্নমেন্টের আলাদা আইন আছে যে যেখানে সেখানে জামাকাপড় খুলে ন্যাংটো হতে পারবে? আর্টিস্ট আছেন থিয়েটার-যাত্রার স্টেজে, এখানে না।

সুমিত্রা বলল, আপনি ভুল করছেন। ইনি বিখ্যাত—

থামুন তো। বিখ্যাত না হলে কি কেউ এই অখ্যাত জায়গায় আসে।

অবাক গলায় সুমিত্রা বলল, আপনি তো আমাদের কথাই বলতে দিচ্ছেন না, উলটে অ্যাকিউসড্ করছেন। আমরা যদি ঘনিষ্ঠভাবে বসেও থাকি, তাতেও বা অপরাধটা কোথায়? কলকাতার মতো শহরে কি মানুষ নিজের ইচ্ছে অভিরুচি অনুযায়ী মেলামেশা করতে পারবে না।

পুলিশ অফিসার গম্ভীর গলায় বললেন, যা বলবার থানায় বলবেন। এখন চলুন আমার সঙ্গে।

শুভব্রত বলল, কোথায় যাব আপনার সঙ্গে?

থানায়।

সুমিত্রা বলল, কী আশ্চর্য, কোথায় আপনি আমাদের লিগাল এইড দেবেন, তা নয়, বিশ্রী পরিস্থিতিতে ফেলে হ্যাবাস্ড করতে চাইছেন।

অ্যান্টি সোশ্যালদের লিগাল এইড? হা হা হা।

লম্বা আর মাঝারি লোকদুটোও পুলিশ অফিসারের দেখাদেখি হাসতে লাগল। যেন সুমিত্রা ভারী মজার কথা বলে ফেলেছে।

সবিস্ময়ে শুভব্রত বলল, আপনি কী বলতে চান বলুন তো? আমরা অ্যান্টি সোশ্যাল?

পুলিশ অফিসার ধমক দিয়ে উঠলেন, একদম চুপ। আইনের কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করলে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব। তা ছাড়া কী মশাই? পথেঘাটে আপনাদের লোচ্চামি দেখে এই যে এদের, মাঝারি আর লম্বা লোকটাকে দেখিয়ে বললেন, এই সমস্ত ইনোসেন্ট কমনম্যানদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেশের ক্ষতি, দশের ক্ষতি হচ্ছে। যুব সমাজ অধঃপাতে যাচ্ছে। যাক গে, বাজে কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। আপনাদের কোনও বক্তব্য থাকলে কোর্টে বলবেন।

কোর্টে? শুভব্রতর চোখের সামনে অসংখ্য গুণমুগ্ধ মানুষ, বন্ধুবান্ধব, খবরের কাগজের পাতা চকিতে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। সুমিত্রা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। তার সুখের সংসারের ছবিও তাকে ভয় দেখাচ্ছিল।

কী আশ্চর্য, আমরা কী দোষ করলাম বলবেন তো? শুভব্রতর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি।

কী করেছেন না করেছেন সেটা বুঝবে কোর্ট। দোষগুণের ব্যাপার জানি না, আমি আইনের লোক। প্রকাশ্যে অশ্লীল আচরণের জন্যে আপনাদের থানায় যেতে হবে। সেখানে আজ সারারাত হাজতবাস, কাল কোর্ট। কোর্টে অবশ্য লিগাল এইড পাবেন। হা হা হা।

এতক্ষণ ধরে শুভব্রত নিজেকে কোনওরকমে সামলে রেখেছিল. এবার ঘাবড়ে গেল। সে বেশ বুঝতে পারছিল সুমিত্রা ভয় পেয়ে গেছে। আর কিছু না হোক একটা অপ্রীতিকর বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হবে। যুক্তির যেখানে মূল্য নেই, সেখানে বুঝে নিতে হবে মানবিক রীতিনীতিগুলো দিয়ে অন্ধকারের রং বদলানো যাবে না। থানা কোর্ট সে এক বিশ্রী ঝামেলা। সবাই মুখ টিপে হাসবে, আসল কথা কেউ জানতে চাইবে না, বরং এক কথাকে রং চড়িয়ে সাতকাহন করবে। বিশেষ করে শুভব্রতর ক্ষেত্রে ভয়টা আরও বেশি। সে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব, দেশের মানুষ তাকে চেনে। খবরটা কাগজেও ফলাও করে ছাপা হবে। পুলিশ অফিসার তাদের থানায় নিয়ে যাবেনই, বাধা দিতে গেলে আরও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। কী ভাগ্যিস শুভব্রতর পরিচয় সত্যি সত্যিই এরা জানে না। জানলে সম্মানের বিনিময় মূল্য আরও বেশি হত।

আগের লোকদুটো, লম্বা আর মাঝারি, সুবোধ বালকের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ পুলিশকে দেখে তো ওদের ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তবে কি সমস্ত ঘটনাই অবিচ্ছিন্ন এবং সাজানো? শুভব্রত টের পাচ্ছিল সুমিত্রা ওর শরীরকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়টা

সুমিত্রার জন্যেই বেশি। সারারাত সে বাড়ির বাইরে থানার লক-আপে থাকবে, ভাবাই যায় না। তারা এক সঙ্ঘবদ্ধ চক্রান্তের শিকার। বিনা মাশুলে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।

শুনুন, বিনা কারণে আমাদের লজ্জার মধ্যে ফেলবেন না। আমরা এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। শুভব্রতর গলা নরম শোনাল।

লম্বা লোকটা দু'পা এগিয়ে এসে পুলিশ অফিসারকে বলল, যেতে দিন স্যার, আমরা মিউচুয়াল করে নিচ্ছি। এই যে মশাই, মালকড়ি কী আছে ঝটপট ছাড়ুন তো। আমি স্যারকে ম্যানেজ করছি।

না না, তা হয় না। অফিসার কড়াভাব বজায় রাখার ভাব করলেন।

মাঝারি লোকটা হাতজোড় করে বলল, আমাদের রিকোয়েস্টটা রাখুন স্যার। নাবুঝ লোক দোষ করে ফেলেছে।

কিন্তু— অফিসার কিছু বলতে চাইলেন যেন।

কিন্তু টিন্তু নয় স্যার, রিকোয়েস্ট রাখতেই হবে। খোকাখুকু ভুল করে ফেলেছে বই তো নয়।

এত করে যখন বলছেন, অফিসারের গলা মোলায়েম শোনাল, আপনারা দু'জন পাবলিক যখন সালিসি করছেন, তখন মোটকথা ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক থাকলেই হল। যাক গে, ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, এসব অসভ্যতা আর কোনওদিন যেন না দেখি।

লম্বা লোকটা তাড়া দিল, কই মশাই?

শুভব্রত পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করল। অপমানের উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছিল। ব্যাগে শ তিনেক টাকার মতো ছিল। লম্বা লোকটা ছোঁ মেরে তুলে নিল ব্যাগটা। মাঝারি লোকটা বলল, ঘড়িটা খুলুন। হাতে আংটি দেখছি, ওটাও দিন। পকেটে আর কী আছে?

লম্বা লোকটা সুমিত্রাকে বলল, হারটাও যে খুলতে হচ্ছে দিদিমণি, ছোট্ট ঘড়িটাও। আজকাল মেয়েদের এই এক নকশা হয়েছে হাতে চুড়ি-বালা পরে না।

সুমিত্রা পিছিয়ে গিয়ে বলল, কক্ষনও এসব আমি দেব না।

ইস, বহুত গরমমসল্লা আছে দেখি মালটা। কী খুকুমণি, হারটা এমনি দেবে না গায়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে নেব?

অফিসার জিব দিয়ে বিরক্তির শব্দ করে বললেন, দিয়ে দিন, দিয়ে দিন। ভদ্রলোক এত করে বলছেন যখন, চক্ষুলজ্জাও তো আছে। থানা কোর্ট করার চেয়ে ভালয় ভালয় হারটা দিয়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? আপনারা পারেনও, সোনার গয়না পরে এসব জায়গায় কেউ আসে?

শুভব্রতর হাতের দামি ঘড়ি আংটি তখন মাঝারি লোকটার হাতে চলে এসেছে। উপায় নেই, মান সম্মান বাঁচাতে হলে এইসব বস্তুর মায়া ত্যাগ করতেই হবে। এই হচ্ছে মিউচুয়াল। টাকাপয়সা আংটি হার ঘড়ি ওরা নেবে, পরিবর্তে শুভব্রত আর সুমিত্রা অক্ষত সম্মানে, শরীরেও, এই বধ্যভূমি থেকে ফিরে যেতে পারবে। হারটা সুমিত্রা না দিলে ওরা জোর করেই নেবে। অর্থাৎ আমও যাবে, আঁটিও যাবে। খারাপ কিছু হয়ে যাবার আগে হারটা দিয়ে দেওয়াই ভাল। শুভব্রত বলল, ওটা আর রেখে কী হবে সুমিত্রা দিয়ে দেওয়াই ভাল।

সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাব দিল না। চুপ করে থেকে কয়েক লহমার মধ্যে অনেক দূরের পথ, সমসাময়িক কলকাতা ঘুরে এল, তারপর অনেকটা মরিয়া হয়েই যেন তুরুপের তাস ছুড়ে ফেলল। টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে দীপ্ত গলায় বলল, না, দেব না। চলুন অফিসার থানাতেই চলুন। তা হলে সত্যি কথাই বলে ফেলা ভাল। আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, ইনি সত্যিই কোনও আর্টিস্ট নন। ইনি হচ্ছে এম এল এ। পাবলিক ইমেজ নষ্ট হবার ভয়ে এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। আমিও পার্টির মেম্বার। আপনি না চিনুন, থানায় গেলে অন্যরা এঁকে, এমনকী আমাকেও চিনতে পারবেন। থানা থেকে পার্টি অফিসে কিংবা হোম মিনিস্টারকে নিশ্চয়ই ফোন করার সুবিধে পাওয়া যাবে?

শুভব্রত ভারী অবাক হয়ে সুমিত্রার কথা শুনছিল। সুমিত্রা সম্ভবত বেপরোয়া হয়ে এই চালটি

দিয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে এখন ভাবনাচিন্তা করার সময় নেই। শুভব্রতকে এখন এম এল এ-র ভূমিকাতেই অভিনয় করতে হবে। কে জানে এতে কিছু কাজ হবে কিনা।

কিন্তু কী আশ্চর্য কাজ হল প্রায় ম্যাজিকের মতোই। স্পষ্টতই বোঝা গেল রাজনৈতিক দলের বিধায়কের নাম শুনে অফিসারটি হঠাৎ থমকে গেছেন। লম্বা আর মাঝারি লোকদুটোরও সেই অবস্থা। যেন প্রবল পরাক্রান্ত এমন কেউ, যে কিনা ওদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ধরে, দাঁড়িয়ে আছে ওদের পেছনে। পেছন ফিরে তাকিয়ে যাচাই করার সাহসও ওদের নেই। তিনজনেই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কী করবে কিংবা কী বলবে ভেবে না পেয়ে।

ওদের এই অস্বস্তিকর অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ ছাড়ল না সুমিত্রা। ঢিলটা ঠিক জায়গায় পড়াতে ওর সাহস বেড়ে গেল। তাড়া দিয়ে বলল, চলুন, থানাতেই চলুন। বড়জোর কয়েকটা কাগজে রসালো রিপোর্ট, কিছু লোকে হট গসিপ করবে, এই তো? এইসব তো হচ্ছেই, নতুন কিছু নয়। ক্যাডাররা এসবকে বিরোধীদের চরিত্রহননের অপচেষ্টা বলে ধরে নেবে। চলুন অফিসার, আমরাই আপনাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি।

অফিসারটি সুমিত্রার কথা সন্দেহ করার কথা চিন্তাও করলেন না। মাথা চুলকে দাঁত বের করে বিগলিত গলায় বললেন, ইয়ে মানে বলছিলাম কী, স্যারের পরিচয়টা আগে জানলে এতসব হত না। থানায় যাবেন কেন, এখানে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন স্যার, দেখি কার বুকের পাটা আছে আপনাদের ডিসটার্ব করে। বুঝলেন স্যার, ল অ্যান্ড অর্ডার মেইনটেন করাই আমার কাজ। আর এই দুটো বদমাস কিনা, বলতে বলতে হুংকার দিয়ে তেড়ে গেলেন লম্বা আর মাঝারি লোকদুটোর দিকে, অ্যাই, অ্যাই রাসকেল, ছিনতাই করার জায়গা পাওনি, না? আজ দুটোকেই লক-আপে পুরব।

লোকদুটো হাতের জিনিসগুলো মাটির উপর রেখে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে দ্রুত পা চালাল পেছনের দিকে। পুলিশ অফিসারও তাদের ধাওয়া করতে করতে এগিয়ে গেলেন। কুয়াশার মতো একরাশ অন্ধকার এসে ওদের ছবিটা মুছে দিল দৃশ্যপট থেকে।

মুহূর্তকাল সেইদিকে তাকিয়ে থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে সুমিত্রা বলল, আমি জানি তোর কিছুই করার ছিল না শুভ, কিছু করতে গেলে ওরা আরও নীচে নেমে যেত। পুরুষ হলেই কি পশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যায়? তুই জানিস না শুভ, কলকাতার সময় এখন কী দুর্যোগের মধ্যে চলেছে।

শুভব্রত ম্লান হাসল। বলল, গুন্ডা-বদমাস পৃথিবীর সব শহরেই আছে, সেটা কলকাতায় নতুন কিছু নয়। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগছে, চ্যাম্পিয়ান মস্তানের নাম শুনে ওরা কেমন ভয় পেয়ে গেল।

অন্ধকারে পা ফেলে ফেলে ওরা ফিরে যাচ্ছিল। যেতে যেতে ভাঙাভাঙা গলায় সুমিত্রা বলল, যে-কলকাতার ছবি আঁকবি বলেছিলি, পেয়েছিস সে কলকাতাকে?

শুভব্রত চশমার কাচের ভেতরের আয়ত চোখদুটো দূরে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, পেয়েছি।

পেয়েছিস?

এমন এক ছবি, যে-ছবিতে মানুষ, ঘরবাড়ি সবকিছু ছাড়িয়ে দলের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে এক শক্তিধর দৈত্য। কিংবা বিশাল দৈত্যটাই হবে পতাকা, সদম্ভে আকাশে মাথা উঁচু করে রইবে। জানি না এটা ছবি হবে কিনা। অপরাধ যেখানে সংগঠনের নাম, সেখানে এ ছাড়া অন্য কিছু ছবির কনটেন্ট হয় কিনা আমার জানা নেই।

নকল যুদ্ধ

দার্জিলিং বেড়িয়ে আসার গল্প বলছিল রত্না। হঠাৎ গল্প থামিয়ে সুজাতার শাড়িতে হাত দিয়ে বলল, দারুণ তো। নতুন কিনলি?

অথচ গল্পটা তখন চলে এসেছে এক রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে। রত্নার এই থেমে যাওয়াটা সুজাতার কাছে হঠাৎ লোডশেডিংয়ের নিশ্চল অন্ধকারের মতো মনে হল। কোনওমতে ঘাড় নেড়ে সে বলল, হ্যাঁ। তারপর?

সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে রত্না ঠোঁট টিপে হাসল। অফিসে পাশাপাশি বসে দু'জনে, সুখ-দুঃখের কথা বলে। তবে কথা যা হয়, রত্নাই বলে। সুজাতা শোনে। কিছুদিন আগেও কিন্তু রত্না এমন ছিল না। ইদানীং বদলে গেছে। হাসিতে খুশিতে রত্না এখন সবসময় চতুর্দশীর চাঁদ। সুজাতা এমনিতে চুপচাপ, রত্নার বিয়ের পর আরও বেশি চুপচাপ আর শীতল হয়ে গেছে। কাজেই সুজাতার কৌতূহল দেখে রত্না বলল, কী ব্যাপার, খুব ইন্টারেস্ট দেখছি? মরা গাঙে বান এসেছে?

সুজাতা টেবিলের ওপর থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে বলল, থাক তা হলে।

এই দ্যাখো, অমনি রাগ হয়ে গেল? শোন না তারপর কী হল। দারুণ থ্রিলিং ব্যাপার। ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল।

স্বামীর সঙ্গে সদ্য দার্জিলিং ঘুরে এসেছে রত্না। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে একই অফিসে। বছর দেড়েক হল ওদের বিয়ে হয়েছে। এবার দার্জিলিংয়ে গেল, ইচ্ছে আছে পরের বার পুরী যাবে।

ছেলেটা তো ঘোড়াকে ছেড়ে দিল, ঘোড়া ছুটল। অবশ্যি ঠিক ছুটল না, হনহনিয়ে চলল পাহাড়ের পাশ দিয়ে। তা আমার কাছে ছোটার মতোই। ব্যাপারটা থ্রিলিং হলেও আমি তো ভয়েই কুঁকড়ে আছি। সাধ মিটেছে বাবা, চিৎকার করে ডাকলাম ছেলেটাকে— এই এই, এসো না, আমি পড়ে যাব। ছেলেটা আসবে কী, মজা পেয়ে হাসছে। এদিকে সুদীপ তো এসব কিছুই জানে না। সে তখন ম্যালের বেঞ্চে বসে বিকেলের দার্জিলিংয়ের শোভা দেখছে। জানেও না তার শ্রীমতী তখন— তুই বিশ্বাস কর সুজাতা, জায়গাটা কেমন যেন নির্জন নির্জন। শুধু পাহাড় আর পাইন গাছ। তাকিয়ে দেখি পাশ দিয়ে পাহাড় অনেক নীচে নেমে গেছে। পড়লে কয়েকশো ফুট নীচে তলিয়ে যাব। হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। ঘোড়ায় চড়ার দুর্মতি হল কেন যে! ঘোড়ার চেয়ে বোধহয় জকির অ্যাট্রাকশনটাই বেশি ছিল। তোকে বলতে লজ্জা কী— ছেলেটা, নেপালি হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যান— নীল প্যান্ট, লাল উলেন গেঞ্জি, ঠিক ইংরেজি ছবির রোমান্টিক হিরোর মতো মনে হচ্ছিল। কী জানিস, ভয় পেলেও সে ভয়ের মধ্যে লুকিয়ে নিষিদ্ধ কাজ করার মতো কোথায় যেন একটু ভালটালও লাগছিল। অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার লাগছিল। এই কলকাতায় কোনও লাইফ নেই, চার্ম নেই, একঘেয়ে জীবন— অল বোগাস!

সুজাতা অধীর গলায় বলল, ঘোড়া ছুটল? খুব জোরে?

রত্না চুল ঠিক করে নিতে নিতে বলল, ছুটল আর কোথায়! তার আগেই ছেলেটা দৌড়ে এসে লাগাম ধরে ওদের ভাষায় কী যেন বলল ঘোড়াটাকে। আর, অবাক কাণ্ড, গুন্ডা ঘোড়াটা অমনি গুড বয় হয়ে থেমে গেল।

আর তুই?

আমি কি তখন আমার মধ্যে আছি রে। ঘোড়াটা দু'পা শূন্যে তুলতেই আমি পড়ে গেলাম।

পড়ে গেলি? কোথায়?

রাস্তায় নয়, পাহাড়ের খাদেও নয়, একেবারে দু'টি ফরসা সবল যুবক হাতের মধ্যে। আহা, অমন বাহুবন্ধনের মধ্যে পড়ে মূর্ছা গেলাম না কেন।

ভ্যাট। সুজাতার গলায় লজ্জা।

ভ্যাট? রত্না সুজাতার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলল, তুমি কী বুঝবে খুকু। কখন যে মেয়েদের মরণেও সুখ, তা তো আর জানলে না। বিয়ে করলে জানবি।

সুজাতা সামনের ফাইলটা টেনে নিয়ে বলল, জানতে বয়ে গেছে আমার।

অথচ, কী আশ্চর্য, সারাদিন কাজের মধ্যে সেই সুখের মরণের কথাই সুজাতার মনে যাওয়া-আসা করল। সিনেমার ছবির মতো রত্নার গল্প ভেসে চলল তার চোখের সামনে দিয়ে। দার্জিলিংয়ের নীল আকাশ আর সাদা মেঘ সবুজ গাছ আর ধূসর পাহাড়— পাহাড়ের উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে চলেছে টগবগে ঘোড়া। ঘোড়ার ওপরে রাজারানির মতো বসে আছে রত্না। পেছনে ছুটে আসছে সুদর্শন এক যুবক। ইংরেজি সিনেমার নায়কের মতো— না, মেয়েদের কখন মরণেও সুখ সুজাতা জানে না। অফিসে আসার সময়, অফিস থেকে ফিরে, আয়নার প্রতিবিম্বে প্রত্যেকদিন যে বিগতশ্রী বিষণ্ণ মুখটা সে দেখে, সে তো দূরতম দ্বীপে নির্বাসিতা এক মৃত যৌবনার মুখ। সে আবার নতুন করে মরবে কেমন করে?

সুজাতা জোর করে মনকে টেনে রাখে। অফিসের কাজে ব্যস্ত রাখে নিজেকে। হেমন্তের ছোট্ট দিনের আলো কমে আসছে। ছুটির সময় হয়েছে। শেষ ফাইলটা টেবিলের এক পাশে সরিয়ে রেখে সুজাতা রত্নার দিকে তাকায়। রত্না তখন শেষ কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছে। টাইপ মেশিনে শব্দ তৈরি হবার খটাখট শব্দ হচ্ছে। ঠিক যেন কোনও নির্জন পাহাড়ের পথে ঘোড়া ছুটে চলেছে, সেই ঘোড়ার পেছনে নীল প্যান্ট, লাল উলেন গেঞ্জি, ইংরেজি সিনেমার নায়কের মতো রোমান্টিক যুবক— দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা হিংস্রভাবে কামড়ে ধরে সুজাতা।

কখন বুঝি আকাশে মেঘ জমেছিল, ছুটির পর বাইরে এসে সুজাতা দেখে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কলকাতা থেকে অনেক দূর যেতে হয় তাকে। আকাশের যা অবস্থা, আজ বাড়ি ফিরতে ক'টা বাজবে কে জানে। দেরি করলে বিধবা মা ঘরবার করবে, ভাই পিন্টু হয়তো বাস স্ট্যান্ডে আসবে।

ফেরার বাসটা যখন তাকে তার স্টপেজে নামিয়ে দিল, তখন রীতিমতো রাত হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। বৃষ্টি কমেছে, কিন্তু থামেনি। মোড়ের চায়ের দোকানটা অন্যান্য দিন খোলা থাকে, দোকানের সামনে দু'একজন লোক থাকে। আজ দোকানটা বন্ধ, লোকজনও নেই। ডান দিকের সরু রাস্তাটা দিয়ে সুজাতা বাড়ি যায়। যদিও এখন নিশ্চিতভাবে তেমন কিছু রাত হয়ে যায়নি। তবু আজ ঠিক অন্যান্য দিনের মতো নয়। নির্জন একটেরে জায়গা, একটু বৃষ্টিবাদলাতেই রাতের বয়েস তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। পিন্টু নিশ্চয়ই তার খোঁজে স্ট্যান্ডে এসেছিল। মা হয়তো ভাবছে।

একটু এগিয়েই সুজাতা লাইটপোস্টের নীচে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের কোনও লোক, পাজামা, পাঞ্জাবি, একটা হাত পাঞ্জাবির পকেটে ঢোকানো, অন্য হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। কে লোকটা? ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন? এ-ধরনের কোনও লোককে এ-অঞ্চলে সে আগে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। তা কত লোকই থাকে এখানে, আসে যায়। সবাইকে কি চেনে সুজাতা? হয়তো সেরকম কোনও লোক, কোনও কাজের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

কাছাকাছি হতেই সুজাতা থেমে যায়। লোকটা তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে একটা স্থির ছবির মতো। ল্যাম্পের আলোয় যতটুকু দেখা যাচ্ছে— একটু লম্বাটে ধরনের গম্ভীর মুখ। পাগলটাগল নয় তো? যদি তার দিকে তেড়ে আসে? কিংবা যদি কোনও খারাপ মতলবে দাঁড়িয়ে থাকে? এই ভয়টাই থাবা

তোলে সুজাতার মনে। নিশ্চয় কোনও খারাপ লোক। সুজাতা তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে যাবে। কিন্তু লোকটা যদি এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে? হাতটা টেনে ধরে? সুজাতার বুক ছমছম করে ওঠে। লোকটা নিশ্চয় এক্ষুনি এগিয়ে এসে মুখ চেপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে যাবে কোনও নির্জন অন্ধকারে। এখন কী করবে সুজাতা? চিৎকার করে উঠবে? কিন্তু লোকটা যদি ছুটে এসে মুখ চেপে ধরে? যদি একটা ধারালো ছুরি গলায় ঠেকিয়ে বলে, টুঁ শব্দ না করে আমার সঙ্গে চলো— তখন?

সুজাতা বুঝে উঠতে পারে না তখন সে কী করবে। লোকটা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সুজাতার দিকে একবারও সে তাকায়নি অবশ্য। সুজাতা জানে ওসব লোকটার ভালমানুষির ভান। খারাপ লোকটা মনে মনে মতলব ভাঁজছে।

এক বিরাট উত্তেজনাকে সুজাতা টেনে আনল ওর শরীরে। লোকটা ঠিক ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ওখানে ওত পেতে অপেক্ষা করে আছে সুজাতা আরও কাছে এলে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে, লোভী জিব দিয়ে মেয়েমানুষের শরীরের স্বাদ চেটে নেবে বলে!

এখন এই মুহূর্তে ধর্ষিতা শহরতলি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার প্রাপ্ত বয়স্কা শিথিল শরীরে ঘুরঘুর করছে কিছু লোভী অন্ধকার, রুগ্ণ নির্জনতা। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সুজাতা তার মধ্যে মেয়েমানুষের শরীরকে খুঁজে নেয়। মধ্যদিন চলে গেলেও এখনও বিকেলের আলো নিভে যায়নি। এখনও এমন কিছু হয়ে যায়নি যে কোনও পুরুষের চোখে সে বাতিল হয়ে যাবে। ভস্মস্তূপে ফুঁ দিয়ে এখনও কেউ জ্বালিয়ে দিতে পারে গনগনে শরীরে আগুন। এখনও সে কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটনার শিকার হতে পারে। সুজাতা মনে মনে ভেবে নিল লোকটা সেরকম কিছু অসৎ উদ্দেশ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু বিপদের ঝুঁকি নিয়েই সুজাতাকে বাড়িতে ফিরতে হবে। সুজাতা একটু একটু করে এগিয়ে যায়। লোকটা কেমন যেন দুঃখী দুঃখী মুখ করে সুজাতাকে দেখল। সুজাতা জানে ওটা লোকটার আসল মুখ নয়। না দেখলেও সুজাতা জানে লোকটার চোখ চকচক করছে লোভে, এখুনি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সুজাতা চোখ বুজে ছুটল। লোকটা নিশ্চয়ই তার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে। তাকে আসতেই হবে। ঠিক যেমনভাবে নীল প্যান্ট লাল উলেন গেঞ্জির ছেলেটা দৌড়ে এসেছিল, ঠিক সেইভাবে। সুজাতা যে এখনও ফুরিয়ে যায়নি, এখনও যে সে আগাগোড়া কোনও মেয়েমানুষ।

সুজাতা ছুটে চলেছে। নিশ্চয়ই পেছনে ছুটে আসছে— একান্ত কামনা হয়ে— সুদীর্ঘ খরায় আক্রান্ত শুকনো মাঠের বুকে বৃষ্টির স্বপ্ন হয়ে এক পুরুষ শরীর।

যখন মেয়েদের মরণেও সুখ, তখন।

অন্তর্ঘাত

আমি আর অরুণা মুখোমুখি বসে আছি দু'টি চেয়ারে। আমাদের মাঝখানে একটি ছোট টেবিল। টেবিলে দু'টি চায়ের কাপ। এই দৃশ্যটা হল জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা অঞ্চলের একটি রেস্তরাঁর প্রায়ান্ধকার একটি ছোট প্রকোষ্ঠের, যাকে কেবিন বলা হয়। কেবিনের দরজায় পরদা ঝুলছে। বাইরে থেকে ভেতরের দৃশ্য দেখা যাবে না। ঘরের একটি মাত্র জানলা। সেটি রাস্তার দিকে এবং সেটিতেও পরদা রয়েছে। রাস্তা থেকেও ঘরের ভেতরটা দেখা যাবে না। এখন দুপুর না হলেও ঠিক বিকেল নয়। রেস্তরাঁয় লোক সমাগমের সময় নয়। রেস্তরাঁয়ও লোকজন কম।

আমি অরুণার দিকে তাকিয়ে আছি। অরুণা আমার সামনে বসে আছে নতদৃষ্টিতে। সে কাঁদছে। তার উদ্বেলিত হৃদয়ের কথা নিরুচ্চার অশ্রু হয়ে দু'চক্ষের কোল বেয়ে নেমে আসছে। বহুদিনের বন্ধ ঘরের দরজা সে খুলে দিয়েছে। বড় সুখে সে কাঁদছে।

আমি কী করব বুঝে উঠতে না পেরে অসহায়ের মতো বসে আছি। এমন কোনও উপায় আমার জানা নেই যা কিনা অরুণার অবাধ অশ্রুধারাকে থামিয়ে দিতে পারে। আর যদি সেরকম কোনও উপায় জানা থাকত, তা হলেও আমি কিছুই করতাম না। আমি যেমন বসে আছি, তেমনিই বসে থাকতাম। আমি অরুণাকে নিবৃত্ত করার কোনওই চেষ্টা করতাম না। অরুণার বয়েস এখন আটচল্লিশ। আটচল্লিশ বছরের কোনও মহিলার কান্না অসত্য হতে পারে না। যে-বয়েসে কান্না অকারণ হতে পারে, সে বয়েসও অরুণা অনেককাল আগে পার হয়ে এসেছে।

অরুণা কেন কাঁদছে, সে কান্নার নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে এবং সেই কারণটা আমার কাছে অজানিত, এমনও নয়। অথচ কথার মালা গেঁথে সেই কারণটা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি জানি এমনতর কোনও নির্মল কান্না দীর্ঘ খরার বুকে শ্যামল বৃষ্টির মতো স্নিগ্ধ এবং পবিত্র। অরুণা কাঁদছে। কাঁদুক। আমি ওকে বিরত করব না।

আমি আর অরুণা এই যে কাছাকাছি এসেছি, এটা আঠারো বছর পরের ঘটনা। আমরা একদা দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের পর সাত বছর একসঙ্গে থেকেছি। সাত বছরের শেষ দু'বছর আমাদের সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে গিয়েছিল। সে সময় আমরা কেউ কাউকে পছন্দ করতে পারছিলাম না। শেষপর্যন্ত এমন অবস্থা হল যে, আমাদের একসঙ্গে থাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়ল। অনিবার্য হয়ে পড়ল ছাড়াছাড়িটা। আমরা দু'জনে দু'পাশে সরে গেলাম, মাঝখানে আদালতের কোনও আদেশ ছাড়াই। তার দরকারও ছিল না। ব্যাপারটা মনের, মস্তিষ্কের নয়। তারপর আঠারো বছর কেটে গেছে আলাদা হয়ে থাকার। এই আঠারো বছরে আমাদের মধ্যে যোগসূত্র হয়ে থাকার মতো কিছু ছিল না। দূর থেকে আমি কয়েকবার অরুণাকে দেখেছি, এই পর্যন্ত।

তবে কি আজ আমার কাছে এসে অরুণা কাঁদছে সময়ের এই দীর্ঘায়ত শূন্যতার জন্যে? অনুযোগ জানানোর মতো কিছুই নেই বলে কি সে কোনও অভিমান জানাতে পারছে না? এবং সেই অসহায়তার দুঃখে সে কাঁদছে? নাকি সেই দর্পিতা ঋজু মহিলা আজ আমার কাছে পরাজিত বিধ্বস্ত হবার যন্ত্রণাময় আনন্দে তার হৃদয়ের সংবাদ চোখের জলের বর্ণমালায় প্রকাশ করছে?

নিজেকেও আমার বড় বিভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছিল।

আমাদের দু'জনের মাঝখানে যে-টেবিলটা রয়েছে, সেই টেবিলের ওপর অরুণা তার ডান

হাতটা লম্বালম্বি করে রেখেছে। ওই হাতটা আমার দিকে প্রসারিত এইরকম ভেবে নিতে আমার কোনওই অসুবিধে নেই। আমি কখনও সখনও সেই হাতটা দেখছিলাম। আঠারো বছর আগেকার সেই মসৃণ সুডৌল হাত নয়, বয়স্ক মানুষের হাত। বয়েস অনেক কিছুর সঙ্গে অরুণার শরীরের সজীবতাও কেড়ে নিয়েছে। কঠিন অঙ্কের অনেক কাটাকাটি অরুণার হাতে এখন। আমার খুব লোভ হচ্ছিল অরুণার সেই হাতটা স্পর্শ করে দেখতে সেটা উষ্ণ না শীতল। ইচ্ছেটা আমার মধ্যে থেকেই যাচ্ছিল। কথাটা মনে হতেই আমি চমকে উঠে নড়েচড়ে বসলাম। যদিও আমি ভাল করেই জানি খুবই অসময়ে জনহীন এক রেস্তরাঁয় স্বল্প পরিসর কেবিনে আমরা বসে আছি, কেবিনের দরজা জানলায় পরদা ঝুলছে, আমাদের যৌবন বহুদিন অস্তমিত, তবু আমি আমার শার্টের দ্বিতীয় বোতামটা আটকে নিলাম। নতুন শীত পড়তে শুরু করেছে। এ-সময়টা সাবধানে থাকতে হয়, হঠাৎ ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তখনই আমার মনে পড়ল অরুণার এভাবে টেবিলে হাত রাখাটা নতুন কোনও ঘটনা নয়। অরুণাকে এইভাবে টেবিলে হাত রেখে বসে থাকতে এর আগে আমি অনেক দেখেছি। ভঙ্গিটা আমার বহু চেনা। বলা যেতে পারে, ওটা অরুণার একরকম শারীরিক অভ্যেস। বহুদূরমনস্ক মুহূর্তগুলোতে সে ওইভাবে বসে থাকত।

এই যে আমি আর অরুণা মুখোমুখি বসে আছি একটা নিভৃত কক্ষে, আর দ্বিতীয় কেউ নেই এ-ঘরে, এ ধরনের কোনও সম্ভাবনার কথা কিছুক্ষণ আগে আমার ভাবনার কোনও অংশেই ছিল না। ঘটনাটা ঘটল এইভাবে— একটা স্টেশনারি দোকানে আমার কিছু কেনাকাটা ছিল। দোকানে ঢুকতে গিয়ে একেবারে সামনাসামনি হয়ে গেলাম অরুণার। এমনতর ঘটনার জন্যে আমি সামান্যতমও প্রস্তুত ছিলাম না। ধরে নেওয়া অমূলক হবে না যে, প্রস্তুত অরুণাও ছিল না। আমার ঠিক সামনে থেমে গিয়ে অরুণা দাঁড়িয়ে আছে, এই অবস্থায় তাকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়া যায় না, সেটা খুবই অভদ্রতা আর দৃষ্টিকটু দেখাত তো! যেটা পরিচিত কোনও লোকের ক্ষেত্রে করা যায় না, অরুণার ক্ষেত্রে সেটা তো কখনওই হতে পারে না। আমার উদাসীন মুখে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াটা হত চরম নিষ্ঠুর এবং অমানুষিক ব্যাপার। অরুণা একসময় আমার স্ত্রী ছিল, সেটা যতখানি বড় কথা, তার চেয়ে অনেক বড় কথা বিয়ের আগে আমাদের সম্পর্ক ছিল ভালবাসার। আঠারো বছর অনেক কিছু বদলে দিতে পারে, ম্লান করে দিতে পারে অনেক প্রাণময়তা, অনেক উজ্জ্বলতাকে আবছা করে দিতে পারে, ভালবাসার স্মৃতিকে নয়। স্মৃতি থাকে, যতই সুদূরবর্তী হোক না সে।

আমি অরুণাকে দেখছিলাম। সেই আগেকার অরুণা এখন নেই। বয়েস যতটুকু বেড়েছে, শরীর ভেঙেছে অনুপাতের চেয়ে বেশি। চশমার কাচের আড়ালে নিয়ে যাওয়া দু'টি চোখ, শিথিল ত্বক, দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্ত ভঙ্গি, সব মিলিয়ে ভারী অসহায় আর নিষ্প্রভ লাগছিল তাকে। মনে হল অনেক দিনরাত্রির পথ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে অরুণা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিতে চাইছে।

অরুণা বলল, কী দেখছ অমন করে?

বললাম, ভাল আছ?

অরুণা কিছু বলল না মুখে, শুধু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল দু'পাশে। সরল স্বীকারোক্তি, সে ভাল নেই। যেন তার কাছে আমি এখনও সেই লোকটিই আছি, একমাত্র যার কাছে সে অকুণ্ঠ হতে পারে, যার কাছে একান্ত মনের ব্যক্তিগত কথাটি বলা যায়।

তুমি? অরুণা আমার চোখের দিকে তাকাল।

আমি? ম্লান হাসলাম। তারপর আমিও ঠিক সেইভাবেই দু'পাশে মাথা নেড়ে একই কথা জানালাম। আমিও ভাল নেই। সত্যি কথাই বললাম। অরুণাকে সমবেদনা জানাতে কোনও নিপুণ অভিনয়ের আশ্রয় নিইনি। সত্যিই তো এই আঠারো বছরে সে রকম কখনওই ছিলাম না, যাকে কিনা বলে ভাল থাকা। চলেছি, ফিরেছি, কথা বলেছি, কিন্তু প্রাণ পাইনি কিছুতেই। একটা অভাববোধ

সবসময় মনকে বিষণ্ণ করে রেখেছে। সেটা যে অরুণার জন্যে, সেটা যে অরুণা কাছে নেই বলে, তার মধ্যে সামান্যতম অতিরঞ্জন নেই।

আসলে অরুণার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার মতো চরম ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিল সেরকম কোনও চরম ব্যাপার ছাড়াই। আজ কখনও কখনও মনে হয় ব্যাপারটা চূড়ান্ত ছেলেমানুষিই হয়ে গিয়েছিল আমার আর অরুণার দু'জনের দিক থেকেই। আমাদের মধ্যে শিক্ষা, রুচি, চারিত্রিক সততা, কোনও কিছুই অভাব ছিল না। আমরা নিঃসন্তান ছিলাম ঠিকই, কিন্তু সংসারের আর কয়েকটা দুর্ভাগ্যের মতো সেটাও মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তথাপি আমাদের মধ্যে একটা শূন্যস্থান ক্রমশ সীমানা বাড়াচ্ছিল। সামান্য কারণে আমাদের মধ্যে মতান্তর হচ্ছিল, ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। আমরা বিশ্বাস হারাচ্ছিলাম। আজ আঠারো বছর পরে সব কথা আমার মনেও নেই, কেননা মনে রাখার মতো কোনও গুরুতর ঘটনা ছিল না সেগুলো। অথচ সেইসব মামুলি কারণই আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি ঘটিয়ে দিয়েছিল। আর কী আশ্চর্য, সেই ছাড়াছাড়িটা দিন-মাস-বছর পার হয়ে আজ আঠারো বছর অতিক্রান্ত। গোনাগুনতি জীবনের ক্ষেত্রে আঠারো বছর বড় কম সময় নয়।

সামনেই একটা মাঝারি রেস্তরাঁ দেখা যাচ্ছে। খুব ইচ্ছে হল ওখানে একটু বসি, বসে দুটো কথা বলি।

তোমার কি এখন খুব তাড়া আছে অরুণা?

সেরকম কিছু নেই। কেন বলো তো?

বললাম, কিছু সময় যদি থাকে, তবে ওখানে একটু বসা যেতে পারে। আমি হাত বাড়িয়ে অরুণাকে রেস্তরাঁটা দেখালাম, এক কাপ করে চা খাওয়া যেতে পারে। অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে না থাকে।

অরুণা রেস্তরাঁটা দেখল। দেখে আমার দিকে তাকাল। তাকিয়ে কেমনভাবে যেন হাসল। আমি যে সবিনয়ে তার কাছে কিছু সময় চাইছি সেটাই বুঝি ভারী অদ্ভুত লাগছে তার। তার চোখদুটো আনমনা দেখাচ্ছিল। এখন উভয়েরই বয়েসের আকাশে বেলা শেষের আলোছায়া। এখন রোমান্স নয়, উচ্ছ্বাস নয়, ভাবপ্রবণতা নয়। এখন সামনের পথ অন্ধকারে হারিয়ে আছে। ঠিক এমনিতর মুহূর্তে কিছু সময়ের জন্যে ভয়ংকর সঙ্গীহীনতা থেকে মুক্তি চাইছি শুধু, সেটা সে বুঝতে পেরেছে। দেওয়া নয়, নেওয়া নয়, শুধুমাত্র সাহচর্য চাইছি, সেটা সে জেনে গেছে।

অরুণা সামান্য হাসল? বলল, চলো।

কদমতলার রেস্তরাঁর কেবিনে দু'জনে মুখোমুখি বসলাম। কর্মচারীকে দু'কাপ চা দিতে বললাম। একটা চিনি ছাড়া। চিনি ছাড়া চা খাই আমি। ডাক্তারের নির্দেশ। শারীরিক দুরবস্থায় প্রায় ভুগতে হয় আমাকে।

অরুণা বলল, কী করছ এখন? সেই চাকরিটাই তো? মাঝখানে অনেকদিন এখানে ছিলে না বুঝি?

বললাম, বদলি হয়ে গিয়েছিলাম বালুরঘাটে। এই তো কয়েকমাস হল ফের ট্রান্সফার হয়ে চলে এসেছি জলপাইগুড়ি। আর বছর আড়াই আছি। আর যাব না কোথাও।

আড়াই বছর আছে? রিটায়ারমেন্টের?

হ্যাঁ। হলও তো অনেকদিন চাকরির। তুমি তো স্কুলে মাস্টারিতে ঢুকেছিলে?

আছি এখনও। ওখানেই। আমার অবশ্য একটু দেরি আছে!

বছর আট-নয়ের মতো, তাই তো?

না। পুরো দশ বছর। ছোট নিশ্বাসটা যেন ইচ্ছে করেই গোপন করল না অরুণা। দশ বছর যেন তার কাছে ঢের সময়? তার একাকিত্বের মতোই।

বললাম, কেন, ভালই তো। আরও অনেকদিন কাজে থাকবে।

কী হবে তাতে?

কী হবে? কী আবার হবে, কী আবার হয়।

অরুণা অধীর গলায় বলল, কিছু হয় না, কিচ্ছু না। আমার ভাল লাগে না একটুও। খুব টায়ার্ড লাগে। পারি না। শরীর ভাল যায় না, ভয় করে।

বললাম, ভয় করে? কী?

অরুণা চুপ করে রইল। ওর কী ভয় করে, ও জানে, সেটা আমিও জানি। সে ভয়টা আমারও করে, আমাব পায়ে পায়ে ঘোরে। সে ভয় হল জীবনযাপনের শক্তি হারাবার ভয়। এখন এই পড়ন্ত বেলায়, পাশে একটা নিরাপদ অবলম্বন থাকা চাই, পায়ের নীচে শক্ত জমি চাই। শরীর ভাঙছে, মনকে ভাঙলে চলবে না। মনকে তাজা রাখা চাই।

ফের বললাম, শরীর ভাল যায় না বললে, কী হয়েছে।

অরুণাকে বিমর্ষ দেখাল। বলল, সন্ধে হলেই শ্বাসকষ্ট, টান। কিছুতেই সারছে না।

ডাক্তার কী বলছে?

ওষুধ দিচ্ছে, খাচ্ছি, এই পর্যন্ত।

টান? ছিল না তো আগে।

অরুণা হাসল, আগে তো অনেক কিছুই ছিল না।

বললাম, তা অবশ্য ঠিক।

অরুণা বলল, আর আগে মানে তো অনেক আগে। আঠারো বছর আগে। দেড যুগ। তখন তুমিও তো অন্যরকম ছিলে। কী, ছিলে না? এখন তুমি চিনি ছাড়া চা খাও, তখন খেতে না।

বললাম, হ্যাঁ। মাঝখানে অনেক সময চলে গেছে। আঠারো বছর।

আঠারো বছরেরও বেশি। আরও সাত মাস। অরুণা আমার দিকে তাকিযে বলল, ইস, তোমার তো সব চুলই প্রায সাদা হযে গেছে। রাতে ভাল ঘুম হয না?

আমাদেব চা খাওযা হযে গিয়েছিল। কিন্তু তখনই উঠে যেতে মন চাইছিল না। আরও কিছু সময় কিংবা অনেক সময় পেতে ইচ্ছে কবছিল। কিন্তু আবারও তো চা দিতে বলা যায না। সেটা কেমন দেখায যেন। দোকানের কর্মচারী ছেলেটাকে ডেকে দুটো ওমলেট দিতে বললাম। কোনওরকম ভাজাভুজি খাওযা অবশ্য আমার পক্ষে খুব অনুচিত কাজ হবে। ডাক্তার বারবার মানা করে দিয়েছেন। কিন্তু রেস্তরাঁতে সময নিতে হলে কিছু তো খেতেটেতে হবে। তা ছাড়া, আমি মনে কবলাম, আজকের দিনটা অন্য সব দিনেব মতো নয, অন্য বকম। আজ একটু সাহসী না হয় হওয়াই গেল।

কেবিনের একমাত্র জানলাব বাইরে বাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে, বয়ে যাচ্ছে শহরের জীবনস্রোত। সাইকেল যাচ্ছে, রিকশা যাচ্ছে, বাস, শব্দ, কোলাহল। জানলার পরদার পেছনে ছোট্ট ঘরে আমি আর অরুণা বসে আছি। এই মুহূর্তে বাইবের চলমান শহরের সঙ্গে আমাদের সংযোগ নেই বললেই চলে। আমবা যেন গভীর অন্ধকাবে হাতড়ে হাতড়ে হারানো কিছু খুঁজছি। অথচ আমরা নিজেরাই স্পষ্ট করে জানি না সেই হাবানো কিছুটা কী।

বললাম, রাতে ভাল করে ঘুম হওয়ার জন্যে দুটো জিনিসের দরকার— বয়েস আর মানসিক শান্তি। দুটোর কোনওটাই আমার নেই। সে যাক গে। এখন তোমার কথা বলো।

আমার কথা? আমার আবার কী কথা। আমার কোনও কথাই নেই।

জিজ্ঞাসিত হলে আমিও ঠিক এই উত্তরটাই দিতাম। আমারও কোনও কথা নেই। এই আঠারো বছরে আমিও নতুন কোনও কথা তৈরি করতে পারিনি। পুরনো কথাগুলোই বারবার পুনরুক্ত হয়েছে আমার জীবনেও। অরুণা আলাদা হয়ে নিজেদের বাড়িতে চলে গিয়েছিল, আমি ছিলাম আমার বাড়িতে। তারপর চাকরির সূত্রে দীর্ঘকাল বালুরঘাটে। আমরা আলাদা হয়ে গিযেছিলাম আলাদা কোনও জীবন নির্মাণ করতে নয়। কোনও বিদ্বেষ কিংবা বিশ্বাসহীনতায় আমরা আক্রান্ত হইনি, নতুন কোনও আয়োজনের প্রয়াসও আমাদের মধ্যে ছিল না। অথচ

একদিন নয়, দু'দিন নয়, আঠারো বছর ধরে আমরা আলাদা হয়ে আছি। ভাবলে অবাক লাগে, কষ্ট হয়।

এ-সময় আমার চোখে পড়ল অরুণার দু'টি চোখে অশ্রু টলমল করছে। সন্দেহ নেই সে কাঁদছে দুঃখে আর আপশোসে। অতীতের এক সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্যে অনেক দাম দিতে হয়েছে। বলতে গেলে এক জীবনের শ্রেষ্ঠতর সময়গুলোকে।

আমারও বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল, যেন উথালপাথাল হল হিমঝড়। আমি হাত বাড়িযে অরুণার হাতের ওপর রেখে তাকে স্পর্শ করলাম।

অরুণা, আমি জানি অনেক দেরি হয়ে গেছে—

অরুণা ক্লান্ত গলায় বলল, অনেক, অনেক দেরি হযে গেছে।

তবু যদি এখন ভুলটা শুধরে নিই? নেওয়া যায় না?

অরুণা ঠোঁট কামড়ে ধরে শুধু।

তোমার অসুবিধে আছে অরুণা?

অরুণা তার হাতটা সরিয়ে নিল না। আমি টের পাচ্ছিলাম আমার হাতের নীচে অরুণার হাত কাঁপছে। আনন্দে, অনুরাগে, বিহ্বলতায়।

অরুণা, তুমি বলছিলে তোমার ভয় করে। আমি যদি আবার তোমার পাশে এসে যাই, তা হলে সেই ভয়টা থাকবে কি?

অরুণা সজল চোখদু'টি আমার চোখের দিকে মেলে ধবে। না, তার কোনও ভয় থাকবে না। সে নির্ভয়, নিরাপদ হবে।

আমরা আবার নতুন করে বাঁচব অরুণা।

হ্যাঁ, আমরা আবার নতুন করে বাঁচব। তুমি পাশে থাকলে আমি কিছুতেই ভয় পাই না। অরুণার গলা আবেশে কেঁপে উঠল। পরম পরিতৃপ্তিতে সে চোখ বন্ধ করল।

আমি অরুণার হাতটা চেপে ধরলাম। তাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলাম সাহস, নিরাপত্তা। বিকেলের রক্তিম সূর্যের রৌদ্রে উষ্ণ করতে চাইলাম আমাদের ছায়াচ্ছন্ন জীবনকে।

অরুণা, আমাদের আর কোনও ভয় থাকবে না।

সেইসময় শোনা গেল বাইরে রাস্তায় কিছু লোকের সম্মিলিত কণ্ঠ। হরিধ্বনি দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে শবদেহ নিয়ে কারা যেন শ্মশানে যাচ্ছে। রেস্তরাঁর কাছাকাছি এসে সেই শব্দ আবও স্পষ্ট আর প্রবলতর হল।

বলো হরি, হরি বোল, বলো হরি, হরি বোল।

কী জানি কেন, সেই বিকট শোকসংবাদ আমাদের দু'জনকে দু'পাশে সরিয়ে দিল।

আমার হাতেব নীচে অরুণার হাত নেই।

আমিও নিজের হাত অজান্তে টেনে নিয়েছি টেবিল থেকে।

আমরা বিমূঢ় মুখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু সময় গেল। কিছু পরে আমি বললাম, এবার আমাদের উঠতে হয়।

অরুণা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

কিছু বলল না সে।

কিংবা বলল।

তবে উচ্চারণ করে নয়।

মৃত্যু সংবাদ

বাবা, আমি জানি এ-চিঠি হাতে নিয়েই আপনি তাড়াতাড়ি দেখবেন কে লিখেছে। তাই আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখি, চমকে উঠবেন না, আমি পার্থ।

ইন্দ্রনাথের মনে হল এইমাত্র তাঁর শরীরের ভেতরে ছিটকে গেল তরঙ্গায়িত বিদ্যুৎ। তিনি তাড়াতাড়ি চিঠিটা খামের মধ্যে ভরে টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলেন। তাকিয়ে দেখলেন দরজার কাছে কেউ আছে কিনা। না জানিয়ে অবশ্য এ-ঘরে একজনই আসেন। স্ত্রী বিভা। আর একজনও আসে, সে হল বাড়ির পুরনো কাজের লোক হরি। ছেলেরা, ছেলের বউরা কিংবা বাড়ির অন্য কেউ এলে তিনি আগেই জানতে পারেন।

বিভার কথাই তিনি ভাবলেন। কিন্তু আজকের ডাকে যে-চিঠিটা এসেছে, সেটা যে পার্থর চিঠি, বিভা জানবে কেমন করে?

ইন্দ্রনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। রায়বাড়ির দোতলার এই ঘরের সামনের টানা লম্বা বারান্দায় এখন কেউ নেই। দুপুর শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বিকেলও ফুরিয়ে যাবে একটু পরেই। এ সময় সমস্ত রায়বাড়িটা চুপচাপ কাজছুট হয়ে থাকে। বড়ছেলে শিবনাথ কোর্ট থেকে ফেরে না, বউরা নিজেদের ঘরে থাকে, ছোটরা খেলাব মাঠে। হিসেবমতো বিভার এখন ঠাকুরঘরে থাকার কথা। বেশ কয়েক বছর ধরেই বিভা সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। ঠাকুরঘরেই কাটায় বেশি সময়।

দিনের আলো কমে এসেছে। ইন্দ্রনাথ ঘরে এসে জানলার পরদা সরিয়ে দিলেন। টেবিলের ড্রয়ার খুলে খামটা হাতে নিয়ে ইজিচেয়ারে এলেন। খামের গায়ে শুধু তাঁর ঠিকানা লেখা। লেখা নেই কে পাঠাচ্ছে, কোথা থেকে পাঠাচ্ছে। ডাকঘরের সিলমোহর দেখলেন। অস্পষ্ট, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ঠিকানাটা অবশ্যই পার্থর লেখা। কিন্তু এ হাতের লেখা যারা মনে রাখতে পারে তাদের কারুর হাতেই এ-খামটা পড়েনি। খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করলেন তিনি।

'বহু বছর, পনেরো-ষোলো বছর হবে, আপনার সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। যোগাযোগ থাকুক এটা আপনার অভিপ্রেতও ছিল না। আপনি স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছিলেন বাড়ির সঙ্গে আমি যেন কোনও ভাবেই কোনও সম্পর্ক না রাখি। একদা যে-রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক আমাকে ঘর ছাড়িয়েছিল, সেই রাজনীতিকে আপনি সর্বান্তকরণে ঘৃণা করতেন। আমার বিশ্বাস, এখনও করেন। আমার এই চিঠি আপনাকে অপ্রসন্ন করবে, এই ভয় হয়তো অমূলক নয়। সম্প্রতি আপনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন, দেশবাসীর সঙ্গে এ-খবর আমিও জানি। কিন্তু রাজনীতি থেকে অবসর নিলেই তো মতাদর্শের কোনও পরিবর্তন হয় না। আপনার কনিষ্ঠ সন্তানের প্রতি আপনার মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে, এমন ধারণা করার মতো কোনও কারণ নেই।

একদা আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত জীবনে প্রচুর অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার চরমপন্থী আচরণ। বিখ্যাত রায়বাড়ির কোনও ছেলে প্রথাগত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করুক, এটা কখনও আপনি চাননি, সম্ভবত এখনও চান না। আপনার রাগ তাই এখনও আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করেনি। আমি মৃত কিংবা নিখোঁজ নই, এ-সংবাদ আপনার মসৃণ কপালে অস্বস্তির ভাঁজ ফেলবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ-চিঠি না লিখে আমার কোনও উপায় নেই। আমি জীবিত আছি,

অন্তত এই মুহূর্তে, যখন এ-চিঠি লিখছি। কোথায় আছি নীচে ঠিকানা দেওয়া থাকবে।'

চোখ থেকে চশমা খুলে জামার প্রান্ত দিয়ে কাচ মুছলেন ইন্দ্রনাথ। একটু একটু করে অস্পষ্ট হয়ে আসছে চিঠির হস্তাক্ষর। দিনের আলো কমে এসেছে। উঠে গিয়ে আলো জ্বালাতে হয়। উঠতে যাবেন, বারান্দায় কার পায়ের শব্দ শুনলেন। বিভা আসছে কি? চিঠিটা ভাঁজ করে পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দিলেন। একটু সময় চুপ করে বসে রইলেন। এ-সময় অবশ্য বিভার আসার কথা নয়। সন্ধে হয়ে যাবার অনেক পরে ঘরে আসে সে। কোনও দিনই নিয়মের হেরফের হয় না। ইন্দ্রনাথ মনে করেন ঠাকুর উপলক্ষ মাত্র, আসলে এটা ঠাকুরঘরে বিভার স্বেচ্ছা নির্বাসন। নইলে ইন্দ্রনাথের কাছে বিভা অনেক দিন অনেক বার এ-কথা বলত না, তুমি একবারটি শুধু আমাকে খবর এনে দাও যে পার্থ বেঁচে আছে। আমি আর-কিছু চাই না।

বিভা নয়, কাজের লোক হরি এসে ঘরের আলো জ্বেলে দিল। এ-বাড়িতে আরও কাজের লোক আছে, কিন্তু হরিই ইন্দ্রনাথকে দেখাশোনা করে। পার্থকেও হরি খুব ভালবাসত। এ-বাড়ির একমাত্র নিয়মভাঙা ছেলেটার জন্যে তার মনের দুঃখকে কখনও লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেনি সে। কোলে পিঠে করে পার্থকে সে বড় করেছিল যে! ইন্দ্রনাথের ভারী লোভ হচ্ছিল, হরিকে বলেন যে পার্থ বেঁচে আছে, তার চিঠি এসেছে। কিন্তু বললেন না। সামলে নিলেন নিজেকে। চমকে দেবার মতো এমন দারুণ একটা সংবাদ হরিকে জানাতে পারলেন না তখনই।

মা কী করছে রে হরি?

সবে শীত গেছে। সন্ধের পর অল্প অল্প ঠান্ডা পড়ে এখনও। শীতশীত হাওয়া আসে। হরি জানলা বন্ধ করতে করতে বলল, মা তো ঠাকুরঘরে থাকেন এখন। ডেকে দেব?

বিভা এ-সময় ঠাকুরঘরে থাকে, কথাটা ইন্দ্রনাথের অজানা থাকার কথা নয়। আসলে মনের দারুণ উত্তেজনাই এই ভুলটা ঘটিয়ে দিয়েছে। আজকের ডাকে পার্থর চিঠি এসেছে এই তুমুল কথাটা একমাত্র তিনিই জানেন। এ বাড়ির আর কেউ না। হরি না, এমনকী পার্থর মা বিভাও না।

না, ডাকার দরকার নেই। এক কাপ চা নিয়ে আয় তো হরি।

হরি চলে গেলে ইন্দ্রনাথ পকেট থেকে চিঠিটা বের করলেন। তিনি টের পেলেন তাঁর হাত কাঁপছে। রক্তের চাপ কি বাড়ল? নাকি এক বিরাট বিস্ফোরণে মনের মধ্যে যে অবিরাম ভাঙচুর চলছে তারই প্রতিক্রিয়া? তাঁর ছেলে পার্থ বেঁচে আছে, পার্থর চিঠি এসেছে, এ সংবাদ কি তাঁর কাছে সবকিছুর চেয়ে বেশি চাঞ্চল্যকর নয়?

'আপনার আশা ছিল দাদাদের মতো আমিও রায়বাড়ির সুখ্যাত ঐতিহ্যের ধারাবাহিক উজ্জ্বল সংযোজন হব। কিন্তু আমি আপনাকে হতাশ তো করলামই, উলটে মূল স্রোতের বাইরে ছিটকে গিয়ে দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণা হয়ে রইলাম। সত্তর দশকের গোড়ায় যে ভীষণ ঝড় উঠেছিল, পুরনো ভাবনাচিন্তাগুলোকে শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে নিয়েছিল, সেই ঝড় আমাকে উপড়ে নিয়ে গেল রায়বাড়ি থেকে। পুরনো মূল্যবোধগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার এক অস্থির রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে আমিও শামিল হয়ে গেলাম। সে-সময় বিদেশি শাসন সদ্য অপসারিত হয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পূর্ণ, আপনারা ক্লান্ত এবং আরামপ্রিয় আপসকামী মানসিকতায় আচ্ছন্ন। মুখে অবশ্য দেশ ও জাতিগঠনের অনলস সংগ্রামের কথা বলতেন, যা কিনা আমার কাছে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রতারণার কৌশল মাত্র মনে হয়েছিল। ছাত্র হিসেবে কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জন করেছিলাম, আপনার আশা ছিল আমিও কোনও কৃতবিদ্য সফল মানুষ হব। কিন্তু তখন এক সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্যে আমি এবং আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। রক্তের বিনিময়ে যে-ইতিহাস লেখা হয়নি, সেই আবেগ সর্বস্ব ইতিহাসকে জঙ্গি বন্দুকের নল দিয়ে বদলে দিতে চাইলাম। ঝাঁপিয়ে পড়লাম গণ আন্দোলনের চরম এবং শর্তহীন রণাঙ্গণে।

'পুলিশ যথারীতি আপনার বাড়িতে এল আমার খোঁজে। আপনি তখন শহরের সম্মানিত জননেতা। পুলিশের আচরণে নিশ্চয়ই ঔদ্ধত্য ছিল না, কিন্তু আপনার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল।

ব্যর্থতা আর আশাভঙ্গের আক্রোশ আপনার মধ্যে ক্ষমাহীন ক্রোধের জন্ম দিল। আমার দুই দাদার, একজন দক্ষ আইনজীবী এবং অন্যজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার, সফলতা আপনাকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিলেও রায়বাড়ির কলঙ্ক কনিষ্ঠ সন্তানের জন্যে আপনার নিষ্কলুষ রাজনৈতিক জীবনে যে ময়লা দাগ লেগেছিল, সে কারণে আপনি আমার জন্যে স্নেহ, ভালবাসা আর ক্ষমার দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিলেন।'

কিন্তু সত্যিই কি তাই? ফুরিয়ে আসা দিনের মলিন অপবাহ্নে ইন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ান আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি। সত্যিই কি সেই রাগ সেই বিরক্তি আজও জমা আছে? তাঁর দুই ছেলের সফলতার পাশে আরেক ছেলের ব্যর্থতাকে রেখে সত্যি কি তিনি আজও কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেয়ে থাকেন?

বিভাকে একদিন বলেছিলেন, তোমার কষ্ট আমি বুঝি, কেননা তুমি মা। কিন্তু শিবু দেবু আছে, ওরাও তো তোমার ছেলে।

বিভা ম্লান হেসে বলেছিল, শিবনাথ আছে, দেবনাথ আছে, কিন্তু পার্থ নেই। আমার তিন ছেলে। দু'জনে থাকলেই কি তিনজনের থাকা হয়ে গেল?

ইন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন কী বলতে চেয়েছিল বিভা। রুদ্রনাথের ছেলে ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথের ছেলে শিবনাথ, দেবনাথ এবং তৃতীয়জন শুধু পার্থ। রায় পরিবারের তিন পুরুষের ধারাবাহিকতার বাইরে এক আলাদা পরিচয়ের মানুষ। শিবনাথ আর দেবনাথ লেখাপড়া শিখে রায় পরিবারের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে। তারা সফল মানুষ। কিন্তু পার্থ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হয়েও বেঁচে থাকার প্রচলিত ধারাকে বদলে দিতে বেছে নিল এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পথ। সত্তর দশকের মুক্তির ডাক তাকে টেনে নিয়ে গেল গণ্ডির বাইরে।

আমি এইটুকুই যদি জানতে পারতাম ছেলেটা অন্তত প্রাণে বেঁচে আছে, শুধু এইটুকুই যদি— আঁচলে চোখ ঢাকত বিভা।

ইন্দ্রনাথও ইদানীং জানতেন না পার্থ কোথায়, কী অবস্থায় আছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে বাড়িতে আসেনি। তার অনেক আগেই পুরনো ব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার সেই চরম পন্থার লড়াই পুলিশি কৌশলই শেষ করে দিয়েছিল। অধিকার অর্জনের জন্যে ক্ষমতার উৎস যে বন্দুকের নল, সেই নলই বিপ্লবীর বুকে এসে ঠেকেছিল। যে মুক্ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন একদল টাটকা তরুণের চোখ উজ্জ্বল করে তুলেছিল, সেই চোখে নেমে এসেছিল হতাশার ঘোর অন্ধকার।

কারুর পায়ের শব্দে নড়েচড়ে বসলেন ইন্দ্রনাথ। চিঠিটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে রাখলেন। চা নিয়ে এসেছে হরি।

শরীরটা কি ভাল লাগছে না কর্তাবাবু, তখন মা'র খোঁজ করছিলেন?

ইন্দ্রনাথ সচকিত হলেন। হরি কি কিছু বুঝতে পেরেছে? কিন্তু কেমন করে হরি চিঠির কথা জানবে? আসলে তিনি মনে মনে দারুণভাবে বিচলিত এখন। তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে এক অলৌকিক শক্তি, যা কিনা এক মুহূর্তে এ বাড়ির স্থিতাবস্থাকে ওলটপালট করে দিতে পারে। তিনি জানেন নিখোঁজ পার্থের জন্যে এ-বাড়ির সবক'টা মনের কিছু জায়গা জুড়ে এক গোপন দুঃখ আছে। সেই পার্থর ঠিকানা এখন তাঁর হাতের মুঠোয়। ভেতরে ভেতরে আলোড়িত হবেন না এমন শক্তি তাঁর নেই। তিনি জানেন তাঁর সেই পুরনো বিশ্বাস থেকে তিনি এখন অনেক দূরে সরে এসেছেন। অথচ বাইরের ঠাটটা তিনি একই রকম রেখেছেন। ভেতরে ভেতরে তিনি হেরে গেছেন, গুঁড়িয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর বাইরের শর্তহীন, আপসহীন দীপ্র ব্যক্তিত্বের ছবিটা একেবারে পরিপাটি ঝকঝকে রেখেছেন। সবাই জানে ইন্দ্রনাথের কাছে পার্থ এক শিলীভূত মৃত অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইন্দ্রনাথ কি বোঝেন না, জানেন না যে পার্থ যাই করুক, ভুল করুক আর ঠিক করুক, নিজের সুখের জন্যে কেরিয়ার তৈরি করার জন্যে কিছুই করেনি। শিবনাথ আর দেবনাথের মতো শুধু নিজের নিরাপদ নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ তৈরি করার জন্যে প্রচলিত ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।

তিনি সেটা জানেন, বোঝেন। কিন্তু কাউকে বুঝতে দেন না যে অন্তঃসলিলা নদীর হিমজল তাঁর বুকের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

'যে-সময় সুখী এবং সমৃদ্ধ জীবন আমার সামনে প্রসারিত, তখন আমি স্বপ্ন দেখলাম ব্যক্তিগত জীবনের নয়, সুখী ও সমৃদ্ধ অন্য এক পৃথিবীর। কেননা আমার মনে হয়েছিল কেরিয়ারের সোনার হরিণের পেছনে ছুটে বেড়ানোর অর্থই হল নির্লজ্জ সুবিধাবাদ, দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে বিভেদের সীমারেখা টেনে এক উন্নাসিক বিচ্ছিন্ন শ্রেণী তৈরি করা। একদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ, অন্যদিকে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছে গরিব মেহনতি মানুষের সঙ্গে সুনিপুণ প্রতারণা— এমনিতর সময়ে শুধু নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকাটা চরম হৃদয়হীনতা ছাড়া আর কী। অবশ্য আমি জানি সেই জঙ্গি আন্দোলন আপনাকে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করেনি। আপনি বিশ্বাস করেন রক্তক্ষয় নয়, দেশগঠনের জন্যে রক্তের প্রয়োজন অনেক বেশি।'

'কিন্তু এখনও কি তাই বিশ্বাস করেন ইন্দ্রনাথ? না। তাঁর সেই বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে অনেক দিন আগেই। অন্যায়, নীচতা, স্বার্থপরতার সঙ্গে গড়াপেটা করে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর দিকে নয়, অতলান্ত খাদের শীতল অন্ধকারের দিকে। ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় তিনি সরে দাঁড়ালেন রাজনীতি থেকে যখন চোখের সামনে দেখলেন দেশে শিব প্রতিষ্ঠিত হয়নি, চলেছে ভূতের নৃত্য। রাজনীতি পরিণত হয়েছে এক বেনিয়া শিল্পে। এই চরম মনুষ্যত্বহীনতার দুঃসময়ে তাঁর বেশি করে মনে পড়ে সেই সশস্ত্র প্রতিবাদকে, পার্থদের, পার্থকে।

'কিন্তু অচিরেই আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। দার্শনিকরা পৃথিবীকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু মার্কস মনে করতেন, যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি, তা হল পৃথিবীর পুরনো নিয়মকানুনগুলোকে বদলে দেওয়া। আর এই বদলে দেবার ইতিহাস লেখা হয় সর্বাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সে-বিপ্লব শুধুমাত্র আবেগ আর কয়েকটা বন্দুক দিয়ে হয় না, তার কৌশলগত দিক আছে, বিজ্ঞান আছে। এখন বুঝি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ছিল না সামান্যতম বাস্তববোধ, যা কিনা দেশের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের এক অতি সামান্য অংশ কিছু লেখাপড়া জানা শহুরে যুবকের বৈপ্লবিক ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আকৃষ্ট করতে পারেনি লক্ষ লক্ষ শোষিত শ্রমিক কিংবা ভূমিহীন গরিব কৃষকদের। অথচ কোনও সুগঠিত বিপ্লবের অগ্রনায়ক তো তাদেরই হবার কথা। ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে যা হবার কথা, তা হয়েছে তৎকালিক আবেগে। সবচেয়ে বড কথা, সেটা মোটেই সময়ভিত্তিক ছিল না। টাটকা বয়েসের রোমান্টিক ভাবাবেশে কিছু মৃত ব্যক্তির মূর্তি ভাঙলেই, কিছু জীবিত লোককে খতম করলেই, বিপ্লব হয় না। সেই বিস্ফোরণ সাধারণ মানুষের মনে আদর্শের বদলে আতঙ্ক ছড়াবেই। এই ভুল যখন বুঝলাম তখন ফেরার আর উপায় ছিল না। পুলিশি হেফাজতের প্রতিহিংসা আমার জীবনীশক্তি অনেক কমিয়ে দিয়েছে তখন।'

ইন্দ্রনাথের কপালে অপার বিস্ময়ের রেখা ফুটে ওঠে। এ কী লিখেছে পার্থ? তবে কি এই চূড়ান্ত অবক্ষয় তাঁর শেষ বিশ্বাসকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না? পার্থদের পথ তিনি কোনও দিনও সমর্থন করেননি, এখনও করেন না, কিন্তু আজও বিশ্বাস করেন এই মৃত্যুপুরীতে তারাই ছিল একমাত্র জীবিত মানুষ।

'আমি কোথায় আছি নীচের ঠিকানা দেখে জানতে পারবেন। জায়গাটা ডুয়ার্সের চা বাগানের লাগোয়া একটা আধা শহর। আমার স্ত্রী কৃষ্ণা এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। ওর সামান্য বেতনে আমাদের সংসার চলে না, চালিয়ে নিতে হয় মাত্র। কৃষ্ণা আমাদের অনুগামী অসীমের বোন। অসীম ধরা পড়ার পর জেলখানাতেই, পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, এক সংঘর্ষে মারা যায়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর আমি বাড়িতে ফিরে যাইনি। এই না-ফেরার জন্যে আমার মধ্যে যে অদম্য মনোভাব সক্রিয় ছিল, তার কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই।

'যে-কথা বলার জন্যে আমার এই চিঠি, সেটা বলি এখন। জেলখানা থেকে আমি ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরেছিলাম, এখন দুরারোগ্য নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিছু কাজ করে সংসারের কষ্ট লাঘব

করার ক্ষমতাও এখন নেই। আমার দু'টি সন্তান। ওদের জন্যেই আমার যা কিছু ভাবনা। আমি বর্তমান থাকতেই ওদের সুখী করতে পারলাম না, আমার অবর্তমানে কী হবে?

'অথচ, এখন মনে হয়, আমি যে-বাড়ির সন্তান, সেই রায়বাড়ির বংশধর হয়ে ওদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা কোনও সমস্যাই হবার নয়। এসব কথা হয়তো আমাকে ভাবতে হত না, যদি কৃষ্ণা মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং প্রচণ্ড আত্মাভিমানী না হত। পুলিশের গুলি এক বছরের মধ্যে ওর দু'ভাইয়ের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে। এই যে আপনাকে চিঠি লিখছি তা কৃষ্ণা জানে না। জানলে কিছুতেই এ-চিঠি লিখতে দিত না।

'সব জানিয়ে আপনাকে চিঠি দিলাম। এখন আপনি যা ভাল বুঝবেন—'

কার চিঠি?

চমকে ওঠেন ইন্দ্রনাথ। বিভা কখন ঘরে এসেছে তিনি টেরও পাননি। দাঁড়িয়ে আছে অদূরেই। চিঠিটা ভাঁজ করে তিনি পাঞ্জাবির পকেটে পুরলেন। শুধু মাথা নেড়ে জানালেন তেমন কারও চিঠি নয়।

বিভার মুখ থেকে তখনও প্রশ্নটা মুছে যায়নি। একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। নিজেকে স্বাভাবিক দেখাতে চাইলেন। বললেন, চেনা একজনের চিঠি। তেমন কিছু নয়। পড়ছিলাম বসে বসে।

বিভার কপালে ভাঁজ পড়ে আছে তেমনই। ইন্দ্রনাথের কথায় যেন খুশি হতে পারছে না। একটু সময় ইন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কী লিখেছে চিঠিতে?

ইন্দ্রনাথের হঠাৎ উষ্মা এসে যায়। বললেন, বললাম তো তেমন কিছু নয়, তাও প্রশ্ন করছ কেন?

তাঁর ভারী রাগ হয়ে যায় বিভার ওপর। কিছুই বোঝে না বলে। এইটুকু বোঝে না যে মায়ের কাছে ছেলের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া যায় না।

পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তাঁর হাতের মুঠোতে ঘামে ভেজা চিঠির কাগজটা দলামুচড়া পাকিয়ে যেতে থাকে।

সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে

আমরা এক বিচিত্র দেশে বাস করছি। আমাদের চারদিকে বৈষম্যের আকাশ পাতাল ব্যবধান। দুর্নীতি আর সুবিধেবাদের মধ্যে আমরা কেরিয়ার তৈরি করছি, চরম স্বার্থপরতার মধ্যে এস্টাব্লিশমেন্ট খুঁজছি। আমাদের দেউলিয়া অর্থনীতি ধনীকে আরও ধনী, গরিবকে আরও গরিব করছে। যখন তখন দোল-দুর্গোৎসবের মতো ভোট-উৎসব হচ্ছে, ফেস্টুন আর পতাকার মালায় শহর সাজানো হচ্ছে, আমরা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বিগলিত হয়ে ভোট কেন্দ্রে লাইন দিচ্ছি। সাধারণ মানুষকে এক্সপ্লয়েট করে নেতারা বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে বসে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ কিংবা গান্ধীবাদ করছেন, গরিবের ভোটে নির্বাচিত মন্ত্রীমহোদয় অসুখের চিকিৎসা করাতে সরকারের টাকায় বিদেশে যাচ্ছেন, আর আমরা এই অতি সাধারণ মানুষেরা ধর্ম কুসংস্কার আর ভাগ্যের ক্রীতদাস হয়ে দলে দলে জন্মাচ্ছি, টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। প্রভু রাখলে থাকছি, না রাখলে থাকছি না। এ এক অদ্ভুত দেশ। এখানে শঠতা নিপুণ কৌশলে সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত ঠকিয়ে যাচ্ছে, বিভ্রান্ত মানুষ নকলটাকে আসল ভাবছে। সুনু, এই যে তুমি কলেজে যাচ্ছ, লেখাপড়া করছ, কিন্তু অন্তঃসার শূন্য অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা তোমাকে শেখাচ্ছে না কিছুই। তুমি যা পড়ছ, শিখছ, তোমার আচরণীয় জীবনে তা গ্রহণ করছ না। যা শিখছ না, সেটাই তুমি করছ। এখানে যা আছে সব ওপরে ওপরে আলো ঝলমল, ভেতবে অন্ধকারেব নরকগুলজার। এখানে ঘুষ ছাড়া সরকারি দপ্তরে কাজ হয় না, পেছনের দরজা ছাড়া চাকরিতে ঢোকা যায না, ভেজাল জিনিস ছাড়া বাজারে বিক্রি হয না, শিক্ষিত মেধাবী যুবক ছেঁড়া জামা পরে অর্ধাহারে থাকে আর গোমুর্খ বানিয়া ফাইভস্টার হোটেলে বসে সোনার চামচেতে মুর্গমুসল্লম খায়। এখানে অন্যায ভ্রষ্টাচার সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত, আদর্শ, নীতি আর সততার পিঠ ঠেকে আছে দেয়ালে। সুনু, আব কিছু না কবি, আমরা তো রাগ করতে পারি। রাগ করার অধিকার তো কারও কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয় না। বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দিয়ে লড়াই করার অভ্যাসটাকে তো থামিয়ে রাখা যায় না।

সল্টলেক এলাকায সাম্প্রতিক নির্মিত এই বাড়ির দোতলার দক্ষিণপ্রান্তেব এই ঘরের দু'পাশে দুটো চেয়ার, মাঝখানে টেবিল। ঘরের দরজার পরদাটা মাঝখান থেকে সরানো। যে-চেয়ারে অমল বসে ছিল, সেটা দবজার মুখোমুখি। সুনেত্রা বসে আছে ওপাশের চেয়ারে অমলের দিকে মুখ করে। সময়টা বিকেলও সবে শেষ হয়েছে, সন্ধেও সবে শুরু হয়েছে, এইরকম সময়ের। ঘরে আলো জ্বলছে।

সুনেত্রা তার কলেজের পড়া বুঝতে এসেছে অমলের কাছে। বিষয বাংলা সাহিত্য। অমল যদিও অর্থনীতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালযে পড়ছে, তবু সাহিত্যে অনায়াস গতি তার। উত্তরবঙ্গের এক ছোট শহর থেকে এ-বাড়িতে এসেছে সে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ মফস্সল শহরে নেই, শান্তিপিসি অনেক করে বললেন সোমনাথকে, সোমনাথ কলকাতায় নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন অমলকে।

সুনেত্রা টানটান হয়ে শুনছিল অমলের কথা। নতুন কোনও কথা নয়, কিন্তু এমন দৃঢ় প্রত্যয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে নতুন শুনছে সে। জানা কথাগুলোর এই নতুন মানেগুলো জানত না সে। তার চোখে আবিষ্কারের মুগ্ধ বিস্ময়।

বলতে বলতে অমল থেমে গিয়েছিল হঠাৎই। থেমে থাকাটা যখন বেশিক্ষণের হয়ে যাচ্ছিল, তখন সুনেত্রা বলল, কী হল? থামলে কেন? বলো।

একটু আগে অমলের চোখে পড়েছে দুটো পায়ের পাতা। দরজায় পরদাটা যেখানে আধাআধি ঝুলছে, সেখানে মেঝে আর পরদার ফাঁকা জায়গাতে দুটো প্রশ্ন চিহ্ন দেখেছে সে। ওখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন সুনেত্রার মা। পাহারাদার? অমল চশমাটা অকারণেই খুলে নিল চোখ থেকে। হাত দিয়ে চোখ রগড়ে নিয়ে দৃশ্যটা মুছে ফেলতে চাইল চোখ থেকে।

আজ এই পর্যন্তই থাক সুনু।

সুনেত্রা বলল, সেকী, কী বলছিলে শেষই তো করলে না।

এখন একটু বাইরে বেরোব। একটু গম্ভীর দেখাল অমলকে।

সুনেত্রা উঠে দাঁড়িয়ে বই হাতে নিয়ে বলল, বেশ লোক যা হোক তুমি। কখন যে কোন মুডে থাকো, ভগবানও জানে না।

মল্লিকা দ্রুত সরে এলেন পরদার পেছন থেকে। নিজের ঘরে গেলেন। তাঁর কপালে চিন্তার আঁকিবুকি। ব্যাপারটা দুর্ভাবনার জায়গায় এসে গেছে নিঃসন্দেহে। সুনু আগেও অমলের কাছে আসত পড়া বুঝে নিতে। তা ছিল কখনও সখনও, মাঝেমাঝে। তাতে আপত্তি করার কিছু নেই, বরং উপকারে আসছে মনে করতেন। এখন আসাটা বেড়ে গেছে, প্রায় সবসময়ই হয়ে যাচ্ছে। পড়াটা ঠিক পড়ার মধ্যে নেই, তার চেয়ে বেশি কিছু, অন্য কোনও ঘটনার দিকে ঝড়ো হাওয়ার মতো এগিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ বেশবাসের অগোছালো ছেলেটার মধ্যে কী আছে কে জানে, সুনুর বাতাসে পা।

কিন্তু তাঁর একমাত্র সন্তানের এই স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছল জীবন এক অতি সাধারণ ছোট মাপের যুবকের সঙ্গে কোনও জটিল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ুক, এটা তো চিন্তা ভাবনারও অতীত। সেটা কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না। অমল প্রথম যখন এ-বাড়িতে আসে তখনও মল্লিকাব পছন্দ ছিল না। কী হবে একটা উটকো ছেলেকে বাড়িতে রেখে। কিন্তু মল্লিকা জানেন সোমনাথ প্রতিটি পা ফেলেন হিসেব করে, তাঁর প্রতিটি কাজের পেছনে থাকে অঙ্কের সমাধান। মল্লিকা তাই খুশি না হলেও আপত্তি করেননি। ভেবেও ছিলেন মফস্সল শহরের মামুলি ছেলে, একটু নিরীহ গোছেরও, হাতদুটো ছোটই থাকবে বরাবর। এখন বুঝতে পারছেন ভুল ভেবেছিলেন তিনি। বাইরে থেকে ঠান্ডা মানুষ দেখালেও ভেতরে ভেতরে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে অমল। প্রচলিত ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতে শেখাচ্ছে সুনুকে, মেয়েটার সাদা মনটাকে কালো করে দিতে চাইছে। ব্যাপারটাকে আর কোনওমতেই এক পা-ও এগিয়ে যেতে দেওয়া চলে না, অবিলম্বে সম্পূর্ণ থামিযে দেওয়া দরকার। আর একটুও দেবি না করে কাঁটাগাছকে শেকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। ঘড়িতে সময় দেখলেন মল্লিকা। সোমনাথের ফেরার সময় হয়েছে। একটু পরেই ডোরবেলের শব্দ শুনলেনও। সোমনাথ ফিরেছেন।

ঘরে ঢুকেই সোমনাথ দাঁড়িয়ে পড়লেন। মল্লিকা গম্ভীর মুখে সোফায় বসে আছেন। বোঝা যাচ্ছে সোমনাথকে কিছু বলবেন বলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে আছেন। একটা অভিযোগ ইদানীং প্রায়ই শুনছেন। সেইটাই কি আজও?

একটু সিরিয়াস দেখছি যেন, কী হল?

মল্লিকা ফোঁস করে উঠলেন, যা হয় প্রত্যেকদিন। খাল কেটে কুমির এনেছ, এখন ঘর সামলাও।

অমলের কথা বলছ?

আবার কার কথা। এখনও সময় আছে। ভালয় ভালয় পাপ বিদেয় করো বলছি। মেয়ে এখন আর খুকিটি নেই কিন্তু।

এটা চলছে প্রত্যেদিনই প্রায়। মল্লিকার মুখে সুনেত্রা আর অমলের ঘনিষ্ঠতার কথা শুনতে হচ্ছে সোমনাথকে। নিজের চোখেও পড়েছে কিছু কিছু অসঙ্গতি। ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম প্রথম তেমন না ভাবলেও এখন ভাবছেন। ছেলেটা আছে, পড়ছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, এই পর্যন্তই ঠিক আছে। এর পরে তো অন্য কিছু অনধিকার হয়ে যাবে অমলের এবং তা হতে দেওয়াও যায় না। কয়েকদিন ধরেই

তিনি মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন। ছেলেটা একটু একটু করে তাঁর ঘরের সিঁধ কাটছে, বাধা না দিলে মূল্যবান জিনিস খোয়াতে হবে।

আজ আবার কী করল সে?

রোজ যা করে তাই করেছে। মেয়েকে কমিউনিস্ট করছে। কত কথা। তোমার মেয়েও কম যায় না। গদগদ হয়ে শুনছে ছোকরার মুখের অমৃতবাণী। কী সব ঘরভাঙানি কথা। সম্পত্তি মানেই নাকি চুরি! ও-ছেলেকে রাখা মানেই দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা।

সোমনাথ বসে পড়লেন সোফায়। রাগটাকে মনের মধ্যেই দরজা বন্ধ করে রেখে দিলেন। অবিলম্বে অমলকে সরাতে হবে এ-বাড়ি থেকে। আর দেরি করলে এ-বাড়ির মান সম্মানে হাত পড়বে। রাগ নয়, আবেগ নয়, সোমনাথ বিশ্বাস করেন কৌশলকে। যা করতে হবে ঠান্ডা মাথায়, নিখুঁত ছক কেটে। ছেলেটাকে শুধু এ-বাড়ি থেকে সরালে চলবে না, সরাতে হবে সুনুর মন থেকেও। এমনকী অমলের এ-বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার এমন একটা চেহারা দিতে হবে, যা কিনা অন্যদের কাছে, অমলের দিদিমা শান্তিপিসির কাছেও, অবিকল্প মনে হয়। অনেক জটিলতার মধ্যে থেকে একটা চমৎকার কৌশল বের করে নিতে হবে।

মল্লিকা দেখলেন সোমনাথকে। চোখে মুখে ভর্ৎসনা। বললেন, বুদ্ধি করে তো জীবনে অনেক কিছুই করলে। জমি কিনলে, বাড়ি করলে, ডাইনে-বাঁয়ে টাকা কামালে— এবার বুদ্ধি করে আপদটাকে—

সোমনাথ গম্ভীর গলায় বললেন, বাড়ি, জমি, টাকা— এগুলো কি তোমাদের দরকারে লাগছে না? একটু ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো।

দৃষ্টিটা সরু করে মল্লিকা বললেন, নীতি শিক্ষা দিচ্ছ নাকি?

ধরে নিতে পারো, দিচ্ছি।

ওটা কিন্তু তোমার মুখে শোভা পায় না। এত বছর ধরে তো দেখছি তুমি কী চিজ।

সোমনাথ দপ করে উঠলেন, এত বছর ধরে দামি দামি কসমেটিক্স, দামি দামি শাড়ি, সিমলা-কাশ্মীর, বুড়ি বয়েসে গালে রং মেখে ছুঁড়ি সেজে ক্লাব, মহিলা সমিতি করা, এসব হচ্ছে কোথা থেকে? তোমার বাপের বাড়ির টাকা থেকে?

মল্লিকা ঘৃণায় বিকৃত মুখে বললেন, কী ভাষা, একেবারে বস্তির লোক হয়ে গেছ। হবেই তো, দু'নম্বরি বাপের দু'নম্বরি মেয়েই হবে। দু'দিন পরে ওই ছোঁড়ার সঙ্গে পালাবে।

সোমনাথ প্রচণ্ড ক্রোধে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, সুনু, অ্যাই সুনু, শিগগির এদিকে আয়।

একটু পরেই সুনেত্রা ঘরে ঢুকে বলল, চেঁচাচ্ছ কেন? বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি?

ডাকাত পড়েনি, চোর পড়েছে। সোমনাথ আরও সরব হলেন, কী ভেবেছিস তুই? লজ্জা করে না তোর?

অবাক দেখাল সুনেত্রাকে, কেন, লজ্জা করবে কেন?

কেন, জানিস না? ওই স্কাউনড্রেলটার সঙ্গে তোর এত মাখামাখি কীসের?

স্কাউনড্রেল? কে?

অমল, তোর অমলদা। কোথায় গেছে শুয়োরের বাচ্চাটা? ফিরুক বাড়িতে? জুতিয়ে মুখ লম্বা করে দেব রাস্কেলটার।

ছি ছি ছি। কী কথা। কোথায় নেমে গেছ তোমরা।

আর তুমি একেবারে ওপরে উঠে গেছ, না? আমাদের মান সম্মান একেবারে স্বর্গে তুলে দেবার ব্যবস্থা করছ।

সুনেত্রা হাসল, তোমাদের মান সম্মান? আছে নাকি সেসব কিছু? শুনলাম তো এতক্ষণ তোমাদের দু'জনের ঝগড়া। শুনতেও ঘেন্না লাগে।

আর ওই ছিঁচকে চোরটার কথা শুনতে অমৃতবাণী মনে হয়, তাই না?

ওকে তো তুমিই এনেছ। জানি না বুঝি কেন ওকে খাতির করে এ-বাড়িতে এনেছিলে? লোভ, লোভ। ওদের জলপাইগুড়ির জমিটা হাতিয়ে নেবার তাল। একটা পেটি অফিসার হয়ে এত সম্পত্তি করেছ কেমনভাবে, জানি না ভেবেছ?

রাগে কেঁপে উঠলেন সোমনাথ, কী? কী বললি হারামজাদি? থাবড়ে মুখ ভেঙে দেব। এইসব শেখানো হচ্ছে বুঝি! পেজোমি ছুটিয়ে দিচ্ছি বাছাধনের, দাঁড়া।

তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার রুচিতে বাধে। চলে যাবার জন্যে তৈরি হয়েও সুনেত্রা থেমে গেল। বলল, কিন্তু পারবে না, কিছুই করতে পারবে না। কিছু করার জন্যে যে-মরালিটির দরকার, তা তোমাদের নেই। আরেকটা কথা বলি, যাকে স্কাউনড্রেল, শুয়োরের বাচ্চা বললে, এই নোংরা বাড়ির দম-আটকানো পরিবেশে সে-ই একমাত্র নিষ্পাপ মানুষ, নিশ্বাস নেবার মতো মুক্ত বাতাস। আর দাঁড়াল না সুনেত্রা। দ্রুত চলে গেল।

সেই দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চিত্রার্পিত সোমনাথ।

মল্লিকা বললেন, নিজের কানেই তো শুনলে সুনু কী বলে গেল। এইসবই ভাবছে আজকাল। সবসময় কানের কাছে ফুসুর ফুসুর গুজুর গুজুর, হবে না। ওকে আর ফেরানো যাবে না।

সোমনাথ কিছু ভাবছিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বললেন না। বললেন, একটু পরে। আশ্চর্য শীতল শোনাল তাঁর গলা।

ফেরানো যাবে, যদি ওর মন থেকে অমলকে কমপ্লিটলি ব্ল্যাক-আউট করে দেওয়া যায়। অল্প বয়েসের কাঁচা মন তো, মনটাকে একটু পাকিয়ে দিতে হবে।

হতাশ ভঙ্গি করে মল্লিকা বললেন, কী জানি। আমার তো কিছু ভাল ঠেকছে না।

একই ভাবে ঠান্ডা গলায় সোমনাথ বললেন, অমলকে আমিই বাড়িতে এনেছিলাম, আমিই তাকে বাড়ি-ছাড়া করব।

অমলকে এ-বাড়িতে আনার পেছনে ছিল সোমনাথের মানসিক যোগ-বিয়োগের সরল সমীকরণ। জলপাইগুড়ির শান্তিপিসির জমিটা অনেকদিন ধরেই সোমনাথের মাথায় খেলছিল। অনেকটা জমি খালি পড়ে আছে, শান্তিপিসিরও বয়স হয়েছে, সময় থাকতে একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারলে একটা বড় দাঁও পকেটস্থ করে নেওয়া যায়। এবার অমলের পড়াশোনার ব্যাপারে যখন শান্তিপিসির চিঠি পেলেন, তখন পুরনো চিন্তাটা আবার নতুন করে মাথায় এল।

শান্তিপিসি সোমনাথের খুব নিকট সম্পর্কিত কেউ হন না। সোমনাথের বাবার দিক থেকে দূর সম্পর্কের কী ধরনের বোন যেন। শান্তিপিসি একাই থাকতেন জলপাইগুড়ি, পুরনো বাড়ি আর সংলগ্ন অনেকখানি জমিজমা নিয়ে। অমল হল বুড়ির মেয়ের ছেলে। অল্প বয়েসে মাকে হারায়, বাবাও দেশত্যাগী হয়, তারপর থেকে দিদিমাই নাতিকে কাছে এনে রেখেছেন। জমির পশ্চিম অংশে দু'ঘর ভাড়াটে আছে। ওই ভাড়ার টাকাতেই দু'জনের সংসার চলে। অমল পড়াশোনা নিয়েই থাকে। খুবই মেধাবী ছাত্র। স্থানীয় কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষায় দারুণভাবে পাশ করে এম এ পড়বে এবার। তারই একটা সুরাহা খুঁজছিলেন শান্তিপিসি। চিঠি লিখলেন সোমনাথকে। কলকাতায় সোমনাথের বাড়িতে থেকে অমল পড়াশোনা করলে সোমনাথের খুব অসুবিধে হবে কি?

চিঠি পাবার দু'দিনের মধ্যে সোমনাথ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তিনি জলপাইগুড়ি যাবেন।

জলপাইগুড়িতে এসে জমি দেখে সোমনাথের চিলের চোখ। যে-কোনও ভাবে এ-জমি তুলে নিতেই হবে। এতদিন তিনি যা ভেবে এসেছেন, এ-জমি তার চেয়ে বেশি। জমি নয়, ছড়ানো সোনা। যে-অংশটা খালি পড়ে আছে, প্রায় দশ কাঠার মতো হবে, এই মফস্‌সল শহরেই তার দাম অনেক। জনসংখ্যার চাপ এ-দিকেও বাড়তি জমির খোঁজে অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছে। শহর বাড়ছে চারপাশে। জমির দামও বেড়েছে সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে। খোঁজ নিয়ে জানলেন এক কাঠাই দশ হাজার টাকার ওপরে। দু'বার ভাববার কোনও প্রশ্নই নেই। এ-জমির জন্যে অমলকে খুশিমনে

কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায়। অমল শান্তিপিসির নয়নের মণি। সে-কারণে সোমনাথও বুড়ির সুনজরে থেকে যাবে। কয়েক মাস যাক, তারপর ধীরে সুস্থে সোমনাথ ভালমানুষ সেজে বুড়ির কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে জমির কথাটা পাড়বে। অমলকে যতটুকু দেখলেন, তাতে বুঝে নিয়েছেন ছেলেটার বিষয়কর্মে নজর নেই। এদিকে কাছে পিঠে বুড়ির নিকটজন বলতেও কেউ নেই। সম্ভবত দূরেও নেই। যা একটু সম্পর্ক তা সোমনাথের সঙ্গেই। অমলকে কলকাতায় নিয়ে এলেন সঙ্গে করেই। বিয়োগের অঙ্কটা ছোট, যোগটাই বড় অঙ্কের।

আজ এতদিন পরে সোমনাথ বুঝলেন একটা লাভের চিন্তা ডেকে আনছে অন্য এক ক্ষতিকে। অমলের পাখা ছেঁটে না দিলে ক্ষতিটা আরও ব্যাপক হবে, অনেক জায়গা জুড়ে ডালপাতা ছড়াবে। যার মূল্য শান্তিপিসির কয়েক কাঠা জমি থেকে অনেক বেশি। অমলকে সরাতেই হবে, তবে সেটা সোজাসুজি করলে চলবে না। সুনুর চোখে যে-আগুন আজ তিনি দেখলেন, তাতে তিনি বুঝে গেছেন সোজাসুজি মোটা দাগের কিছু করলে সেই আগুন তাঁর ঘর জ্বালিয়ে দেবে। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না। অমলকে ছোট করতে হবে, হীন মনোবৃত্তির করতে হবে, কাপুরুষ চরিত্রের করতে হবে। সুনুর মনে অমলের যে-উজ্জ্বল ছবি আছে তার সমস্ত রং মুছে ফেলতে হবে। এবার আর সম্পত্তি নয়, মেয়ের মন তৈরি করবেন সোমনাথ।

রাতে মল্লিকা বলল, তোমার মেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। খায়নি। বলল খিদে নেই।

সোমনাথ বললেন, কাঁচা বয়েস তো, আবেগটাও তাই কাঁচা। চিন্তা নেই, দু'দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মল্লিকা বললেন, তা হোক, তুমি আর দেরি কোরো না। কালই ঢাকুরিয়ার ওই ছেলের বাপের সঙ্গে দেখা করো। সুনুর বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওযাটাই ভাল। এ-ছেলেটা ভালই মনে হয়। ইঞ্জিনিয়াব, ভাল চাকরি করছে, বাড়ির অবস্থাও ভাল। পড়তে চায়, বিয়ের পরে পড়বে। তুমি কালই যাও।

সোমনাথ বললেন, যাব। তবে তার আগে ঘরের শত্রুটাকে তাড়াতে হবে। ছোঁড়াটার সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের মেলামেশা আছে নাকি? দলেটলে থাকে নাকি?

মল্লিকা বললেন, না না, সেসব কিছু নেই। ওদিক দিয়ে পরিষ্কার ছেলে। সারাদিন তো ঘরেই থাকে, মেশেটেশে না কারুব সঙ্গে। পার্টিফার্টিও কিছু করে বলে শুনিনি। ওই ইউনিভার্সিটিতে যতটুকু সময় থাকে। কেন বলো তো?

সোমনাথ বললেন, ডিফেন্সটা কীরকম স্ট্রং জেনে নিলাম।

কী ব্যবস্থা নেবে বললে না তো?

নিজের চোখেই দেখতে পাবে। দুটো দিন অপেক্ষা করো। বাঘের ঘর থেকে ঘোগের বাসা ভাঙতেই হবে।

দু'দিন গেল। তিন দিনের দিন সকালে মল্লিকার নেকলেসটা পাওয়া গেল না। আগের দিন রাতে ওটা পরে এক বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ফিরে শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলেন। আলমারির লকারে রাখবেন বলে সকালে ড্রয়ার খুলেই দেখা গেল নেকলেসটা সেখানে নেই। প্রায় সাড়ে চার ভরি সোনার গয়না, শখ করে বানিয়েছিলেন কয়েক মাস আগে। মল্লিকা চেঁচামেচি ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন। কিন্তু অনেক খুঁজেও উধাও নেকলেসটার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

সোমনাথ বললেন, এতদিন পর্যন্ত এ-বাড়ি থেকে কুটোটি পর্যন্ত খোয়া যায়নি। না না, এসব মোটেই ভাল কথা নয়। যেমন করেই হোক নেকলেসটা পেতেই হবে।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও নেকলেস পাওয়া গেল না। সোমনাথ আরও কিছুক্ষণ সময় নিলেন, অপেক্ষা করলেন। কিন্তু অবস্থা যা ছিল, তাই রইল। নেকলসেটা দৃষ্টির বাইরেই রয়ে গেল।

সোমনাথ মাথা নাড়লেন, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। বাইরের কেউ যখন বাড়িতে আসেনি তখন নেকলেসটা হারাবে কেন? যাই তালুকদারকেই বলি। পুলিশ খুঁজে বের করুক জিনিসটা।

তালুকদার হলেন স্থানীয় থানার ওসি। সোমনাথের বিশেষ জানাশোনা লোক। একজন কনস্টেবল নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক পরে তালুকদার চলে এলেন।

রুটিন মাফিক তিনি কাজের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, দু'-একটা জায়গায় উলটেপালটে দেখলেনও। কিন্তু সবই যেন নিয়মরক্ষা। নেকলসেটা যে এভাবে পাওয়া যাবে না, তা যেন জানাই ছিল। এঘর ওঘর দেখে সব শেষে তালুকদার ঢুকলেন দোতলার দক্ষিণের ঘরে, যে-ঘরে অমল থাকে।

এ-ঘরে কে থাকে?

অমল চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, আমি থাকি।

তালুকদার ঘুরে দেখলেন অমলকে। চব্বিশ-পঁচিশের শ্যামলা চেহারা, দোহারা গড়ন, মুখে সামান্য দাড়ি গোঁফ, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, কাচের নীচে দুটো ঝকঝকে চোখ। তালুকদারের দৃষ্টি দু'বার ওঠানামা করল অমলের আপাদমস্তক। বাইরেটা শুধু নয়, শরীরের ভেতরটাও যেন দেখে নিতে চাইলেন।

সোমনাথ বললেন, ও হল অমল। অমল দত্ত। বাড়ি হল নর্থবেঙ্গলে, জলপাইগুড়ি। এ-বাড়িতে আছে গত কয়েক মাস।

কে হয় আপনার?

কেউ হয় না। আমার কোনও রিলেশন টিলেশন নয়। ওই থাকে। থাকে, বাড়ির কাজটাজ করে, পড়াশোনাও করে।

আই সি। এ-ঘরটা ভাল করে দেখা দরকার। তালুকদার কনস্টেবলের দিকে তাকালেন, বলরাম, ওর বাক্স পেটরাগুলো ভাল করে দেখো তো।

বাক্স পেটরা বলতে একটি মাত্র সুটকেস। তাকে ছিল, নামিয়ে আনল কনস্টেবল বলরাম। চাবি দেওয়া নেই। ডালা খুলে দেখা গেল কয়েকটা জামাকাপড় ছাড়া অন্য কিছু নেই। এবার তালুকদার নিজেই এগিয়ে এসে জামাকাপড়গুলোর তলায় হাত ঢোকালেন। একটু পরেই তাঁর হাত উঠে এল। শূন্য হাত নয়, হাতে ধরা রয়েছে একটি সোনার অলংকার। নেকলেস।

দেখুন তো সোমনাথবাবু, সেই নেকলেসটা কিনা?

সোমনাথের চোখ তখন কপালে। বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই তো সেই নেকলেসটা মনে হচ্ছে। কী কাণ্ড।

মল্লিকা দৌড়ে এলেন ঘরে। নেকলেসটা দেখে সেটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন তালুকদারের হাত থেকে। বললেন, এই তো, এটাই তো আমার নেকলেস। কোথায়, কোথায় পেলেন এটা?

তালুকদার অমলকে দেখিয়ে বললেন, ওর সুটকেস ছিল।

অমলের সুটকেসে ছিল? চোর, চোর, ইতর, ছোটলোক। ভালমানুষ সেজে তলে তলে সর্বনাশ করা হচ্ছে, না? বেইমান কোথাকার।

সোমনাথ বললেন, না খেয়ে মরছিল, পড়াশোনা হচ্ছিল না, ভাল বুঝে বাড়িতে নিয়ে এলাম— তার প্রতিদিন এই? আমারই খেয়ে আমারই ঘরে চুরি করা।

তালুকদার বললেন, এদের মুখ দেখে এদের চেনা যায় না সোমনাথবাবু। এরা যার খায়, যার দায়, তারই গলা কাটে। এই ব্যাটা বল, নেকলেসটা তোর সুটকেসে ছিল কেন?

দেখা গেল সমস্ত ঘটনা অমলকে এতটুকুও অবাক করেনি। একটা বাঁকা হাসি সবসময়ই তার ঠোঁটে ঝুলে ছিল। সহজ গলায় বলল, ওটা ওখানে রেখে দেওয়া হয়েছিল বলেই ছিল। আপনি তো ভাল করেই জানতেন যে নেকলেসটা আমার সুটকেসে জামাকাপড়ের নীচেই পাওয়া যাবে। সবই

তো সাজানো ব্যাপার। অবাক হবার মতো কিছু নেই। নেকলেস হারানো, সেটা খোঁজা, থানায় খবর দেওয়া, আপনার আসা— একটাই বানানো নাটকের পরপর দৃশ্য সব। উদ্দেশ্য, আমার চরিত্রহরণ, আমাকে এ-বাড়ি থেকে তাড়ানো।

তালুকদার কঠিন গলায় ধমক দিলেন, চোপ ব্যাটা চোর, তোর যা বলবার কোর্টে বলবি। এখন থানার লক-আপে চল।

অমলের হাসিটা প্রসারিত হল, কোর্টে? আমাদের মতো লোকের কথা পৌঁছায় সেখানে? সেও তো এক সাজানো ব্যবস্থা। উকিল, সাক্ষী, পেয়াদা, পুলিশ— ধুস, ওসব তো দেশের শোভা বর্ধন করছে। তাজমহল, কুতবমিনার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—

তালুকদার অমলের জামার কলার গলার কাছে চেপে ধরে বললেন, খুব লেকচার দেওয়া হচ্ছে, না? থানায় চল, লেকচার ছুটিয়ে দেব। থার্ড ডিগ্রি মেথড কী জিনিস জানিস তো? না জানলে আজ জেনে যাবি। বলরাম, হাতকড়ি লাগাও একে। চল ব্যাটা থানায় চল। সোমনাথবাবু—

সোমনাথ বললেন, আমি কী বলব! আইনে যা আছে, তাই হবে।

তালুকদার বললেন, হ্যাঁ, তাই হবে। চলি।

একটু পরেই অমলকে নিয়ে পুলিশের জিপ চলে যাবার শব্দ শোনা গেল।

পুলিশ চলে যাবার পর, যেমনটি হয়, উত্তেজনা, নানারকম কথাবার্তা, তেমন কিছু ঘটল না। বাড়িটা হঠাৎ যেন প্রবল তুষারঝড়েব নীচে চাপা পড়ে গেল। একটা ব্যস্ত দিনের আরম্ভ ফ্রেমে-আটকানো ছবি হয়ে গেল। মল্লিকা চলে গেলেন রান্নাঘরে, সোমনাথ চুপ করে বসে রইলেন, সুনেত্রা সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেছে, একটিবারও বাইরে আসেনি তারপর। পুলিশ যখন অমলের ঘরে ঢোকে, তখনও না, অমলকে নিয়ে পুলিশ চলে যাবার পরেও না। সেই সকালবেলায় যে-নাটকীয় ঘটনা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, মাঝপথেই যেন তার অন্তিম পরদা পড়ে গেল। মূল্যবান নেকলেসটা হারাল, পাওয়া গেল, ধরা পড়ল এত বড় চুরি, তার জন্য কোনওই আলোড়ন উঠল না। অনেক সময় অনেক কিছু হয়ে যায়, কিন্তু তার পেছনে মনের কোনও সানন্দ সমর্থন থাকে না, সেইরকম। সোমনাথ মনে করলেন, যা কিছু হয়েছে তা নিজের একমাত্র সন্তানের ভালর জন্যে, তার ভবিষ্যতের জন্যেই। সুনুকে অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা করতে এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। তিনি বাপ, সন্তানের ভালমন্দের ব্যাপারে অবশ্যই তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে। দরকার পড়লে কঠিন হতে হবে।

ঘণ্টাখানেক পরে মল্লিকা ঘরে ঢুকে বললেন, সুনু বাড়িতে নেই। বেরিয়ে গেছে।

সোমনাথকে খুব বিচলিত দেখাল না। বললেন, গেছে হয়তো কোথায়। ঠিক এসে যাবে।

মল্লিকাকে খুব নিশ্চিন্ত দেখাল না তবুও। কী জানি বাপু, ভাল ঠেকছে না আমার। বয়েসটা তো ভাল নয়।

সোমনাথ বললেন, আরে না, না। সেরকম কিছু ভয় নেই। সুনু কি বাইবে যায় না।

তা যায়, কিন্তু— কী জানি কেন, একটুও ভাল লাগছে না।

আসলে সুনু ভীষণ লজ্জা পেয়েছে, বুঝলে। যার হয়ে ওকালতি করতে এসেছিল, শেষে কিনা সে একটা চোর! মহাপুরুষ থেকে একেবারে কাপুরুষে পতন। চিন্তা কোরো না দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। এসব বয়েসে জ্বলে উঠতেও সময় লাগে না, নিভে যেতেও না।

মল্লিকার খুশিমুখ দেখা গেল না। বললেন, যাই বলো বাপু, বাড়াবাড়িটা একটু বেশি বেশি হয়ে গেছে। ছেলেটাকে একটু ঘুরিয়ে ভালমুখে বললেই হত, সে ঠিক চলে যেত। অতটা না করলেই চলত।

সোমনাথ বললেন, বাড়ি থেকে চলে যেত হয়তো, সুনুর মন থেকে কিন্তু যেত না। ওই যে বয়সের কথা বললে না, সেইজন্যেই একরকম বাধ্য হয়েই এসব করা। ছেলেটার চটকদারি কথায় সুনুর মন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল, ওকে এখনই না আটকালে পরে মুশকিলে পড়তে হত।

মল্লিকা বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু সুনু গেছেও তো অনেকক্ষণ।
এসে যাবে, এসে যাবে। ঠিক সময়মতোই এসে যাবে।

কিন্তু ঠিক সময়মতো সুনেত্রা এল না, এল অনেক পরে। সেই দুপুরে বেরিয়েছিল, তারপর দুপুর গেল, বিকেলের আলো কমে এল, সন্ধে ঘোর হয়ে গেল, তখন এল সুনেত্রা। মাঝের সময়টুকু সোমনাথ আর মল্লিকার ভাবনা, ভাবনা থেকে উদ্বেগ, উদ্বেগ থেকে আতঙ্কে কাটাতে হয়েছে। এ-সময়ে দু'জনের কথা কাটাকাটি ঝগড়াবিবাদের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আজ তেমন কিছু হল না। সোমনাথ বুঝতে পারছিলেন যে-উচ্চাশা তাঁকে ওপরে, আরও ওপরে ওঠার উসকানি দিয়েছে, তা নড়বড়ে করে দিয়েছে তাঁর মনের জোরকে। তাঁর ঘর গৃহস্থালির খুঁটি দমকা হাওয়ায় কাঁপছে। তাঁর চোখের সামনে অন্য একদিনের ছবি ভাসছিল। মধ্যজীবনে দেখা এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছবি।

প্রবল বৃষ্টি আর দুর্যোগের মধ্যে কী একটা জরুরি কাজে শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন। উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে জল আর কুয়াশার মধ্যে খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল ড্রাইভারের। একটা জায়গায় এসে সে গাড়ি থামিয়ে দিয়ে সোমনাথকে অদূরের পাহাড় দেখিয়ে বলল, দেখুন।

সোমনাথ দেখলেন একটু দূরের পাহাড় থেকে ধস নামছে। পাহাড়ের একটা বিশাল অংশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নামছে। পাহাড় অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর ভেঙে পড়ছে, কিন্তু তার কিছু করার নেই। তার মুখ নেই যে কিছু বলবে, হাত নেই যে আটকাবে। শুধু নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেরই পতন নিজে দেখছে।

সুনেত্রা যখন বাড়ি ফিরল, তখন দোতলার ঘরে নয়, নীচের তলার বসবার ঘরে ছিলেন সোমনাথ আর মল্লিকা। এ-ঘরের সামনের দরজাটা দিয়েই এ-বাড়িতে ঢুকতে হয়। সুনেত্রা ও-ঘর দিয়েই ঢুকবে ঘরে। একটু আগেই সোমনাথ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে আর একটু দেখেই তিনি মেয়ের খোঁজখবর করতে বেরোবেন।

ডোরবেলটা বাজতেই মল্লিকা দরজা খুলে দিলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সুনেত্রা। যেমন দেখায় তাকে প্রত্যেকদিন তেমনই দেখাচ্ছে। সটান দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটার মধ্যে কোনও জড়তা নেই, লজ্জা কিংবা ক্ষোভেরও কোনও আভাস নেই তার মুখে। শুধু একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, কিন্তু সেটা মনের কোনও প্রতিফলন বলে মনে হল না।

মল্লিকা বললেন, কোথায় গিয়েছিলি?

যেন কোনও ব্যাপারই নয়, এমনিভাবে সুনেত্রা উত্তর দিল, বন্ধুর বাড়ি।

মল্লিকা বললেন, বলে তো যেতে হয়। এদিকে আমরা ভেবে ভেবে অস্থির। সন্ধে হয়ে গেছে কখন।

বিষণ্ণ হাসল সুনেত্রা। বলল, ভয় নেই, কোনও নতুন সিন ক্রিয়েট করব না। স্বাতীর বাবা অ্যাডভোকেট। তাঁর সঙ্গে কথা বললাম।

মল্লিকা বললেন, কেন, অ্যাডভোকেটের সঙ্গে আবার তোর কী কথা?

সুনেত্রা বলল, বা রে, কোর্টে লড়তে হবে না।

কোর্টে? কোর্টে লড়বি তুই?

লড়তে হবে না? একজন সৎ, আদর্শবাদী মানুষকে তোমরা ষড়যন্ত্র করে পুলিশের হাতে তুলে দেবে, সেটা তো আর বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া যায় না। কিছু করা যাবে না জানি, তবু লড়াই করা অভ্যেসটা তো চালু রাখতে হবে।

সুনেত্রা গটগট করে চলে গেল ঘর থেকে। একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে মল্লিকাও গেলেন। মল্লিকা কি সুনুকে কিছু বোঝাতে গেল? মন ফেরাতে গেল? ঘরে দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন সোমনাথ। কোনও লাভ নেই। দরজা বন্ধ করে দিয়ে কি ভূমিকম্পকে ঠেকানো যায়?

একসময় সোমনাথের খেয়াল হল অনেকক্ষণ তিনি একা একা নীচের তলার এই ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। কী ভাবছিলেন, ভাল করে কিছুই তাঁর মনে পড়ল না। এবার তাঁর যেতে হবে। অনেক অনেক সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ফের উঠতে হবে। এ-ঘর পার হলেই দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন সোমনাথ। বড় ফাঁকা লাগছিল সিঁড়িটা, অনেক দূরের পথ মনে হচ্ছিল। এত লম্বা দূরত্ব কি তিনি পার হতে পারবেন?

মাঝামাঝি উঠে তাঁর মনে হল শরীরটা কেমন যেন লাগছে, জোর পাচ্ছেন না একদম। হাত-পা অবশ লাগছে, জিভ ভারী, বুকের মধ্যে থমথম করছে নির্জন মাঠের আদিগন্ত শূন্যতা। ওপরে তাকালেন, কেউ নেই। নীচে দেখলেন, কেউ নেই। সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধু তিনি একা। হাত বাড়িয়ে রেলিংটা ধরতে চাইলেন, শুধু হাত ঠেকাতে পারলেন। তবে কি এবার তিনি পড়ে যাবেন? গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে চলে যাবেন সেই পাহাড়ের ধসের মতো? আতঙ্কে হিম হয়ে যাওয়া শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল তখনই। তাঁর বোধ হারিয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনে থেকে কমে আসছে আলো, সিঁড়িটা আবছা লাগছে। সোমনাথ প্রাণপণ শক্তিতে রেলিংটা আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইলেন।

প্রথমে তাঁর শিথিল হাত থেকে রেলিংটা সরে গেল। তারপর একটা পা সিঁড়ি থেকে ছিটকে গেল। তারপর সমস্ত শরীরটাই টেনে নিল নীচের অতলান্ত অন্ধকার।

সাদা দেয়াল কালো দাগ

আমার ঠাকুরমা যে-ঘরে থাকতেন, একাই থাকতেন। সে-ঘরের সাদা দেয়ালে সারি সারি অনেকগুলো দাগ ছিল। কাঠকয়লা দিয়ে টানা লম্বা কালো দাগ। দাগগুলো ঠাকুবমার দেওয়া। ও-দাগগুলো ছিল জমা-খরচের হিসেব। খরচটা হল জীবনের, জমাটা হল মৃত্যুর। কাছের মানুষ কেউ মারা গেলেই ঠাকুরমা কাঠকয়লা দিয়ে দেয়ালে একটা দাগ কেটে রাখতেন। এই হল বড়খোকার, এই হল সেজঠাকুরপোর, এই হল শান্তির— সব দাগগুলো তাঁর জীবনের শেষ দুটো বছরের। ব্যাপারটা মজার এবং সেইসঙ্গে আতঙ্কেরও ছিল সবার কাছে। সবাই ভাবত বুড়ির মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। শেষ জীবনে কোথায় ঘরভরা নাতিনাতনির মুখ দেখে হাসতে হাসতে চলে যাবেন, তা নয়, ভয়ে সিঁটকে দিন গুনছেন কবে মরবেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তাই ছিল কি? বোধহয় না। এখন বুঝি বুড়ির মাথা ওই নব্বই বছরেও ঠিক ছিল। একেবারে সঠিক জীবনদর্শন। হাসতে হাসতে কেউ মারা যেতে পারে না। মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়। সবচেয়ে প্রিয় জিনিসকে সবাই আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। মৃত্যুভয়কে কেউ লুকিয়ে রাখে, কেউ রাখতে পারে না— এই পর্যন্ত।

ইন্দ্রাণী বসে বসে উল বুনছিল। বোনাটুকু শূন্যে মেলে ধরে দেখল কেমন হচ্ছে, সাইজটা ঠিক আছে কিনা। আমার কথা শুনতে শুনতে বলল, এই, তুমিও কি দেয়ালে ওরকম দাগ দেবে? নতুন বাড়ির পরিষ্কার দেয়ালে কালো কালো দাগ-- বিচ্ছিরি দেখাবে।

ছুটির সন্ধেবেলায় আমি আর ইন্দ্রাণী বসে বসে গল্প করছিলাম। এক বছরও হয়নি আমাদের বিয়ে হয়েছে। সন্ধেবেলাটা বাড়িতে বসে কাটানো এখনও বিরক্তিকর লাগার অবস্থায় আসেনি। তা ছাড়া আজ সারাদিনের টিপটিপ বৃষ্টি ঘরের মধ্যেই আমাকে খুশি রেখেছিল। যেমন হয়, এ-কথা সে-কথার পর দেশের বাড়ির কথায় এসে গিয়েছিলাম। দেশের বাড়ির কথা থেকে ঠাকুরমার কথা। আসলে কাল রাতে আমাদের পাড়ায় একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল। দাশগুপ্তবাবুর মেয়ে বিষ খেয়ে জীবনের ছেদ টেনেছিল। প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নাকি। আমাদের কথাও ওই মৃত্যু দিয়ে শুরু করে এ-গল্প সে-গল্পের পর ঠাকুরমার মৃত্যুভযের ব্যাপারটায় এসে গিয়েছিল। ইন্দ্রাণীর নতুন বাড়ির দেয়ালের কথা আমার একটা ইচ্ছেকে উসকে দিল। শহরের উপকণ্ঠে পাঁচকাঠা জমি অনেক কষ্টসৃষ্টে কিনে রেখেছি। বাড়ি করার স্বপ্নটা কবে বাস্তব করতে পারব কে জানে। অনেক টাকার দরকার। তবু বাড়ি না করলেই নয়। আমার বহুদিনের ইচ্ছে মনেরমতো একটা নিজস্ব বাড়ি। ছিমছাম, দৃষ্টিনন্দন। খুব বেশি বাজেটের না হলেও অফিস থেকে যে হাউস বিল্ডিং লোন পাব, কিছু জমানো টাকা, তার ওপরেও হাজার পঞ্চাশেক টাকার দরকার। তবু যেমন করেই হোক একদিন না একদিন আমি একটা মনোরম বাড়ির-মালিক হব— এমন একটা সুখের ভাবনা প্রিয়জনের মতো অতিথি হয়ে আসে আমার মনে।

লোনটা শিগগিরই পেয়ে যাচ্ছি, বুঝলে। সামনের মাস থেকে তোড়জোড় না করলে— জমিটা পড়ে আছে অনেকদিন, যা দিনকাল, কে কখন...মনের ক্যানভাসে একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ির রঙিন ছবি আঁকতে আঁকতে বলি।

ইন্দ্রাণী কিন্তু তার আগের কথাতেই থেকে গেল।

আমাদের বাড়ির কেউই বেশিদিন বাঁচে না, বাঁচেনি। আমার মা, আমার মাসি, রাঙামামা— কেউ

পঞ্চাশ পেরোয়নি। এ বাড়ির জেঠু, বড়দাও— এক বাবাই এখনও আছে। খুব অদ্ভুত না? আমিও বোধহয়, বোধহয় কেন, সত্যিই বেশিদিন বাঁচব না।

ইন্দ্রাণী যে এসব কথা হালকা গলায় বলছিল না, তার উচ্চারণই তা বলে দিচ্ছিল। তবু ব্যাপারটা আমি হাসিঠাট্টার বলে ধরে নিয়ে বললাম, তবে তো খুব দুঃখের ব্যাপার।

সে তুমি যাই ই ভাবো, আমি ঠিকই বলছি। আমি জানি।

কী জানো?

আমি জানি খুব বেশিদিন হলেও চল্লিশ-বিয়াল্লিশ— কিংবা তারও আগে— ভুলুমামার কথা তোমার মনে আছে তো? সেই যে দারুণ হাত দেখতে পারে — আমার হাত দেখে বলেছিল —

কী, কী বলেছিল? চল্লিশ বিয়াল্লিশের বেশি বাঁচবে না?

ইন্দ্রাণী আমার কথার জবাব না দিয়ে উল বুনতে থাকল।

আমি বললাম, অল বোগাস।

ইন্দ্রাণীর কথাগুলো, হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করা, এগুলোর প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখালেও, কী আশ্চর্য, আমি ভেতরে ভেতরে কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। আমরা দু'জনেই কিছু সময় চুপ করে বসে ছিলাম। মনে হচ্ছিল চুপ করে থাকার সেই নিস্তব্ধতা যেন ঘরের মধ্যে বড় বেশি শব্দময় হয়ে আছে। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট মুখে দিলাম। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে মনে হল হাতটা যেন অল্প কেঁপে উঠল। অথচ ব্যাপারটা, মানে ইন্দ্রাণী যে মৃত্যুর কথা বলল, সেগুলো অদ্ভুত মনে হলেও সত্যিই তো মৃত্যুর কোনও অঙ্ক নেই। পাটিগণিতের নিয়মে মৃত্যু হয় না। কিছু ঘটনা ভয়ংকরভাবে মিলে গেছে, এই আর কী। সেগুলোকে আশ্চর্য সমাপতন বলে ভেবে নিলে কোনওই অসুবিধে থাকে না। কিন্তু অনেক ব্যাপার যুক্তিতর্ক দিয়ে মেনে নিতে গিয়েও — মনের ব্যাপারটাই বড় বিচিত্র - বিশেষ করে অত্যন্ত প্রিয়জনের ক্ষেত্রে- কোথায় যেন এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেই শূন্যতা বুকটাকে ফাঁকা করে দিয়ে ভয় পাইয়ে দেয়। আর ভয়টা কুয়াশার মতো। কোন ফাঁকফোকর দিয়ে মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে টেরও পাওয়া যায় না।

তবু আমাকে নড়েচড়ে বসতে হয়। মনটাকে শক্ত করতে হয়।

ব্যাপারগুলো, ওই কে কে অল্প বয়সে মারা গেছে বললে, কোইনসিডেন্স ছাড়া কিছুই নয়। যাকে বলে কাকতালীয়। আর হাত দেখার ব্যাপার? বিশ্বাস করার কোনও প্রশ্নই নেই।

এবারও ইন্দ্রাণী মুখে কিছু বলল না। উল বুনতে বুনতে দু'পাশে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ, যতই বোঝাই না কেন, আমার সঙ্গে সে একমত নয়।

নয়? তুমি বলতে চাইছ এসবের মানে হয়?

হয়। নিশ্চয়ই মানে হয়। আমি জানি সব কথা ঠিক ঠিক মিলে যাবে। ভুলুমামার হাত দেখা কখনও ভুল হয় না।

হ্যাঁ, তুমি সব জেনে বসে আছ। যত্তসব গাঁজাখুরি।

পরিবেশটা বদলিয়ে দেবার জন্যে আমি উঠে গিয়ে টিভিটা চালু করে দিলাম। জীবনবিমার ওপর অনুষ্ঠান হচ্ছে। জীবনবিমা কেন করা উচিত, এতে করে কী উপকার পাওয়া যায়, এইসব। টিভিটা ফের বন্ধ করে বিছানায় বসতে বসতে বললাম, এ যুগে — মানুষ এখন মহাকাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে— এখন এসব বিশ্বাস করা-- হাসি পায়।

টিভি বন্ধ করলে কেন, বেশ প্রোগ্রাম হচ্ছিল। ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়িয়ে বোনাটা বিছানায় রেখে বলল, দাঁড়াও চা করে নিয়ে আসি। গোপালের মা আবার কোথায় গেল।

ইন্দ্রাণী চলে যেতেই আমি ফের টিভি চালু করলাম। অনুষ্ঠানটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকলাম। ইন্দ্রাণীর এ-ঘরে আসা টের পেলেই বন্ধ করে দেব।

এ ঘটনা বেশ কয়েকদিন আগেকার। তা দশ-বারোদিন তো হবেই। তেমন করে মনে রাখার মতো কিছু নয়। এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়তো নয়, তবু মনটা কেমন যেন ভারী ভারী হয়ে থাকে।

ঠিক মন খারাপও নয়, তবু যেন কী, বুঝে উঠতে পারি না। মাঝেমাঝে এমন তো সবারই হয়— কী যেন নেই, কী যেন হারিয়ে ফেলেছি, কী যেন করতে হবে অথচ করা হয়নি। কেন এমন হচ্ছে, স্পষ্ট কোনও কারণ খুঁজে পাই না। তবু বুকের মধ্যে হিম হয়ে থাকে কী একটা ভয়। মনে হয় কোনও একটা কারণ আছে, সেই কারণটা পেয়ে গেলেই আমার মন ভরে যাবে আত্মবিশ্বাসে। অথচ কোনওভাবেই কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল বুকের মধ্যে হু হু করে ঘোরে শীতল হাওয়া। দু'বার, তিনবার কিংবা কয়েকবার ইন্দ্রাণীর গল্পটাকে দায়ী করতে চেয়েছিলাম। তার স্বল্পায়ু জীবনের ভয়, দূরদর্শনের জীবনবিমার ওই অনুষ্ঠান, এসব মনের মধ্যে কোনও অসুখ ঘটিয়ে দিয়েছে কিনা কে জানে। কিংবা অন্য কিছু, অন্য কোনও ব্যাপার— কিন্তু সেটা কী, এখনও জানা হয়নি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই টের পাই মনের মধ্যে কোনও জোর নেই। হতাশা যেন সারাদিন হিমঘরের নীচে ডুবিয়ে রাখে মনটাকে।

ইন্দ্রাণী বলল, কী হয়েছে তোমার বলো তো?

বললাম, কী আবার হবে, কিচ্ছু হয়নি। ধুস, কী আবার হবে?

ইন্দ্রাণী আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে। একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কিন্তু সেটা ইন্দ্রাণীকে টেব পেতে দিই না। মুখে একটা হাসি তৈরি কবে নিয়ে বলি, ঠিকই তো আছি। অনিমেষ সেন ইজ অলরাইট। চটপট এককাপ চা নিয়ে এসো তো, গরমাগবম।

আমাব ছলনা কিন্তু ইন্দ্রাণীকে ফাঁকি দিতে পারে না। ও মাথা নাড়ে। উঁহু, যা বলছ এসব ঠিক নয়।

অফিসে কিছু হয়নি তো?

অফিসে আবাব কী হবে?

সেটা আমি জানব কেমন করে? কারুর সঙ্গে ঝগড়া কিংবা--

না না, ওসব কিচ্ছু হয়নি। অল কোয়ায়েট অন দি অফিশিয়াল ফ্রন্ট।

অফিসে আবার বন্ধুদের উলটো প্রশ্ন।

কী রে অনিমেষ, কয়েকদিন ধরে আনমাইন্ডফুল দেখছি, বাড়িতে কিছু হয়নি তো? মিসেসের সঙ্গে কিছু?

হা হা করে হাসতে হয়। হেসে বলি, সে তো দেরি আছে। বিয়ের আর একটা বছর যাক। স্ত্রীসঙ্গ বোর লাগার মতো অবস্থা এখন - আসেনি। হাসিটা আরও প্রসারিত করি।

কিন্তু মনকে ঠকাতে পারি না। কী এক অদ্ভুত অসুখ বাসা বেঁধেছে সেখানে। মনের চারপাশে কোনও দেয়াল নেই, হুহু করছে আদিগন্ত শূন্যতা। কোনও এক মহার্ঘ বস্তু হারিয়ে ফেলেছি, কী সেই জিনিস বুঝতে পারছি না। অথচ দৃশ্যমান জগতে যা ছিল আগে, এখনও তো তাই আছে। আমার টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি, ঘর-গেরস্থালি, আত্মীয়-স্বজন, কোথায়ও একতিল ঘাটতি হয়নি। তবু মনে হয় অদূরে যেন অপেক্ষা করে আছে এক মহা বিপদ। আমি একটু একটু এগিয়ে যাচ্ছি এক অতলান্ত গভীর খাদের দিকে। কিংবা আমি শাণিত অস্ত্র হাতে একটু একটু ব্যবধান কমাচ্ছি— কিন্তু কার সঙ্গে সেই ব্যবধান? কে সে? আমার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে।

তবে কি সে আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ? সন্দেহের কাঁটাটা কি স্থির হয়ে তাকেই দেখাচ্ছে? ইন্দ্রাণী বলেছিল, সে বেশিদিন বাঁচবে না, সেটা কি আমার মনের অন্ধকার গভীরে বিশ্বাসের সত্য হয়ে আমাকে ব্যধিগ্রস্ত করে দিয়েছে? হাতের রেখায় কি বেঁচে থাকার দূরত্ব লেখা থাকে? কিন্তু সেসবের জন্যে তো কোনও কোনও সময়ে মন খারাপ থাকতে পারে। সর্বক্ষণের দুশ্চিন্তা হয়ে থাকবে কেন। ওসব হাতের রেখাটেখার গল্পগাছা তো আমি সত্যিই বিশ্বাস করি না। আর কিছু হয়ে গেলেও সেটাকে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া যাবে— এইরকম মেনে নিযে আমি হালকা হতে চেষ্টা করি। তবু জোর পাই না। মনকে কিছুতেই নিজের ইচ্ছাধীন করতে পারি না। দরজার পরদার ফাঁক দিয়ে একটা কুৎসিত মুখ ঘরের ভেতরে উঁকি মারে। আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। আবার ভাবলাম

এমনও হতে পারে যতটুকু আনন্দের দরকার, ঠিক ততটুকু আমি পাচ্ছি না চারপাশ থেকে। সবকিছুই ছকে বাঁধা, গতানুগতিক। অচলায়তন জমিতে প্রাচীন বৃক্ষের মূল তলিয়ে আছে অনেক গভীরে। সবকিছু চলছে, কিন্তু ভ্রাম্যমাণ গ্রহের মতো নির্দিষ্ট কক্ষপথের মধ্যে। সবকিছু সেই একই রকম। অফিস, বাজার, সিনেমা, খবরের কাগজ। কোথায়ও একটু ঘুরে এলে হয়তো ভাল লাগবে। দীঘা, দার্জিলিং কিংবা পুরী। আবার মনে হল সে তো সামান্য কয়েকদিনের ব্যাপার। আমার আরও আনন্দের দরকার। কী সেই আনন্দ? বাড়ি করাটা এখনও হয়ে উঠল না। কবে হবে কে জানে। ছিমছাম একটা দোতলা বাড়ি। জানলায় বাহারি গ্রিল, দেয়ালে ডিসটেম্পার করা হালকা সবুজ রং। স্বপ্নের মতো একটা দোতলা বাড়ি। প্রভাতদা কী যেন বলেছিলেন!

কিছুই করতে পারলাম না রে অনিমেষ। যাদের আসার কথা ছিল, তারাই এল না। এখন বুঝছি মধ্যবিত্তদের কাছে বিপ্লব একটা স্বপ্নবিলাস ছাড়া কিছুই নয়। ঘরের চারদেয়ালের সিকিউরিটির মধ্যে বসে শুধু গরম গরম কথা। নিম্নবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্তরা স্বপ্ন দ্যাখে না। তারা যা ভাবে, তাই করে। স্বপ্ন দ্যাখে মধ্যবিত্তরা। পারিস তো মিডল ক্লাস সেন্টিমেট থেকে বেরিয়ে আসবি।

এই মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট কি আমাকে ক্রমশ গ্রাস করছে? আমিও কি স্বপ্নের শিকার?

রাতে আমার পাশে শুয়ে ইন্দ্রাণী বলে, এই, এমন করছ কেন? আগে তো এমন করতে না।

কী? কী করছি?

ইন্দ্রাণী হাসে, এই পাগলের মতো— আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি!

পাগলের মতো? ইন্দ্রাণী আমি পাগলের মতো করছি?

শুধু পাগলের মতো নয়, দস্যুর মতো, লুটেরার মতো। অসভ্য। ইন্দ্রাণী মুখ টিপে হাসে।

সেই মুহূর্তে সুখী ও পরিতৃপ্ত ইন্দ্রাণীকে বুঝতে আমার অসুবিধে হয় না, কিন্তু আমি ধড়মড করে বিছানায় উঠে বসি। আমি বুঝতে পারি, আমি কোনওভাবেই স্বাভাবিক আনন্দ পাব না, একটু অভাববোধ আমার থেকেই যাবে। কোথায়ও বেড়াতে গেলেও না, কোনও আনন্দ অনুষ্ঠানে গেলেও না, কোনও প্রিয়জন সান্নিধ্যও আমার শীতল বুকে একটু উষ্ণতা আনবে না। যা করব, যেখানেই যাব, আমার অসুখী মন আমার পায়ে পায়ে ফিরবে। ইন্দ্রাণীর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আমি চুপ করে বসে থাকি বিছানায়।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ইন্দ্রাণীও উঠে বসল।

এই, তুমি ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছ নাকি?

কোন ব্যাপারটা?

ওই যে বলেছিলাম, আমি বেশিদিন বাঁচব না।

ধুত।

আমি মুখে যা-ই বলি না কেন, বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস লুকিয়ে রাখি। আমি কিছুতেই নিজেকে হালকা ভাবতে পারছিলাম না।

ইন্দ্রাণী বলল, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ। চুপ করে বসে আছ কেন? তোমাকে খুব কোল্ড মনে হচ্ছে। এই বলো না, কী হয়েছে তোমার?

আমি এই মুহূর্তের জন্যে ইন্দ্রাণীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি, তারপর চোখ অন্য দিকে সরিয়ে নিলাম। ভাবলাম বলি, জানো ইন্দ্রাণী, আজকাল সবসময় আমার মন খারাপ হয়ে থাকে। কেন থাকে সত্যিই আমি জানি না। আমার সবসময় মনে হয় ঘন কুয়াশার মধ্যে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। পাগলের মতো দু'হাতে কুয়াশা সরিয়ে সরিয়ে আমি তোমার কাছে আসতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। ইন্দ্রাণী, আমার ভীষণ অসুখ করেছে, অদ্ভুত অসুখ। কিন্তু সেসব কথা ইন্দ্রাণীকে বলতে পারলাম না।

আমার শরীরের সঙ্গে ঘন হয়ে ইন্দ্রাণী বলল, তুমি আমায় খুব ভালবাসো, তাই না গো?

আমি হাসি। বলি, কী মনে হয় তোমার?

আমি মরে গেলে খুব কষ্ট হবে তোমার, না?

আবার সেই মৃত্যুর কথা। সাদা দেয়ালে কাঠকয়লার কালো দাগ— এই হল বড়খোকার, এই হল সেজঠাকুরপোর, এই হল শান্তি। দেয়াল, বাড়ির দেয়াল, বাড়ি। একতলা কোনওমতে হলেও দোতলা তুলতে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার দরকার। আমার অনেক দিনের একটা ইচ্ছেসুখ হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে আমার কাছে। একটা সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি। হঠাৎই আমার বন্ধু সুনির্মলের কথা আমার মনে পড়ে যায়। সুনির্মল জীবন বিমার কর্মব্যস্ত এজেন্ট। খবর পাঠিয়েছি দেখা করবার জন্য। আমার যেন দমবন্ধ হয়ে আসে। আমার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আস্ত একটা দোতলা বাড়ি।

ব্যাপারটা ইন্দ্রাণী টের পায়। ভীত গলায় বলে, কী হল তোমার? অমন করছ কেন?

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, কিছু হয়নি তো। আমাকে এক গ্লাস জল দাও তো।

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি আলো জ্বালে। জল এনে দেয় আমাকে। এক চুমুকে সব জল শেষ করে ফেলি। ইন্দ্রাণী আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখে মুখে ভয়।

কাল তুমি একটা ভাল ডাক্তার দেখাবে। অবশ্যই।

ডাক্তার কেন?

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি ভাল নেই।

ঠিকই তো আছি।

না না, কাল ডাক্তার দেখাবেই।

আলো নিভিয়ে দাও, ঘুমাব।

আলো নিভিয়ে দেয় ইন্দ্রাণী। আমার পাশে শুয়ে থাকে চুপচাপ। আমি ওর বড় বড় নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনি। মনে হল দেয়ালগুলো যেন চারপাশ থেকে সরে এসে ঘরটাকে ছোট করে দিয়েছে।

আরও কয়েকটা দিন একইভাবে কেটে গেল।

দু'দিন পরে অফিসে দেখা করতে এলেন দেবেশবাবু। যেখানে আমার জমি কেনা আছে সেই জমির পাশের জমিতে নতুন বাড়ি করেছেন দেবেশবাবু। সজ্জন প্রতিবেশী সন্দেহ নেই।

কী মশাই, কী ঠিক করলেন?

বসতে বলে বললাম, ভাল আছেন দেবেশবাবু?

বললেন, এই বাজারে আর ভাল থাকাথাকি। তা জমিটার কী ঠিক করলেন অনিমেষবাবু? খালি পড়ে আছে অনেক দিন।

আমিই দেবেশবাবুকে জমিটাকে একটু দেখেশুনে রাখতে অনুরোধ করেছিলাম। দিনকাল ভাল নয়, বেদখল হলে মুশকিলে পড়ে যাব। বিক্রি করলে অবশ্য দেবেশবাবু এক্ষুনি কিনে নেবেন। তাঁর জমির পাশেই বলে সুবিধেটা তাঁরই বেশি হবে। পয়সাকড়ি আছে, জমি পেলে কীসের একটা ছোটখাটো কারখানা করার ইচ্ছে আছে। আভাসে ইঙ্গিতে আমাকে তাঁর মনের ভাবটা জানিয়েছেনও।

ও মশাই, টাকাপয়সার ব্যবস্থা কিছু হল? জিনিসের দাম যে-রেটে বাড়ছে, এর পরে তো বাড়ি করার কথা চিন্তাই করা যাবে না।

বললাম, চা খাবেন তো এককাপ?

তা খাওয়া যায়। চিনি ছাড়া কিন্তু। কী মশাই আপনাকে একটু শুকনো শুকনো লাগছে যেন!

গোবিন্দকে দু'কাপ চা দেবার কথা বলে পাঠালাম। এক কাপ চিনি ছাড়া।

দেবেশবাবু কথা বলতে ভালবাসেন। বললেন, আজকাল বাড়ি করাটা, বুঝলেন মশাই, আমাদের মতো লোকের কম্ম নয়। আমি তো মশাই বাড়ি করতে গিয়ে বউকেই বিক্রি করে দিয়েছিলাম, হা-হা।

দেবেশবাবু কথা শুনে আমি নড়েচড়ে বসলাম। বললাম, বউকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন— তার মানে?

দেবেশবাবুর মুখে তখনও মজা পাবার হাসি। বললেন, ওই আর কী, জেদ চেপে গিয়েছিল তিনতলাটা তুলবই। হাতে তখন অত টাকা ছিল না, দিলাম বউয়ের গয়না বিক্রি করে। তা মশাই একই কথা হল। বউ বিক্রি করে বাড়ি, গয়নাগাটি তো মেয়েদের জীবনের চেয়ে প্রিয়। নাকি বলেন?

তারপর কী হল আমার ঠিক মনে নেই। দেবেশবাবু কী কথা বললেন, কী পরামর্শ দিলেন, সেসব মনে রাখার মতো আমার অবস্থা ছিল না। তখন আমার সমস্ত চেতনা, সব শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে দিয়েছে কুটিল প্রবৃত্তি, মাথা ঝিমঝিম করছে, সহসা যেন টের পেয়ে যাই আমি একটা ঘাতক হয়ে গেছি। আমার লালসা চরিতার্থ করার জন্যে একজনের গলায় ফাঁস লাগিয়ে টানবার অপেক্ষা করছি।

দেবেশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, উঠি। তা মশাই আপনাকে একটু অন্যমনস্ক সত্যিই লাগছে। ডিস্টার্ব করলাম না তো!

লজ্জিত গলায় বললাম, আরে না না। আপনি আসাতে খুব ভাল লাগল। ভাবছি দু'-এক মাসের মধ্যে বাড়ির কাজে হাত দেব। না হয় অল্প বাজেটের মধ্যে — হবে না ছোটখাটো একটা মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই?

হবে না কেন, নিশ্চয়ই হবে। আরে মশাই শুরু করলে ঠিক শেষ করা যায়। চলি, কিছু কেনাকাটা আছে।

দেবেশবাবু চলে যাবার পর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম।

সেদিন রাতে ইন্দ্রাণী বিধ্বস্ত হতে হতে হঠাৎ ভয়ের গলায় বলে উঠল, এই ছাড়ো, ছাড়ো। গলা থেকে তোমার হাত সরাও, লাগছে। এসব কী করছ তুমি।

ইন্দ্রাণীর গলায় আমার হাত। কখন যে সেই হাত ঘাতকের হাত হয়ে একটু একটু করে চেপে বসেছে আমি নিজেই জানি না। ভয়ানক চমকে উঠে হাতদুটো সরিয়ে নিলাম। সভয়ে বুঝতে পারলাম আদর করার অছিলায় আমি ইন্দ্রাণীর শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলাম।

আমি বিছানা থেকে ছিটকে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে চলে এসে চিৎকার করে বললাম, ঘরের দরজা ভেতর থেকে খিল এঁটে বন্ধ করে দাও ইন্দ্রাণী। শিগগির। কিছুতেই দরজা খুলবে না। আমি আজ সারারাত বাইরে থাকব।

পরের দিন খুব সকালে ঘরের দরজার সামনে আমাকে দেখে সুনির্মল অবাক। বলল, অনিমেষ! কী ব্যাপার, এত সকালে?

বললাম, এদিকে একটা দরকারি কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম তোর সঙ্গে দেখা করে যাই।

সুনির্মল বলল, বেশ করেছিস। আয়, ভেতরে আয়। দেখে মনে হচ্ছে সারারাত ভাল করে ঘুমাসনি। বিয়ের এতদিন পরে এখনও ওসব চলে?

আমিও হাসলাম। বললাম, বেশিক্ষণ বসা যাবে না রে। বাজার, অফিস আছে। বলছিলাম কী ওই যে ইনশিয়োরেন্সের কথাটা বলেছিলাম—

সে তো ঠিক করাই আছে। পলিসি ইন্দ্রাণী সেনের নামে, নমিনি তুই, অনিমেষ সেন।

বললাম, না না। নমিনি হবে ইন্দ্রাণী সেন। ইনশিয়োরেন্সটা হবে আমার নামে। পঞ্চাশ হাজার।

সুনির্মল একটু সময় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মতটা বদলে ফেললি? দ্যাটস গুড। তাই হবে। বস, চা আসছে।

সুনির্মলের বাড়ি থেকে যখন বাইরে এলাম, তখন সকালবেলার টাটকা হাওয়া বইছিল। সেই স্নিগ্ধ হাওয়া আমার রাতজাগা শরীরে নরম হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। সুখী মানুষের মতো আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার অসুখ সেরে গেছে।

মনের ঘরে খুন

সবে সন্ধে হয়েছে। এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না। তবু নতুন কেনা ছাতাটা সঙ্গে নিল অবনী। বিকেলের দিকে বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি পড়েছে। আবার যে পড়বে না এমন কথা নিশ্চিত করে নিশ্চয় বলা যায় না। আকাশে মেঘ আছে, ছাতাটা সঙ্গে থাকা ভাল। এখন একটু একটু করে বয়েস বাড়ছে। কোনও কাজ করার আগে সবকিছু আগাম ভেবে চিন্তে নেয় অবনী।

যাবে সে ভূপতির বাড়ি। কয়েক মাস আগে একটা জরুরি দরকারে হাজার খানেক টাকা ধার নিয়েছিল ভূপতির কাছ থেকে। টাকাটা ফেরত দেওয়া হয়নি। আজ কিছু টাকা শোধ করে দেবে। ভূপতি অবশ্য টাকার জন্য অবনীকে কিছু বলে না। অবনীর বহুদিনের বন্ধুলোক সে। কিন্তু অবনী জানে ভূপতি টাকা সুদে খাটায়। অনেকে তার কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। সুদ দেয়, শোধও করে দেয়। ভূপতি টাকার জন্যে কাউকে কিছু বলে না, তাগাদাও দেয় না, শুধু ঠান্ডা চোখে তাকায়। তাকিয়ে যেন একটা লোকের শরীরের ভেতরটা দেখে নেয়। টাকা নিয়ে তাকে বড় একটা ফাঁকি দেয় না কেউ। ভূপতি অবশ্য অবনীর ক্ষেত্রে একটু আলাদা। অনেকদিনের আলাপ পরিচয় তো।

তবুও কেন যেন অবনীর পছন্দের তালিকায় ভূপতির নাম থাকে না।

ভূপতির বাড়ির সামনে এসেই জলপাইগুড়ি শহরটা যেন শেষ হয়ে গেছে। বাড়ির পেছনে ফাঁকা মাঠ। লোকবসতি এদিকে খুব একটা ছিল না আগেও। ইদানীং দু'-একটা নতুন বাড়ি এখানে ওখানে উঠছে। ভূপতির বাড়িটাও প্রায় নতুনই বলা চলে, ছোট দোতলা বাড়ি। সামনে বাগান। বাড়িতে ভূপতি একাই থাকে বলা চলে। একটা কাজের লোক অবশ্য আছে। সারাদিন কাজ করে সন্ধে হলেই চলে যায়। বছর দুয়েক আগে ভূপতির বউ মারা গেছে। একমাত্র মেয়ের শিলিগুড়িতে বিয়ে হয়েছে। মাঝেমধ্যে বাপের কাছে আসে।

অবনীর বাড়ি থেকে ভূপতির বাড়ি অবশ্য খুব একটা দূরে নয়। বিশ পঁচিশ মিনিটের পায়ে-হাঁটা পথ। যখন সে ভূপতির বাড়ির সামনে এসে পৌঁছাল, তখন হাতঘড়িতে সাতটা বাজে। আকাশ এখন মোটামুটি পরিষ্কার। দু'-একটা তারা ফুটেছে। মাটি অবশ্য এখনও ভিজেভিজে হয়ে আছে। অবনী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দোতলার একটা ঘরেই ভূপতি থাকে। সামনেরটা বসবার ঘর। ঘরের দরজা বন্ধ। তবে ভেজানো। ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া নেই। সামান্য ফাঁক দিয়ে ঘরের আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। অবনী দরজায় টোকা মারল।

ভূপতি আছ নাকি হে?

কোনও উত্তর এল না। ভূপতি সম্ভবত ভেতরের ঘরে আছে, অবনী দরজার পাল্লাদুটো ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ভূপতির এ-ঘরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ছাতাটা দেয়ালের এক পাশে রেখে একটা চেয়ারে বসতে যাবে.. সামনের দিকে চোখ পড়তেই ভীষণভাবে চমকে উঠে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু দূরেই ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কেউ। মাথাটা বাড়িয়ে একটু ভাল করে লক্ষ করতে বুঝল সে যা সন্দেহ করেছে ঠিক তাই। মানুষটা ভূপতি ছাড়া আর কেউ নয়। মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন। গড়িয়ে পড়ে চাপ চাপ রক্ত জমে আছে মেঝেতে। খুন? একটু আগেই কেউ কি পেছন থেকে ভূপতির মাথায় আঘাত করে সরে পড়েছে?

অবনীর হাত-পা অবশ হয়ে জমে আসতে চাইল। তার চোখের সামনে ভূপতি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অবনী আসার আগেই কেউ খুন করে গেছে তাকে। ব্যাপারটা বুঝে নিতে অবনীর কয়েক

মুহূর্ত সময় লাগল। তারপরেই তার সহজাত বুদ্ধি তাকে জানিয়ে দিল আর এক মুহূর্ত এ-ঘরে থাকলে তাকে মহা বিপদে পড়তে হবে। ভূপতিকে খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়তে পারে সে। যত শিগগির এখান থেকে সরে পড়তে পারে ততই মঙ্গল তার পক্ষে।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে অবনী প্রায় লাফ মেরে ঘরের বাইরে চলে এল। বাইরে এসেই চারপাশটা সতর্ক চোখে ভাল করে দেখে নিল। কোনও লোকজন চোখে পড়ল না। জায়গা এমনিতেই জনবিরল, ঘরবাড়িও কম, তার ওপর রাত্রি সাড়ে সাতটা এখন। চারপাশ অন্ধকার অন্ধকার হয়ে আছে। রাস্তায় যে আলো জ্বলছে, তাও বেশ দূরে দূরে। না, তাকে কেউ দেখে ফেলেছে বলে মনে হয় না। এখন চটপট সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষ খুন বলে কথা। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে।

অনেক দূর চলে আসার পর অবনী যখন বুঝল আর ভয় পাবার মতো কিছু নেই তখন সমস্ত ঘটনাটা নিয়ে আরেকবার ভাবল সে। কোনও ভুল নেই, ভূপতি খুন হয়ে পড়ে আছে। তার ওপরে অনেকেই অখুশি ছিল, অনেকেই টাকা ধার নিয়েছে তার কাছ থেকে। তাদের মধ্যে থেকে যে-কেউ খুন করতে পারে। উত্তমর্ণ আর অধমর্ণের সম্পর্ক কখনই ভাল হয় না। এই তো অবনীর কাছেই ভূপতি টাকা পেত। অবনীও মনে মনে অপছন্দ করত তাকে। ভূপতির মৃত্যুটা তার কাছে দারুণ কিছু মর্মান্তিক ব্যাপার নয়।

বাড়িতে এসে একটু সময় চুপচাপ বসে থেকে অবনী ভাবল। বাড়ির লোকেরা তখন একটা ঘরে বসে টিভির অনুষ্ঠান দেখছিল। অবনীকে খেয়াল করল না কেউ। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে কেউ জানতেও পারল না। শুধু বাড়ির লোক কেন, এ-শহরের কেউই ব্যাপারটা এখনও জানে না। অবনীর একবার মনে হল একটা উড়ো ফোন করে পুলিশকে ঘটনাটি জানিয়ে দেয়। কিন্তু সাহস হল না। কোথা থেকেই বা ফোন করবে, কে আবার দেখে ফেলবে, সেই নিয়ে কথা হতে কতক্ষণ। কী দরকার বাবা আগ বাড়িয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনার।

অথচ কিছু একটা তো করতে হয়। ঘটনাটা তো সাধারণ কোনও মামুলি ব্যাপার নয়। একটা লোক তার বাড়িতে খুন হয়ে পড়ে আছে। ভেতরে ভেতরে ভারী অস্থিরতা বোধ করছিল অবনী। ভূপতি খুন হল, অথচ কথাটা কেউ জানল না, ব্যাপারটা কেমন যেন মনের মধ্যে ঠিক মিল খাচ্ছে না।

অবনী ঘড়িতে সময় দেখল। আটটা বেজে গেছে পনেরো মিনিট আগে। এখনও নিশ্চয়ই ভূপতি ওইভাবেই পড়ে আছে। মরে গেছে নির্ঘাত। ওইরকম একটা আঘাত নিয়ে চাপ চাপ রক্তের মধ্যে যে স্থির হয়ে পড়ে আছে, সে নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। কিন্তু যদি না মরে গিয়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে? হতেও তো পারে। এমন তো নয় যে অবনী কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে নিশ্চিত হয়েছে যে ভূপতির শরীরে প্রাণ নেই। অবনীর মনে হল কোথায় যেন একটু বাধছে তার। ভূপতি লোকটা যেমনই হোক না কেন, অবনীর তাকে ভাল না লাগলেও এককালের বন্ধুলোক তো। সে এভাবে ঘরের মধ্যে মরে পড়ে থাকবে ভাল লাগছে না। ভাবতে ভাবতে অবনীর মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শান্তিপদর কাছে গেল। শান্তিপদ অবনীর বন্ধু। ভূপতির সঙ্গে ভাল জানাশোনা আছে।

শান্তিপদ বলল, কী রে অবনী, এত রাতে?

অবনী বলল, এত রাত আবার কোথায়, সবে তো আটটা-সাড়ে আটটা। চল একটু ভূপতির বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। যাব আর আসব। একটু জরুরি দরকার আছে। দরকারটা বুঝতেই তো পারছিস।

শান্তিপদ কিছু না বলে শুধু হাসল। হঠাৎ হয়তো টাকাপয়সার খুব দরকার হয়ে পড়েছে অবনীর, তাই ভূপতির বাড়ি যাওয়া। একটু রাত হয়েছে বলে শান্তিপদকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। আপত্তি করল না সে। ঠেকা বেঠেকায় বন্ধুকে তো সাহায্য করতেই হবে।

২

পুলিশ ইন্সপেক্টর হালদার বললেন, স্টেটমেন্ট আপনি আগেই দিয়েছেন অবনীবাবু, শান্তিবাবুর স্টেটমেন্টও নিয়েছি। তবু কতকগুলো পয়েন্টে আরেকটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার বলে আপনাকে থানায় ডেকে এনেছি।

অবনী নড়েচড়ে বসল।

হালদার বললেন, ঘটনার দিন রাতে আপনি আর শান্তিবাবু যখন ভূপতিবাবুর বাড়ি যান এবং ঘরে ঢুকে তাকে ওই অবস্থায় দেখেন, তখন ঠিক ক'টা বাজে?

আটটা বেজে বিয়াল্লিশ মিনিট।

হালদার অবনীর মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে বললেন, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় আটটা বিয়াল্লিশ?

হ্যাঁ ঘড়ি দেখেছিলাম।

কিন্তু ওইরকম একটা সাংঘাতিক দৃশ্য দেখার মুহূর্তে ঘড়িতে সময় দেখার মতো মানসিক অবস্থা কারও থাকে কি? বলছেন আপনার বন্ধু ছিলেন ভূপতিবাবু, বন্ধুর ওইরকম অবস্থা দেখে কোথায় ছুটে গিয়ে লোকজন ডাকার কথা ভাববেন, পুলিশে খবর দেবার কথা ভাববেন, হাসপাতালের কথা ভাববেন, তা না করে আপনি ঘড়িতে সময় দেখলেন কাঁটায় কাঁটা ক'টা বাজে তখন? অথচ আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন শান্তিবাবু, তিনি সঠিক সময় বলতে পারেননি। বলেছেন সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে।

অবনী একটু থতমত খেয়ে গেল। অনেক ভেবেচিন্তে ওই সময়ের জন্য তার গতিবিধি সম্পর্কে একটা অভ্রান্ত বক্তব্য আগেই ঠিক করে রেখেছিল এবং সেই কথাই বলেছে পুলিশকে। বলা বাহুল্য, সেটা তার দ্বিতীয়বার ভূপতির বাড়ি যাওয়ার ঘটনার ব্যাপারেই। প্রথমবার যাওয়ার ঘটনাটা সে অন্ধকারেই রেখে দিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কোনও মানবিক আচরণের কথা উঠতে পারে, যেমনটি বললেন ইন্সপেক্টর হালদার, সেটা সে তেমন করে ভেবে দ্যাখেনি। আসলে সে পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ তথ্য বলে, প্রথমবার যাওয়ার ঘটনাটা সম্পূর্ণ গোপন করে গেছে বলে, খুব ঠান্ডা মাথায় ছিল না সে। তা ছাড়া সে ভেবেছিল পুলিশ সবকিছু আইনের অঙ্কে হিসেব করে। মানবিক আচরণের ব্যাপার ট্যাপারগুলো তাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে থাকে না খুব একটা।

ঘটনার দু'দিন পরে অবনীকে থানায় ডেকে আনা হয়েছে। এর আগে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দেওয়া হয়ে গেছে তার, তবু কী কারণে যেন হালদার আবার তার স্টেটমেন্ট নিচ্ছেন, মিলিয়ে নিচ্ছেন আগের সঙ্গে পরের বিবৃতি।

অবনীর মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, তবু তার কপালে ঘাম জমছিল। ইন্সপেক্টর হালদারের তাকানো, ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা বাঁকা হাসি, অসরল কথাবার্তা, এসব ভাল ঠেকছিল না তার কাছে। একটা সন্দেহ যেন হিংস্র পশুর মতো ওত পেতে আছে, একটু বেসামাল দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপরে।

সব ব্যাপারেই সঠিক সময় দেখে নেওয়াটা আমার একটা অভ্যেস বলতে পারেন। মনে মনে যুক্তিটা সাজিয়ে নিয়ে অবনী বলল।

অভ্যেস? অ। তা বলতে পারেন। কিন্তু মুশকিল হল সঠিক সময়টা আপনার মনে থাকে না, তাই না? হালদার সোজাসুজি তাকালেন অবনীর দিকে, আগের স্টেটমেন্টে আপনি বলেছিলেন কিন্তু আটটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, বিয়াল্লিশ নয়। তিন মিনিট বেশি।

অবনীর মুখের রং বদলে গেল। তার আগের কথার সঙ্গে পরের কথা মিলছে না। তিন মিনিট সময়ের গণ্ডগোল হয়ে গেছে। হালদার কি তাকে খুনের ব্যাপারে সন্দেহ করছে, সন্দেহ করার মতো তথ্য তার হাতে আছে কি? সে আগে একবার ভূপতির বাড়ি গিয়েছিল, পরে শান্তিপদকে সঙ্গে করে

গিয়েছিল নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখতে, তার কাছে ভূপতি দু'হাজার টাকা পেত, এগুলো কি হালদারের এখন অজানিত নেই? এতক্ষণে অবনীর মনে হল তার ভয়ভয় লাগছে। ঘড়িতে সে সত্যিই সময় দ্যাখেনি, সময়টা হিসেব টিসেব করে বলেছিল শুধু, সেটা এখন মিলছে না। তবে একটা ভরসার কথা এই যে ভূপতি সত্যিই খুন হয়নি, অন্য কেউ তাকে খুন করতে চেয়েছিল, সাংঘাতিকভাবে আহত ভূপতি এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। কিন্তু ভূপতি যদি মরে যায়? তার তো এখনও জ্ঞান আসেনি। তখন কী হবে? পুলিশ যদি কোনওভাবে জেনে যায় যে অবনী আগেও একবার ভূপতির বাড়ি গিয়েছিল? তা হলে তো ঘটনার যাবতীয় দায়ভাগ অবনীর ওপরেই চাপিয়ে দেবে। একবার সত্যকে গোপন করেছে বলে পরে হাজার সত্যি কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। সন্দেহের কাঁটাটা তার দিকেই ঘুরে থাকবে।

হালদার অবনীকে দেখতে দেখতে বললেন, তা একটু ভুলভ্রান্তি তো হতেই পারে। থাক সে কথা। তার পরের ঘটনা যা বলেছেন, তা হল ভূপতিবাবুর বাড়ি গিয়েই তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে আপনি আর শান্তিবাবু লোকজনকে খবর দেন থানায় খবর পাঠান, প্রায়-মৃত ভূপতিবাবুকে অবিলম্বে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ভাগ্যক্রমে সেইজন্যই ভূপতিবাবু এখনও জীবিত আছেন। যদিও তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। হালদার একটু থামলেন। কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা অবনীবাবু, আপনি এবং শান্তিবাবু তো একই সঙ্গে ভূপতিবাবুর ঘরে ঢুকেছেন, একই সঙ্গে তাঁকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দ্যাখেন, তাই তো?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমরা দু'জনেই একই সঙ্গে ভূপতির ঘরে ঢুকি, তাকে ওই অবস্থায় দেখি।

এটাও কিন্তু মিলছে না। হালদার মাথা নাড়ালেন আগের স্টেটমেন্টে আপনি এ-কথা বলেননি অবনীবাবু। বলেছিলেন ভূপতিবাবুকে আগে শান্তিবাবু দ্যাখেন তিনিই আগে ঘরে ঢুকেছিলেন বলে। আপনি পেছনে ছিলেন। শান্তিবাবুর ভয় পাওয়া চিৎকার শুনে আপনি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ব্যাপারটা দ্যাখেন।

আবারও ভুল? ভারী অসহায় দেখাল অবনীকে। আগে কী বলেছিল কিছুই মনে নেই তার' জবাবে কী বলবে, কোনও কথাই মুখে জোগাল না তার।

হালদার অবনীর চোখে চোখ রেখে বললেন, আসলে সত্যি কথা বলার একটা মস্ত সুবিধে কী জানেন, আগে কী বলেছি সেটা মনে না রাখলেও চলে। এই যেমন আমি ইচ্ছে করেই সময়টা আটটা পঁয়তাল্লিশ আর শান্তিবাবুর আগে ঘরে ঢোকার কথা বানিয়ে বলেছি। অথচ আপনি কিন্তু মোটেই ভুল বলেননি, দু'বারই একই কথা বলেছেন। কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলেন হয়তো আমার কথাই ঠিক। আপনার আগের স্টেটমেন্টে আপনি নিশ্চয়ই নিজের অ্যালিবাই তৈরি করেছেন কিছু কিছু মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে যেগুলো মোটেই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। তাই আপনি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না আগের স্টেটমেন্টে ঠিক কী কথা বলেছিলেন। অবনীবাবু, সত্যি একদিন প্রকাশ পায়ই, শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই যেমন আমরা জেনে গেছি যে আপনি শান্তিবাবুকে নিয়ে যাবার আগেও একবার ভূপতিবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। আর আপনি যে গিয়েছিলেন তার সাক্ষীও আছে।

অবনীর শরীরের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সাক্ষী আছে? কে সেই সাক্ষী? কেউ কি অবনীর প্রথমবার যাবার ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে? অবনীর শিরদাড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে এল।

যেন খুবই অপছন্দের ব্যাপার এইভাবে অখুশি মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে হালদার বললেন, আপনি যখন প্রথমবার ভূপতিবাবুকে ওই অবস্থায় দেখেন তখন যদি তাঁকে হাসপাতালে আনা যেত তা হলে তাঁর চিকিৎসা আরও আগে করা যেত, সেজন্য হয়তো তার অবস্থা এতটা সংকটপূর্ণ না-ও হতে পারত। কিন্তু আপনি তা করেননি। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে ব্যাপারটা জানাজানি হয়, ভূপতিবাবুকে তখন হাসপাতালে আনা হয়। অমূল্য দু'ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে ভূপতিবাবু মারাও যেতে পারতেন এবং তা হত আপনি সব জেনেও চুপ করে ছিলেন বলে। শুনুন অবনীবাবু, এটাও

কিন্তু হত্যার চেষ্টার মধ্যে পড়ে। অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। আঘাত না করেও কোনও মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা। সাংঘাতিকভাবে আহত কোনও মানুষের ইচ্ছাকৃতভাবে চিকিৎসায় দেরি করে দেওয়া, এটা কি খুন করার মতো অপরাধ নয়? কী বলে আপনার বিবেক? আপনি কি মনে মনে চাননি যে ভূপতিবাবু মারা যান? কাগজের আইন যা-ই বলুক না কেন, আপনার মনের আইন কী বলে?'

প্রাণপণ শক্তিতে অবনী এতক্ষণ নিজেকে ধরে রেখেছিল, এবার আর পারল না। বুঝল তার সামনে আর প্রতিরোধ রেখে লাভ নেই। পুলিশ সব জেনে গেছে। এখনও মিথ্যেটা চালিয়ে গেলে সেটা পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হবে। ভাববে নিজের অপরাধকে ঢাকতেই সে সত্যকে গোপন করছে। অথচ সত্যিই তো সেসব কিছু নয়। সত্যিই তো সে ভূপতিকে আঘাত করেনি, তাকে খুন করতেও যায়নি, কিছুই করেনি সে। তবে মিছেমিছি ভয় পাচ্ছে কেন? সত্যি কথা বলে ফেলাই তো ভাল।

হ্যাঁ, আমি সত্যিই আগে একবার ভূপতির বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু তাকে ওই অবস্থায় দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কোথা থেকে কী হবে কে জানে। ভেবেছিলাম পুলিশ হয়তো সন্দেহ করবে আমিই হয়তো খুন করেছি, আমার কথা বিশ্বাস করবে না, আমাকে গ্রেপ্তার করবে। বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আমার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। আর তা ছাড়া -

তা ছাড়া? হালদার জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

তা ছাড়া তখন আমার মনে হয়েছিল ভূপতি বেঁচে নেই।

তাই যদি হয়, হালদার বললেন, সেটাও আপনি ঠিক কাজ করেননি। আপনার দ্যাখা উচিত ছিল ভূপতিবাবু বেঁচে আছেন কিনা। আপনার কোনও প্রিয়জনের ক্ষেত্রে তো আপনি তাই করতেন।

সেটা নিশ্চয়ই আমার অনুচিত কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না।

বিশ্বাস করি। হালদার আশ্বস্ত গলায় বললেন, শুধু বিশ্বাস নয়, আপনি যে সত্যিই দোষী নন সেরকম প্রয়োজনীয় তথ্য আছে আমাদের কাছে। যে ভূপতিবাবুকে খুন করতে চেয়েছিল, তার নামও আমরা জেনে গেছি।

জেনে গেছেন? অবনীর চোখ চকচক করে উঠল।

তাকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ওই যে বলেছিলাম সত্যকে গোপন রাখা যায় না। কোনও দুষ্কর্মকেই চিরদিন অন্ধকারে রাখা যায় না। কিছুক্ষণ আগেই ভূপতিবাবুর সামান্য জ্ঞান ফিরতেই আমরা ওঁর মুখ থেকেই অপরাধীর নাম জানতে পেরেছি।

এতক্ষণে অবনীর মনে হল তার মাথার ওপর থেকে দুর্যোগের আকাশটা সরে গেছে। সিলিঙে যে ফ্যানটা ঘুরছে, তার হাওয়া লাগছে গায়ে।

হালদার আবার বললেন, ঘটনাটা হল, আসল অপরাধী একবার আঘাত করতেই ভূপতিবাবু জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত, সামলাতে পারেননি ভূপতিবাবু। অপরাধী ধরে নিয়েছিল তিনি মারা গেছেন। এবং যেহেতু সে পেশাদারি খুনে নয়, হঠাৎ রাগের মাথায় আঘাত করে বসে, তার আগে তাঁদের মধ্যে টাকাপয়সা লেনদেনের ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তাই হুঁশ হতেই সে পালিয়ে যায়। তার অপরাধ মারাত্মক, কিন্তু আপনার অপরাধও তার চেয়ে কম কিছু নয়। সে প্রথমবার আঘাত করে ভূপতিবাবুকে খুন করতে চেয়েছিল আর দ্বিতীয়বার আপনি সেটা চেয়েছিলেন ঠান্ডা মাথায়, দু'ঘণ্টা চুপ করে থেকে আপনি কাউকেও বলেননি ঘটনার কথা। অথচ আপনি সবার আগে সেটা জানতেন।

অবনী বলল, কিন্তু সেটা, মানে আমি যে আগেও ভূপতির বাড়ি গিয়েছিলাম, আপনি সেটা জানলেন কেমন করে।

জানলাম কেমন করে? হালদার সামান্য হাসলেন। বললেন, সাক্ষী আছে।

সাক্ষী? কে সেই সাক্ষী?

আপনার ছাতা।

অবনী অবাক হয়ে বলল, আমার ছাতা?

হ্যাঁ, তাই। আপনাব ছাতা। এ-কথা মনে করা খুব একটা বেঠিক হবে না যে প্রথমবার ওই ঘরে গিয়ে আপনি ছাতাটা রেখেছিলেন এবং ভয় পেয়েই হোক আর যে ভাবেই হোক, ভীষণভাবে উত্তেজিত হবার ফলে ছাতাটার কথা আপনার মনেই ছিল না। কারুকাজ করা সুদৃশ্য হ্যান্ডেলওয়ালা একটা দামি ছাতা, সেটা ভূপতির ঘরে পাওয়া গেছে। নতুন কেনা, একটু চেষ্টা করতেই দোকানের খোঁজ পাওয়া গেল। জলপাইগুড়ি তো আর খুব বড় শহর নয়। দোকানদার জানাল ওইরকম বাঁটওয়ালা ছাতা একটিই তাদের দোকানে ছিল এবং সেটা দিনপনেরো আগে অবনী মিত্র, মানে আপনাকে বিক্রি করা হয়েছিল। আর আপনি তো ওই দোকানেরই পরিচিত লোক। ছাতাটা অবশ্য দ্বিতীয়বার যাবার সময় রেখে এসেছেন সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু সে-সম্ভাবনাটা খারিজ করে দিল শান্তিবাবুর কথা। শান্তিবাবুকে জিজ্ঞাসা করাতেই তিনি বললেন তাঁর সঙ্গে যাবার সময় আপনার হাতে কোনও ছাতা ছিল না।

গোকুলবাবু ও জন্মান্তরবাদ

গোকুলানন্দ চক্রবর্তী বরদাকান্ত হাই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক ছিলেন। বিজ্ঞান পড়াতেন বলে শুধু বিজ্ঞানই পড়াতেন তা কিন্তু নয়। বাংলা, ইতিহাস কিংবা ভূগোল ক্লাসও দরকার পড়লে নিতে হত। আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মফস্‌সল শহরের স্কুলে এইরকমই রেওয়াজ ছিল। ইংরেজিটা তাঁর ভাল আসত না বলে এবং অঙ্ককে ভয় পেতেন বলে ও-দুটো ক্লাস তিনি নিতেন না। ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়ালেও নিজে কিন্তু সবরকম সংস্কার অবলীলায় বিশ্বাস করতেন। ভূত-প্রেত, তাবিজ-কবচ, হাঁচি-টিকটিকি, রাক্ষস-খোক্কস, আত্মা-জন্মান্তর, জলপড়া-বাটিচালান— এসব শুধু বিশ্বাসই করতেন না, বিশ্বাস করে খুব আনন্দ পেতেন।

মধ্য বয়সের ছোটখাটো পাতলা চেহারার গোকুলবাবু একটু খেপাটে ধরনের মানুষ ছিলেন। একটা দলমলা টুইলের হাফহাতা শার্ট, মোটা ধুতি আর বিবর্ণ ক্যাম্বিসের জুতো— এই ছিল তাঁর সারাবছরের পোশাক। খুব শীতটিত পড়লে একটা মোটা খদ্দরের চাদর গায়ে জড়িয়ে নিতেন মাত্র। চোখে মহাত্মা গান্ধীর চশমার মতো গোল ফ্রেমের হাইপাওয়ারের নিকেলের চশমা। চুল আঁচড়াতেন না। মাসে একবার কানাই নাপিতের কাছে দাড়ি কাটতেন। তাঁকে কেউ ছিটগ্রস্ত বললে, সেও ঠিক বলত, আবার খামখেয়ালি বললে, তারও ভুল হত না। পাগল হলেও সবটুকু পাগল নন, আবার স্বাভাবিক হলেও সবটুকু স্বাভাবিক নন, এইরকম এক মাঝামাঝি মানুষ ছিলেন তিনি। সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যেতেন। ক্লাসে অপূর্বকে অভূতপূর্ব বলে ডেকে ভুল জানতে পেরে মাথা চুলকে বলতেন, তাই তো, একটু ভুল হয়ে গেছে। আবার হেডমাস্টার ধমক দিলে বলতেন, ওহো। তাই তো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তখন সহশিক্ষক কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, কী গো গোকুল স্যার, কী আবার ভুল হল? তো মাথা চুলকে বলতেন, ভুল? তাই তো কী যে ভুল হল সেটাই মনে পড়ছে না। ঠিক আছে, মনে পড়লে বলব'খন।

ভুলোমনের হলেও খুব সরল আর নিপাট ভালমানুষ ছিলেন বলে সকলে কিন্তু গোকুলবাবুকে ভালবাসত। এমনকী অমন রাশভারী হেডমাস্টার হেরম্ব ঘোষেরও গোকুলবাবুর প্রতি কিছুটা দুর্বলতা ছিল। ছাত্রদের কাছেও তিনি অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। সে-আমলে ছাত্ররা পড়া না পারলে কিংবা দুষ্টুমি করলে নানানরকম শাস্তিদানের বিধান ছিল। হাতে-পিঠে বেতের বাড়ি, দু'আঙুলের মধ্যে পেনসিল ঢুকিয়ে দিয়ে জোরে চেপে ধরা, নীল ডাউন, বেঞ্চের ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, কানমুলে লাল করে দেওয়া, মাথায় গাঁট্টা মারা— এসব ছিল শিক্ষাদানের আবশ্যিক অংশ। গোকুলবাবু এসব কিছুই করতেন না। আসলে রাগ করতেই তিনি জানতেন না। অনেক কিছুই তাঁর অজানা ছিল। কখনও তাঁর কাছে কোনও পরিচিত লোক বা তাঁর নামে কোনও চিঠিপত্র আসতে দ্যাখেনি কেউ। আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে, তাও জানা ছিল না তাঁর। সেই যে বছর পাঁচেক আগে একদিন বরদাকান্ত হাই স্কুলের মাস্টার হয়ে এলেন, তারপর একদিনের জন্যেও কোথাও যাননি। শোনা গিয়েছিল, তাঁর বাড়ি হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার কোথায় যেন! কেউ জিজ্ঞেস করলে নামটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত না। বলতেন, ওই উত্তর মেরু না কোথায় যেন। ঠিক মনে পড়ছে না।

গোকুলবাবু অবিবাহিত ছিলেন। একবার স্কুলের অঙ্কের মাস্টার মজা করতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা বিয়েটা করলেন না কেন গোকুলস্যার, কোনও গোপন ব্যাপার-ট্যাপার ছিল নাকি?

গোকুলবাবু মাথা চুলকে বলেছিলেন, তাই তো বড্ড ভুল হয়ে গেছে। বিয়ে করার কথাটা একদম মনে নেই।

ওই অঞ্চলের এক দরিদ্র ভদ্রলোক গোকুলবাবুকে তার অবক্ষণীয়া কন্যার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। গোকুলবাবু সেই প্রস্তাব শুনে ভদ্রলোককে বলেছিলেন, মেয়েদের দেহের গঠন অনুযায়ী চারটে শ্রেণী আছে। এগুলো হল শঙ্খিনী, পদ্মিনী, চিত্রিণী আর হস্তিনী। আপনার মেয়ে কোন শ্রেণীর?

ভদ্রলোক ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলেন, ইয়ে, তা তো জানি না।

গোকুলবাবু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, জানা উচিত ছিল। শঙ্খিনী নারী হলেই আমি বিয়ে করব। পেত্নি, শাঁকচুন্নি এসব আমার খুব পছন্দ কিনা। শঙ্খিনী মেয়েদের মধ্যে এই ভাব আছে। আর বিয়ে হলে সে বিয়ে হবে পিশাচমতে।

বলাবাহুল্য, কন্যাদায়গ্রস্ত সেই ভদ্রলোক আর অগ্রসর হননি।

গোকুলবাবু থাকতেন স্কুলের সেক্রেটারির এক বাতিল পুরনো বাড়িতে। খুব ভগ্নদশা একতলা বাড়ি। চারপাশে আগাছার জঙ্গল, দেয়ালের পলেস্তরা খসা, ভুতুড়ে বাড়ি বলে একটা ক্ষীণ বদনামও ছিল। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে হত না গোকুলবাবুর। বরং ওই বাড়িতে তিনি মহানন্দেই থাকতেন। নানারকম অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ব্যাপার স্যাপারে বিশ্বাস ছিল তাঁর। কিন্তু ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে তিনি সবচেয়ে আনন্দ পেতেন। আহা, কত রকমের ভূতই যে আছে মামদো, স্কন্ধকাটা, ব্রহ্মদৈত্য শাঁকচুন্নি আরও কত কী। কী চমৎকার ভয় দেখায় তারা। শেওড়াগাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে অন্ধকারে খিঁ খিঁ করে হাসে, নানারকম শব্দ করে। গোকুলবাবুর মনে বড় দুঃখ ছিল ভূতেদের সঙ্গে এখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়নি বলে। তবে একদিন রাতে ঘরের মধ্যে খুটখাট শব্দ শুনে তার মনে হয়েছিল তেনাদের কেউ নিশ্চয় এসেছেন। ব্যাপারটা ভাল করে দেখবেন বলে বড় আশা নিয়ে লণ্ঠনের আলোটা উসকে দিয়ে একটা হুমদোমুখো কালো হুলোকে দেখলেন ঘরের মধ্যে। হুলোটা তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাঁচ করে মুখ ভেংচে জানলা টপকে পালাল। ভেংচি কাটাটা দেখে বড় আনন্দ হল গোকুলবাবুর। ভূত ছাড়া অমন সুন্দর ভেংচি কেউ কাটতে পারে না। নির্ঘাত বেড়ালভূত। কিন্তু পরের দিন সকালে বাড়ির সামনে ছাইগাদায় হুলোটাকে বসে থাকতে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। ভূতেরা তো দিনের আলোতে দৃশ্যমান নয়। তবে এটা ওইরকমই দেখতে, অন্য একটা হুলোও হতে পারে। যা হোক, গোকুলবাবু চারপাশে ভূতপেত্নি, দৈত্যদানা, মঘা অশ্লেষা, কোষ্ঠীপাঁজি, তিথিনক্ষত্র নিয়ে বেশ আরামেই ছিলেন। মানুষটার মনটা ছিল খুব নরম। স্বপাক আহার করতেন। তবে অধিকাংশ দিন খাওয়াই হত না। রান্না করতেই ভুলে যেতেন। বেশি খিদে পেলে মনে করতেন কোনও কারণে তার জ্বর হয়েছে। চট করে ওষুধের কৌটো থেকে জ্বরের বড়ি বের করে খেয়ে নিতেন। স্কুলে যেতেন, পড়াতেন, এবং মনে করতেন ভুল পড়াচ্ছেন। সূর্য ঘুরছে না পৃথিবী ঘুরছে, চাঁদের ছায়া পড়ে সূর্যগ্রহণ হচ্ছে না রাহু সূর্যকে গ্রাস করছে— এসব গোলমেলে চিন্তা তাঁকে খুবই পীড়িত করত। নিজের চোখে যেটা দ্যাখেননি, তা বিশ্বাস করতেন না। বইয়ে তো কত কিছু লেখা থাকে। যা হোক, দোষেগুণে তিনি ভালই ছিলেন। তাঁর এই ধারণা আর সংস্কারের জন্যে লোকে যে খুব হাসাহাসি করত, তাও নয় কিন্তু। আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে মফস্‌সলের মানুষের চিন্তা-ভাবনা গোকুলবাবুর চেয়ে খুব একটা সরেস ছিল না।

কিন্তু গোকুলবাবুর ভাল থাকাটাকে বাদ সাধল ছ'আনা দামের একটা বই। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখলেন রাস্তার ধারে বই বিছিয়ে বিক্রি করছে একটা লোক। দেখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। সচিত্র স্বাস্থ্যবিধি, সহজ ধারাপাত, বোধোদয় থেকে শুরু করে জড়িবুটির চিকিৎসা, মেয়েদের ব্রতকথা, চোর ডাকাতের রোমহর্ষক গল্প, প্রেমপত্র লিখন, শিক্ষা— সবরকমের বই আছে। এর মধ্যে একটা বইয়ের নাম দেখলেন জন্মান্তর ও জাতিস্মরের রোমাঞ্চকর কাহিনী। লেখক ত্রিগুণানন্দ ব্রহ্মচারী। গোকুলবাবু জন্মান্তরবাদে ভীষণ বিশ্বাসী ছিলেন। হাতে নিয়ে একটু

উলটে পালটে দেখে নগদ ছ'আনা দিয়েই বইটা কিনে নিলেন। সে-আমলে ছ'আনাই অনেক পয়সা ছিল।

সময়টা ছিল শীতকালের। গোকুলবাবু বাড়ি ফিরতে ফিরতেই বিকেলের আলো ফুরিয়ে গেল। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভাল ছিল না, লণ্ঠনের আলোয় বইয়ের খুদিখুদি অক্ষরগুলো ভাল করে পড়তে পারলেন না। সকালে দিনের আলোতে পড়বেন বলে বইটা বিছানার তলায় রেখে দিলেন। সকালে উঠে কিন্তু বইটার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। উনুনে ভাত চাপিয়ে গামছা পরে স্নান করতে যাবেন, বইটার কথা মনে পড়ল। একটু চোখ বুলিয়ে নেবেন বলে বিছানার তলা থেকে বইটা বের করলেন। কিন্তু প্রথম তিন পাতা পড়েই তার শরীর শিহরিত হয়ে উঠল, গায়ে কাঁটা দিল, নাসিকা স্ফুরিত হল, বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। গোকুলবাবু বিশ্বসংসার বিস্মৃত হয়ে গোগ্রাসে বইটা পড়তে লাগলেন। বইয়ের প্রথম অংশ জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে, দ্বিতীয় অংশে জাতিস্মরদের কয়েকটা কাহিনী। লেখক ত্রিগুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় জন্মান্তরে ঘোরতর বিশ্বাসী। নানান চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করেছেন এবং জানিয়েছেন আত্মা বিভিন্ন জন্মে অন্যের দেহে বিরাজ করে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে জোরালো যুক্তি দেখিয়ে কয়েকজন জাতিস্মরের কাহিনী শুনিয়েছেন। বইটা পড়ে গোকুলবাবুর মধ্যে একটা বিরাট ভাবান্তর এসে গেল। ভাবলেন একটু চেষ্টা করলেই গত জন্মের কথা তিনি জানতে পারবেন। ভাবতে ভাবতে মনে হল তাঁকে জানতেই হবে। বইটা একবার পড়া শেষ করে আরেকবার পড়লেন। দ্বিতীয়বার পড়েও মনে হল আরও একবার পড়া দরকার। এদিকে উনুনে ভাত পুড়ে ছাই হয়ে গেল, বাটির সব ডাল বেড়ালে চেটেপুটে খেয়ে হেলতে দুলতে চলে গেল। খাবার সময় অবশ্য বেড়ালটা গোকুলবাবুর দিকে তাকিয়ে ফ্যাচ করে ভেংচি কাটতে ভুলল না। শব্দ শুনে গোকুলবাবু চমকে উঠে দেখলেন, সেই কালো হুলোটা। একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, তখনই মনে পড়ল স্কুলের কথা। বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। স্কুলে যেতেই হবে। বইটা বিছানার ওপর রেখে স্কুলে রওনা হলেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছেন, মুখোমুখি পড়ে গেলেন হারাধনবাবুর। হারাধনবাবু কাছেই থাকেন। কী সব ব্যাবসা ট্যাবসা করেন যেন। তিনি গোকুলবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, একী, কোথায় চললেন গোকুলবাবু?

গোকুলবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, কোথায় যে যাচ্ছি — ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। স্কুলে যাচ্ছি। অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে তো।

হারাধনবাবু আরও অবাক হয়ে গিয়ে বললেন স্কুলে যাচ্ছেন? বেলা একটার সময়? এই পোশাকে?

নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে গোকুলবাবু দেখলেন, তাঁর গায়ে কোনও জামা নেই, শুধুমাত্র একটা গামছা পরে আছেন। স্নান করতে যাবার সময় বইটা পড়তে পড়তে এতই বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন যে, কী পরে আছেন খেয়ালই করেননি। এখন বুঝলেন, তখন থেকে শীত লাগছে কেন? কুণ্ঠিত গলায় বললেন, ওহো বড্ড ভুল হয়ে গেছে। যাই ধুতিটা পরে আসি।

ফের বাড়িতে এসে গোকুলবাবু ধুতি পরলেন, জামা গায়ে দিলেন, কিন্তু ভুলে গেলেন স্কুলে যাবার কথা। জন্মান্তর ও জাতিস্মরের রোমাঞ্চকর কাহিনী আবার পড়ার লোভ সামলাতে পারলেন না। স্নান স্কুল মাথায় উঠল, জন্মান্তরবাদের গভীর রহস্যে তিনি নিমজ্জিত হলেন।

তারপর যত সময় যেতে লাগল, একটাই চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। গত জন্মে তিনি কী ছিলেন? মানুষ যদি ছিলেন, তবে কোথাকার মানুষ ছিলেন? নিবিষ্ট মনে গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে যদি হঠাৎ মনে পড়ে যায়। পৃথিবীর নানান দেশের নানা জাতির কথা ভাবলেন। মেরু অঞ্চলের এস্কিমো, উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান, আফ্রিকার জুলু উপজাতির কথাও ভাবলেন। কিন্তু ওদের ভাষা আচার আচরণ সম্পর্কে জানেন না বলে ভেবে সুবিধে হল না। এমনকী ভারতের অন্য কোনও প্রদেশের লোক হিসেবে ভাবাও নিরাপদ মনে

করলেন না। বাঙালি ছিলেন কি? কিন্তু একটু ভেবেই তিনি মাথা নাড়লেন। তেমন কিছু মনে আসছে না। তা হলে কি তিনি আদৌ কোনও মানুষই ছিলেন না? নিশ্চয়ই তাই হবে। মানুষ ছিলেন না, তাই জাতিস্মরও হতে পারছেন না। চিন্তিত মুখে গোকুলবাবু জানলার বাইরে তাকালেন। সামনের মাঠে গোরু চরছে কয়েকটা। লালু ধোপার গাধাটাকেও ঘাস খেতে দেখলেন। গাধাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে করার চেষ্টা করলেন গত জন্মে কোনও ধোপার গাধা ছিলেন কিনা। সেরকম কিছু মনে পড়ল না। একে একে কুকুরজন্ম, বেড়ালজন্ম, ছাগলজন্মের কথা ভাবলেন। কিন্তু কোনও জুত পেলেন না ভেবে। এমন সময় জানলার সামনের পেয়ারা গাছের ডালে একটা কাক উড়ে এসে গম্ভীর গলায় ডাকল, কক্। কক্ শব্দটা কেমন যেন চেনাচেনা মনে হল গোকুলবাবুর। কম্পিত বক্ষে ভাবলেন, তা হলে কি তিনি গত জন্মে কাক ছিলেন! জানলার কাছে এলেন কাকটাকে ভাল করে দেখতে। কিন্তু কাকটা হঠাৎ উড়ে গেল। এরপর একসঙ্গে অনেকগুলো কাক উড়ে এসে কা কা করে বিকট গলায় মহা হইচই লাগিয়ে দিল। গোকুলবাবু বিরক্ত হলেন, কাকজন্মে তাঁর পছন্দ হল না। কিন্তু তাঁর চিন্তাও কমল না। আকুল হয়ে ভেবেও গত জন্মের কোনও কথা তাঁর স্মরণে এল না। মহা আতান্তরে পড়ে গেলেন তিনি। একসময় ভাবলেন, হয়তো তিনি একটা সাপই ছিলেন। মনে হতেই শিউরে উঠলেন। সাপকে বড় ভয় পান তিনি। কক্ষনও তিনি সাপ ছিলেন না।

গোকুলবাবু আবার বইটা পড়লেন। এক জায়গায় লেখক বলেছেন 'কোনও ব্যক্তির মনে যদি কোনও বিশেষ জীবের প্রতি অহেতুক স্নেহ, প্রীতি ইত্যাদি সঞ্চারিত থাকে, তাহা হইলে পূর্বজন্মে সেই জীবদ্দশা হইতে তিনি মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ মীমাংসায় আসা অসমীচীন হইবে না।' কথাগুলো বারবার পড়লেন গোকুলবাবু। পড়ে ভাবতে বসলেন। ভাবতে গিয়ে গোরুর কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ এই নিরীহ শান্তশিষ্ট পরম উপকারী জীবটির কথা কেন মনে হয়নি, এটাই তাঁর খুব আশ্চর্য লাগল। গোরুকে তাঁর ভীষণ ভাল লাগে। রাস্তাঘাটে গোরু দেখলেই তিনি সস্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। ব্যস, কোনও সন্দেহই নেই, তিনি পেয়ে গেছেন গত জীবনের জন্মবৃত্তান্ত। আর্কিমিডিস যেমন করে 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন, গোকুলবাবুও সেইরকম চিৎকার করে উঠলেন— পূর্বজন্মে আমি গোরু ছিলাম'

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরে একটা গোরুকে ডাকতে শোনা গেল— হাম্বা।

হাম্বা? হাম্বা মানে কী? একটু ভাবতেই গোকুলবাবুর গায়ে কাঁটা দিল। হাম্বা মানে হ্যাঁ। গোরুটা তাঁর কথার উত্তর দিয়েছে— হ্যাঁ।

মোতিগয়লা খুব সকালে গোকুলবাবুকে একপো করে দুধ দিয়ে যায়। পরদিন সকালে দুধ দিতে এসে মোতি এক বিচিত্র দৃশ্য দেখল। গোকুলবাবু ঘরের মেঝেতে বসে আছেন। একটা দড়ির একপ্রান্ত তাঁর গলায় বাঁধা, অন্যপ্রান্ত খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধা। ঠিক যেমন করে গোরু খুঁটিতে বাঁধা থাকে। বিছানা দেখে মনে হল, গোকুলবাবু রাতে বিছানায় না শুয়ে ওইভাবে দড়িবাঁধা অবস্থায় মেঝেতে বসে এই শীতের রাত কাটিয়েছেন। মোতি অবাক হয়ে গিয়ে বলল, একী মাস্টারবাবু, অমনভাবে বসে আছেন কেন?

মোতির কথা শুনে গোকুলবাবু মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাই তো, বসে আছি কেন— কারণটা কী— মাথা চুলকাতে চুলকাতে কিছুক্ষণ ভাবলেন। হঠাৎ মাথা চুলকানো থামিয়ে দিলেন।— ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে রে মোতি। কাল বিকেলে পূর্বজন্মের কথাটা হঠাৎ জানতে পারলাম তো। তাই গো-জন্মটা প্র্যাকটিশ করছিলাম। যদি কিছু মনে পড়ে।

মোতি এই ছিটেল মাস্টারকে বিলক্ষণ চেনে। একটু হেসে বলল, তা কিছু মনে পড়ল মাস্টারবাবু?

গোকুলবাবু একটা হতাশ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, না রে কিছুই মনে পড়ছে না।

শ্বাস প্রশ্বাস

খাটের ওপর বসে উল বুনতে বুনতে শুনলাম ডোরবেলটা বাজছে। কেউ এসেছে। গরম চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দিতে গেলাম। তখনও জানতাম না দরজার বাইরে এক মধুর বিস্ময় অপেক্ষা করছে। দরজা খুলে দিয়েই দেখলাম বাইরে লম্বা ফরসা বছর চল্লিশের যে লোকটা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, সে আর কেউ নয়, দেবাশিস। দেবাশিস সেন। ঠিক এ সময়ে দেবাশিসের আসাটা আমার ভাবনার মধ্যে ছিল না কিন্তু অবাকও হলাম না। একদিন তো এ-বাড়িতে আসতই দেবাশিস। এক পা এক পা করে তার পথ তো একদিন এ বাড়িতে এসে থামতই। চল্লিশোত্তর সম্পর্কের অঙ্কটাই যে তাই। শাস্ত্রবিরোধী সে প্রায়শ হয় না।

বললাম, আসুন।

নভেম্বরের শুরুতেই এই পার্বত্য শহরে জাঁকিয়ে শীত পড়তে শুরু করেছে সকালে আর সন্ধ্যায় ঘন কুয়াশার মধ্যে ঢুকে যায় শহরটা। কলকাতায় এ সময় গরমজামা আলমারিতে থাকে, এখানে কিন্তু শুধু সোয়েটারে হয় না। সোয়েটারের ওপর আবার গরমজামা চাপাতে হয়। দেবাশিসের গায়ে অবশ্য একটা নীল রঙের ভারী সোয়েটার মাত্র। অনেক দিন ধরে এই শীতের শহরে আছে, ঠান্ডাটা অভ্যেস হয়ে গেছে।

খুব অবাক লাগছে, তাই না? দেবাশিস কিছুটা সপ্রতিভ হতে চাইল।

আমি শুধুমাত্র হাসলাম।

এই চলে এলাম আর কী।

বললাম বেশ করেছেন।

ততক্ষণে আমরা ঘরে ঢুকে গেছি। বললাম, বসুন।

আমার বারো বছরের মেয়ে স্নেহা রবিবারের সকালের টিভির ছোটদের অনুষ্ঠান দেখছিল সোফায় বসে। দেবাশিসকে দেখেই উঠে দাড়াল। এর আগে দেবাশিসকে কখনও বাড়িতে দেখেনি সে। বাড়িতে আমার স্কুলের কয়েকজন মিস্ট্রেস ছাড়া অন্য কেউ বড় একটা আসে না। দেবাশিস এই প্রথম এল।

দেবাশিস বলল, উঠলে কেন? বসো। কী দেখছিলে, অ্যানিমেশন ছবি? জঙ্গল বুক?

আমি ভেবেছিলাম স্নেহা হয়তো খুব লজ্জা পেয়ে যাবে। সারাদিন একা একাই তো থাকে, অন্যের কাছে খুব একটা খোলামেলা হতে পারে না। কিন্তু স্নেহার মধ্যে খুব একটা ভাবান্তর লক্ষ করলাম না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

দেবাশিস তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি বললাম, আপনি বসুন।

দেবাশিস সোফায় বসে বলল, রবিবার তো, তাই ভাবলাম - মানে, এই আর কী, একটু বেড়িয়ে আসি।

দেবাশিসকে প্রথম থেকেই খুব একটা অবাক লাগছিল না, অবশ্য ওর চলাফেরা, কথাবার্তায় কোনওদিন হইহই ভাব নেই। কিছুটা শান্ত, অনেকটা ভদ্র, কখনই প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। টেবিল থেকে একটা পাক্ষিক ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে দু' চার পাতা উলটে আবার রেখে দিল। দেয়ালের ক্যালেন্ডারের ছবিটা দেখল কিছুক্ষণ। সবই যেন নিজের সামনে একটা আপাত আড়াল রেখে দেওয়া। নিজেকে নিজের মধ্যে আনতে সময় নিচ্ছিল সে।

দেবাশিসের কথা বললে তো আমার কথাও বলতে হয়। আমিও কি দেবাশিস আসার আগে যেমন ছিলাম, এখনও তাই আছি? কী বলব, কেমন আচরণ করব, আমিও তো ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। স্নেহার সামনে নিজেকে স্বাভাবিক রাখা তো খুবই দরকার। অথচ আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম আমার ভেতরে ভেতরে ভাঙচুর হচ্ছে। বুকের মধ্যে যে স্পন্দন হচ্ছে, সেটা কিশোরী কিংবা যুবতী মেয়েদের ঝড়ো আবেগ হতে পারে, পঁয়ত্রিশ বছরের কোনও প্রাক্তন বিবাহিতার হৃৎস্পন্দন কখনই নয়। আমি যে একজন ডিভোর্সি মহিলা, কথাটা বারবার স্মৃতির কানাগলিতে হারিয়ে যাচ্ছিল।

একজন পরিচিত মানুষের, সে যদি মনের সুজন হয়, বাড়িতে আসাটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়, আসতেই পারে। বিশেষ করে সেই লোকটি যদি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেক্টর হয়, আমি যেখানে টিচার হয়ে ঢুকেছি কয়েক মাস আগে, তার আসাটা তো সবসময় স্বাগত। আর দেবাশিস তো পরিশীলিত রুচির চমৎকার মানুষ। তবু আমি কিছুতেই সহজ হতে পারছিলাম না। আমি জানি এই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধটা আমার জন্যে যতটা স্নেহার জন্যে তার অনেক বেশি। স্নেহার বয়েস এখন বারো হলেও জটিল পরিস্থিতির জন্যে সে এখন সংসারের দ্বিতীয় মানুষও বটে। তার মনের মধ্যে পছন্দ অপছন্দের বিভাজন চেতনা এসে যাওয়াটা আশ্চর্যের নয়। আমার অস্বস্তি সেখানেই।

দেবাশিস চুপ করে বসে রইল সামান্য কিছু সময়, আমিও। এ সময় এই নীরবতা ভীষণ শব্দময় মনে হচ্ছিল। আসলে কথা বলার জন্য নতুন কোনও আরম্ভ আমরা কেউ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। একটু পরেই সেটা যেন হঠাৎই খুঁজে পেয়েছে, এইভাবে দেবাশিস বলে উঠল, আরে এই দেখ, যে জন্যে এসেছি, সেটাই তো হল না।

আমি বললাম, কী সেটা?

স্নেহা, স্নেহার সঙ্গে তো ভাল করে আলাপই করা হল না। ওর জন্যেই তো আসা। কই স্নেহা কাছে আসবে না?

এবার স্নেহার মুখে সামান্য হাসির আভাস দেখলাম। সে একটু এগিয়ে আমার গা ঘেঁষে দাড়াল। দেবাশিস পকেট থেকে চকোলেটের দুটো বড় বার বের করে বলল, এটা আমারও না, স্নেহার মা'রও না, তবে কার জন্যে?

স্নেহা চকোলেট খেতে ভীষণ ভালবাসে বিশেষ করে দেবাশিস যেটা এনেছে সেটা। স্নেহার পছন্দের সঙ্গে দেবাশিসের পছন্দ দারুণভাবে মিলে গেছে।

কই স্নেহা, এটা নেবে না?

তখনও স্নেহা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি বললাম, স্নেহা যাও। উনি ডাকছেন তোমাকে।

স্নেহা খুব আস্তে আস্তে ওর কাছে গেল। দেবাশিস অমনি এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে একটা খুব মিল আছে আমার মধ্যে। আমিও কিন্তু সবচেয়ে ভালবাসি অ্যানিমেশন ছবি জঙ্গল বুক দেখতে। আর কী ভালবাসি জানো? আইসক্রিম আর চকোলেট খেতে।

স্নেহা তখনও সহজ হতে পারছিল না। তবে ওকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। আমার সঙ্গে থেকে থেকে কিছুটা আত্মমুখী হয়ে গেছে। ওর মুখ দেখে ওকে বোঝা যায় না। আবহাওয়াটা হালকা করতে আমি বললাম, কী খাবেন বলুন, চা না কফি?

দেবাশিস মাথা নাড়ল, কোনওটাই নয়। আজ তো শুধু স্নেহার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। দুঃখিত মুখ করল দেবাশিস। —কিন্তু স্নেহার আমাকে একটু পছন্দ হয়নি। কথাই বলছে না আমার সঙ্গে। ভেবেছিলাম সেই গল্পটা বলব। ওই যে অনেক, অনেকদিন আগে এক যে ছিল রাজা, তার যে ছিল এক ছেলে, সেই রাজপুত্র অচিনপুরের রাজকন্যাকে দৈত্যপুরী থেকে উদ্ধার করে আনতে যাবে, সব ঠিকঠাক, এমন সময় এক জটাধারী শ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসী রাজসভায় এসে বলল, মহারাজ— বলতে

বলতে হঠাৎ থেমে গেল দেবাশিস। গম্ভীর গলায় বলল, থাক, আর বলব না। স্নেহা তো আঙ্কেলের গল্প শুনতে ভালবাসে না, বলে কী লাভ।

স্নেহা অমনি ঠোঁট কামড়ে ধরল। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল সেই একইভাবেই। দেবাশিস আর একটু সময় বসে থেকে হাতঘড়িতে সময় দেখে বলল, এবার উঠতে হয়। আজ খুব শীত পড়বে মনে হয়।

সামনের টেবিলের ওপর চকোলেটের বারদুটো রেখে দিয়ে দেবাশিস উঠছে, স্নেহা বলে উঠল, ও আঙ্কেল, বলো না, সন্ন্যাসীটা রাজাকে কী বলল?

২

এইভাবেই দেবাশিস প্রথম দিন বাড়িতে এসেছিল। বলা ভাল, বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল। তারপরেও সে এসেছে। কিন্তু প্রথম দিনের মতোই তার আসাটা কখনই সাড়ম্বর মনে হত না। আসাটা কেমন যেন চলে যাওয়ার রাস্তা দিয়ে আসা মনে হত। এই নভেম্বরের বিকেলের মতোই। ডোরবেলটা বাজিয়ে অপেক্ষা করত, দরজা খুললে সলজ্জমুখে ভেতরে ঢুকত, কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার চলে যেত। গল্প যা করত, তা ওই স্নেহার সঙ্গেই। ভাবটা এমন, আমি কেউ নই, স্নেহার কাছেই সে এসেছে। যাবার সময় শুধু আমার দিকে তাকিয়ে বলত, চলি। সে সময় কেমন যেন উদাসী উদাসী মনে হত ওকে। আমি দরজার সামনে দাড়িয়ে দেখতাম লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে দেবাশিস। তারপর একটু দূরের পাহাড়ের বাঁক ঘুরলেই আর দেখা যেত না তাকে। আর একটু সময় দাড়িয়ে থাকতাম আমি। আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত পাহাড় আর গাছগাছালির ওপরে এক অখণ্ড নীল আকাশ। উদার, শান্ত, সমাহিত।

আসলে দেবাশিস স্নেহার সঙ্গে যতই কথা বলুক, গল্প করুক, আমি জানতাম সেগুলো একটু একটু সত্যি, কখনই পুরোপুরি সত্যি নয়। স্নেহা তো শুধু একটা সুন্দর উপলক্ষ মাত্র। দুটো মানুষের মধ্যে এক সেতুবন্ধন। আমি বুঝতে পারছিলাম দেবাশিস একটু একটু করে অনেক কাছে চলে এসেছে আমার। আর এটা তো আমারও পরম প্রার্থনা। তাই যদি না হবে, তবে দেবাশিস এলেই এই পাহাড়ি শহরের নভেম্বরের শীতল হাওয়ায় উষ্ণতার স্পর্শ লাগত কেন, কেন দেবাশিস চলে গেলে উদাস মন আমাকে আনমনা করে রাখত।

খবরের কাগজে এখানকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের টিচারের জন্যে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করে দিয়েছিলাম কাজটা পেয়েও গিয়েছিলাম। স্কুলের প্রধান দেবাশিস সেনের সঙ্গে পরিচয়টা স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছিল। ফরসা লম্বা ভদ্র মানুষটিকে আমার ভাল লেগেছিল। কলকাতা থেকে অনেক দূরে এই অজানা অচেনা শৈলশহরে একজন শুভার্থী মানুষকে পেয়ে স্বভাবতই কিছুটা নির্ভর মনে হয়েছিল।

স্নেহা আর আমি ছাড়া আমাদের সংসারে আর কেউ ছিল না। আর স্নেহা খুব ছোট বলেই কখনই নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখতে পারতাম না, মাঝেমাঝে মনে হত ঘরের চারপাশের চারটে দেয়াল খুব কাছে চলে এসেছে, অবাধ বাতাসে আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না। দেবাশিসের কাছে আমি কী কী চেয়েছিলাম জানি না, যেটা জানি, তার নাম নিরাপত্তা। আমার পায়ের নীচে শক্ত জমি, মাথার ওপরে অবারিত আকাশ।

তা ছাড়া দেবাশিসের মধ্যে একটা সমিল দুঃখও খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার সহকর্মী একদিন দেবাশিসের জীবনের বিষাদময় ঘটনার কথা আমাকে জানিয়েছিল। অন্য একজনের সঙ্গে তার বিবাহিতা শিক্ষিতা স্ত্রী চলে গেছে সুদূর আমেরিকা। এখন সেখানেই থাকে। যাবার আগে অবশ্য ছাড়াছাড়িটা বৈধ করে নিয়েছিল কোর্ট থেকে। তার উদ্দাম জীবন সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানিয়ে নিতে পারেনি দেবাশিসের শান্ত সংযত জীবনের সঙ্গে। ইন্দ্রনীলও তো সেইভাবেই ছেড়েছে

আমাকে, তার একমাত্র সন্তান স্নেহাকে। বোম্বেতে এখন ইন্দ্রনীলের অন্য সংসার, অন্য পরিচয়। একই দুর্ভাগ্য দু'জনের।

দেবাশিসের কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ঠিক, তবু কোথায় যেন একটা সান্ত্বনা পেয়ে যাচ্ছিলাম স্বার্থপরের মতো। মানুষটার প্রতি আমার গভীর মমতা কখন যে একটু একটু ভালবাসা হয়ে গেল টেরও পাইনি। কেন জানি না ইদানীং একটা ভারী লোভ এই দারুণ শীতে নরম আগুনে ঠান্ডা হাত-পাগুলো সেঁকে নেবার ইচ্ছেটা উসকে দিচ্ছিল। ইচ্ছে করে বরফের স্তূপের নীচ থেকে আমার আর স্নেহার ছোট্ট সংসারটা খুঁড়ে খুঁড়ে এক নিরাপদ আশ্রয়ে বের করে আনি। আমি জানি, দেবাশিস নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে এমন দূরত্বে দাঁড়িয়ে নেই যে হাত বাড়িয়ে তাকে আমি ছুঁতে পারব না।

কিন্তু আমার সুখের ঘরে সিঁদ কেটে চোরের মতো ঢুকে পড়ে হতাশা। আমার ইচ্ছেটাই যে আমাদের সংসারের শেষ কথা, তা তো নয়। আমার বারো বছরের মেয়ের কথাও আমার ভাবতে হয়। দেবাশিসকে স্নেহা কেমনভাবে নেবে জানি না। কিছু কিছু ব্যাপারে ছোটরা কখনও অন্যের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয় না। বিশেষ ক্ষেত্রে ওরা ভয়ানক অনুদার আর হিংসুক হয়। ওদের হিসেবটা সোজাসুজি, সেখানে আপস নেই। দেবাশিস স্নেহাকে খুব ভালবাসে, দেবাশিসও স্নেহার দারুণ পছন্দের মানুষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্নেহা গল্প যত ভালবাসে, গল্পবলা লোকটাকে, মনে হয়, ঠিক ততটা ভালবাসে না। অথচ এগুলো হলে সেটা সবচেয়ে সুখের হত। কিন্তু মন তো সবসময় সরল রেখা ধরে চলে না, সেটা স্নেহার মতো খুব অল্প বয়েসের মেয়ের মন হলেও। আর স্নেহা তো ওর বয়েসি অন্যান্য মেয়েদের থেকে আলাদা। আসলে মনকে বয়স্ক করে দিন, মাস, বছর নয়, চারপাশের কর্মকাণ্ড।

আবার এসব ব্যাপারে স্নেহাকে বলাও যায় না। ওকে তো বলা যায় না এই সংসারের সদস্য সংখ্যা দু'থেকে বাড়িয়ে তিন করার একটা ইচ্ছের টানাপোড়েন চলছে আমার মধ্যে। আমার মনে হল, আমার অপেক্ষা করতে হবে যত দিন না স্নেহা ওর মনের সব ক'টা জানলা দরজা হাট করে খুলে দেয়। ফলে দেবাশিস বাড়িতে এলেই স্নেহাকে লক্ষ করা শেষপর্যন্ত আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ওর মুখের রেখায় ওর মনের কথা পড়তে চাইতাম। কোথায় যেন আমি ভারী দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমি কী করব, কী করব না, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল দেবাশিসের জন্যে ঘরের দরজা খুলে দিলেও ওর আসার পথ কিছুতেই প্রশস্ত করতে পারছিলাম না।

একদিন স্নেহা জানতে চাইল, আঙ্কেল আমাদের কে হয় মা?

বই পড়ছিলাম, কথাগুলো শুনে বইয়ের অক্ষরগুলো স্থির হয়ে গেল চোখের সামনে। স্নেহার প্রশ্ন আমাকেও দাঁড় করিয়ে আরেক প্রশ্নের মুখোমুখি। স্নেহা কি আজকাল সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে ভাবছে? নাকি ওটা নিছকই একটা ছেলেমানুষি জিজ্ঞাসা?

বললাম, কেন রে?

বলো না, কে হয়?

বললাম, আমি যে স্কুলে আছি— সেই ব্লেসিংস স্কুলের রেক্টর, আমাদের ওয়েলউইশার, তোমার আঙ্কেল।

স্নেহা বলল, সে তো জানি। কিন্তু—

কিন্তু কী?

কিন্তু টমাস আঙ্কেল, বিকাশ আঙ্কেল, বিক্রম আঙ্কেল— ওরাও তো আঙ্কেল হয়।

তা তো হয়ই।

কিন্তু ওরা তো খুব বেশি আমাদের বাড়িতে আসে না।

সঙ্গে সঙ্গে এমন কোনও কথা তৈরি করতে পারলাম না যা কিনা স্নেহার প্রশ্নের সহজ উত্তর হতে

পারে। ওর ভাবনার মধ্যে কোনও জটিলতা না-ও থাকতে পারে, বাচ্চারা সবাই যেমন করে ভাবে, সেও হয়তো তাই ভেবেছে। সবাই যদি দেবাশিসের মতো আঙ্কেল হয়, তবে শুধু দেবাশিসই কেন বেশিবার বাড়িতে আসে? আগে তো আসত না? কী বলব ভাবছি, কেমনভাবে এই জিজ্ঞাসার সরল সমাধান করা যায়, চোখ পড়ল স্নেহার মুখের দিকে। চোখ কুঁচকে সে আমার উত্তরের অপেক্ষা করছে। দেখেই চমকে উঠলাম। এ-মুখ কোনও অবোধ শিশুর নিষ্পাপ জিজ্ঞাসার মুখ নয়। এ-মুখে বারো বছরের সারল্য নেই, অবুঝ শৈশব নেই। দৃশ্যটা আমার মনের ভেতরটা নাড়িয়ে দিল।

দেবাশিস আর আমার মাঝখানে তা হলে কি একটা প্রশ্নচিহ্ন এসে দাঁড়িয়েছে?

কিন্তু এ-কথাটা তো একটুও মিথ্যে নয় যে দেবাশিসের সঙ্গে আমার এই মানসিক দুর্বলতার পিছনে আমার চিন্তাভাবনা ছিল না, কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন তো আমাকে প্ররোচিত করেনি। যা হয়েছে, তা হয়ে গেছে। অনেক কিছু তো হয়ে যায়, কেন হয়, তার কোনও ব্যাখ্যা থাকে না। ভবিষ্যতের দিনগুলোর জন্যে আমার ভাবনা ছিল, ভয় ছিল, কিন্তু তার জন্যে সত্যিই কোনও পরিকল্পনা ছিল না। মনের এক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ আমার সব হিসেবকে ওলটপালট করে দিয়েছে। মনকে শাসন করার, নিজের ইচ্ছাধীন করে রাখার কোনও ক্ষমতাই আমার ছিল না। দেবাশিসের প্রতি আমার মমতা কখন যে ভালবাসা হয়ে গেছে, আমি নিজেই জানি না। শুধু আমার নয়, সেই একই জিনিসে দেবাশিসও আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু এসব কথা তো আর স্নেহাকে বলা যায় না। বইটা টেবিলে রেখে চশমাটা চোখ থেকে খুলে কাচটা শাড়ির কাপড়ে মুছতে মুছতে একটু সময় নিলাম। তারপর বললাম, টমাস আঙ্কেল বিক্রম আঙ্কেলরা হয়তো বেশি আসা পছন্দ করে না।

আঙ্কেল আমাদের খুব পছন্দ করে, তাই না?

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তাই হবে। উনি আমাদের ভাল চান হয়তো। কিন্তু এসব নিয়ে তোমার এত ভাবার দরকার নেই স্নেহা।

আমি আবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখলাম। আমি জানি স্নেহা আমাকে এই মুহূর্তে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না। আমার গলার স্বর শুনেই ও বুঝতে পারে কোথায় থেমে যেতে হয়।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে স্নেহার কথাগুলো তোলপাড় হয়েই যাচ্ছে যে। বইয়ের পাতায় আমার চোখ, মন কোথায়! হাজার চেষ্টা করলে একটা লাইনও এখন পড়া যাবে না। আমি বই বন্ধ করে রান্নাঘরে চলে গেলাম। রান্নাঘরে কোনও কাজ নেই, কিন্তু কিছুক্ষণ তো একা একা থাকা যাবে।

৩

মা যতই বলুক, স্নেহা, এখন তুমি ছোট, সব কথা তোমার ভাবার দরকার নেই, আমি কিন্তু জানি ছোট আমি শুধু বয়েসেই। আমার মনের বয়েস শরীরের বয়েসের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। বড় হওয়ার আগেই আমি বড় মানুষের মতো ভাবতে শিখে গেছি। আমার বয়েসের অন্য মেয়েরা যা ভাবে না, তা আমি ভাবতাম। এমন কোনও ছেলেবেলা আমি পাইনি, যার চারপাশটা খোলা। আমার চার দিকের তিন দিকেই ছিল তিনটে কালো দেয়াল। যে-দিকে দেয়াল ছিল না, সেটা খোলা রেখেছিল আমার মা। ওই দিকটা দিয়েই যা কিছু আলো বাতাস আসত। আমার জন্যে মা কোনও অভাব রাখেনি। আমার যা যা দরকার তার অনেক বেশি পেতাম মা'র কাছ থেকে। যে-জিনিসটার একটা দরকার, মা দুটো এনে দিত। আমার দারুণ দেখতে সব জামা ছিল, অনেক সোয়েটার, কার্ডিগান, দেদার গল্পের বই, কমিকস। এখানকার সবচেয়ে নাম করা কনভেন্টে পড়তাম, বাড়িতে এসে একজন মিস আমার পড়াশোনা দেখতেন। কিন্তু এতসব থাকা সত্ত্বেও অভাবটা আমার থেকেই যেত। সেই অভাবই আমার তিন দিকের তিনটে কালো দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আমার মনের

অনেক ভেতরে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল, সেটা কিছুতেই ভরাট হত না। আমাদের দু'জনের সংসারে সবকিছু অনেক বেশি বেশি করে থাকলেও সবসময় একটা বিষণ্ণ দুঃখী মুখ পরদার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারত। আমার মনের মধ্যে যে-শূন্যতা ছিল, তা অনেক জামা, গল্পের বই, চকোলেট, টফি, টিভির প্রোগ্রাম, ক্যাসেটের গান দিয়ে ভরানো যেত না। কিছু কিছু জিনিস আছে, অন্য কিছু দিয়ে বিনিময় করা যায় না। আমার বাবাও কোনও বিকল্প ছিল না আমার কাছে।

এই যে এত কথা বলছি, এগুলো বড়দের মতো পাকাপাকা শোনাচ্ছে। কিন্তু এগুলো সব আমার মনের কথা। ওই যে বললাম, আমার মন আমার বয়েসের দিন, মাস, বছরের চেয়ে অনেক বেশি বয়েসের।

এই যে আমার বাবা ছিল না আমাদের বাড়িতে, সেই না-থাকাটা যেন ছিল অনেক বেশি করে থাকা। আমি জানতাম আমাদের সংসারে আরেকজন এমন লোক আছে, য়াকে দেখা যায় না, কিন্তু বোঝা যায়। সেই লোকটা হল ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত। আমার বাবা।

অথচ মা কখনও আমাকে বাবার কথা বলে না, কখনও ভুলেও বাবার প্রসঙ্গ আনে না। কিন্তু আমি বাবার অনেক কথাই জেনে গেছি একটু একটু করে। ঠিক যে-সময় বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যায়, তখন আমি এত ছোট যে বাবার কিছুই আমার মনে নেই। বাবাকে কেমন দেখতে ছিল, কেমন করে হাসত, কেমন করে কথা বলত, কেমন ছিল হাঁটাচলা, কিছুই আমি মনে করতে পারি না। যে-বয়েসে মনের কোনও ছবি সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকে, সেই বয়েসটা তখনও আমার হয়নি। আমি শুধু অনেক ঘটনার কথা শুনে শুনে টুকরো ছবিগুলোকে মনে মনে একটা অখণ্ড ছবি করে সাজিয়ে নিয়েছি। এখন কেউ যদি একজনকে নিয়ে এসে বলে, স্নেহা, এই যে তোমার বাবা ইন্দ্রনীল দাসগুপ্ত, সে মানুষটার সঙ্গে আমার মনের ছবির বাবা কিছুতেই মিলবে না। মানুষটা যদি সত্যি সত্যি আমার বাবাও হয়, তাও মিলবে না। আমার মনের বাবার সবটুকু তো সত্যি নয়, তার অনেকখানি কল্পনার মিশেল দিয়ে তৈরি।

এখন তো আমরা অনেক দূরে আছি, কলকাতা থেকে কয়েক শো মাইল দূরে পশ্চিমবাংলার একেবারে উত্তরে। কিন্তু যখন কলকাতায় ছিলাম তখন মামার বাড়িতে গেলে বাবার সম্বন্ধে অনেক কথাই আমার কানে এসে যেত। এমনকী এখানেও অনেক কথা শুনতে পাই। রুচিরা আন্টি তো মা'র খুব বন্ধু, তাই ওর কাছে মা'র কোনও দুঃখ সুখ লুকোনো থাকত না। রুচিরা আন্টির সঙ্গে মা'র কথা হত যখন, আমি অনেক কথাই শুনে ফেলতাম। এসব কথা শুনে বাবার সম্বন্ধে আমার মনে একটা খারাপ ধারণা হওয়া উচিত ছিল। সত্যি তো বাবা আমার কথা ভাবেনি, মা'র কথা ভাবেনি, আমাদের কী হবে, কোথায় যাব, কিছুই ভাবল না। সবচেয়ে খারাপ যেটা, সেটা হল, বাবা আরেকজনকে নিয়ে নতুন সংসার পেতেছে। কিন্তু কিছুতেই বাবার প্রতি আমার কখনও ভয়ংকর রাগ হত না। বরং মনে হত কোথায় যেন একটা ভুল বোঝাবুঝি এতসব ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছে। ভুলটা বাবারই হয়েছে। মা কখনও কোনও ভুল করতে পারে না, কোনও অন্যায় করতে পারে না। এই ভুলটাই বাবাকে অন্যরকম করে দিয়েছে। কিন্তু বেশিদিন এই ভুল থাকবে না। বাবা একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তখন জানব, এই যে আমাদের ছেড়ে থাকা, নতুন করে সংসার করা, সব বাবার সাজানো ব্যাপার ছিল, যার মধ্যে একটুও সত্যি ছিল না।

দেবাশিস সেন, মানে আঙ্কেল, প্রথম যেদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল, সেদিন মনে হয়েছিল, ওর আসবার কথা ছিল না, হঠাৎই চলে এসেছে। এই আসাটা কিন্তু কখনও বাবার শূন্যস্থানে চলে আসা মনে হয়নি। বাবা আর মা আমার সব থেকে আপনজন, সেখানে অন্য কাউকে ভাবার মতো অবকাশ কোথায়?

প্রথম দিনের পর আবার এসেছে আঙ্কেল। তখন কিন্তু তার আসাটা হঠাৎ-হয়ে-যাওয়া মনে হয়নি আমার। মনে হত, কেন আসত হয়তো আঙ্কেল নিজেও জানত না। ওর একটা ছোট্ট লাল মারুতি গাড়ি ছিল, সে গাড়িটা মাঝেমাঝে ছুটির দিনগুলোতে আমাদের বাড়ির সামনে এসে

থামত। আঙ্কেল এসে ঘরে বসত, আমার সঙ্গে কথা বলত, গল্প করত, যেন আমার কাছেই এসেছে। মা'র সঙ্গে ওর কথাই হত না। যাও হত, তাও কোনও দরকারি কথা। শুধু যাবার সময় বলত, চলি। সে সময় আঙ্কেলের চোখ থাকত আমার দিকে, কিন্তু আমার মনে হত, কথাগুলো আমাকে বলা হয়নি। আঙ্কেল চলে যাবার পর মাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগত। বাইরে থেকে সবই ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকত। আমার ভারী অবাক লাগত। আসলে বয়েসে ছোট হলেও ছোটদের মতো করে কিছুই দেখতাম না। কিছুদিন পরেই আমি বুঝে ফেলেছিলাম এই যে আঙ্কেল আমাদের বাড়ি আসে, আমার সঙ্গে অনেক কথা বলে, এগুলো সব সত্যি নয়। কোথায় যেন একটা ছলনা আছে। মা'র মধ্যেও যেন আজকাল সেই আগের মাকে খুঁজে পাই না। আঙ্কেলকে মা কী চোখে দেখে সেটা কেউ না বলে দিলেও বুঝে নিতে মোটেই অসুবিধে হয় না আমার। একটা কথা বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আঙ্কেল বাড়িতে এলে মা কখনও উচ্ছ্বসিত হয়নি, আবার মা'র মধ্যে কখনও সৌজন্যের অভাবও হয়নি, এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু এরপর বেশ কিছুদিন যখন আঙ্কেল কী কারণে যেন বাড়িতে এল না, তখন মা'র সেই ঠিক থাকাটা একটুও মিলল না। সে সময় মাকে কেমন যেন খুব বেশি ঠান্ডা আর চুপচাপ মনে হত। আমার সঙ্গে আগের মতো কবেই কথা বলত, হাসত, আবার যখন নিজের কাজে থাকত, তখন বড্ড বেশি গম্ভীর মনে হত। এই পাহাড়ি শহরে যেমন রোদ্দুর আর মেঘ বড্ড পাশাপাশি থাকে, মাকেও যেন ঠিক সেইরকম মনে হত। এই রোদ্দুর, একটু পরেই আবার একরাশ মেঘ এসে আকাশ মেঘলা করে দিয়ে গেল। তারপর হঠাৎই একদিন যখন আঙ্কেলের গাড়ি এসে থামল আমাদের বাড়ির সামনে, তখন মা'র মুখ দেখে মনে হয়েছিল সব মেঘ সরে গিয়ে যেন ঝলমল করে উঠল রোদ্দুর। ছোটদের চিন্তা ভাবনাগুলো তো জটিল রেখা ধরে চলে না। সম্পর্কের ফাঁকিটুকু খুব সহজেই ধরে ফেলে তারা। তখন হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে হয়েছিল। বাবার না-থাকাটা এক সমুদ্র কান্না হয়ে আমার বুকে দুলে উঠেছিল।

কয়েকদিন পরে এক ছুটির দিনে মা খুব সকালে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিল। সকালটা ছিল খুব চমৎকার আবহাওয়ার। ঝকঝক করছে নীল আকাশ, সবুজ পাহাড় আর সোনালি রোদ্দুর। পাহাড়ি অঞ্চলে এমন দিন কাছে পিঠে কোথায়ও বেড়িয়ে আসার ইচ্ছেটাকে উসকে দেয়। হাত মুখ ধুয়ে দুধ আর খাবার খেতে খেতে শুনলাম মা গুনগুন গান গাইছে। গানটা আমি জানি। আজি বিজন ঘরে নিশিথরাতে আসবে যদি। মা তো খুব ভাল রবীন্দ্রসংগীত গায়, শুনে শুনে আমিও অনেক গান জেনে গেছি। মা যখন গান গায়, তখন মাকে আমার ভীষণ ভীষণ ভাল লাগে। অনেকদিন পরে মা'র মুখে গান শুনে বুঝলাম আজকের সকালটা মা'র কাছে খুশির সকাল।

মাকে কোথাও বেড়িয়ে আসার কথা বলতে যাব, তখনই আঙ্কেলের গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। আঙ্কেলকেও আজ খুশিখুশি লাগছিল। ঘরে ঢুকেই বলল, স্নেহা, আজকের দিনটা কেমন?

বললাম, ফাইন।

আজ কোথাও ঘুরে এলে কেমন হয়?

বললাম, সুপার ফাইন।

আঙ্কেল বলল, তা হলে চটপট তৈরি হয়ে নাও। হিলটপে গিয়ে আজ আমরা পিকনিক করব।

মা ঘরে ছিল না, আমি চিৎকার করে মাকে বললাম, মা, পিকনিক।

একটু পরে মা একরাশ গরমজামা নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, দ্যাখো, কোনটা পরবে। এই সোয়েটারটা, না এই কার্ডিগানটা?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন মা?

মা বলল, বা রে, হিলটপে ঠান্ডা লাগবে না। খুব ঠান্ডা ওখানে।

একটু পরে আমরা আঙ্কেলের লাল মারুতি গাড়িতে বসলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে

গেলাম হিলটপে। জায়গাটা সত্যি দারুণ সুন্দর। কত রকমের ফুল, কত রকমের গাছ। নীল আকাশে সাদা মেঘ ভাসছে, নীচে অনেক দূরে শহরটা ছবির মতো দেখাচ্ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে ঝরনার স্বচ্ছ জলের ধারা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ, নানান ঢঙের বাড়িঘর।

একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে একটা পাইন গাছের নীচে চাদর বিছিয়ে আমরা বসলাম। আঙ্কেল গাড়ি থেকে মস্ত টিফিন ক্যারিয়ার আর জলের বোতল নামিয়ে আনল। টিফিন ক্যারিয়ারে অনেক রকমের খাবার ঠাসা আছে। ওগুলো খেয়ে আজ পিকনিক হবে।

আরাম করে বসে আঙ্কেল বলল, আজ স্নেহার গান শুনব। কিন্তু তখন থেকে দেখছি স্নেহা চুপ করে আছে। কী স্নেহা, মুড ভাল নেই?

আমি চুপ করে রইলাম। মা বলল, কী রে, তোর ভাল লাগছে না? শরীর—

আমি বললাম, শরীর ঠিক আছে।

তবে?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। একটু দূরে গিয়ে অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে কান্না আসছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে বলে উঠি, তোমরা যা ইচ্ছে করো। আমি তোমাদের কেউ না। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। আমি সব বুঝতে পারি।

কিন্তু কথাগুলো আমার ভয়ানক রাগের কথা হলেও সেগুলো তো সত্যিই বলা যায় না। মা লজ্জা পাবে, দুঃখ পাবে, এমন কাজ আমি কক্ষনও করতে পারি না।

আসলে আজকের এই পিকনিক করার ব্যাপারটা যে মা আর আঙ্কেল আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল সেটা আমি অনেক পরে বুঝেছি। আঙ্কেল যেই বাড়িতে এসে পিকনিকের কথা বলল আর মা অমনি ভাল গরমের পোশাকগুলো নিয়ে এসে আমাকে পরতে বলল, তখনই আমার একটু অবাক লেগেছিল। হঠাৎ করে এই পিকনিকে যাওয়ার কথা উঠল, কিন্তু সে ব্যাপারে মা কিছুই জিজ্ঞেস করবে না, তা তো হতেই পারে না। মা'র আগে থেকে জানা না থাকলে মাকে খুব সকালে উঠে এত খুশিখুশি কখনওই দেখতাম না। তা ছাড়া বাইরে যাওয়াটা আগেভাগে ঠিক করে না রাখলে আঙ্কেল টিফিন ক্যারিয়ারে করে অত খাবারদাবার আনবে কেন? আমি কী বোকা। মা আর আঙ্কেল যে দু'জনে দু'জনকে খুব পছন্দ করে, তা বুঝে উঠতে আমার অনেক সময় লেগেছে। আমার কাছে আসা মানে তো আঙ্কেলের মা'র কাছেই আসা। আঙ্কেলের আসাটা মাকেও নিশ্চয়ই খুব খুশি করে।

মা আর আঙ্কেল কী বুঝল জানি না, আমার হাবভাব দেখে দু'জনেই গম্ভীর হয়ে গেল। আনন্দ করতে আসাটা শোকের ব্যাপার হয়ে গেল যেন। পিকনিক একটুও জমল না।

এক ঘণ্টা পরে আমরা ফিরে এলাম।

বাড়িতে এসে মা ভীষণ চুপচাপ হয়ে গেল। আমার খারাপ ব্যবহারের জন্যে আমাকে কিন্তু কিছুই বলল না। আমি বুঝলাম মা দুঃখ পেয়েছে। মা দুঃখ পেলে আমার একটুকুও ভাল লাগে না। মা ছাড়া আমার কেই বা আছে। মা তো আমার ভালর জন্যে সব কষ্ট নীরবে সহ্য করে এসেছে। সেই মা আমার জন্যে দুঃখ পাক, কষ্ট পাক, আমি কিছুতেই চাই না।

রাতে বিছানায় মা'র বুকের কাছে এসে বললাম, মা, আমি আর কখনও দুষ্টুমি করব না।

মা কিছু না বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আমি টের পেলাম মা'র হাতটা কাঁপছে।

৪

হিমঠান্ডা নভেম্বরের শেষে থাবা বসিয়ে ছিল এই শহরে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সেই থাবার ধারালো নখ আঁচড় কেটে ফালাফালা করে দিল শহরটাকে। স্থানীয় মানুষের মুখে শোনা গেল বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এমন ঠান্ডা পড়েনি। কী শীত, কী শীত। গরমজামা ভেদ করে শরীর, শরীর ভেদ করে হাড়কে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ঠান্ডা। অনেক দূরে কোথায় যেন বরফ পড়ার খবর পাওয়া গেল। সারাদিনে রোদ্দুর নেই, ঘন কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে থাকল সূর্যের মুখ।

মন্দিরা আর স্নেহার এত শীতে কাহিল হবার অবস্থা তো হবেই, ডিসেম্বরের শীতে এই শহরে ওরা এই প্রথম। বাড়ির কাজে মেয়ে কাঞ্চি, শীতই কিনা যার জীবনসঙ্গী, সেই শীতে কাঁপতে কাঁপতে কান মাথা ঢেকেঢুকে কাজে আসে, চটপট কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যায়। গল্প করে, এবারের মতো দুশমন শীত কখনও আসেনি আগে। বলতে গেলে সমস্ত পাহাড়ি অঞ্চল তলিয়ে রইল তুষারশীতল শীতের নীচে। দিনের বেলায় যা-কিছু মানুষজন থাকে, সন্ধে হলেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়।

স্নেহার স্কুল এখন বন্ধ, মন্দিরার স্কুলও। কখন ঘড়ির কাটা সকাল পার হয়ে যায়, টেরই পাওয়া যায় না। ঘুম থেকে উঠতে প্রত্যেকদিনই অনেক বেলা হয়ে যায়। লেপ কম্বলের আরাম ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করে না। অনেকদিন কাঞ্চি এসে ডাকাডাকি করলে তবে বিছানা ছেড়ে মন্দিরার উঠতে হয়। স্নেহার তখন আপাদমস্তক লেপে ঢাকা। কিছু পরে মন্দিরা ডাকাডাকি করলে অনিচ্ছা নিয়ে ওঠে।

কাচের জানলার বাইরের ছবিটা কে যেন তুলে নিয়ে গেছে। আগে ঘরে বসেই জানলার বাইরের রঙিন ছবিটা দেখা যেত। সবুজ পাহাড়, উঁচুনিচু পাহাড়ি পথ, ঝাউ পাইন গাছের সারি, আকাশ, মেঘ, আর ঝলমলে রোদ্দুর দেখা যেত। এখন শুধু কুয়াশা। জানলা খুললেই বরফের হাওয়া তিরের মতো ছুটে আসে। দরজা জানলা তাই বন্ধ করে রাখতে হয়। সবসময় ঘরে আলো জ্বলে। সময়ের হিসেব রাখতে হয় ঘড়ির কাঁটায়। কখন যে সকাল যায়, দুপুর হয়, দুপুর যায়, বিকেল হয়, টেরই পাওয়া যায় না। স্নেহা আর মন্দিরা ভারী অসুবিধের মধ্যে পড়ে গেল। কে বা দোকানে যায়, কেনাকাটা করে, বাজারে যায়। অন্য একজনের অভাবটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

দেবাশিস এখন প্রায় আসেই না। ওর না আসার কারণটা মোটেই দুর্বোধ্য নয় মন্দিরার কাছে। হিলটপে সেদিনের স্নেহার আচরণই দেবাশিসকে থামিয়ে দিয়েছে। শুধু দেবাশিস কেন, মন্দিরাকেও নিষেধের এক অতলান্ত খাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। স্নেহা যেন একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব। তার বেশি এগোনো যাবে না। দেবাশিসও নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পেরেছে। মন্দিরা আর সে, দু'টি বিচ্ছিন্ন মানব মানবী, পরস্পরের কাছে এসেছিল জীবনটা আবার নতুন করে নির্মাণ করে নিতে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা সাবলীল পথে হবে না। জোর করে কিছু করাটাও অনৈতিক হবে। সেটা কক্ষনও দেবাশিসের অভিপ্রেতও নয়। দেবাশিস জানে স্নেহার বয়েস বারো হলেও তার দাবি অনেক। কাজেই নিঃশব্দে পিছিয়ে আসাটাই সে ভাল মনে করেছে। মনের মতো অনেক জিনিসই সে পায়নি, এটাও না হয় সেইরকমই হয়ে রইল।

মন্দিরার সামনে এখন কুয়াশার অন্ধকার, পিছনেও কোনও আলোকিত পথ নেই। তার আর দেবাশিসের মাঝে স্নেহা একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরা জানে স্নেহাকে বড় করে তোলা মানুষ করে তোলাই তার সবচেয়ে বড় কর্তব্য, কিন্তু মনে জোর পায় না। এখনও অনেক পথ, অনেক দূর যেতে হবে, অনেক দিনরাত্তির আলোঅন্ধকার পার হতে হবে। মন্দিরার বুকের অতল থেকে বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিশ্বাস। বড় অসহায় লাগে নিজেকে। এক একবার ইচ্ছে করে মনটাকে শক্ত করতে। স্নেহার ইচ্ছে-অনিচ্ছে নয়, তার ভালমন্দের সিদ্ধান্ত মন্দিরাই নিক। দেবাশিসের মতো একজন চমৎকার মানুষ সম্পূর্ণ করে তুলুক তাদের সংসার। স্নেহা

ছেলেমানুষ, সে তো অনেকদূর এগিয়ে রেখে ভাবতে পারে না। সে কী ভাবল, কী মনে করল, সেটা কক্ষনও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। মন্দিরাকে শক্ত হতে হবে। তাদের সংসারের চারপাশে মজবুত বেড়া দিতে হবে। জীবনকে কোনও সাময়িক দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঘেরাটোপে বন্দি রেখে লাভ কী!

কিন্তু ভাবনাটা ভাবনাই থেকে যায়। কী করবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না মন্দিরা। তার মতোই একজন প্রতারিত নিঃসঙ্গ মানুষ কাছে এসে দু'জনের সুখ দুঃখকে ভাগ করে নিতে চাইছে, তাকে গ্রহণ করার চেয়ে পবিত্রতম কিছু আছে কি! দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতে মন চায় কি! মন্দিরাও কি চায় না এই শীতল কুয়াশা কেটে গিয়ে সুনীল আকাশের নীচে ফুলের মতো ফুটে উঠুক নীল লাল দিন। তারই বা কী এমন বয়েস হয়েছে। শুরুতেই শেষ হয়ে যেতে তারও কি সাধ যায়। এক একবার বিদ্রোহ করে উঠতে ইচ্ছে করে তার। সে তো কোনও দোষ করেনি, তবে কেন সারাজীবন এই ব্যর্থতার গুরুভার বহন করে নিয়ে যেতে হবে। একটা অনুদার স্বার্থপর হীন মানুষের জন্যে কেন সে ফিরিয়ে দেবে তার উজ্জ্বল সময়গুলোকে। কেন সে তার নিজের পছন্দ অভিরুচি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। একটা বাতিল সম্পর্কের ফাঁস গলায় লাগিয়ে সারাজীবন ঝুলে থাকার কোনও মানে আছে কি?

সবচেয়ে বড় কথা স্নেহার পায়ে নীচে শক্ত জমি থাকুক, মাথার ওপর মজবুত ছাদ থাকুক, এটা চাওয়া নিশ্চয়ই অবিবেচক কাজ নয়। কিন্তু কিছুই তো হয় না। স্বপ্নের পর স্বপ্ন সাজাতে সাজাতে একটা মন্দির গড়ে ওঠে না। স্থিতাবস্থা থেকে একটু নড়তে পারে মন্দিরা। দেবাশিস বুঝি তার জীবনে কল্পলোকের ছলনাই হয়ে থাকবে শুধু। সামনের দিকে তাকিয়ে সে শুধু আদিগন্ত শূন্য অনাবাদি মাঠই দেখবে।

শীত নেমে গেল হিমাঙ্কের আরও নীচে। দিনের বেলায় যদি বা কোনও গতিকে কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু রাতে যেন হিমঝড় আছড়ে পড়ে। সমস্ত শহরটা বরফের সমাধি হয়ে যায়। লেপের ওপর লেপ তার ওপর ভারী কম্বল দিযেও শরীরকে গরম রাখা যায় না। ছোট্ট মেয়ে স্নেহা, নিস্তেজ হয়ে পড়ল অসহনীয় শীতে।

সেদিন আরও শীত পড়ল। কাজ সেরে যাবার আগে সন্ধেবেলায় লোহার আঙঠায় কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল কাঞ্চি। ওরা নাকি ওদের বস্তির বাড়িতে সারারাত এই আগুন জ্বালিযে রাখে। শীত কিছুটা কম লাগে তাতে।

সন্ধের একটু পরেই রাতের খাওয়া সেরে লেপের তলায চলে গেল মন্দিরা আর স্নেহা। ঘণ্টা খানেক পরে স্নেহা ঘুমিয়ে পড়ল। মন্দিরা শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যা ঠান্ডা, হাতই বাইরে রাখা যায় না। একটু পরে মন্দিরাও আলো নিভিয়ে নিজেকে মাথাসুদ্ধ ডুবিয়ে নিল লেপের তলায়।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মন্দিরার। ধড়মড় করে উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে কোনওমতে বেড সুইচটা খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালাল। কষ্টটা বেড়েই চলেছে। মনে হচ্ছে কে যেন বুকের ওপর একটা বিশাল জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। তবে কি সে সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। ঘরের মধ্যে এত ধোঁয়া কেন? ভীষণ ভয় পেয়ে গেল মন্দিরা। তার শরীরের ভেতরে কিছু ঘটে চলেছে, দমবন্ধ হয়ে আসছে। একটু পবে তার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে যাবে। কথা বলতে পারবে না। স্নেহাকে এক্ষুনি জাগানো দরকার।

স্নেহা, এই স্নেহা!

গায়ে হাত দিয়ে মন্দিরা টের পেল স্নেহাও শুয়ে নেই, সেও বিছানায় উঠে বসেছে।

স্নেহা, আমার না দমবন্ধ হয়ে আসছে।

স্নেহাকে কাশতে শুনল মন্দিরা। কোনওমতে সে বলল, মা, আমারও— আমিও— মা—

দারুণ আতঙ্কে বুকের মধ্যে হিম হয়ে যায় মন্দিরার।

স্নেহা, তোর কি— তুইও কি—

দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার— মা, মাগো— ভাল করে কথা বলতে পারে না স্নেহা, কোনওমতে থেমে থেমে কথাগুলো বলল।

মন্দিরার আতঙ্কিত চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তবে কি ওগুলো শুধুমাত্র ধোঁয়া নয়, ঘরের মধ্যে জীবনঘাতী গ্যাস সৃষ্টি হয়েছে? নিশ্ছিদ্র ঘরের ভেন্টিলেটার পর্যন্ত কাগজ দিয়ে আটকানো, গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারছে না।

কিন্তু কোথা থেকে এসেছে এই গ্যাস? বাইরে থেকে আসার সব পথই তো বন্ধ।

মা মাগো, আমি— আমি— স্নেহা কী বলতে চায়, পারে না। ওর মুখ চেপে ধরেছে ক্ষতিকর গ্যাস। বাচ্চা মেয়ে, বুঝতে পারছে না।

আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মন্দিরা। আর একটু দেরি করলেই দু'জনকে দমবন্ধ হয়ে মরে পড়ে থাকতে হবে এই ঘরে। গ্যাসের ছোবল কাউকে নিস্তার দেবে না। যা করতে হবে এখনই, এই মুহূর্তেই। মন্দিবা জানলার কাছে টলতে টলতে এগিয়ে গেল। জানলার ছিটকিনি খুলে পাল্লা দুটো দু'হাতে বাইরে ঠেলে দিল। মুহূর্তে ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ছুটে এল হিমাঙ্কের নীচের দারুণ ঠান্ডা। থরথর করে কেঁপে উঠল দুটো শরীর। তবু সেই শীতল হাওয়াতেই দু'জনে বুক ভরে নিতে পারল বেঁচে থাকার শ্বাসপ্রশ্বাস। আঃ বেঁচে থাকাটা কত সুখের!

একটু একটু করে ঘরটা গ্যাসমুক্ত হয়ে গেল কিছু সময় পরেই। এখন দারুণ শীত, কিন্তু নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না। কীসের জন্যে এই গ্যাস? মন্দিরা তাকিয়ে দেখল ঘরের এক কোণে তখনও ধিকিধিকি করে কাঠকযলার আগুন জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কোনও সন্দেহ নেই ওই আগুনের ধোঁযাই এই গ্যাস সৃষ্টি করেছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড। ইস, অশিক্ষিতের মতো কী ভীষণ ভুল করেছিল সে। রাত বাড়তেই কাঞ্ছিব জ্বেলে দেওয়া আঙঠার আগুনে আরও কাঠকয়লা দিয়েছিল সে ঘর গরম করতে। তাবপর কখন যে স্নেহার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে নেই। আগুনটা নিভিয়ে দেবার কথা একবারও মনে ছিল না। তাডাতাডি গিয়ে মন্দিরা একটা মোটা কাপড দিয়ে গরম আঙঠাটা ধরে খোলা জানলার বাইরে ফেলে দিল। জানলার বাইরে কোনও জনবসতি নেই, পাহাড নেমে গেছে অনেক নীচে।

এবার আর ভয নেই। ঘর সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত। মন্দিরা ফেব জানলাটা বন্ধ করে বিছানায় স্নেহার পাশে চলে এল।

তখনও স্নেহার ভয় কাটেনি। লেপের ভেতরে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে মন্দিরাকে। থরথর করে কাঁপছে তখনও। মন্দিরা মেয়ের মাথায হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, স্নেহা, সোনা আমার, মানিক আমার। ভয় কী, এই তো আমি তোমার পাশে আছি।

একটু পরে স্নেহা বলল, মা, আঙ্কেল আর আসে না কেন?

মন্দিরা একটু চুপ করে থেকে বলল, কী জানি, কেন আসে না।

আঙ্কেল আমাদের বাড়িতে আর আসবে না?

একটু সময় আবার চুপ করে থাকে মন্দিরা। তারপর বলল, আসবে। তুমি চাইলেই আসবে।

কিন্তু মা—

মন্দিরা বলল, বলো।

স্নেহা মন্দিরার বুক থেকে মুখ তুলে বলল, আমি কিন্তু মা আঙ্কেলকে আঙ্কেলই বলব।

মন্দিরার গম্ভীর মুখে দুই ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠল স্নিগ্ধ হাসি, তার পরেই মেয়ের কচি মুখটা টেনে নিল বুকের মধ্যে।

পিছু পিছু আসে সে

পশ্চিম ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কখনও বেঁকে, কখনও সোজা এসে পায়ে চলা পথটা যেখানে শেষ হয়েছে, জঙ্গল কিছুটা ঢিলেঢালা সেখানে। এখানে ওখানে কিছু শাল, সেগুন, অর্জুন গাছ, কিছু ফাঁকা জায়গা। সেই স্বল্প পরিসর সবুজ ভূখণ্ডটি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে একটা সুদৃশ্য কাঠের বাড়ি। সাদা দেয়াল, লাল টিন, উঁচু পাটাতন। বন বিভাগের বাংলো। এই বাংলোবাড়ির মাঝখানের ঘরটিতে আছেন সেনসাহেব। আজ রাতে তাঁকে খুন করবে পান্নালাল। পান্নালাল এখন বাংলো থেকে কিছুটা দূরে যেখানে জঙ্গল ঘনসন্নিবদ্ধ, সেখানে একটা পাতায়-ঢাকা গাছের ডালে বসে হাতঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে অপেক্ষা করে আছে চরম মুহূর্তের জন্যে।

পান্নালালের হাতের রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িতে এখন রাত দশটা বেজে চোদ্দো মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড। শুক্লপক্ষের গোলাকার চাঁদ এখন মাথার ওপরে। চাঁদের আলোয় বাংলোবাড়িটি এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার থাকলেও ক্ষতি ছিল না। বেড়ালের মতো অন্ধকারেও সে দেখতে পায়। বেড়ালের মতো কথাটা পান্নালালের খুব পছন্দ। সেও কিনা বেড়ালের মতো নিঃশব্দ, সতর্ক, ক্ষিপ্র এবং নিশাচর।

পান্নালাল বাংলোবাড়ির দিকে চোখ ফেরাল। জঙ্গলের মধ্যে যেমন, বাংলোর চারপাশে থমথম করছে নির্জন নিশুতি রাত। বাংলোর সিঁড়ির সামনে থেমে আছে সেনসাহেবের জিপগাড়ি। বাংলোর সবক'টা ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। চৌকিদার আর মালীর ঘরেরও দরজা বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। সবকিছু একটা হাতে-আঁকা ছবির মতো মনে হচ্ছে। আধ ঘণ্টা আগেও সেনসাহেবের ঘরের আলো জানলার কাচ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। এখন সেই আলোও নেই। সেনসাহেবের ঘরের ডানদিকের রুমে যে আছে, সে সেনসাহেবের অধস্তন কর্মচারী কেউ। তার ঘরের আলো তো সেই কখন নিভে গেছে। পান্নালাল এখন নিশ্চিন্ত। কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এখানে, এই জঙ্গল মধ্যবর্তী স্থানে, রাত দশটা মানেই অনেক রাত। সময়টাও নভেম্বরের গোড়ার দিকের। এ-অঞ্চলে এর মধ্যেই বেশ শীত পড়ে গেছে। রাত বাড়লে শীতও বাড়ে, কম্বল মুড়ি দেওয়া ঘুমও।

এবার পান্নালালের কাজ শুরু হবে। মাইকেল কাজ বলে না, বলে অপারেশন। অমুক অপারেশন, তমুক অপারেশন। তা নাম যা-ই হোক না কেন, মোদ্দা কথা হল একটা লোককে দুনিয়া থেকে হাপিস করে দেওয়া।

পান্নালাল আরেকবার চারধারটা খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর আস্তে আস্তে গাছ থেকে নীচে নেমে এল। একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনতে চাইল কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা, সামনে দূরে সন্দেহ করার মতো কিছু আছে কিনা। কথায় বলে সাবধানের মার নেই। সে তো বিয়ে করতে যাচ্ছে না, যাচ্ছে একজনকে খুন করতে। সেনসাহেবকে খুন করেই রাতের মধ্যে তাকে এ-তল্লাট থেকে সরে পড়তে হবে। ধরা পড়লে ফাঁসির দড়ি কিংবা যাবজ্জীবন কারাবাস। তখন কেউই তাকে বাঁচাতে আসবে না। এমনকী তার ঠিকেদার মাইকেলও না। মানুষ খুন করা পান্নালালের বিজনেস। ব্যাবসার লাভ-ক্ষতির দায়দায়িত্ব সবই তার। আর এ-কাজের কনট্র্যাক্ট কাগজেকলমে হয় না, যা হয় সবই মুখেমুখে। কোনও লেখাপড়া থাকে না কোথাও। কাজেই ঢোকার মতো পালাবার রাস্তাটাও পরিষ্কার রাখতে হয়।

দিনের আলো থাকতে থাকতেই পান্নালাল জঙ্গলের ঝোপঝাড় কাঁটাগাছের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে

লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে এসেছে। রাস্তার হদিসটা তাকে আগেই ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই পর্যন্ত এসে গাছের ডালে বসে সে অপেক্ষা করেছে রাত্রি শুনশান না হওয়া পর্যন্ত। সে সেনসাহেবকে চেনে না। লোকটা কে, কী করে, স্বভাবচরিত্র কেমন, তাও জানে না। জানার দরকারও পড়ে না। সে পেশাদার খুনি। টাকা ফেলো, মাল চিনিয়ে দাও, লাশ পড়ে যাবে। তাকে শুধু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে লোকটা কোথায় থাকবে, দেখতে কেমন, কী কী তার শরীরের বৈশিষ্ট্য। ফরেস্ট বাংলোর তিনটে রুমের মাঝখানের রুমে মাথায় সামান্য টাক, ফরসা রং, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, সরু গোঁফ, ডানদিকের কপালে কাটা দাগ, শর্টহাইট, চল্লিশ-একচল্লিশ বছর বয়েসের যে-লোকটি আছে, সেই হচ্ছে সেনসাহেব। এই সেনসাহেবের বুকের ধুকপুকানি চিরতরে থামিয়ে দিতে হবে পান্নালালকে। চুক্তিটা পান্নালাল পেয়েছে তার ওস্তাদ মাইকেলের কাছ থেকে। খুনের অ্যাসাইনমেন্টটা মাইকেল কোন পার্টির কাছ থেকে পেয়েছে, তা অবশ্য সে জানে না। এটা তাকে জানানোও হয় না। কে কাকে সরাতে চায, কেন সরাতে চায়, এসব জানা তার কাজের মধ্যে পড়ে না। সে হল গিয়ে ভাড়াটে খুনি। পুরো টাকাটা পকেটে এলেই সে খুশি। খুন করার জন্যে বিশ হাজারের বারো হাজার পাবে সে। বাকি আট হাজার মাইকেলের। অ্যাডভান্স পেয়েছে দু' হাজার, বাকিটা কাজের পরে। সেনসাহেবের প্রতি তার কোনও রাগ কিংবা আক্রোশ নেই। তবে কিনা এটা হল বিজনেসের ব্যাপার। কাজ হাসিল হলেই কড়কড়ে একশো টাকার একশোটা পাত্তি চলে আসবে তার পকেটে। এর আগেও এমন খুন করেছে সে, খুন করার সময়েই যাকে প্রথম দেখেছে। তা কী আর করা, বিজনেস ইজ বিজনেস। তুমি মুরগি খতম করে, পাঁঠা খতম করে টাকা নাও, আমি তেমনি মানুষ খতম করে টাকা নিই। তবে হ্যাঁ, ছোট কাজ আর বড় কাজ সেটা অবশ্য বলতে পারো। তা পান্নালাল ছোট কাজ করে না।

প্রায় অন্ধকারের সঙ্গে মিশে থেকে খুব সন্তর্পণে বাংলোর দিকে এগোল পান্নালাল। সেনসাহেবকে চেনার এত বেশি বিশেষত্ব আছে যে দূর থেকে দেখেও সে সেনসাহেবকে চিনে নিয়েছে। চোখে বাইনোকুলার লাগাতেও হয় না পান্নালালের, তার চোখ বাজপাখির চোখ। অনেক দূর থেকে সে লক্ষ্যবস্তু পরিষ্কার দেখতে পায়। অন্য তিনজনকেও সে দেখেছে। সেনসাহেবের কর্মচারী, বাংলোর চৌকিদার আর মালী। টার্গেটের বিবরণের সঙ্গে তার একদম মিল নেই। তিনজনের একজন খুবই লম্বা, একজন খুব কালো, একজনের মাথা ভরতি কোঁকড়ানো চুল। আর কে অফিসার আর কে অফিসার না, সে তো চালচলনেই বোঝা যায়। কাজেই অন্যদের সঙ্গে অল্প টাক, ফরসা, শর্ট হাইট সেনসাহেবের ভুল হবার কোনওই সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া খুন করার পূর্বমুহূর্তে পান্নালাল ভাল করে দেখে নেবে যে লোকটা ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে কিনা। শনাক্তকরণটা অব্যর্থ কিনা। ভুল হলে মিছেমিছি একটা লসের বিজনেস হয়ে যায়, টাকাটাও মার যায়। খুব ভাল হত যদি কোনও সুযোগে সেনসাহেবের ঘরে ঢুকে খাটের নীচে লুকিয়ে থাকতে পারত। কিন্তু এখানে সেরকম কোনও সুযোগ নেই। সেনসাহেব কোথায় গিয়েছিলেন, ফিরেছেন বিকেলে। কেউ না থাকলে তাঁর রুমেরও দরজা বন্ধ থাকে। কুচি পাথর বিছানো রাস্তা দিয়ে যখন সেনসাহেব ফিরছিলেন, তখন গাছের ডালপাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে পান্নালাল তাঁকে স্পষ্ট দেখে নিয়েছে। মাথায় অল্প টাক, ফরসা, শর্ট হাইট। হ্যাঁ এই হল সেই লোক। একেই আজ রাতে খুন করতে হবে। তার বুকে বসিয়ে দেবে ধারালো অস্ত্র। দরকার হলে দু'বার, তিন বার। বুকে, পেটে। লোকটা পুরো খতম হয়ে গেছে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত। পান্নালাল দেখেছিল সেনসাহেব বাংলোয় ফিরে একটু পরে বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বসলেন, চৌকিদার আর কর্মচারীটির সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বললেন, চা খেলেন, সিগারেট খেলেন, সামনের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে কী ভাবলেন। ঘরে গেলেন যখন তখন ঝুপ করে নেমে গেছে নভেম্বরের সন্ধে। আগেভাগে ঘরে ঢুকে লুকিয়ে থাকার সুযোগ পাবে, এমন চান্স তো সব ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। বড় কাজ, ঝুঁকিও বেশি। একটা বিজনেস করতে পারলেই কয়েক মাসের খরচা পকেটে চলে আসে। এ তো আর নুন তেলের দোকান নয় যে প্রত্যেকদিন ঝাঁপ খুলে বসতে হবে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে পান্নালাল একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে চারদিক আবার ভাল করে দেখে নিল। হঠাৎ রাগ কিংবা উত্তেজনার বশে সে খুন করতে যাচ্ছে না। চুক্তি মোতাবেক সে মাথা ঠান্ডা রেখে খুন করে। পয়সা পেলে মুরগি জবাই করার মতো যে-কোনও লোককে খুন করতে পারে। এসব কাজে খুব সাবধানে এগোতে হয়। না, তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। রাতের ছবিটা আগের মতোই আছে। খবরমতো এই বাংলো আর স্টাফ কোয়ার্টার্সে আছে গোনাগুনতি ছ'টা লোক। সেনসাহেব, তাঁর কর্মচারী, মালী, চৌকিদার, তার বউ আর বাচ্চা। এখন যে যার লেপ কম্বলের তলায় সেঁধিয়ে গিয়ে ঘুমে পাথর হয়ে আছে। একটা আদিবাসী বস্তি আছে বটে, কিন্তু সেটা এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। শুধু একটাই ভয় আছে জংলি জানোয়ারের। শ্বাদপসংকুল গভীর জঙ্গলের মধ্যে এই বন বাংলোর সামনে যখন-তখন চিতা কিংবা বুনো হাতি নাকি চলে আসে।

পান্নালালের সঙ্গে যে-অস্ত্র আছে তা দিয়ে বন্য জন্তুর মোকাবিলা করা যাবে না। একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি আর একটা পিস্তল আছে সঙ্গে। পিস্তলটা খুব দরকার না পড়লে ব্যবহার করা যাবে না। খুনটা সঙ্গে সঙ্গে জানাজানি হয়ে যাক, পেশাদার খুনিরা কখনও তা চায় না। অকুস্থল থেকে সরে পড়ার মতো যথেষ্ট সময় তার চাই। সে গোপনে আসে, সরেও পড়ে গোপনে। সে তো আর ফৌজ আদমির মতো ঢাকঢোল পিটিয়ে যুদ্ধ করতে আসে না, তার বিজনেস করেই সে চলে যায়।

পান্নালালের ঘড়িতে এখন এগারোটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। কাজ শেষ করার আগে আরও কিছুক্ষণ সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে তার। একটু একটু করে এগিয়ে আনতে হবে সেনসাহেবের জীবনের শেষ মুহূর্তটি। খবর আছে বাংলোর বারান্দার দিকে জানলায় কোনও শিক কিংবা গ্রিল নেই। খুব কায়দা করে জানলার পাল্লা খুলতে হবে। এ-কাজে পান্নালাল অবশ্য খুবই ওস্তাদ। তার হাত দুটোতেও লোহার জোর আছে।

পান্নালালের দু'হাতে রবারের দস্তানা, পায়ে মোজা। জুতোজোড়া খুলে এসেছে গাছের নীচে। কোনও শব্দ করা যাবে না, হাত-পায়ের কোনও ছাপ রাখা যাবে না। পরনে একটা কালো ফুল সোয়েটার আর কালো প্যান্ট। অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে রাখতে পারবে সহজেই।

পান্নালাল সাবধানে পা ফেলে ফেলে চোখ কান সতর্ক রেখে আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে এগোতে থাকল। এ-গাছ সে-গাছের আড়াল দিয়ে চলে এল খুব কাছে। চারধার এখন নিঃঝুম, নির্জন। রাত্রির গহন অতলে তলিয়ে আছে সবকিছু। তবু বেশি সাহস দেখানো ঠিক না। সেনসাহেব নাকি নামকরা শিকারি, সঙ্গে রাইফেল আছে। ছোটখাটো দেখতে হলে কী হবে, শরীরে নাকি ভালই শক্তি রাখেন। তাঁকে কোনওমতেই টের পাইয়ে দেওয়া চলবে না। কিছু টের পাবার আগেই তাঁকে খতম করে দিতে হবে।

হঠাৎ কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। পান্নালাল সঙ্গে সঙ্গে একটা গাছের আড়ালে চলে গেল। একটা রাতচরা পাখি উড়ে গেল সামনে দিয়ে। কয়েকটা বাঁদর এ-ডাল ও-ডাল করল লাফিয়ে লাফিয়ে। গাছের পাতার শব্দ হল। একটু পরে আবার সবকিছু চুপচাপ হয়ে গেল। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে নড়ল না। সবকিছু বরফের মতো ঠান্ডা আর নিশ্চল হয়ে যাবার জন্যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। যখন বুঝল কপালে ভাঁজ পড়ার মতো কিছু নেই, তখন সে আবার পা বাড়াল।

বাংলোর গেট খুলে ভেতরে যাবার আগে পান্নালাল একটা বড় পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে মারল কম্পাউন্ডের ভেতরে। একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হল। পান্নালাল তখন ফের একটা গাছের পেছনে সরে গেছে। খুব সাবধানে মুখ বাড়িয়ে দেখল। পাথর পড়ার শব্দে কেউ জাগে কিনা, দরজা খুলে কেউ বাইরে আসে কিনা। কিন্তু চাঁদের আলোয় বাংলোর ছবিটা যেমন ছিল, তেমনই রইল। গেট খুলে একটু একটু করে বাংলোর সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নেবার জন্যে পান্নালাল পেছনে তাকাল। তাকিয়েই ভয়ানক চমকে উঠে ঝট করে শরীরটা ঘুরিয়ে নিল। বিস্ফারিত চোখে সে দেখল অদূরেই ওত পেতে বসে ল্যাজ

নাড়ছে একটা বড় সাইজের চিতা। পান্নালালের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল হিমেল আতঙ্ক। সামনেই সাক্ষাৎ মৃত্যু লাফ মারার জন্যে অপেক্ষা করছে। এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে যেমন একজনের মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে নিঃশব্দে এসেছে, সেইভাবে তার পেছনেও এসেছে তার মৃত্যুর পরওয়ানা। যে পান্নালাল এতকাল দয়ামায়াহীন বিবেকবর্জিত একটা যন্ত্র ছাড়া কিছুই ছিল না, সে এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের মতো বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। না পারল দৌড়ে পালিয়ে যেতে, না পারল আর্ত চিৎকার করে উঠতে। এইটুকু শুধু বুঝল কিছু করে কোনও লাভও হবে না। চিতার আক্রমণের বাইরে সে কিছুতেই যেতে পারবে না। অমোঘ নিয়তির মতো ওটা এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ধারালো দাঁতে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে।

তখনই চিতাটা বিদ্যুতের মতো ছিটকে শূন্যে উঠে গেল, ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপরে, সীমাহীন আতঙ্কে পান্নালালের চোখদুটো বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ রাইফেলের গুলির শব্দ তার কানে এল। অব্যর্থ নিশানা চিতাটাকে শূন্যেই লক্ষ্যভেদ করেছে। চিতাটা ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। কোথাও গুলি অবশ্যই লেগেছে। মারাত্মক আহত হয়েও পশুটা মাটিতে পড়েই লাফ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

পান্নালালের চোখ তখন চিতার দিকে ছিল। তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল বাংলোর বারান্দায় সেনসাহেব দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে রাইফেল। ওই রাইফেলের গুলিই পান্নালালকে অবধারিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে সামান্য আগে।

যে-সেনসাহেবকে পান্নালাল খুন করতে এসেছিল, সেই সামান্য টাক, ফরসা রং, ছোটখাটো চেহারার মানুষটাকে এখন বিশাল অতিমানবের মতো মনে হল তার। নিজের অজান্তে মাথা নিচু হয়ে এল।

গুলির শব্দ শুনে ততক্ষণে সবাই জেগে উঠেছে। সেনসাহেবের কর্মচারী, চৌকিদার, চৌকিদারের বউ, মালী। সবাই ছুটে এসেছে বারান্দায়। কী ব্যাপার হল, রাইফেল কে ছুড়ল, কেউ জানে না। আর সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে কালো পোশাক পরা লোকটাই বা কে? অমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

সেনসাহেব বললেন, কী কারণে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঢিলটিল কিছু পড়ার শব্দ শুনেছিলাম যেন। জানলার বাইরে তাকিয়েই দেখলাম এই লোকটা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে আর ওর সামনেই একটা বড়সড় চিতা। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটা নিয়ে বাইরে এসে ফায়ার করলাম। চিতা তখন সবে লাফ মেরেছে। ভাগ্যি ভাল, গুলিটা চিতার গায়ে লাগাতে পেরেছি। এক মুহূর্ত দেরি হলে আর পূর্ণিমার চাঁদের আলো না থাকলে কী হত জানি না। বাঘ বলেই অমন ঘায়েল হয়েও পালাতে পারল। তবে মরবে ঠিক। কিন্তু এ লোকটা কে বলো তো? কালো ড্রেস, এত রাতে এখানে— চিত্তবাবু, জিজ্ঞেস করুন তো?

সেনসাহেবের কর্মচারীটি চেঁচিয়ে বলল, এই যে, কে তুমি? এত রাতে এখানে কী করতে এসেছ?

উত্তর দেবে কী, পান্নালালের জিভ তখন শুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। দৌড়ে পালাবে কী, পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। একটা দীনহীন ভাঙাচোরা মানুষের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল।

মৃত্যুর কারবারি এই প্রথম জানল জীবন কেমন। বড় সাধের জীবন।

ফসিল

ঘড়ির কাঁটা ঠিক যখন দুপুর বারোটার ঘর পার হয়, আর টুপাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কাজের মহিলা সাবিত্রী মাসির ঘন্টা চারেকের জন্যে কাজ থেকে ছুটি। সিঁড়ির পাশের ঘরে সে চলে যায়, বেরিয়ে আসে চারটের সময়। টুপাইকে দুধ গরম করে দেয়, টুপাইয়ের দাদু অমরনাথের জন্যে চা। বারোটা থেকে তিনটে, এই তিন ঘণ্টা অমরনাথের বিছানায় শুয়ে থাকার সময়। ঘুমানোর চেষ্টা করেন, ঘুমের কাছাকাছি পৌঁছেও যান, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েন না কোনওদিনও। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকে সুনসান দুপুরের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনেন। ফেরিয়ালা বিচিত্র ভাষায় হাঁক পেড়ে চলে যায়, কা কা করে হঠাৎই গম্ভীর গলায় ডেকে ওঠে কোনও সঙ্গী-খোঁজা নিঃসঙ্গ কাক, রিকশা চলে যায় টুংটাং শব্দ করে, হঠাৎ হাওয়ায় সামনের পুরনো অশ্বত্থ গাছের পাতার শব্দ হয় সরসর করে, চকিতে ভেসে আসে মাইকে বাজা হিন্দি সিনেমার চটুল গান। ছোট ছোট শব্দেব ঢেউ ওঠে, সেই শব্দ ভেঙে ভেঙে মিশে যায় দুপুরের অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে। অমরনাথ চুপচাপ শুয়ে থেকে অপেক্ষা করেন কখন দেয়ালঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ হবে। তিনটের সময় টুপাইয়ের তিন ঘণ্টার ঘুম ভেঙে যায়। টুপাইয়ের ঘুম ভাঙলেই অমরনাথ চোখ বন্ধ করে নকল ঘুমের অভিনয় করেন। টুপাই দাদুর বিছানায় চলে এসে তার আট বছরের গোল গোল হাত দিয়ে ধাক্কা দেয় দাদুর শরীরে।

ও দাদু, ওঠো না, ও দাদু!

অমরনাথ তখন চোখ খুলে তাকান টুপাইয়ের দিকে। হেসে ফেলেন, উঠে বসেন বিছানায়।

রোজ এই হয়। সপ্তাহের সাতদিনই। টুপাইয়ের মা-বাবা নীলেশ আর জয়শ্রী বাড়িতে থাকলেও হয়। সেদিন জয়শ্রী কিংবা নীলেশের নির্বিঘ্ন ঘুমের জন্যে একটা নির্বিঘ্ন দুপুরের দরকার। নীলেশ একটা বহুজাতিক সংস্থার পদস্থ কর্মচারী, জয়শ্রী সরকারি অফিসের স্টেনো। ফলে ছুটির দিনেও মা-বাবাকে সঙ্গে পায় না টুপাই। দাদুর ঘরে চলে যেতে হয়। অঙ্কের নিয়মের বাইরে যাওয়া হয় না তার। দাদুর ঘরে আরেকটা চৌকিতে টুপাইয়ের জন্যে আলাদা বিছানা আছে। সেই বিছানায় একা একা শুয়ে টুপাইয়ের বাল্যকাল কাটে।

অনেকক্ষণ ধরে কী একটা শব্দ কানে আসছিল অমরনাথের। কোথায় যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলের ফোঁটা পড়ছে টুপটাপ করে। শব্দ একইভাবে হয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম তেমন কিছু মনে হয়নি অমরনাথের। নির্জন, নিস্তব্ধ, কাজছুট দুপুরে যে-কোনও শব্দই স্পষ্ট শোনা যায়। শব্দ হয়, সে শব্দ থামে, নতুন শব্দ আসে, কোনও শব্দই দীর্ঘজীবী হয় না। কিন্তু এ-শব্দটা থামছে না। টুপটাপ করে একটা শব্দ দুপুরের শরীর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ক্রমশ অমরনাথের মস্তিষ্কের কোটরে কোটরে পৌঁছে যাচ্ছে। বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। অস্বস্তি হচ্ছে। একঘেয়ে লাগছে। গ্রামোফোনের ফাটা রেকর্ডে পিনটা আটকে আছে কতকগুলো ফিরে ফিরে আসা শব্দের আবর্তে যেন। কীসের শব্দ ওটা? কলের মুখ থেকে জল পড়ার শব্দ কি? কিন্তু রান্নাঘর কিংবা বাথরুম থেকে কোনও শব্দ তো এ-ঘরে পৌঁছাবার কথা নয়? তবে কি শব্দটা বাইরে কোথাও হচ্ছে? কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টির জল কি এই চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ির কোথাও আটকে থেকে এখন একটু একটু করে পড়ছে কার্নিশে বা কোথাও?

তাঁর খাটের মাথার কাছে একটা ছোট টেবিলে আর সব জিনিসের সঙ্গে একটা টাইমপিসও আছে। এখন দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। এ-ঘড়িতেও শব্দ হয় মুহূর্ত পার হবার। সারাদুপুর,

সারারাত। টিকটিক করে সময় এগিয়ে যায়। বাল্য পার হয়ে কৈশোর, কৈশোর পার হয়ে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্য। পার হয়ে যাচ্ছে বার্ধক্যও। অন্যদিন এ-সময় তিনি শুয়েই থাকেন। আজ ওই লাগাতার শব্দটাই তাঁকে উঠিয়ে দিয়েছে। তিনি অসহায় চোখে ঘরের চারপাশ তাকিয়ে দেখলেন। টুপাই পাশবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে। কাল রাতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আজ গরম নেই। পাখার বাতাসে ঠান্ডার আমেজ।

এই আবাস তাঁর নিজের নয়, ছেলে নীলেশের। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় চলে আসার পর নিজস্ব বাড়ি করা হয়ে ওঠেনি। ভাড়া বাড়িতেই ছিলেন বরাবর। সরকারি আমলার পদ থেকে অবসর নেবার পরও। দু'ছেলের মধ্যে বড়ছেলে চাকরি সূত্রে দিল্লিতে। ওখানেই থেকে যাবে সম্ভবত। কালেভদ্রে কলকাতায় আসে বুড়িছোঁয়ার মতো। বছর পাঁচেক আগে অমরনাথের স্ত্রী কল্যাণী গত হবার পর ছোটছেলে নীলেশ দক্ষিণ কলকাতার এই ফ্ল্যাটে উঠে আসে। তখন থেকে তিনিও ছোটছেলের কাছে। বড়ছেলের কাছে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। প্রবাসী জীবন অমরনাথের পছন্দ নয়। এই বয়সে বাংলার জলমাটি থেকে শিকড়টা উপড়িয়েও নিতে পারবেন না। থেকে গেলেন ছোটছেলের কাছেই। নীলেশ আর ওর বউ জয়শ্রী অবশ্য যত্নের কোনও ত্রুটি রাখেনি, অমরনাথের সুবিধে অসুবিধের প্রতি লক্ষও রাখে। ওদের একমাত্র সন্তান আট বছরের টুপাইকে দিনের আট-নয় ঘণ্টা দাদুর হেপাজতে রেখে ওরা নিশ্চিন্ত। বয়স্কা সাবিত্রী মাসি অবশ্য খুবই বিশ্বস্ত। অনেক বছর ধরে আছে এ-সংসারে। থাকেও এ-বাড়ির একটা ঘরে। তবু একজন রক্তের সম্পর্কের মানুষের দায়িত্বে থাকলে মনের কোথাও কোনও ছোট্ট কাঁটাও খোঁচায় না। কতরকম ঘটনার কথা থাকে খবরের কাগজে।

শব্দটা হয়েই যাচ্ছে। একইরকম গোল গোল শব্দ। অমরনাথের মনে হল ওটা যেন চারপাশ থেকে এগিয়ে আসা ভয়ংকর একাকিত্বের পায়ের শব্দ। এই একাকিত্ব অমরনাথের একার নয়, সামনের খাটে শুয়ে থাকা ওই আট বছরের ছেলেটিরও। টুপাই ঘুমাচ্ছে। কিন্তু মনে হল ঘুমটা কোনও শিশুর নিটোল ঘুম নয়। কপাল মসৃণ নয়, একটা ভাঁজ দেখা যাচ্ছে যেন।

দক্ষিণ কলকাতার এ-জায়গা অন্য এক প্রবাস যেন। বেড়াবার জায়গা নেই, হইচই করে কথা বলার মতো লোকও নেই। এই আবাসনের অধিকাংশ আবাসিক দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের লোক। ভাষা, লোকাচার, জীবনধারণ সবই আলাদা। এখানে অমরনাথের যেমন কোনও সঙ্গী নেই, তেমনি টুপাইয়েরও কোনও বন্ধু নেই। ছেলেটা যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নির্বাসিত। ওর মা-বাবা ওর চারপাশে নিষেধের লক্ষ্মণরেখা টেনে দিয়েছে। কঠোর অনুশাসনে সে এখন থেকেই কঠিন প্রতিযোগিতার জন্যে তৈরি হচ্ছে। খেলাধুলা নেই, গল্পের বই নেই, টিভি দেখা নেই। তাকে কেরিয়ার তৈরি করতে হবে, কোথাও একটু দাঁড়াবার সময় নেই। সামনের বছর তাকে ভরতি হতে হবে নামকরা এক স্কুলে। সেখানে শক্ত পরীক্ষা, হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা। টুপাই সকালে কিন্ডারগার্টেনে যায়, বিকেলে হোমওয়ার্ক করে, সন্ধেবেলায় দিদিমণি পড়াতে আসে। ওই দুপুরের কিছু সময়ই টুপাইয়ের ঘুমানোর সময়। সেটাও কিন্তু কাজের মধ্যে পড়ে। দুপুরে ঘুমিয়ে নিলে রাতে আরও বেশি সময় পড়াশোনা করতে পারবে। অমরনাথ এক এক সময় ভাবেন, কে বেশি একা। শৈশব-বঞ্চিত টুপাই, না বয়ঃভারাক্রান্ত বিপত্নীক অমরনাথ?

আবার ভাবেন, টুপাইয়ের সামনে তবু তো বয়েস আছে। অপ্রকাশিত ভবিষ্যৎ আছে, পালাবদলের সম্ভাবনা আছে— তাঁর সামনে তো কিছুই নেই। রুক্ষ মরুভূমি সীমানা বাড়াচ্ছে শুধু। এক পা বাড়িয়ে রাখা শুধু শেষদিনটির জন্যে। স্ত্রী কল্যাণী চলে যাবার পর বেঁচে থাকার মানেটাই অন্যরকম হয়ে গেছে। বড় বিষণ্ণ হয়ে গেছে সময়।

টুপাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। দাদুকে দেখল বিছানায় বসে থাকতে। অন্যদিন এমনটা হয় না। টুপাই-ই দাদুকে বিছানা থেকে তোলে। এটা জিজ্ঞেস করে, ওটা জিজ্ঞেস করে। একটু পরেই সাবিত্রী মাসি এসে যায় এ-ঘরে। টুপাই দুধ খায়, সাবিত্রী মাসির সঙ্গে বাথরুমে যায়, বাথরুম থেকে

এসে হোমওয়ার্ক করে। দিদিমণি পড়াতে আসে ঠিক সন্ধে সাতটায়, যায় ন'টার পরে। ন'টার পরে রাতের খাওয়া হয়ে গেলে ফের এক ঘন্টা জয়শ্রী ওর পড়াশোনা দেখে। তখন ঘুমে জড়িয়ে যায় টুপাইয়ের ছোট হয়ে আসা দুটো চোখ। কিন্তু থামলে চলবে না। সময় তার একেবারে মাপে মাপে হিসেব করা। যেভাবেই হোক সফল তাকে হতেই হবে। সামনেই তার বিরাট প্রতিযোগিতা। অমরনাথের বড় মায়া হয় ছেলেটার প্রতি। টুপাই তার নিজের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন। চারপাশের চারটে নিরেট দেয়াল ওর কাছে আসতে দেয় না অচিনপুরের রাজপুত্রকে, লুকোচুরি খেলাকে, ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিকে। ছেলে কিংবা ছেলের বউকে সে-কথা দু'-একদিন বলেছেনও। কিন্তু তাঁর কথা ওরা শুধু শোনেই, করে না কিছুই। অমরনাথ পুরনো আমলের মানুষ, এই জেটগতির যুগে তাঁর চিন্তাভাবনার কী-ই বা মূল্য আছে। আজকাল আর বলেন না। কল্যাণী চলে যাবার পর তিনি শুধু এক শরীরসর্বস্ব মানুষ। তাঁর কথা শোনে না কেউ।

টুপাই একটু সময় বিছানায় বসে রইল। মুখটা ভারভার। এই সময়ই অমরনাথ টুপাইয়ের মধ্যে একটি শিশু মানুষকে খুঁজে পান। বোধহয় পৃথিবীর সব শিশুরই ঘুমভাঙা মুখ এমনিতর হয়। মনে হতেই তিনি হেসে ফেললেন। টুপাইকে ডাকলেন, আয়।

টুপাই সঙ্গে সঙ্গে দাদুর বিছানায় এসে বলল, ও দাদু, সেই যে ঘুড়ির মাঞ্জা দেওয়া সুতোয় তোমার এত্তোখানি হাত কেটে গিয়েছিল, রক্ত পড়েছিল? অনেক?

অমরনাথ টুপাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, পড়বে না? কাচের গুঁড়ো আর জিওল গাছের আঠা দিয়ে তৈরি মাঞ্জা, খুব ধার। রক্ত পড়বেই তো!

তোমার মা তোমাকে খুব বকেছিল?

কত আর বকবে। তখন তো সবাই ওইরকমই ছিল। সারাদিন এই ঘুড়ি ওড়ানো, এই ডাংগুলি খেলা, এই গোল্লাছুট, এই পুকুরের জলে দাপাদাপি করা, গাছে উঠে আম পেয়ারা পাড়া— দুষ্টুমির কি অন্ত ছিল। কতবার মাথা ফেটেছে, হাত ভেঙেছে, তার ঠিক নেই।

টুপাই বড় বড় চোখ করে বলে, তা হলে তুমি হোমওয়ার্ক করতে কখন?

অমরনাথ হা হা করে হেসে ওঠেন, তখন এত সব ছিল না রে। তবে সকালে বিকেলে পড়াশোনাটা করতাম ঠিকই। সেও ছিল এক মজার কাণ্ড। জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো সব ভাইবোন— প্রায় সাত-আটজন এক ঘরে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া করতাম।

আট-দশজন ভাইবোন? টুপাই অবাক হয়ে যায়।

তা তো হবেই। তখন তো সবাই একসঙ্গে থাকত। বলত একান্নবর্তী পরিবার। একই রান্নাঘরে বাড়ির পঁচিশ-ত্রিশ জনের রান্না হত। খুব সস্তাগণ্ডার দিন ছিল অবশ্য।

টুপাই কিছু বুঝল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু ওর মুখে বিস্ময়ের ভাবটা থেকেই গেল।

অমরনাথ বললেন, একটা শব্দ হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছিস?

টুপাই একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শব্দটা শুনতে চাইল। বলল, কীসের শব্দ দাদু?

অমরনাথ বললেন, কী জানি কীসের শব্দ। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ— তখন থেকে হয়েই যাচ্ছে।

টুপাই দাদুর কাছে সরে বসে বলল, সেই যে পোড়োবাড়িতে কীসের শব্দ শুনেছিলে না একবার, ওটা কি একটা ভূতে করেছিল দাদু! মাকে বলেছিলাম, মা খুব বকল আমায়। ভূত কি আগেকার দিনের অসভ্য লোকের বানানো গল্প দাদু? ও দাদু, বলো না।

অমরনাথ বললেন, এখন বিজ্ঞানের যুগ, সব কিছু বদলে গেছে। ভূতও মিথ্যে হয়ে গেছে। ভূত না থাক, আমাদের ছেলেবেলায় ভূতের ভয় ছিল খুব। একবার হয়েছে কী, আমি আর ভোলা দু'জনে মিলে মাছ ধরতে গেছি দূরের এক জংলা পুকুরে। মেঘলা দিন, চারধারে ঝোপ জঙ্গল, লোকজন কেউ নেই, হঠাৎ একটা কাক কা কা করতে করতে উড়ে গেল আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। মিশমিশে কালো দাঁড়কাক, ডাকটাও কেমন যেন। একটু ভয়ভয় লাগল। কাকটা একটা

গাছের ডালে বসে আবার ডাকতে ডাকতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। পুকুরটা নানান আগাছায় ভরতি। একটা ফাঁকা মতো জায়গায় ছিপ ফেলে বসে আছি, এমন সময়—

পাশের ঘরে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটু পরেই সাবিত্রী মাসি টুপাইয়ের জন্যে দুধ আর অমরনাথের জন্যে চা নিয়ে আসবে এ-ঘরে। দুপুর পশ্চিমে চলে গেছে। সেই শব্দটাও কমে এসেছে। একটু পরে থেমে যাবে মনে হয়।

টুপাই তাড়া দেয়, ও দাদু, বলো না, এমন সময় কী হল?

অমরনাথ তাঁর ছেলেবেলার গল্প বলেন টুপাইকে। অন্য কোনও গল্প নয়, টুপাই শুধু শুনতে চায় দাদুর বাল্যকালের গল্প। অমরনাথের ছেলেবেলা কেটেছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে। পঞ্চান্ন-ষাট বছর আগে মফস্‌সলের শহর আর গ্রামের কোনও তফাত ছিল না। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আসেনি, যানবাহন ছিল না বিশেষ, জটিলতাও ছিল না এত। জীবনযাত্রা ছিল ধীরগতির। মানুষের মধ্যে ছিল নানাবিধ সংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর অলস গল্পগাছা। তবু মনে হয় সেদিনের সেই জগৎটা বড় মায়াময় ছিল। বুকের কোথায় যেন কান্নার মতো জমে আছে সব স্মৃতি। টুপাই বড় বড় চোখ করে গালে হাত দিয়ে দাদুর সেইসব গল্প শোনে। দু'টি অসময়বয়সি মানুষ দুপুরের মন্থর প্রহরে পরস্পরের আত্মার আত্মীয় হয়ে যায়।

দাদু, তুমি ফুটবল খেলতে?

ফুটবল? খেলতাম বই কী। জাম্বুরার বল দিয়ে খেলা হত।

জাম্বুরার বল? জাম্বুরা কোথায় দাদু, ব্রাজিলে? আর্জেন্টিনায়?

ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা? আজকাল তোমরা অনেক দেশের নাম জেনে গেছ দাদুভাই। জাম্বুরা কোনও দেশ না রে, বাতাবিলেবুকে বলতাম। বড় বড় বাতাবিলেবুকে বল করে খেলতাম, চামড়ার বল কোথায় পাব। ওই ঘুড়িও নিজেরা বানাতাম, শ্রীমন্ত ঘরামি লাটাই বানিয়ে দিত। এক পয়সা করে দাম নিত।

টুপাই একটু সময় চুপ করে থাকে। চুপ করে থেকে ভাবে। সে যেন এই ঘর, এই ঘরের বাইরে ওই জমি, জমি পার হয়ে অনেকদিন আগেকার কোনও নির্জন মাটির পথ দিয়ে একাকী হেঁটে যায়। তার চোখদুটোতে যেন স্বপ্নের ঘোর লেগে থাকে। সে অমরনাথের দিকে তাকায় না, জানলার বাইরে উঁচু উঁচু বাড়ির সামান্য ফাঁক দিয়ে হঠাৎ-পাওয়া সংক্ষিপ্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, দাদু, আমাকে একটা ঘুড়ি কিনে দেবে? আর লাটাই, মাঞ্জা দেওয়া সুতো?

ভারী অবাক অমরনাথ। ঘুড়ি, লাটাই? ওসব দিয়ে কী করবি দাদুভাই?

লাট্টু কিনে দেবে? নীল-লাল গুলি?

কিন্তু ওসব দিয়ে কী করবি বলবি তো?

সামান্য সময় চুপ করে থেকে টুপাই বলে, সাজিয়ে রাখব। ওই যে র‍্যাক, যেখানে আমার অঙ্কের বই, ইংরিজি বই আছে, ওখানে সাজিয়ে রাখব লাটাই, ঘুড়ি— চাঁদিয়াল, পেটকাটি, দোরঙা—

ভূপতি, এই ভূপতি

সে কিংবা অন্য যে-কোনও লোক এই শহরের যে-কোনও জনবহুল রাস্তার ধারে গাড়ি ধরবে বলে যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। অথচ গাড়ি পাচ্ছিল না। যে-নম্বরের বা যে-ঠিকানার গাড়িগুলোর কোনওটাতেই সে বাড়ি পৌঁছোতে পারবে না, কেবল সেই গাড়িগুলোই তার কাছে এসে থামছিল। ওর আশেপাশের লোকজন যারা আগে কিংবা পরে এসেছিল, তারা সবাই টুপটাপ গাড়িতে উঠে চলে যাচ্ছিল। সে-ই শুধু বারবার একা হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক নম্বরের গাড়ি, যা কিনা তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে, কিছুতেই তার চোখে পড়ছিল না। ব্যাপারটা তার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে না হওয়াতে তার কপালে ছোট্ট একটা ভাঁজ পড়ল। তা হলে কি সেই এতই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে যে গাড়ি ধরবে বলে ভুল রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে? কথাটা মনে হতেই সে রাস্তার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। কিন্তু তখনই সে বুঝতে পারল না কোনও ভুল করেছে কিনা। তবু সে তাড়াতাড়ি রাস্তার উলটোদিকে গিয়ে দাঁড়াল। যদিও উলটোদিকে দাঁড়ানোর কোনও মানে বুঝতে পারল না। কিন্তু এখানেও সেই একই অবস্থা। বাড়ি ফেরার গাড়ি এখানেও তার চোখে পড়ল না।

তার কপালের ছোট্ট ভাঁজ বিস্তৃত হল। ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে কেন তার বোধগম্য হল না। রাস্তার দু'ধারে আবার সে তাকিয়ে দেখল। তার পেছনে ইংরিজি দৈনিক পত্রিকার বাড়ি, এ-পাশে আয়কর ভবন, সামনে স্যার আশুতোষ দাঁড়িয়ে আছেন, আরও সামনে কর্মব্যস্ত চৌরঙ্গি, গড়ের মাঠ, শহীদ মিনার। মানুষ, গাড়ি, ঠিক জায়গাতেই তো সে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ অনেকক্ষণ হয়ে গেল যে-গাড়িতে সে উঠবে সেই গাড়ি সে পাচ্ছে না।

তবে কি যে-রাস্তায় সে যাবে, সেই রুটের সমস্ত গাড়ি কোনও কারণে আজ বন্ধ হয়ে আছে? কিংবা এ-রাস্তা দিয়ে না গিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে? তাকে একটু চিন্তিত দেখাল। অথচ এসব নিয়ে খুব বেশি ভাববার মতো সময় তার নেই। যেমন করেই হোক, খুব তাড়াতাড়ি তার বাড়ি ফেরা দরকার। তার হাতে খুবই প্রয়োজনীয় এক ওষুধ, যা কিনা অনেক খুঁজে এতদূর এসে তাকে পেতে হয়েছে, যা ডাক্তারের নির্দেশে তার খুবই অসুস্থ স্ত্রীকে অবিলম্বে খাওয়ানো দরকার। কাজেই বাড়ি ফেরার চিন্তা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা তার মাথায় এখন নেই। এখনই তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে।

কাজেই পরিস্থিতি সম্বন্ধে খুব দ্রুত তাকে ভেবে নিতে হল। গাড়ি ধরবে বলে সে হয়তো এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যেখান থেকে তার বাড়ি ফেরার গাড়ি আদৌ যাওয়া-আসা করে না, সমস্ত ব্যাপারটাকে এইরকমভাবে সে ভেবে নিতে চাইল। কিন্তু ভেবে নিলেও সে নিজের স্থিতাবস্থা থেকে একচুলও নড়তে পারল না। এ-সময়ে, ঠিক এই মুহূর্তে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে তো তার খুব পরিচিত রাস্তা। এত বড় ভুল তো তার হওয়ার কথা নয়। সে আবার রাস্তাটা দেখল। উঁহুঁ, ভুলটা কিংবা ভুল হবার কারণটা সে ধরতে পারল না। সে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল, আবার কী ভেবে ফিরে এল। একবার ভাবল এ-রাস্তায় না হলে অন্য রাস্তায় সে গাড়ি পেয়ে যাবে। অন্য রাস্তাতেই যাওয়া যাক। কিন্তু অন্য কোনও রাস্তার কথা চট করে তার মনে এল না। অথচ একটা কিছু নিশ্চয়ই ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভুলটা কী হচ্ছে সে বুঝতে পারছিল না। আর কেন ভুল হচ্ছে তার কোনও সঙ্গত কারণ সে ভাবতে পারছিল না। ওষুধ নিয়ে তার শিগগির বাড়ি ফেরাটা এতই জরুরি যে সে তার এই অবস্থা নিয়ে ভাবাভাবির জন্যে সময় করে নিতে পারছিল না। সে

তাড়াতাড়ি আবার এসপ্লানেডের নানান রাস্তার মুখে চলে এল। রাস্তার এক পাশে দাঁড়াল। তারপর একটু সময় নিয়ে ভাবল এবার সে সত্যি সত্যি কোন রাস্তা দিয়ে যাবে।

কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে দেখল সে কিছুই মনে করতে পারছে না। স্পষ্টতই সে বুঝতে পারল কোথায় যেন ভীষণরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাড়ি ফেরার গাড়ি ধরার জন্যে দারুণ ব্যস্ত ছিল বলেই সে ঠিক করল আপাতত কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবে। একটু এগিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। দোকানের সামনে তখন কেউ ছিল না, কাউকে কেনাকাটা করতে দেখল না। দোকানের খুব কাছাকাছি হতেই দোকানদারের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। দোকানদার তাকে সম্ভাব্য ক্রেতা মনে করে নিয়েছে।

সে কিছু কিনতে আসেনি, ব্যাপারটাও খুবই সামান্য— এইভাবে ইতস্তত করে কুণ্ঠিত গলায় বলল, ইয়ে মানে বলছিলাম কী—

তাকে কথাটা শেষ করতে না-দেখে দোকানদার বলল, কী দেব বাবুজি?

না, আমি ইয়ে— মানে কী যেন বলে— এবারও সে কথাটা শেষ করতে পারে না।

দোকানদার আবার বলল, কী দেব, পান? সিগারেট?

তখন তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুচ্ছিল না। দারুণ বিস্মিত হয়ে সে বুঝতে পারছিল কত নম্বর গাড়িতে সে যাবে সেই কথাটাও এখন মনে করতে পারছে না। তার ভুল হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই ভুল যে এতবড় জায়গা দখল করে নিয়েছে, তা সে এতক্ষণ জানত না। পানের দোকানের আয়নায় নিজের মুখ তার চোখে পড়ল। নিজের মুখ দেখে নিজেই চমকে উঠল। বিস্মিত দোকানদারের সামনে থেকে সে তাড়াতাড়ি সরে এল। যে করেই হোক এক্ষুনি তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। ভুলটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার জন্যে মোটেই সময় দিতে সে চায় না। ভাগ্যক্রমে তখনই একটা খালি ট্যাক্সি তার সামনে দেখল। তার অস্বাভাবিক ভুলটাকে ভোলাবার জন্যে সে এত তাড়াতাড়ি করছিল যে ট্যাক্সির ভাড়ার টাকা তার পকেটে ঠিকঠাক আছে কিনা তাও ভাবল না। ট্যাক্সিটা থামাবার জন্যে হাত তুলল।

ট্যাক্সিটা থেমে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভার জানতে চাইল, কোথায় যাবেন?

ট্যাক্সিতে উঠবে বলে সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছিল। কথাটা তার কানে গেল। কী একটা বলতে গিয়ে পর মুহূর্তে ভয়ের একটা হিমশীতল স্রোত তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল। নিশ্চল ছবির মতো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ড্রাইভার আবার জিজ্ঞেস করল, কই, কী হল? কোথায় যাবেন?

অন্যমনস্কভাবে সে মাথা নাড়ল। না, কোথাও সে যাবে না। পানের দোকানদারের মতো ট্যাক্সির চালকও অবাক হয়ে তাকে দেখল। তারপর অস্পষ্ট গলায় কী একটা বলে, বোধহয় গালাগালি দিয়েই, হুস করে বেরিয়ে গেল।

যন্ত্রচালিতের মতো রাস্তার ধার থেকে আস্তে আস্তে সে ফুটপাথে উঠে এল। ফুটপাথের একপাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যমান কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু তাকিয়ে থেকে সে কিছুই দেখছিল না। নানান বর্ণের চলমান কলকাতা তার কাছে একটা সাদা কাগজের মতোই বিবর্ণ মনে হচ্ছিল। তার মস্তিষ্কের গভীরে কোথায় যেন বিপুল বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। তার বুদ্ধি, স্মৃতি, চেতনা, সবই যেন তার আয়ত্তের বাইরে। অস্থিপিঞ্জরে ধরে রাখা দেহটাকেই শুধু সে টেনে চলেছে। প্রথমে সে ভেবেছিল যে-রাস্তায় গাড়ি ধরবে বলে দাঁড়িয়ে আছে সেটা ঠিক রাস্তা নয়। তারপর কত নম্বর গাড়ি ধরবে সেটাও মনে করতে পারল না। এই পর্যন্ত, অর্থাৎ ঘটনার এতদূর পর্যন্ত সে তার বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে, এইরকম একটা ভাসাভাসা মানসিক অবস্থা তার ছিল। কিন্তু কোথায় যাবে, কোথায় তার বাড়ি, কোন জায়গা, কী ঠিকানা, এ-কথাও যখন তার মনে এল না, তখন থেকে এক ছমছমে আতঙ্ক অন্ধকারের মতো ঘন কুয়াশার মতো তার বুকের মধ্যে ছেয়ে গেল। সভয়ে সে ভাবল তবে কি সে একটু একটু স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

কিন্তু সে-ধরনের কোনও ধারণাকে সে তার মনে ধরে রাখতে চাইল না। পরিস্থিতি এতই জটিল হয়ে উঠেছে যে সেটাকে বেশি দূর এগিয়ে যেতে দেওয়া চলে না। এমন সময় যে-দোকান থেকে ওষুধটা কিনেছে সেই দোকানের কথা তার মনে এল। সঙ্গে সঙ্গে লোকজনকে ধাক্কা মেরে গাড়িঘোড়াকে ভয় না করে সে পাগলের মতো এগিয়ে গেল ওষুধের দোকানে। এবার কিন্তু তার কোনও ভুল হল না। ওষুধের দোকানটা ঠিকই খুঁজে পেল। কিন্তু হন্তদন্ত হয়ে সেই দোকানে ঢুকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। ওষুধের দোকানে এসে কী লাভ হবে? দোকানের লোকেরা তো তাকে চেনে না। সে কোথায় থাকে, কী করে, এসব কথা তো তাদের জানার কথা নয়। ঠিক তখনই পরশ পাথর পেয়ে যাওয়ার মতো একটা কথা তার জানা হয়ে গেল। তার পকেটে তো দোকানের ক্যাশমেমো আছে। সেখানেই তার ঠিকানা পাওয়ার কথা। কথাটা মনে হতেই নিজের বুকপকেট থেকে প্রায় ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিল। কিন্তু এবারও তাকে ভীষণভাবে হতাশ হতে হল। ক্যাশমেমোতে তার নাম ঠিকই লেখা আছে। কিন্তু ঠিকানার জায়গায় শুধু কলকাতা লেখা। কলকাতার ঠিক কোথায়, কোন রাস্তায়, কত নম্বর বাড়ি, খাস কলকাতায় না শহরতলীতে, সেসব কিছুই লেখা নেই। এবার পকেট থেকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা বের করে দেখল। সেখানেও একই অবস্থা। প্রেসক্রিপশনে শুধু ডাক্তারের সই আর ওষুধের নাম লেখা। খুবই জরুরি এই ওষুধটার নাম ডাক্তার খসখস করে একটা সাধারণ কাগজে লিখে দিয়ে তাড়াতাড়ি এনে খাওয়াতে বলেছিলেন। অর্থাৎ কিনা অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে সে তার সংগ্রহের মধ্যে এক্ষুনি এমন কিছু পাচ্ছে না যাতে করে তার বাড়ির ঠিকানাটা পেয়ে যেতে পারে। তখন ঠিক স্বাভাবিক কোনও মানুষের মতো সে কিছু ভেবে উঠতে পারছিল না। ওষুধের দোকানে এ-ব্যাপারে কোনও খবর যদি সে পেয়ে যায়, এইভাবে কাউন্টারের কাছে গিয়ে বলল, এই যে দেখুন, একটু আগে আমি একটা ওষুধ, এই ওষুধটা— ওষুধটা সে দেখাল— আপনাদের দোকান থেকে কিনেছি— কথাটা কীভাবে শেষ করবে চিন্তা করতে একটু সময় নিল সে।

তার সামনেই দোকানের যে-সেলসম্যান দাঁড়িয়ে ছিল সে তার হাতের ওষুধটা দেখল, তারপর ক্যাশমেমোটা দেখে বলল, হ্যাঁ, একটু আগেই তো নিয়ে গেছেন। কেন, কী হয়েছে?

না, কিছু হয়নি, তবে— সে কথাটা গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, তবে মেমোতে আমার ঠিকানাটা দেওয়া নেই তো— কথাটা সে শেষ করে না।

সেলসম্যান ক্যাশমেমোটা ভাল করে দেখে বলল, পুরো ঠিকানাটা অবশ্য দেওয়া নেই। তা এতে কি আপনার কোনও অসুবিধে আছে?

দোকানের ক্যাশমেমো অনেক সময় অনেক দরকারে লাগে সেজন্যে ঠিকানা থাকলে সঠিক মানুষটাকে শনাক্ত করা যায় এইরকম মুখের ভঙ্গি করে সে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সুবিধে হয়। আপনারা আমার পুরো ঠিকানাটাই লিখে দিন।

বলেই সে দোকানের তাকে সাজানো ওষুধগুলো দেখতে থাকল। মুখের ভাবটা খুব সহজ দেখাতে চাইল। যেন ঠিকানা লিখতে বলাটা খুব সামান্য ব্যাপার, এ নিয়ে আর বিশেষ কিছু বলার বা ভাবার দরকার হয় না, এক্ষুনি ঠিকানাটা লেখা হয়ে যাবে, কাজেই তাকে দোকানের চারপাশ দেখে বাড়তি সময় কাটাতে হচ্ছে।

সেলসম্যান ক্যাশমেমো বইটার ওপরে কার্বনপেপার দিয়ে তার দেওয়া কাগজটা রেখে বলল, হ্যাঁ, বলুন।

সে যতই অন্যমনস্ক ভাব দেখাক না কেন, তার কান অত্যন্ত সজাগ ছিল সেলসম্যান কী বলে শোনার জন্যে এবং তার মনের মধ্যে এই ভয়টাই ঘুরঘুর করছিল। সে নিশ্চিত জানে না তখন তার পুরো ঠিকানাটা বলেছিল কিনা। কিংবা বলে থাকলেও এতক্ষণ পরে এদের তা মনে থাকার কথা নয়। একটা ঝুঁকি নিয়েই সে দোকানে ঢুকেছিল। কাজেই তার কাছে যখন ঠিকানাটা জানতে চাওয়া হল, তখন সে বুঝল শেষ আশাটাও তার হাতছাড়া হয়ে গেল।

তার মধ্যে তখন বিরাট ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে। শুধু প্রাণপণে নিজেকে ধরে রাখতে রাখতে বলল, তখন যে ঠিকানাটা বললাম সেইটেই লিখুন না।

দোকানের লোকটা হাসল।

বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু—

বলে হাসিটা আরও একটু প্রসারিত করল। অর্থাৎ ঠিকানাটা তার যথারীতি মনে নেই।

সে মরিয়ার মতো বলল, এই তো একটু আগেই বললাম—

মনে নেই। আবার বলুন।

হঠাৎ তার রাগ হয়ে গেল। একটু তেজি গলায় বলল, এক ঠিকানা কতবার বলব?

এবার দোকানে চেয়ারে বসে থাকা চশমা ধুতি পাঞ্জাবি পরা ফরসামতো মধ্যবয়সি ভদ্রলোকের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হল। বললেন, কী ব্যাপার, কী হল আপনার?

তার বদলে সেলসম্যানই কথা বলল।

ভদ্রলোক তাঁর মেমোতে ঠিকানা লিখে দিতে বলছেন। তা ঠিকানাটা ওঁকে জিজ্ঞেস করাতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

চশমা-পরা ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে শান্ত মুখেই বললেন, আপনি ঠিকানা চান, ভাল কথা। ওকে বলুন, ও লিখে দিচ্ছে—

কিন্তু ঠিকানা আমি আগেই বলেছি। বলে সে মুখ গম্ভীর করার ভান করল।

বেশ তো, আরেকবার বলুন।

সে দেখল দোকানের সব লোক, যারা ওষুধ কিনতে এসেছে তারাও, অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার অবস্থাটা পিছু হঠতে হঠতে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের ঠিকানা নিজেই জানে না। একবার কেন, এখন একশোবার কেউ জিজ্ঞেস করলে সে বলতে পারবে না। কাজেই নকল একটা রাগ দেখিয়ে, যেন ইচ্ছে করেই ঠিকানা বলবে না এইরকম ভাব দেখিয়ে, তাকে দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে হল। পেছনে তাকাল না। সে জানে পেছন ফিরে তাকালেই দেখতে পাবে অনেকগুলো চোখ তার দিকে অবাক হয়ে, যেমনভাবে পাগল দেখে সেভাবে, তাকিয়ে আছে।

রাস্তায় এসে তার রোখ চেপে গেল। যেমন করেই হোক তার বাড়ি যাবার পথ সে খুঁজে বের করবেই। তার হাতের ওষুধটা এতই জরুরি যে ওটা খাওয়ানো তার স্ত্রীর বেঁচে থাকবার পক্ষে একান্ত দরকার। অথচ এমত এক অবস্থার মধ্যে সে পড়ে গেছে, অজানা ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়ার মতো, যে প্রাণপণ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে বাড়ি ফিরতে পারছে না। হাঁটতে হাঁটতে সে মনকে বোঝাল যে হয়তো সে কোনওভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং সাময়িক এই অসুস্থতা অথবা নানান চিন্তা ভাবনায় তার মাথার শিরা উপশিরাগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না, সেইজন্যে হয়তো কিছু সময়ের জন্যে সবকিছু জট পাকিয়ে গেছে। দু'-একটা রাস্তা ঘুরলেই জটটা খুলে যাবে, আবার সবকিছু মনে পড়ে যাবে— এইরকম চিন্তাভাবনা নিয়ে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকল। রাস্তাব মাঝখান দিয়ে যত গাড়ি যাচ্ছিল সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। রাস্তার দু'পাশে যত বাড়ি, অফিস, দোকান, সাইনবোর্ড, মানুষ, সবকিছুর মধ্যেই সে হারানো স্মৃতিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল অকূলপাথারে ভাসতে ভাসতে খড়কুটো পেয়ে যাবার মতো। প্রথমে ধর্মতলা দিয়ে মৌলালি হয়ে শেয়ালদা স্টেশনের দিকে গেল। বাঁদিকে ঘুরে বউবাজার দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটল। বেশিদূর গেল না। আবার এসপ্ল্যানেডে ফিরে এল। এবার দক্ষিণমুখো হাঁটল। অনেকটা পথ হাঁটল। হেঁটে হেঁটে পৌঁছে গেল ভবানীপুর। আবার পিছনে ফিরল। সব রাস্তা তার চেনা, সব রাস্তাতেই সে আগে বারবার, অনেকবার আসা যাওয়া করেছে। হয়তো এর যে-কোনও একটা রাস্তা দিয়ে তার বাড়ি পৌঁছানো যায়। কিন্তু সেই রাস্তা যে কোনটা, দক্ষিণের না উত্তরের, না মাঝখানের, সে কিছুতেই ধরতে পারছিল না। দিশেহারা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সর্বস্বান্ত মানুষের মতো আবার সে চৌরঙ্গীতে ফিরে এল। তখন তাকে ধরে নিতে হচ্ছে চৌরঙ্গিই তার আপাতত ঠিকানা। কেননা একটা বিষয়ে সে

নির্ভুল যে তার স্মৃতির সূত্রটা চৌরঙ্গির আশেপাশের অঞ্চল থেকে হারিয়ে গেছে। খোঁজাখুঁজি করতে করতে আবার হয়তো ফিরেও পেতে পারে। চৌরঙ্গিতে এসে সে থামল। রাস্তার এপাশে দাঁড়িয়ে অভিজাত হোটেলের গম্বুজের ঘড়িতে সময় দেখল। সেই সকাল থেকে সে ঘুরছে। সকাল পেরিয়ে এখন দুপুর। তার হাত-পা আর চলছিল না। গলা শুকিয়ে আসছিল, পেটে খিদে অনুভব করছিল। পকেটে কিছু টাকাপয়সা আছে। কিন্তু সেই পয়সায় কিছু কিনেটিনে খেয়ে নেবার মতো স্থির হয়ে কিছু করতে পারছিল না। সে যেন ঘুরপাক খাচ্ছে গোলকধাঁধার মধ্যে। এক জটিল আবর্তে ঘুরছে তার শরীর, মন, ভাবনা। একটা দারুণ ভয় তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে আরও দূরে, অন্য কোথাও, কোনও দূরতম কোণে— বুদ্ধির অগম্য চেতনার অতীত কোনও অন্ধকার রাজ্যে।

ঘুরতে ঘুরতে সে ময়দানের একটা ফাঁকা জায়গা দেখে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। তার মনে একটা ক্ষীণ আশা নিভুনিভু প্রদীপের মতো তখনও জ্বলছিল যে এই সাময়িক বিপর্যয় থেকে সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসতে পারবে। কাজেই সবুজ জমির ওপর বসে প্রথমে সে একটু ধাতস্থ হতে চাইল। তারপর ছড়ানো ছিটানো আজকের দিনটাকে গুটিয়ে নিয়ে ভাবতে ভাবতে, কিংবা কোনও সীমাহীন সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সবুজ কিনারা খুঁজতে শুরু করল। পরিস্থিতিকে সে পর্যায়ক্রমে এইভাবে সাজাল— প্রথমত সে, তার কী নাম এবং পরিচয়। এগুলো কিন্তু সে ঠিকঠিক ভেবে নিতে পারল। এরপর এখন যেখানে থাকে সেই বাড়ি, তার স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বউ, সবকিছু ছবির মতো চোখের সামনে মেলে রাখল। সে অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে দেখল যে ছবিটা অবিকৃতই আছে। ছেলের বাড়িতে তার অবসর জীবন, তার স্ত্রীর অসুখ, আশেপাশের ঘরবাড়ি মানুষজন রাস্তাঘাট সবই সে অবিকল মনে করতে পারল। কিন্তু সেই জায়গাটা যে কোথায় খুঁজতে গিয়েই তার সামনে অনতিক্রম্য এক অন্ধকার এসে পড়ল। গভীর হতাশায় আবার সে ডুবে গেল।

অবশ্য বুঝতে পারল জায়গাটা বেশিদূরে নয়। কলকাতার কোথায়ও। ক্যাশমেমোর ঠিকানা তার মুখে শুনেই লেখা হয়েছিল। তা ছাড়া একটা ঘিঞ্জি গলি, গলিতে হাতে-টানা রিকশা, সাত ভাড়াটের দোতলা বাড়ি। সারাদিন নানান মানুষের হাজার কথা, চেঁচামেচি, জানলার বাইরে ঘেঁষাঘেঁষি ছোট-বড় বাড়ি, অদৃশ্য আকাশ, গুমোট, ছায়াছায়া স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার, মানুষের ভিড়, তাকে কলকাতাকে চিনিয়ে দিল। কিন্তু সেটা কলকাতার কোথায়? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম মধ্য, কোন কলকাতায়? সে যেখানে থাকে তার আশেপাশের রাস্তাগুলো নামগুলো সে ভাবল, সমস্ত মনকে এক জায়গায় জড়ো করে ভাবল, তবু কোনও রাস্তার নামই তার মনে পড়ল না।

ছেলের বাড়ির কথা সে ভাবল, যেখানে সে এখন থাকে। ছেলের বাড়িতে সে এসেছে চাকরি থেকে অবসর নেবার পর। তার আগে যেখানে ছিল, চাকরি করত, অনেক দূরের সেই মফস্‌সল শহর, ফাঁকা মাঠ, ছোট্ট নদী, অফুরন্ত আকাশ, শান্ত জীবন— নিখুঁতভাবে সে মনে করতে পারল। চাকরির শেষে একমাত্র ছেলের কর্মস্থলে চলে আসে বাকি জীবনটা ছেলের সংসারে নাতি নাতনি নিয়ে সুখে কাটিয়ে দেবে বলে। ভাবতে ভাবতে এই জায়গায় তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। একটু সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। কেননা তার আগের জায়গা থেকে ঘরবাড়ি জমিজমা বিক্রি করে ছেলের কাছে চলে এসেছিল পাকাপাকি ভাবে। কিন্তু ছেলের সংসারের স্বল্প পরিসর ছোট্ট ঘরগুলোর মধ্যে উদারতা, ভালবাসা, সুখ, এইসব বড় মাপের জিনিসগুলোর স্থান সংকুলান হত না। কাজেই ছেলের অপ্রসন্ন মুখ, ছেলেবউয়ের বিরক্তি, স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধি, আর স্মৃতিমন্থন তার নিত্য সহচর হয়ে গিয়েছিল। সে যা টাকাপয়সা এনেছিল, স্ত্রীর দু'বছরের কঠিন অসুখে তার প্রায় সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল, ছেলের হাতে বিশেষ কিছুই দিতে পারেনি। এসব কথা তার ঠিকঠাক মনে পড়ছিল। তার প্রতিদিনের জীবন, চারপাশের চরিত্রগুলো, তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসছিল। কিন্তু সেটা কোথায় তা মনে করতে গিয়ে সে দেখল তার সামনে অতলান্ত খাদ। সেই নিঃসীম শূন্যতার ধার দিয়ে সে পাগলের মতো ছোটাছুটি করেও পার হবার কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই উত্তেজিতভাবে সোজা হয়ে বসল। তার ছেলে এই কলকাতারই কোথায় যেন চাকরি করে। ছেলের অফিসে গেলেই তো হয়। সেখানেই তো ঠিকানা পেয়ে যাবে। সে নিজেকে অত্যন্ত নিরেট বোকা বলে স্বগতোক্তি করল, এই সামান্য কথাটাই এতক্ষণ তার মাথায় আসেনি। সে চটপট উঠে দাঁড়াল। কিন্তু পরক্ষণেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ কী, তার ছেলের অফিসের ঠিকানাটাও যে এই মুহূর্তে তার মনে আসছে না! উন্মাদের মতো মনের অন্ধকার হাতড়ে বেড়াল। না, কিছুই মনে পড়ছে না।

ভয়টা এইবার তার বুকে হাজারমনি পাথরের মতো চেপে বসল। তার পরিষ্কার জানা হয়ে গেল যে কোনও ভয়াবহ অসুখে সে আক্রান্ত হয়েছে। কোনও-না-কোনও ভাবে সে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং এই বিস্ফোরণ একটু একটু করে তাকে গ্রাস করছে। তার গলা শুকিয়ে গেল, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, এইমাত্র ফাঁসির আদেশ শুনেছে এইভাবে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অথচ, একটু পরে সে আবার ভাবল, স্মৃতির চরিত্রগুলো তার পরিষ্কার মনে আছে। ছেলের বাড়ি, ছেলে ছেলেবউ নাতি নাতনির মুখ, অসুস্থ স্ত্রীর শীর্ণ মুখ, সব সে ঝলমলে দিবালোকের মতো দেখতে পাচ্ছে। মেয়ের মুখ, যার কিনা বহুদিন আগেই বিয়ে দিয়েছিল, তার মুখও তার কাছে স্পষ্ট। তবে কি এই ভুলে যাওয়া আংশিক? সে জানে না আংশিক স্মৃতিভ্রষ্ট হয় কিনা। তবে তার হয়েছে। অনেক দূরের অতীতকে সে জলমাটির মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছে, ময়দানের ঘাসের ওপর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই বিমর্ষ আতঙ্কিত মানুষটাকেও চিনতে পারছে— অর্থাৎ কিনা এপার আছে ওপার আছে মাঝখানে কিছু নেই। জীবনের খাতা থেকে মাঝখানের পাতাগুলো কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে।

বয়েসের এই পড়ন্ত বেলায় একা একা দাঁড়িয়ে থেকে তার কান্না পেল। অনেক দূরে ফেলে আসা ছেলেবেলার মতো সে ডুকরে কেঁদে উঠতে চাইল। কান্নাটা তার বুকের মধ্যে ছটফট করে উঠল। তার যে বাড়ি ফেরা একান্ত দরকার। বাড়িতে তার স্ত্রী অসুস্থ। তার কাছে রয়েছে স্ত্রীর জন্যে দরকারি এক ওষুধ, যা কিনতে এতদূর এসে তার মাঝখানের স্মৃতি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

সে চোখ বন্ধ করে আবার বসে পড়ল মাটিতে। হঠাৎ সে একজনকে দেখল তার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে। তাকে দেখেই সে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে তার স্থিরচিত্রটা নড়ে উঠল। সে ঠিক চিনতে পেরেছে। কত বছর পার হয়ে গেছে তবু তার ছাত্রজীবনের বন্ধু ভূপতিকে চিনতে এতটুকুও ভুল হল না।

ভূপতি ময়দানের ওপর দিয়ে একমনে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। ভূপতির চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, মাথায় কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুল, ধুতি শার্ট, ছোটখাটো খয়া খয়া চেহারা।

সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডাকল, ভূপতি, ভূপতি!

ভূপতির কানে তার ডাক পৌঁছোল না বুঝি। একভাবে হেঁটেই যাচ্ছে। কোনওদিকে তাকাচ্ছে না। ময়দানের ঘাস মাটি পার হয়ে গাড়িঘোড়ার রাস্তায় পৌঁছোতেই সে ভীষণভাবে ব্যস্ত।

সে ছুটে এসে ভূপতির সামনে দাঁড়িয়ে একটা হাত খপ করে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ভূপতি, এই ভূপতি, তুই আমাকে চিনতে পারছিস?

তাকে দেখে ভূপতি দাঁড়িয়ে গেল। চোখদুটোতে বিস্ময়ের ঝিলিক লাগল। হ্যাঁ, ভূপতি চিনতে পেরেছে।

ভূপতি, আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম, ঘুড়ি ওড়াতাম, নদীতে মাছ ধরতে যেতাম, মনে আছে? বল না, মনে আছে কিনা?

আবার ভূপতির চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। হ্যাঁ, তার মনে আছে কিংবা মনে পড়েছে ছেলেবেলার সেই দিনগুলোর কথা।

ভূপতি এখনও কোনও কথা বলেনি। সে অস্থিরভাবে ভূপতির হাত ধরে নাড়া দিল।

তা হলে ভূপতি? তুই চুপ করে আছিস কেন?

ভূপতি তবু কথা বলে না। বড় বড় চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে।

ভূপতি, তুই আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিস। স্কুল ছাড়ার পর আমি কোথায় চলে গেলাম, তারপর কোথায় চাকরি করতাম, তুই জানিস?

ভূপতির চোখে ছায়া পড়ল। এক মুহূর্ত যেন সে চিন্তা করে নিল। তারপর ছায়াটা সরে গেল। মেঘ-ভাঙা রোদ্দুরের মতো ঝকঝক করে উঠল তার চোখ। অর্থাৎ কিনা ভূপতি জানে। সে স্কুল ছাড়ার পর কোথায় গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে কোথায় চাকরি করত, দুটোর ঠিকানা ভূপতির জানা আছে।

ভূপতি, কথা বলছিল না কেন? চাকরি থেকে রিটায়ার্ড হয়ে আমি আমার ছেলের কাছে কোথায় চলে এসেছি, জানিস?

এবার ভূপতির চোখদুটো ছোট হয়ে আসে। নিষ্প্রভ হয়ে আসে চোখের আলো। না, এ-খবর ভূপতির জানা নেই।

ভূপতি, আমি বাড়ি যেতে পারছি না, ঠিকানা ভুলে গেছি— ভূপতির হাত জড়িয়ে ধরে কান্নার গলায় সে বলে, ভূপতি, তুই আমাকে পৌঁছে দে। ভূপতি , প্লিজ—

ভূপতি হঠাৎ ওব কাছ থেকে ছিটকে পিছিয়ে এল। ওর চোখের সামনে ভূত দেখার আতঙ্ক। সভয়ে একটু দূরে সরে এসে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ায়।

ভূপতি, আমাকে তুই পৌঁছে দে, বাড়ি নিয়ে যা—

ভূপতি আর কোনও কথা শোনার জন্যে দাঁড়ায় না। কোনওদিকে না তাকিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে।

সে ডাকে, ভূপতি , ভূপতি শোন—

কিন্তু ভূপতি দাঁড়ায় না। খুব জোরে হাঁটতে হাঁটতে, প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে, ময়দান পার হয়ে রাস্তার দিকে চলল। ভয়ংকর একটা জন্তু যেন তার পিছনে ধাওয়া করে আসছে।

ভূপতি, একটু দাঁড়া।

ভূপতি তখন ছুটছে। সেও ছোটে ভূপতির পেছনে পেছনে।

ভূপতি, আমি হারিয়ে গেছি, তুই আমাকে নিয়ে যা—

ভূপতি তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ময়দান পেরিয়ে জনবহুল রাস্তায় পৌঁছেছে। দুপুরের ব্যস্ত কলকাতার রাস্তা দিয়ে অবিরাম ট্রাফিক স্রোত। ভূপতি কোনওদিকে তাকায় না, কোনও কথা শোনে না, কোনও বাধা মানে না, কেবল ছুটছে। ছুটতে ছুটতে ভূপতি শূন্যে উঠে যায়। হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে। নীচে পড়ে থাকে কলকাতা। গাড়ি, বাড়ি, গাছ, মাটি। তবু ভূপতি ছুটছে।

ভূপতির পেছনে সেও ছোটে। ভূপতির মতো সেও উঠে যেতে চায় শূন্যে, বায়ুস্তরের ওপরে। কিন্তু পারে না। রাস্তার মাঝখানে ছুটে-আসা কোনও ধাতব পদার্থের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়। রক্তাক্ত দেহে রাস্তায় শুয়ে পড়ার আগে তার কথাগুলো গলার কাছে ছটফট করে।

ভূপতি, একটু দাঁড়া। আমাকে নিয়ে যা।

একসঙ্গে

দেবব্রতবাবু যখন প্রাতঃভ্রমণে বের হন, তখন ঠিক সকালও ভাল করে শুরু হয় না, আবার শেষ রাতও থেকে যায়। বছর চারেক আগে চাকরি থেকে অবসর নেবার পর থেকেই তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার এই নিয়মটা চালিয়ে আসছেন। কী শীত, কী বর্ষা, সবদিনই তাঁকে এ-সময় রাস্তায় দেখা যায়। হাতে একটা লাঠি থাকে। লাঠিটা তাঁকে নির্জন ভোরের পথে সাহস জোগায়, বেয়াড়া কুকুর সামলায়। প্রথম প্রথম রাস্তাটা ফাঁকাফাঁকা লাগে, কিছু দূর গেলে তবে আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কারুর সঙ্গে কথা হয়, কারুর সঙ্গে হয় না। কিন্তু চলা থামে না। যা হয়, ওই চলতে চলতেই হয়। তিন রাস্তার মোড়ে আসতেই দেখতে পান আরেকটা কর্মব্যস্ত দিনের সূচনা হয়ে গেছে। জগুর চায়ের দোকানের ছোকরাটা উনুনে আগুন দিয়েছে, ধোঁয়া উঠছে কয়লার। পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলে যায় খবরের কাগজের হকার, সাইকেলের হ্যান্ডেলে টিন ঝুলিয়ে দুধের জোগানদার, গৃহদেবতার জন্যে পুজোর ফুল তুলছে বিধবা মহিলা বাড়ির গাছ থেকে। কা-কা-কা।

ডিসেম্বর মাস একেবারে শেষ কিনারায় এসে ঠেকেছে। এমনিতে গত কয়েকদিন ধরে শীত জাঁকিয়ে বসেছে, আজ আরও বেশি। সোয়েটার, চাদর, মাফলার, টুপিতে শরীর ভাল করে ঢাকাঢুকি দেওয়া, তবু শীত টের পাচ্ছেন দেবব্রতবাবু। আরও কিছুটা পথ গিয়ে তবে ফিরবেন। মোড় পেরিয়ে দক্ষিণপল্লির রাস্তায় কিছুটা দূর যেতেই দেবব্রতবাবুর চোখে পড়ল ডানদিকের দেয়ালের গায়ে একটা বড় সাদা কাগজ সাঁটা। কাগজটা গতকাল সকালে চোখে পড়েনি তাঁর। এটা-ওটা কতরকম কী হচ্ছে, তারই কোনও পোস্টার হবে হয়তো। সামনাসামনি হতে ভাল করে ঠাহর করে দেখলেন। একেই এখন সকালের আলো স্পষ্ট নয়, তার ওপর এই বয়েসের চোখ, তবু কাগজের লেখা পড়তে খুব অসুবিধে হল না। সাদা কাগজে কালো কালির বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে— সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে আজ সাতাশে ডিসেম্বর বিকেল তিনটায় টাউন হল ময়দানের জনসমাবেশে দলে দলে যোগ দিন।

প্রাচীরের ওপরে একটা কাক বসে ছিল। হঠাৎ কা কা করে ডেকে উঠল। অমনি দেবব্রতবাবুর চোখের পাতা কেঁপে উঠল। লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরলেন। তিনি রাস্তার ডানদিকে তাকালেন। কেউ নেই। বাঁদিকে তাকাতেই অখিলবাবুকে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন। একই পাড়ায় থাকেন। তাঁর মতো মর্নিং ওয়াক করেন।

এই যে দেবুবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচিলে কী দেখছিলেন? কোনও গাছটাছ— ও, এই লেখাটা? কী লিখেছে? অখিলবাবু পোস্টারটা পড়লেন এবং পড়ে দেবব্রতবাবুর মতোই সিঁটিয়ে গেলেন। বড় বড় চোখ করে তাকালেন দেবব্রতবাবুর মুখের দিকে। চাপা গলায় বললেন, কী সব্বোনাশ!

ভয়-পাওয়া গলায় দেবব্রতবাবু বললেন, কেন? সর্বনাশ কেন?

সব্বোনাশ বলে সব্বোনাশ! বুঝলেন কিনা, এবার একটা অনর্থ হবে, রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

দেবব্রতবাবু সেইখানেই শুধালেন, কেন? রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে কেন?

অখিলবাবু বিপন্ন মুখে রাস্তাটা দেখলেন। বললেন, চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হবে না। কে না কে দেখবে, ভাববে আমরাই বুঝি পোস্টারটা— চলুন, বাড়িই ফিরে যাই। আজ শীতটাও খুব পড়েছে কিন্তু।

দেবব্রতবাবুরও সেই ইচ্ছে। বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। ফিরেই যাই চলুন।

রাস্তায় এখন আরও কিছু মানুষ, সাইকেল, রিকশা। একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে আকাশের রং, নানা শব্দ কানে আসছে। দু'জনে নিঃশব্দে বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। একটু বা তাড়াতাড়ি পা ফেলে ফেলে।

একটু ফাঁকামতো জায়গার এসে দেবব্রতবাবু বললেন, কী রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে বললেন না তো?

আরও কিছুটা পথ হেঁটে গিয়ে অখিলবাবু বললেন, পোস্টারটার লেখাগুলো পড়ে কিছুই বুঝলেন না? আরে মশাই, এ-শহরে কার এত বুকের পাটা ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে? কোনও সিকিউরিটি আছে পাবলিকের? এ-শহর তো সমাজবিরোধীদেরই দখলে। টাউন হল ময়দানে জনসমাবেশ হোক না, দেখবেন বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে।

দেবব্রতবাবু মাথা নাড়লেন, খুব ঠিক কথা বলেছেন। সাপের গর্তে হাত ঢোকানো— যাক গে মশাই, আমরা কোনও সাতেপাঁচে নেই। নিরীহ ছাপোষা মানুষ, আমাদের এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ। না কী বলেন মশাই?

অখিলবাবুর কপালে ভাঁজ পড়ল, কিন্তু সাতেপাঁচে না থেকেও নিরাপদে থাকতে পাচ্ছি কই। সবসময় প্রাণ হাতে করে ভয়ে ভয়ে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে ওই পোস্টারটা কারা মারল?

দেবব্রতবাবু চাদরটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, একটু তাড়াতাড়ি হাঁটুন মশাই।

কিন্তু দক্ষিণপল্লির দেয়ালের ওই একটা পোস্টার শুধু নয়, একটু সকাল যখন খোলামেলা হয়ে গেল, দেখা গেল ঠিক ওইরকম আরও পোস্টার শহরের সব প্রকাশ্য জায়গায় রাতের অন্ধকারে কে বা কারা সেঁটে দিয়ে গেছে। দু'জন একজন করে হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল প্রভাতী খবরটা। শহরবাসী জেনে গেল সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে কেউ। আজ সাতাশে ডিসেম্বর বিকেল তিনটের সময় টাউন হল ময়দানে জনসমাবেশ হবে। কেউ পোস্টারের লেখাটা পড়ল, কেউ শুনল, কিন্তু অবাক হয়ে গেল সবাই। এ যে আগ্নেয়গিরির চূড়ায় বসে পিকনিক করতে চাইছে কেউ!

তবু এমন একটা ঘটনায়, যা কিনা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মেলে না, স্বাভাবিকভাবেই টানটান উত্তেজনা ফিসফিস করবেই। বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল এসব কোনও পাগলের কাণ্ড কিংবা ভয়ংকর তামাশার জন্যে কেউ এসব করেছে। কিন্তু পাগল কিংবা তামাশার যুক্তি টিকল না। বড় বড় করে সাদা কাগজে লাল হরফের গোটাগোটা একইরকম পরিষ্কার লেখাগুলো মোটেই কোনও অদ্ভুত খেয়ালের ফসল নয়, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা আছে। কার সেই চিন্তা?

শীতের সেই সকালটা রোদ্দুরের উষ্ণমুখ দিয়ে শুরু হয়েছিল, কিন্তু সকাল ফুরাতে না ফুরাতেই বিবর্ণ হয়ে গেল। মেঘে ঢেকে গেল আকাশ, টিপটিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হল, সেইসঙ্গে এলোমেলো কনকনে হাওয়া, তীব্র শীত। এমনিতে পাহাড়ের পাদদেশে উত্তরবঙ্গে এই শহরে শীতের দাপট বেশি, সময়টাও চূড়ান্ত শীতের। তার ওপর অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় ওতপ্রোতভাবে থাকা ঠান্ডা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারিখটা ছিল ছুটির, রবিবার। ফলে সকাল শেষ হতেই পুরো দিনটাই সেঁধিয়ে গেল চার দেয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যে। তবু উত্তেজনা একটুও কমল না, ফিসফিসানি চলতেই থাকল পোস্টারের বিষয়ে। আজ ঘড়ির কাঁটার দিকে সবাই খুব বেশি তাকাচ্ছে। বিকেল তিনটে যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। পোস্টারে লেখা আছে, ঠিক তিনটের সময় টাউন হল ময়দানে শহরের সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে জনসমাবেশ হবে। বিপজ্জনক খবর। সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ? তাও এই শহরে? জলে বাস করে কুমিরকে ঘাঁটানো? তিনটের সময় কে জানে কী হবে। পুরো শহরটাই না রসাতলে চলে যায়।

এমনই এ-শহরের বর্তমান পরিস্থিতি। এখানে পুলিশের থানা আছে, উর্দি-পরা পুলিশ আছে, আইন আদালত আছে, শামল-পরা উকিল আছে, প্রশাসন আছে, সরকারি অফিস আছে। কিন্তু সে

সবই একটা শহরে থাকতে হয়, তাই আছে। আসলে শহরটাকে পায়ের জুতোর নীচে চেপে ধরে আছে এক সংগঠিত সমাজবিরোধীদের দল। তাদের মরজিই এ-শহরের আইন। তাদের ইচ্ছেতেই এ-শহরের যো-হুকুম জনজীবন চলে। খুন, জখম, ধর্ষণ, লুটতরাজ এ-শহরের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কেউ প্রতিবাদ করেন না। প্রতিবাদ করলেই তাঁকে মোকাবিলা করতে হবে পিস্তলের গুলির। পুলিশ ওদের সমঝে চলে, রাজনৈতিক নেতারা পিঠ চাপড়ে দেয়, আইন চোখ বন্ধ করে থাকে। আর সাধারণ মানুষ ওদের কুর্নিশ করে ঘাড়ের ওপর মাথাটা বহাল রাখে। সন্ধে হলেই শহরের রাস্তাঘাট অঘোষিত সান্ধ্য আইনে প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। দিনের বেলায় যাও বা কিছু ঢাকাঢুকি দেওয়া থাকে, অন্ধকার নামলেই বিবস্ত্র হয়ে যায়। শহর সম্পূর্ণ দখলে চলে যায় সমাজবিরোধীদের, মুক্তাঞ্চল হয়ে যায় পেশিশক্তির। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তখন ওরাই। এ-শহরের প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে তোলা দিয়ে নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিতে হয়, রিকশাওয়ালাকে বিনে পয়সায় ট্রিপ দিয়ে বিগলিত হাসি হাসতে হয়। হোটেল রেস্তোরাঁ অবাধ রাখতে হয়, মদের দোকান দাতব্য করে দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়। সে-সময় শুধু নরক গুলজার হয় নিষিদ্ধপল্লিতে।

শহরের মানুষ জেনে গেছে প্রচলিত ব্যবস্থাটা না মেনে নিলে নিজের চরম বিপদ ডেকে আনা হবে, কেউ এগিয়ে আসবে না সাহায্য করতে। এ নিঃসঙ্গ অসহায়তাই মানুষকে ভয়ের গুহায় টেনে এনেছে। আবার এই ভয় যে জীবনের রক্ষাকবচ, তাও কিন্তু নয়। কেউ জানে না কার ঘাড়ে কখন লোমশ থাবা এসে পড়বে। সমাজবিরোধী মস্তানদের কোনও নৈতিক দায়বদ্ধতা নেই। ওদের খেয়ালখুশিই সবচেয়ে বড় কথা।

তবু দেয়ালের গায়ে পোস্টারগুলো যেন বহুদিনের অচলায়তন বদ্ধ জলাশয়ে একটা ঢিল ছুড়ে মারল। ঢেউ উঠল জলের, সেই ঢেউয়ের আঘাতে গৃহস্থের ঘরের খুঁটি নাড়িয়ে দিল। সত্যিই কি কেউ মার খেতে খেতে আর মারের ভয় পাচ্ছে না, অবাধ্য হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে? সত্যিই কি কারুর সহ্য করার ক্ষমতা একেবারে শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে? শহরের মানুষ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল পরস্পরের। এই অসহ্য শীত আর দুর্যোগের মধ্যে বিকেল তিনটের সময় টাউন হল ময়দানের জনসমাবেশে কে যাবে? কারা যাবে? কারা ডেকেছে এই সমাবেশ? মৃত্যুপুরীতে কে জীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে?

সময় গড়ায়। কনকনে হিমবাতাস ধারালো দাঁতে কামড়ে ধরে। বৃষ্টি, মেঘ, হাওয়া। নিভুনিভু হয়ে আসে ডিসেম্বরের দুপুরের আলো। ছুটির দিনের বিকেলে এমনিতে এই ঘরোয়া শহরের রাস্তায় খুব বেশি সংখ্যায় লোক থাকে না, শীত-জল-বাতাসের এমনি বিপন্ন দিনে সেই সংখ্যা আরও কম হবে ধরে নিতে অসুবিধে নেই। তার ওপর আছে জনসমাবেশের পোস্টারটা। ক্রীতদাসদের ঔদ্ধত্যের জবাব দেবে না মস্তানরা?

কিন্তু কী আশ্চর্য, আজ আর হিসেবটা ঠিক মিলল না। যে-পথটা আজ ভয়ানক নির্জন থাকার কথা, সেই পথে আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ দেখা গেল। টাউন হল ময়দানে পৌঁছানোর পথগুলোতে বেলা তিনটের অনেক আগে থেকে ছাতা মাথায় মানুষজনকে গুটি গুটি পায়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। ঠিক ময়দানে নয়, ময়দানের দু'পাশের রাস্তায় নানান ছলছুতোয় রাজ্যের কাজ পড়ে গেল শহরের লোকেদের। নিছক কৌতূহল হলেও সে কৌতূহলের জন্যে অনেক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়েছে। জনসমাবেশে শামিল হতে হয়তো নয়, কিন্তু ব্যাপারটা একটু দূর থেকে দেখার কৌতূহল হওয়াটাও তো কম ব্যতিক্রমের ব্যাপার নয়। এমন সাহস আগে কখনও দেখা যায়নি। দু'-একজন মুখ বাড়িয়ে ময়দানের ভেতরটা দেখে নিল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সভার আয়োজন কই? মঞ্চ কোথায়? উদ্যোক্তারা কোথায়? সবই তো ফাঁকা।

আড়াইটে বেজে তিনটে বাজতে চলল অথচ ময়দান যেমন ছিল, তেমনই রইল। তেমনি মানুষবিহীন, তেমনি শুনশান। কেউ কোথাও নেই। জনসমাবেশ যে হবে, নিশ্চয় তার জন্যে ব্যবস্থা থাকবে, মঞ্চ থাকবে, মাইক না থাক টেবিল-চেয়ার থাকবে। কিন্তু সেসব কিছুই দেখা গেল না। তা

হলে কি সবটাই একটা মোটা দাগের রসিকতা? এই বৃষ্টি আর হাড়হিম করা ঠান্ডার মধ্যে শহরের লোককে উষ্ণ গৃহকোণ থেকে ময়দানে টেনে এনে কেউ কি আড়ালে থেকে হি হি করে বোকা বানানোর হাসি হাসছে?

তিনটে বাজল, সোয়া তিনটে, সাড়ে তিনটে। ততক্ষণে টাউন হল ময়দানের দু'পাশের রাস্তায় ছাতা মাথায় আপাদমস্তক গরম কাপড়ে ঢাকা বিস্তর লোক জমে গেছে। জনসমাবেশের ব্যবস্থা নেই দেখে কী হয় কী হয় ভাবটা কেটে গিয়ে তখন রাগ আর বিরক্তি এসে গেছে সবার মুখেই। কিন্তু কাকে দুষবে? কেউ তো জানে না সেই অদৃশ্য ব্যক্তিটি কে?

নিখিলবাবু কিছুটা সাহসী লোক। স্বাস্থ্য ভাল, বয়েসও তেমন হয়ে যায়নি। বললেন, চলুন তো ভেতরে যাওয়া যাক। দেখি ব্যাপারটা আসলে কী।

বিভূতিবাবু বললেন, মানে আপনি বলছেন ময়দানের ভেতরে যাবেন?

নিখিলবাবু বললেন, তা আমরা সবাই তো এসেছি ওই একই কারণে, ময়দানের ভেতরের ব্যাপারে। ভয় কী, দেখুন না কত লোক এসেছে।

বিভূতিবাবু তাকিয়ে দেখলেন সত্যিই অনেক লোক। তাঁর মতোই বা তাঁর চেয়ে কম বয়েসি লোকে রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। এত লোক দেখে সাহস পেলেন তিনি। বললেন, ঠিক আছে, তাই চলুন। মাঠের ভেতরটা দেখে আসা যাক।

সাহসও বুঝি মানুষকে সংক্রামিত করে। ওদের দেখাদেখি একজন-দু'জন করে আরও অনেকে ঢুকে গেল ময়দানের মধ্যে। কিন্তু কাউকেও দেখা গেল না। উদ্যোক্তাদের কেউ নেই ময়দানে।

হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, ওই তো, ওই যে, ওদিকে বকুল গাছের নীচে বেঞ্চে কে যেন বসে আছে!

সবাই তাকায় সেই দিকে। ময়দানের একপাশে এক বিশাল বকুল গাছ, তার নীচে বসবার বেঞ্চ, অন্ধকার অন্ধকার হলেও বেশ দেখা যাচ্ছে সেই বেঞ্চে কেউ একজন বসে আছে। নড়ছে না, চড়ছে না। একইভাবে বসে আছে। একটা কালো রঙের কোট আর কালো প্যান্ট পরে আছে সে। দূর থেকে বয়েসটা অনুমান করা গেল না। এই হিম আর বৃষ্টির মধ্যে তার মাথার ওপর কোনও ছাতা নেই, অন্য কোনও আচ্ছাদন নেই, যা আছে তা হল বকুল গাছের অজস্র ডালপাতা।

নিখিলবাবু বললেন, চলুন তো, ওর কাছেই যাই। ও এমন ভাবেই বা বসে আছে কেন। কে লোকটা?

ঠিক আছে। চলুন।

সবাই চলল বকুল গাছের নীচে সেই বেঞ্চের কাছে যেখানে বসে আছে সেই মানুষটা। কাছে গিয়ে দেখা গেল যে বসে আছে বেঞ্চে হেলান দিয়ে, তাকে এর আগে কেউ দ্যাখেনি। অসুস্থ, ধ্বংসানো, দীনহীন চেহারা, মুখে অনেক দিনের দাড়ি-গোঁফ, এলোমেলো জটপাকানো চুল, ছেঁড়া প্যান্ট, ততোধিক জীর্ণ একটা বোতামবিহীন কোট ভিজে জবজব করছে। খালি পা, বিবর্ণ হলদেটে শরীরের রং। একইভাবে চোখ বুজে বসে আছে। একটা ছোট্ট ধাক্কা মারলেই বুঝি গড়িয়ে পড়বে নীচে। মানুষটা ভিজছে। বকুল গাছের পাতা থেকে চুঁইয়ে টপটপ করে জল পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে তাকে।

কে যেন বলল, ইস। এইভাবে এই শীতে। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে। মরে যায়নি তো লোকটা?

তখনই অন্য একজন ওর বুকের কাছে কান পেতে জীবনের স্পন্দন শুনতে চাইল। না, বেঁচে আছে এখনও। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না। খাঁচার পাখি পাখা ঝাপটাচ্ছে। ফুড়ুত করে এই উড়ে গেল বলে।

বুঝলেন, এমনিতে তো দুর্বল, তার ওপর এই দারুণ ঠান্ডা আর বৃষ্টি, রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে লোকটার। এক্ষুনি একটু গরমের ব্যবস্থা না করলে— খুব জরুরি, আসুন, সবাই মিলে

ওকে ঘিরে রাখি, আমাদের শরীরের তাপ দিই ওকে, ঠান্ডা হাওয়া আর বৃষ্টির জল থেকে ওকে বাঁচাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন, আসুন, আমাদের এতগুলো জীবনের উত্তাপ দিয়ে ওর প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তুলি। ভয় কী, আমরা এত মানুষ আছি একসঙ্গে। ওদের চেয়ে সংখ্যায় হাজার গুণ বেশি। সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষ গায়ে গা ঠেকিয়ে, কাঁধ কাঁধ লাগিয়ে মুমূর্ষু মানুষটার চারপাশে নিশ্ছিদ্র দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। শীতল মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের উষ্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলল। মানুষটাকে বাঁচাতেই হবে। ও না বাঁচলে, কেউ বাঁচবে না।

পাঁচ নম্বর ভুল

অংশুমানের বয়স এখন চল্লিশ। গড়পড়তা বাঙালির চেহারা যেমন হয়, অংশুমান তার ব্যতিক্রম নয়। লম্বা কিংবা বেঁটে, কালো কিংবা ফরসা, স্বাস্থ্যবান কিংবা রোগা, কোনওটাই সে নয়। সবকিছুতেই সে মধ্যবর্তী। স্বভাব-চরিত্রেও তাই। সে অসৎও নয়, আবার সৎও নয়। বাড়তি পয়সা উপার্জনের ষোলো আনা লোভ আছে, কিন্তু ঘুষ নিতে তার সাহস হয় না। রাজনীতির আলোচনায় সে ভয়ংকর রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা বলে, কিন্তু অফিসের বড়সাহেব তলব করলে তার বুকের কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। বন্ধুদের কাছে সে হিন্দি সিনেমা সম্বন্ধে ছ্যা ছ্যা করে, কিন্তু বাড়ির টিভিতে রগরগে হিন্দি সিনেমা রোমাঞ্চিত হয়ে দ্যাখে। তার ধারণা, অন্যায় আর দুর্নীতি দেশকে রসাতলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ট্রামে-বাসে ভাড়া ফাঁকি দিতে পারলে নিজেকে লাভবান মনে করে। পথে সুন্দরী মহিলারা তাকে পুলকিত করে, কিন্তু বাড়িতে সে বউকে ভয় পায়। সে সমঝদারের মুখ করে আর্ট ফিল্ম দেখে এবং যথারীতি তার মাথায় কিছুই ঢোকে না।

অংশুমানের স্ত্রীর নাম মণিমালা। মণিমালার বয়স বত্রিশ, কিন্তু দেখলে মনে হয় চব্বিশ-পঁচিশ। ফরসা রং, ঢলঢলে স্বাস্থ্য, মুখশ্রী ভাল। মণিমালা বুদ্ধিমতী এবং সংসারের সমস্ত হ্যাপা সেই সামলায়। খুব হইচই করে থাকতে পছন্দ করে না সে, ঘরসংসার নিয়েই থাকতে ভালবাসে। অংশুমানের কোনও বন্ধু বাড়িতে এলে মণিমালা তাদের সামনে বিনা প্রয়োজনে প্রায়শ আসে না, এলেও ঘোমটা মাথায় দিয়ে আসে। এরজন্য অংশুমান রাগ করে না, বরং মনে মনে খুশিই হয়। ঘরের বউ একটু লজ্জাশীলা থাকাই ভাল। তাতে বাইরের ঢেউ ঘরে আসে না। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

অংশুমান আর মণিমালার একমাত্র ছেলে দ্যুতিমান। ক্লাস এইটে পড়ে। সকাল দশটায় স্কুলে যায়, ফেরে চারটের পরে। দ্যুতিমান বন্ধুদের সঙ্গে লুকিয়ে সিগারেট খায় ও এলাচদানা চিবোতে চিবোতে বাড়ি আসে।

তো স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অংশুমানের সংসার মোটামুটি গড়গড়িয়েই চলে। কিন্তু চলল না একদিন। একদিন গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরে গেল অন্যদিকে। আর এই অন্যদিকে চাকা ঘুরে যাবার ঘটনাটাই তৈরি করে দিল এই গল্প।

সেদিন সকাল ন'টায় অংশুমান যথারীতি অফিসে যাবার জন্য যুদ্ধ জয়ের প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। বি বা দী বাগে সরকারি অফিসে সে কাজ করে। ইউনিয়নের নেতা নয় বলে তাকে সময়মতো অফিসে পৌঁছাতে হয়, কাজও করতে হয়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে পার হয়ে যায়।

বাস ধরবে বলে অংশুমান তাড়াতাড়ি হাঁটছে। রাস্তার মোড়ে আসতেই দেবকুমারকে চোখে পড়ল। দুটো বাড়ি পরেই থাকে সে। দেবকুমার তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে জগার চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে। অংশুমান ঝট করে দোকানটা পার হয়ে যেতে চাইল। কিন্তু এড়াতে পারল না দেবকুমারের চোখ। ছোকরা গায়ে পড়ে খেজুরে আলাপ করে। বাড়িতেও মাঝেমাঝে এসে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বলে, চা খেতে এলাম দাদা। দেবকুমার এলে মণিমালা বিরক্ত হয়, অংশুমানেরও পছন্দ নয়। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। একে প্রতিবেশী, তার ওপর পাড়ার গণ্যমান্য মস্তান। ওকে ঘাঁটানো মানে হাসপাতালে শয্যা নেওয়া।

এই যে অংশুদা, অফিস চললেন বুঝি?

রোজই এক প্রশ্ন। অংশুমানের ইচ্ছে হল বলে, না, শ্মশান যাচ্ছি। কিন্তু সে-কথা তো বলা যাবে না। কাজেই হেঁ হেঁ করে একটু দেঁতো হেসে বাস ধরতে এগিয়ে গেল সে।

অফিস টাইমের বাস, ঠেসাঠেসি ভিড়ে একেবারে হাউসফুল। তবু মরিয়া হয়ে ওই ভিড়ের মধ্যেই নিজেকে অলৌকিক উপায়ে গলিয়ে দিল। বাস ছেড়ে দিল। কোনওমতে এক হাতে রড ছুঁয়ে অংশুমান যাচ্ছে। চারপাশে গাদাগাদি মানুষ। নিজের হাত-পাগুলোও কষ্ট করে চিনে নিতে হয়। আরও কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ সে শুনল তার কানের কাছে একটা মুখ এগিয়ে এসে সতর্ক গলায় বলছে, এ লালুবাবু—

তখনই বাসটা থামল। কেউ উঠল পাদানিতে। আবার বাস ছেড়ে দিল। কাকে লালুবাবু বলল পেছনের মুখটা? নিশ্চয়ই তাকে নয়। সে তো লালুবাবু নয়। বাস চলেছে। আবার কানের কাছে সেই মুখ।

খুব হোঁশিয়ার থাকবেন লালুবাবু। পুলিশের লোক গন্ধ পেয়েছে। আজই মাল পাচার করে দেবেন।

অংশুমান চট করে মাথা ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু বুঝতে পারল না কে কথাটা বলল। সব লোকেরই একরকম মুখ। অফিস টাইম, ঠাসবুনোট ভিড়, রড ধরে ঝোলা— যেন লাশকাটা ঘরের সারি সারি মৃত মুখ— এর মধ্যে থেকে কাউকে আলাদা করতে পারল না। একটু ভাবনায় পড়ে গেল অংশুমান। আবার ভাবল ভাবনারই বা কী আছে! সে তো আর লালুবাবু নয়। ভিড়ের বাসে নিশ্চয়ই ভুল করেছে লোকটা। কিন্তু লালুবাবুটি কে? পাড়ায় একজন লালুবাবু আছে। লালমোহন গোস্বামী। তিলককাটা পরম বৈষ্ণব। রেশনের ডিলার। মনে হয় না তিনি। তিনি তো ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানেন না। অন্য কোনও লালুবাবু নিশ্চয়। যাক গে। ওসব ভেবে কী হবে! লোকটা ভুল করেছে। ভুল ইজ ভুল। অংশুমানের এখন প্রধান কাজ হল সময়মতো অফিসে পৌঁছানো। কিন্তু আরও কিছুদূর যাবার পর বাসটা অফিসের রাস্তায় না গিয়ে অন্য রাস্তা ধরল। অংশুমান হইচই করে উঠল— একী, বাস এদিকে যাচ্ছে কেন!

পাশে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, এই যে দাদা, যাবেন কোথায়?

ডালহৌসি। অফিসে।

ভুল বাসে উঠেছেন।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ। নেমে পড়ুন। এটা খিদিরপুর যাবে।

অগত্যা পরের স্টপে তড়িঘড়ি নেমে পড়তে হল অংশুমানের। ওঠার সময় বাসের নম্বর দ্যাখা হয়নি, অন্য বাসে উঠেছেন। অংশুমানের রাগ হয়ে গেল দেবকুমার ছোকরার ওপর। ওর জন্যই তো তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে। গায়ে বাড়তি মাংস থাকলে একদিন দেখে নিত মর্কটটাকে।

অফিসে পৌঁছোতে পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল। হাজিরার খাতায় নামের পাশে তখন লাল ঢেড়া পড়ে গেছে। ভুলের খেসারত। নিজের চেয়ারে কিছুক্ষণ তুম্বো মুখে বসে রইল অংশুমান। তারপর বাইরে এল। মাথাটা ধরে আছে তখন থেকে। এক কাপ কড়া চা খাওয়া দরকার। চা খেল। চা খেয়ে ফের নিজের ঘরের দিকে যাবে, কে যেন দ্রুত পাশে এসে একটা সাদা খাম গুঁজে দিল অংশুমানের হাতে।

শর্মার বিলটা পাস করিয়ে দেবেন অ্যাকাউনটেন্টবাবু।

আবার ভুল। অংশুমান অ্যাকাউনটেন্টবাবুও নয়, বিল সেকশনে কাজও করে না। সে কাজ করে রেফারেন্স সেকশনে। সে কথা লোকটাকে বলতে যাবে, কাছেপিঠে কাউকেও দেখতে পেল না। খামটা গুঁজে দিয়েই কেটে পড়েছে সে।

অংশুমানের হাতের ঘামে ততক্ষণে খামটা ভিজে উঠেছে। এ কী ভুলের ফ্যাসাদে পড়ল সে। একটা নয়, দুটো নয়, একই দিনে তিন-তিনটে ভুল! এখন খামটা নিয়ে কী করবে সে? খামটা যে ফাঁপা নয় ওজন দেখেই বোঝা যায়। ভেতরে নিশ্চয় কয়েকটা কড়কড়ে তিন অঙ্কের পাত্তি হাসছে। একবার ভাবল অ্যাকাউনটেন্ট সত্যরঞ্জনবাবুকে ব্যাপারটা জানিয়ে খামটা দিয়ে দেয়। কিন্তু সবাই জানে সত্যরঞ্জনবাবু ভীষণ কড়া ধাতের মানুষ এবং সৎ। এভাবে দেওয়া খামটা তো নেবেনই না, উলটে দু'-চারটে নীতিবাক্য শুনিয়ে হইচই বাধিয়ে দেবেন। এই নিয়ে অফিসে নানা কথা হবে। লাগানিবাবুরা বড়সাহেবের কানে লাগিয়ে দেবে কথাটা। না বাবা, গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়ার সাধ তার নেই। কিন্তু খামটার কী গতি করা যায়? তবে কি মওকায় পাওয়া খামটা অংশুমান নিজেই মেরে দেবে? ভাবতে গিয়েই কিন্তু বুকটা কেঁপে গেল। বেশি লোভে কাজ নেই বাবা, কোথাকার জল কোথায় পৌঁছাবে কে জানে! কে বলতে পারে খামের মধ্যে সি বি আইয়ের সই করা নোট নেই? না না, খামটা তার কাছে রাখা ঠিক হবে না। কিন্তু কী ব্যবস্থা করবে সে? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে সে বারান্দায় গেল। দু'দিকে তাকিয়ে দেখল অফিসের কেউ আছে কিনা। কেউ নেই দেখে অফিসের লেটার বক্সে টুপ করে খামটা ফেলে দিল। যাক বাবা নিশ্চিন্দি। এখন যা হবার তাই হোক, সে তো দায়মুক্ত।

ফিরে নিজের চেয়ারে এসে অংশুমান ভাবল লোকটা তাকে সত্যরঞ্জনবাবু বলে ভুল করল কেন। সে সত্যরঞ্জনবাবুর চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, সামান্য মিল আছে বটে তার সঙ্গে সত্যরঞ্জনবাবুর। দু'জনেই ধুতি পরে। উচ্চতা, গায়ের রংও প্রায় একরকম। কিন্তু মিলটা প্রায় এবং এই 'প্রায়' শব্দটা এতবড় একটা ভুল করিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যাক গে, এ নিয়ে আর ভেবে কী হবে? ভুল ইজ ভুল।

টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকে সবটা খেয়ে ফেলল অংশুমান। আঃ। এখন বেশ আরাম লাগছে, ভারমুক্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। অফিসের ডাকের সঙ্গে যখন খামটা পাওয়া যাবে, তখন কী হবে সে কথা ভেবে মনে মনে একচোট মজাও অনুভব করে নিল অংশুমান। সত্যরঞ্জনবাবুর কথাও ভাবল। আপনি কী হারাইতেছেন আপনি জানেন না। খোশ মেজাজে সামনের ফাইলটা তুলে নিল অংশুমান। কিন্তু নিজেকে যতই হালকা মনে করুক, সে বেশ বুঝতে পারছিল মনের কোথায় যেন বিঁধে থাকা একটা কাঁটা খচখচ করছে। খামের মধ্যে নিশ্চয়ই নির্দোষ সাদা কাগজ ছিল না, ভাল অঙ্কের টাকাই ছিল, এ-ব্যাপারে অংশুমান হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত। বিনা আয়েশে সেটা তার হাতে চলে এসেছিল। মেরে দিলে কেউ জানতেও পারত না, কোনও প্রমাণও নেই। কিন্তু ভয় পেয়ে সে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিয়েছে। আবার ভাবল যা করেছে ভালই করেছে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। দু'নম্বরি টাকা, কোথা থেকে কোন বিপদ এসে যাবে কে জানে! তার চেয়ে এই ভাল। অজানা সুখের চেয়ে জানা স্বস্তি অনেক নিরাপদ। তার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, তাদের সে পাপের ভাগী করে কেন! স্ত্রী মণিমালাই ঘরের লক্ষ্মী, ছেলে দ্যুতিমানই ঘরের সম্পদ।

অংশুমান ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অফিসের কাজে মন দিল। কিন্তু কাজে মন বসাতে পারল না। নানান উদ্ভট ঘটনা আজ তার মনকে শান্ত থাকতে দিচ্ছে না। সকাল থেকে তিন-তিনটে ভুলের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। বাসে তাকে লালুবাবু মনে করা, তাড়াহুড়োয় ভুল বাসে ওঠা, অফিসে ভুল করে তার হাতে খাম গুঁজে দেওয়া। কার মুখ দেখে যে আজ যাত্রা করেছিল! কার আবার, যত নষ্টের গোড়া ওই দেবকুমার ছোকরার। মণিমালা ঠিকই বলে, ছেলে নয়তো ফণিমনসার গাছ। অংশুমানের রাগ হয়ে যায় ছোকরার ওপর। নেহাত পাশের বাড়িতে থাকে, নইলে—

নইলে কী, সেটা অবশ্য অংশুমানের ভাবনায় আসে না।

অফিসের একটা জরুরি চিঠি টাইপ করতে হবে। টাইপিস্ট দিব্যেন্দু চেয়ারে নেই। থাকেই বা

কতক্ষণ। সবসময় উত্তমকুমার হয়ে থাকে। অফিসে অনেক মেয়ে কাজ করে, দু'-চারজন তো রীতিমতো সুন্দরী, ওদের সঙ্গেই সবসময় ফস্টিনস্টি। কখন আসবে কে জানে! অংশুমান নিজেই দিব্যেন্দুর চেয়ারে বসে গেল টাইপ করতে। ডিয়ার স্যার, উইথ রেফারেন্স টু ইয়োর লেটার ডেটেড— একমনে টাইপ করছে অংশুমান, হঠাৎ কানের কাছে মহিলার কণ্ঠস্বর— টিফিনে কেটে পড়ে আজ কিন্তু সিনেমায় যাবার কথা দিব্যেন্দু। অংশুমান মুখ তুলে তাকাতেই দেখল কথাটা বলেই সুস্মিতা চলে যাচ্ছে। এ-অফিসে মেয়েদের মধ্যে সুস্মিতাই সবচেয়ে শান্ত স্বভাবের মেয়ে। তার আজ দিব্যেন্দুর সঙ্গে সিনেমায় যাবার কথা, সে-কথা আরেকবার মনে করিয়ে দিল।

কিন্তু এটা কী হল? আবার সেই ভুল? পেছন থেকে দেখে অংশুমানকে দিব্যেন্দু ভেবেছে সুস্মিতা। সব ভুল কি একই দিনে লক্ষ্যভেদ করছে অংশুমানকে? চার নম্বর ভুলটাকে এবার আর ভুল ইজ ভুল বলা যাচ্ছে না। হঠাৎ কেমন যেন শীতশীত করতে লাগল অংশুমানের। বারবার এসব হচ্ছে কেন? দিব্যি তো বউ ছেলে নিয়ে ঘরসংসার করছিল, হঠাৎ এ কী ফ্যাসাদে পড়ল সে। অংশুমানের মনে হল তার শরীর খারাপ লাগছে। মাথা ভনভন করছে, কান কটকট করছে, বুক ধড়ফড় করছে। এ অবস্থায় সে অফিস করতে পারবে না। এখনই তার বাড়ি চলে যাওয়া দরকার। হঠাৎ খারাপ কিছু হয়ে গেলে মণিমালা বেচারি অথই জলে পড়ে যাবে। কে জানে রক্তচাপ বেড়ে গেছে কিনা। নিশ্চয়ই বেড়েছে, না হলে শরীর এরকম লাগছে কেন? আজ সন্ধেবেলাতেই ডাক্তার দেখাবে সে। অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে। বেরিয়ে যাক, জীবনের দাম টাকার চেয়ে বেশি।

বড়বাবুকে ডবল ডিমের মামলেট খাইয়ে শরীর খারাপের কথা বলে ছুটি নিয়ে বাড়িতে চলে যাওয়া সাব্যস্ত করল অংশুমান। মনে পড়ে না অফিসে এসেই এইভাবে আগে কখনও বাড়ি ফিরেছে কিনা। মণিমালা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। শরীর খারাপের কথা শুনলে তো ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়বে। বারেবারে কপালে হাত দিয়ে দেখবে জ্বরজারি এসেছে কিনা। অংশুমান বরং তাকে বলবে কোনও কারণে অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সরল বিশ্বাসে মণিমালা তাই মেনে নেবে। অবশ্য অংশুমানের শরীর যে সত্যিই খারাপ হয়েছে, এখন কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। আসলে অদ্ভুত সব ভুলের ঘটনায় সে মনের দিক থেকে কোনও জোর পাচ্ছিল না। যাক গে, ভুল ইজ ভুল।

বাড়িতে এসে দেখল ঘরের দরজা বন্ধ। মণিমালা নিশ্চয়ই বিছানায়। দ্যুতিমান এ-সময় স্কুলে থাকে। মণিমালার কোনও কাজ থাকে না। হয় বিছানায় শুয়ে বই পড়ে কিংবা ঘুমায়। অংশুমান দরজার বেল টিপল এবং একটু পরেই দরজা খুলতে খুলতে মণিমালাকে খুশিখুশি গলায় বলতে শুনল, কী ব্যাপার দেবকুমার, আজ এত তাড়াতাড়ি? রোজ তো—

দরজা খুলেই চোখের সামনে অংশুমানকে দেখে বিস্ফারিত চোখে মণিমালা থেমে গেল। চমকানো গলায় বলল, তু-তুমি?

অংশুমান স্খলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, আমি আমি নই মণিমালা, অন্য কেউ। লালুবাবু, সত্যরঞ্জনবাবু, দিব্যেন্দু কিংবা দেবকুমার— যে কেউ একজন।

চোরা নদী

দু'দিনের জন্যে একটা ছোট্ট সফরে এসে প্রথম দিনটাই যদি মেঘে মেঘে নিষ্প্রদীপ হয়ে থাকে, তবে বেড়ানোর আনন্দটাই অনেক কমে যায়। মনের অনেক ইচ্ছেকেই কাটছাঁট করে নিতে হয়। কাল দুপুরে বনবিভাগের এই অবসর-আবাসে এসে কমলেশ, কমলেশের বউ মধুপর্ণা আর কমলেশের বন্ধু সমীরণ এইরকমই একটা দিন পেয়েছিল। আজ কিন্তু আগের দিনটা ঘুরে এল না। সকাল থেকেই নির্মেঘ আকাশের অবাধ রোদ্দুর ছুটে এল দরজা-জানলা হাট করে খুলে দিয়ে। সেই রোদ্দুর ছড়িয়ে গেল বনবাংলোয়, চারপাশের শাল, সেগুন, কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতায় পাতায়। শীত শেষের দিনটা যেন উৎসবের দিন হয়ে গেল।

মধুপর্ণা বারান্দায় এল। এখন সময় সকাল আটটার কাছাকাছি। এতক্ষণ সে ঘরেই ছিল, পোশাক বদলে বাইরে এসে ওর চোখে-মুখেও রোদ্দুর ঝলমল করে উঠল। বলল, লাভলি!

বনের মধ্যে বাংলো। বাংলোর সামনে লম্বা বারান্দা। বারান্দায় কয়েকটা বেতের চেয়ার একটানা সরলরেখার মতো সাজানো রয়েছে। ডানদিকের শেষ চেয়ারে বসে আছে সমীরণ। লম্বা, ফরসা, কমলেশের সমবয়েসি, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মধ্যে। কমলেশ আর মধুপর্ণার বিবাহিত জীবনের এক তির্যক কোণ সমীরণ। কমলেশের ছাত্রজীবনের সহপাঠী, মধুপর্ণার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় কমলেশের বন্ধু হিসেবে। কিন্তু সম্পর্কের এই দূরত্বটা খুব তাড়াতাড়ি কাছে চলে এসেছিল কমলেশের চারিত্রিক শিথিলতার মসৃণ পথ দিয়ে। নিঃসন্তান এবং সুদর্শনা মধুপর্ণা কোনও কালেই কমলেশের মতো সাদামাঠা বৈচিত্র্যহীন মানুষকে নিজের উত্তপ্ত জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিতে পারেনি এবং সেই কারণেই সপ্রতিভ প্রাণবন্ত মানুষ সমীরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে বেশি সময়ও নেয়নি। সমীরণেরও কমলেশকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে হয়েছে। ফলে মধুপর্ণা এবং সমীরণের অন্তরঙ্গতার এলাকার সীমানা ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছিল। অনেক সময় কমলেশ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু সেজন্য কমলেশের মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা যায়নি। বিয়ের সাত বছর পরেও কমলেশ সবসময় যেমন সসংকোচে কাঁচুমাচু হয়ে থেকে নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছে, সেইরকমই থাকত।

সমীরণ ডানদিকের শেষ চেয়ারে, বেশ কয়েকটা চেয়ার বাদ দিয়ে বাঁদিকের একটা চেয়ারে কমলেশ। মধুপর্ণা দু'দিকে তাকিয়ে দু'জনকেই দেখল। তারপর এগিয়ে এসে সমীরণের পাশের চেয়ারে বসল। একটু আগেই সে রাতের পোশাক বদলে প্রসাধন সেরেছে। দামি পারফিউমের সুগন্ধ পেল সমীরণ। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল মধুপর্ণাকে। সুন্দর সুঠাম শরীর আরও আকর্ষণীয়া লাগছে। পাশের চেয়ারটা যেন আলো করে বসে আছে সে।

সমীরণের চোখের দিকে তাকিয়ে মধুপর্ণা হাসল, কিছু বলবেন?

সমীরণ বলল, আমি কী আর বলব। কথা বলছে তো আপনার শরীর।

বটে! মধুপর্ণা ভ্রূভঙ্গি করল, বাস, এই শুধু?

এই শুধু নয়। একটু আগে আপনি যে কথাটা বললেন, সেই কথাটা আমিও রিপিট করছি। লাভলি।

আমি তো লাভলি বলেছি সকালের ওয়েদারকে। মধুপর্ণা শাড়ির অবাধ্য আঁচলটা ফের কাঁধে তুলে নিতে নিতে বলল।

আমার কথাটা অবশ্য টু-ইন-ওয়ান। ওয়েদার এবং— সমীরণ কথা অসমাপ্ত রাখল।
এবং? মধুপর্ণা জানতে চাইল।
সব কথা কি উচ্চারণ করে বলতে হয়।
মধুপর্ণা মাথা কাত করে দেখল সমীরণকে। দেখতে দেখতে নিজের ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই, আপনি হাত দেখতে জানেন? দেখুন না আমার হাতটা।
হাত দেখতে হলে মধুপর্ণার হাত ধরার একটু সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। সমীরণ নিজের হাতটা এগিয়ে নিয়েও শেষপর্যন্ত ইচ্ছেটা থামিয়ে রাখল। একটু দূরেই কমলেশ বসে আছে। যেমনই লোক হোক না কেন, মধুপর্ণার স্বামী তো। সমীরণ মুখ বাড়িয়ে সেদিকে তাকাল। কমলেশ বসে বসে কী একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। অদূরে যে তার স্ত্রী এবং বন্ধু পাশাপাশি বসে আছে, সেটা এই মুহূর্তে মনে হয় তার মনোযোগের মধ্যে নেই সম্ভবত।
মধুপর্ণা বলল, কী দেখছেন? ডেনজার এরিয়া? বলে সে হাসল।
সমীরণ সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, অনেক সময় উদারতাকে আমরা দুর্বলতা কিংবা কাপুরুষতা বলে ভাবি। আসলে কমলেশ মানুষটা কিন্তু সত্যিই নিপাট ভালমানুষ।
ভালমানুষ! মধুপর্ণার মোটেই পছন্দ হল না কথাটা। বলল সন্দেহ নেই, হিংসে নেই, থ্রিল নেই, উত্তেজনা নেই, সম্ভবত অনুভূতিও নেই, এমন কোনও মানুষকে ভালমানুষ না বলে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীই বলা ভাল। ভাবতেই পারি না এরকম একটা মরবিড লোকের সঙ্গে কীভাবে সাত বছর ঘর করছি। ভালমানুষ নয়, আমি কাজের মানুষ চাই।
সমীরণ কোনও উত্তর না দিয়ে মলিন হাসতে চাইল। কিন্তু হাসিটা ঠোঁটকে প্রসারিত করল না। মাথায় একটা যন্ত্রণা টের পাচ্ছিল সে। কয়েকদিন ধরেই এই হচ্ছে। মাথাটা মাঝেমাঝেই ধরে থাকছে। আজ তো খুব বেশিই মনে হচ্ছে। বাইরে বেড়াতে এসে শরীর ঠিক না থাকলে আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়। তা ছাড়া এই জঙ্গলের মধ্যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে সেটা চিন্তার মধ্যে রেখে দেবে।
আসলে এখানে দু'দিনের জন্যে বেড়াতে আসাটা সমীরণের ইচ্ছেতেই হয়েছে। সেই ইচ্ছেকে অবশ্যই উসকে দিয়েছিল মধুপর্ণা। কমলেশকে রাজি করাতে খুব বেশি সময় লাগেনি। মধুপর্ণার সুখের ইচ্ছেতে কোনওদিনই বাদ সাধেনি কমলেশ। তার নির্বিবাদ জীবনে কখনও কোনও কালো মেঘ জমতে দেবার সুযোগ দেয়নি। বলেছিল, বেশ তো, তাই চলো।
কমলেশ আর সমীরণ দু'জনেরই বন্ধু এই ফরেস্ট ডিভিশনের আধিকারিক। সেই ওদের এখানে থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।
সবই তো ঠিক ছিল, ঠিক চলছিলও, শুধু এই মাথা ধরাটা ভ্যানভ্যানে মাছির মতো বারবার ফিরে এসে যদি না অস্বস্তি দিত।
ম্যাগাজিনটা চেয়ারে রেখে কমলেশ উঠে দাঁড়াল। সমীরণ আর মধুপর্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, যাই, বাইরে একটু ঘুরে আসি।
মধুপর্ণা বলল, কোথায় বেড়াতে যাবে, চারদিকেই তো জঙ্গল।
সামনের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে কমলেশ বলল, জঙ্গলেই তো বেড়াতে এসেছি।
জঙ্গলে যদি পথ হারিয়ে ফেলো?
না না, জঙ্গলের ভেতরে ঢুকব না। এই সামনেটায়— বেশিদূর যাব না।
সমীরণ বলল, অবশ্য এ জঙ্গলে বাঘটাঘের ভয় নেই। এখন তো সব জঙ্গলেই ওয়াইল্ড লাইফ কমে এসেছে। তবু একটু অ্যালার্ট থাকিস কমল। ভেতরে ঢুকিস না। স্যাংচুয়ারি হলেও।
কমলেশ বলল, না না, কাছাকাছিই থাকব। বড় জোর ঘণ্টাখানেক।
তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ডের গেট খুলে কমলেশ ডানদিকের পায়ে চলা রাস্তায় পা বাড়াল। বাংলোর চারপাশে কিছু জায়গায় জঙ্গল ঢিলেঢালা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অল্পস্বল্প গাছ। জঙ্গল শুরু হয়েছে একটু দূর থেকে। জঙ্গলের গা ঘেঁষে আদিবাসী বস্তি। বনবিভাগের শ্রমিক ছাড়াও কিছু

আলাদা মানুষ সেখানে থাকে যাদের জীবনজীবিকা জঙ্গলের ওপরই নির্ভরশীল। উত্তর বাংলার সব জঙ্গলই মূল্যবান বনজ গাছগাছালিতে সমৃদ্ধ। শাল, সেগুন, অর্জুন, গরান, মেহগনি প্রভৃতি বিশাল বিশাল গাছ বহুদূর বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে আধুনিক সভ্যতার একপাশে পৃথিবীর আদিম যুগকে ধরে রেখেছে। মাঝখানের তৈরি করা ফাঁকা জায়গায় বনবিভাগের এই অবসর-আবাসে মাঝেমধ্যেই লোকজন আসে। দু'দিন থেকে আনন্দের রোমাঞ্চকর স্মৃতি নিয়ে আবার ফিরে যায়। বাংলোয় রান্নার লোক, কাজের লোক, চৌকিদার সবই আছে। কোনও অসুবিধে হয় না।

কমলেশের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে সমীরণ বলল, কমল এক ঘণ্টার জন্য ঘুরতে গেল, না সুযোগ দিয়ে গেল? ব্যাপারটা সরল ভালমানুষি না চরম উপেক্ষা, কে জানে।

কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় মধুপর্ণা, চোখের পাতা সামান্য কেঁপে ওঠে। তাও কি হতে পারে? সরলতা, না উপেক্ষা? এতদিন যেটাকে কমলেশের দুর্বল চরিত্র বলে ভেবে এসেছে, সেটা কি কমলেশের নিষ্ঠুর উদাসীনতাও হতে পারে? এবং সেই উদাসীনতার উৎস কি মধুপর্ণার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা? কমলেশের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের সাত বছরের চওড়া সময়কে ছোট করে এনে দেখতে চাইল মধুপর্ণা। কিন্তু সন্দেহ করার মতো কিছু দেখতে পেল না। ভীরুভীরু আজ্ঞাবহ মানুষটার মধ্যে কোনও রকমফের আনা গেল না। ধুস! সমীরণ একটা কথার কথা বলেছে মাত্র।

চিন্তাটা মন থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইল মধুপর্ণা। ডান হাতটা আবার সমীরণের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কই, হাত দেখলেন না আমার।

মাথাটা দপদপ করছে সমীরণের, কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। তবু কষ্টটা চেপে রেখে বলল, দেখছি তো।

কী দেখছেন বলুন?

দেখছি একটি মৃণাল বাহুলতা, চম্পাকলি আঙুল—

এই ইয়ারকি হচ্ছে, না! আমার হাতটা দেখতে কেমন, তাই বলেছি নাকি? আমি বলেছি আমার হাতের রেখা— একী, আপনাকে কিছু আনকমফোর্টেবল মনে হচ্ছে যেন। কী হয়েছে?

মাথাটা খুব ট্রাবল দিচ্ছে। কমার কোনও লক্ষণই নেই। সমীরণ হাত দিয়ে কপালের পাশের রগ টিপে ধরল।

কালও তো বললেন মাথা ধরার কথা। আজও? কষ্ট হচ্ছে?

খুব। মাথার ভেতরে ছিঁড়ে খাচ্ছে যেন।

তা হলে? মধুপর্ণাকে চিন্তিত দেখাল। মাথাটা টিপে দিলে কিছুটা আরাম পেত সমীরণ। কিন্তু এই মুহূর্তে সে ইচ্ছেকে থামিয়ে রাখতে হল তার। কমলেশ এখন বাংলোতে নেই, তার না-থাকার সময় এতটা খোলাখুলি আচরণ করাটা ঠিক হবে কিনা, সেই দ্বিধাটা তাকে সাহস জোগাল না। তা ছাড়া বাংলোয় আরও লোক আছে, তাদের চোখে ব্যাপারটা অনৈতিক ঠেকতে পারে। বিশেষ করে মধুপর্ণারা যখন বড় সাহেবের অতিথি।

সমীরণ বলল, একটা অ্যাসপিরিন জাতীয় কোনও ট্যাবলেট পেলে ভাল হত। আছে?

ট্যাবলেট? কিন্তু মাথা ধরার ওষুধ তো— মধুপর্ণার হঠাৎ মনে পড়ে গেল ও ধরনের কোনও ট্যাবলেট কমলেশের ব্যাগে থাকলেও থাকতে পারে। ওষুধের ব্যাপারে কমলেশ বরাবরই খুব সচেতন। বাড়িতে সবসময় সব ধরনের জরুরি ওষুধ মজুত রাখে। বেড়াতে এসে সঙ্গে করে কি নিয়ে আসেনি! কমলেশ একটু আগেই বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে আসবে না। ওর ফোলিও ব্যাগটা খুঁজে দেখলে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠল মধুপর্ণা। বলল, চলুন তো ওর ব্যাগে ওষুধটষুধ কিছু আছে কিনা দেখি। অনেক সময় ব্যাগে ওষুধ রাখে। অবশ্য না পাওয়া গেলেও ভয়ের কিছু নেই। মাথাটাথা সবারই ধরে।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবাভাবির কিছু নেই, সেইরকম ভেবে গুনগুন করে একটা গান গাইতে গাইতে

মধুপর্ণা ঘরে ঢুকল। পেছনে সমীরণ। কমলেশের ফোলিও ব্যাগটা দেয়ালের র‍্যাকে রাখা ছিল। সেটা হাতে নিয়ে মধুপর্ণা একটানে চেনটা খুলে ফেলল। ব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বাইরে আনার সময় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছোট্ট কিন্তু ভারী একটা ধাতব জিনিসও বেরিয়ে এল। মধুপর্ণা আর সমীরণ ভয়ানক অবাক হয়ে দেখল জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র। রিভলবার।

রিভলবারটা দেখতে দেখতে মধুপর্ণা স্খলিত গলায় বলল, এটা ওর ব্যাগে কেন?

বিস্মিত সমীরণ জানতে চাইল, আপনি এই রিভলবারটার কথা জানতেন না?

মধুপর্ণা মাথা নাড়ল, উঁহু। কিছু বলেনি তো আমাকে।

সমীরণ বলল, স্ট্রেঞ্জ। জিনিসটাকে কিছুতেই কমলের চরিত্রের সঙ্গে মেলাতে পারছি না। যদি ধরেও নেওয়া যায়, বনেজঙ্গলে আত্মরক্ষার জন্যে এনেছে, তা হলে এটা ঘরে রেখে জঙ্গলে গেল কেন? আপনাকেই বা জানাল না কেন?

মধুপর্ণা ভাঙাভাঙা গলায় বলল, কিন্তু এটা কেন? কীসের জন্যে? কী এটার টার্গেট? বাইরে একটা শব্দ হল। কেউ কি গেট খুলল? কমলেশ কি ফিরে এসেছে? একটু যেন চমকে উঠল মধুপর্ণা। তাড়াতাড়ি রিভলবারটা আর অন্য জিনিসপত্র ব্যাগে ঢুকিয়ে চেন আটকে দিয়ে যেখানে যেভাবে ছিল সেইভাবেই রেখে দিল। মাথা ধরার কোনও ওষুধ ব্যাগের মধ্যে অবশ্য ছিলও না।

কমলেশ আসেনি। তবে আসার সময় হয়ে গেছে। তখন নিশ্চয়ই অন্য কোনও শব্দ হয়েছিল বাইরে। ঘর থেকে বারান্দায় এসে সমীরণ আগের চেয়ারেই ফের বসল। মধুপর্ণাও বসল। তবে আগে যেখানে বসেছিল, সেখানে নয়। একটা চেয়ার বাদ দিয়ে বসল সে।

যেন কিছুই হয়নি, সেইভাবে মধুপর্ণা নিজেকে স্বাভাবিক দেখাতে চাইল। শুধু একটু আগে গুনগুন করে যে-গানটা গাইছিল, সেটা তখন আর গলায় ছিল না।

কনকলতা

যেতে যেতে হঠাৎ থেমে যায় রতনের মা। নেই নেই করে বয়েস তো কম হল না। ষাট পেরিয়েছে সেই কবেই। এখন গায়েগতরে অনেক কমে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে হাঁপ ধরে যায়। ধড়ফড় করে বুক। একটু জিরেন দিতে মন চায়। শরীরটা ভেঙে পড়ে আসতে চায়।

রতনের মা দাঁড়িয়ে পড়ল তো নন্দলালও দাঁড়িয়ে পড়ে। হাঁটতে তারও কি কষ্ট হচ্ছে না। বয়েস তো তারও বসে নেই। আগের বছরই তো সত্তর গেল। শরীর তো তার আগেই ভেঙেছে অভাবে অনটনে। এতখানি পথ আসতে তারও শরীরের জোর আরও কমে গেছে। পা দুটো এখন ভারী ভারী ঠেকছে। তবে কিনা রতনের মা তার সঙ্গে চলেছে, নিজের কষ্টের কথা বলা তো যায় না তাকে। আরও অনেকটা পথ যেতে হবে। এখন কষ্টের কথা বললে রতনের মা'র মন দমে যাবে, পা দুটো পাথর মনে হবে। বলে, কী গো রতনের মা, দাঁইড়ে পড়লা যে? বেশ তো হাঁটতে ছিলে!

রতনের মা কাঁপাকাঁপা মাথা তুলে দূরের পানে চায়। ধু-ধু করছে মধ্যিচোতের আগুনপারা মাঠ। রাক্ষুসে মাঠের কোথায় যে শেষ কে জানে। জনমুনিষ্যি নেই কোথায়ও। সূর্য এখন মাঝ আকাশে। গনগনে রোদ্দুরে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হাওয়া নেই, বাতাস নেই, গাছের পাতা নড়ে না। এই মাঠ পার হয়ে জংলা জমি, সে জংলা জমি পার হয়ে নাকি পাগলবাবার ডেরা। গাঁয়ের লোকে বলে বাবার থান।

রতনের মা শূন্যচোখে তাকায় নন্দলালের দিকে। রোদ্দুরের আঁচে মুখের রং তামাটে হয়ে গেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে সারামুখে। বলে, আর কদ্দুর গো নন্দঠাকুর? বেলা তো দু'পহর হল। আর যে শরীলে ধকল সয় না।

নন্দলাল সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, এই তো, এই আসি পড়লাম বলে। বুঝলা কিনা, এই মাঠটুকুনিই, ব্যস।

গোঁসামুখ করে রতনের মা, তখন থিকা ওই একই কথা কও— এই একটুকুনি পথ, এই একটুকুনি পথ। আর যাওন যায় না বাপু। মাঠ তো নয়, যেন তিপান্তর। ফুরায় না আর।

নন্দলাল বলে, তা বাবার থানে যেতি হলি, বুঝলা কিনা রতনের মা, ওই একটুকুনি কষ্ট করতেই হবে। কথায় বলে না, সি কথাটা গো, কষ্ট করলি পরে তবে না কিষ্টো মিলে।

রতনের মা তেরছা চোখে তাকায় নন্দলালের দিকে। নন্দলালের মুখটা সেই একরকম যেমনই থাকুক, চোখদুটোতে মিটিমিটি হাসি। রতনের মা'র গা জ্বলে যায়। মুখঝামটা দিয়ে বলে, কেমনধারা বেআক্কেলে মানুষ তুমি হে নন্দঠাকুর। রোদে পুড়ে আমার জেবনটা যায়, আর তুমি কিনা মশকরা করো? একটুকুও বিবেচনা নাই?

রতনের মা'র দজ্জাল মুখকে বড় ভয় নন্দলালের। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, কই, মশকরা করি না তো। এখন পা না চালালি, বেলাবেলি বাবার থান থিকে ফিরা যাবে না, সেই কথাই কই। উই যে মেঘ দেখি পুব আকাশে। সময়টা ঝড়জলের কিনা, তাই ভয়।

রতনের মা আকাশ দেখে। কোথায় মেঘ জমেছে ঠাওর করে দেখতে চায়। চোখের জোর কমে গেছে, দিশা পায় না কিছু। ঝলসানো গরমে দেহটা খাক হয়ে যাচ্ছে যেন। কোথাও কোনও গাছের ছায়ায় একটুখানি বসে থাকতে সাধ জাগে। কিন্তু কোথায় বা গাছ, কোথায় বা গাছের ছায়া। আদিগন্ত ছড়িয়ে উদম হয়ে পড়ে আছে দ্বিপ্রহরের তপ্ত মাঠ। ভারী অসহায় দেখায় ষাটোর্ধ্ব

বৃদ্ধাকে। শরীরের চামড়া শিথিল হয়ে ঝুলছে, দেহ বেঁকে গেছে, চোখের পাতা কাঁপে। আর এক পা-ও হাঁটতে মন চায় না। তবু যেতে হবে পাগলাবাবার থানে। এখন না গেলে দিনমানে ফিরতে পারবে না। কোথায় নাকি মেঘ দেখেছে নন্দঠাকুর। হবেও বা। এ-সময়ের মেঘ শুধু জল আনে না, আনে ঝড়-তুফান আর শিলপাথর। সেসব হলে এ বিভুঁইয়ে বড় আতান্তরে পড়তে হবে। একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলে, যেতি যখন হবেই, চলো তা হলি। তোমার মতো অকম্মা লোকের সঙ্গে আসাটাই দিকদারির বেপার হইছে।

অপরাধীর মতো মুখ করে নন্দলাল ঘাড় চুলকায়। একটু সাহস পেয়ে বলতে যায়, তবে কিনা, বুঝলা না রতনের মা, আমার কথাটা হল গিয়ে—

মাছি তাড়াবার মতো হাত নেড়ে এক ঝটকায় নন্দলালকে থামিয়ে দেয় রতনের মা, চুপ করো তো। আমি মরি নিজের জ্বালায়, মেনিমুখো মিনসে শোনাতে এলেন নিজের বেত্তান্ত!

নন্দলাল মিনমিন করে বলে, না তাই বলছিলাম।

রতনের মা চুপ করে থাকে। অন্য সময় হলে সাতকাহন শুনিয়ে দিত, এখন বলতে পারছে না কথা। নন্দলাল দেখল গরমের ধকলে রতনের মা'র বুক ওঠা-নামা করছে। একে এই বয়সে এই পথশ্রম, তার ওপর রোগাভোগা শীর্ণ শরীর। এখন মানুষটাকে বহাল শরীরে ফিরিয়ে আনতে পারলে হয়। নন্দলাল কপালে জোড়াহাত ঠেকিয়ে মনে মনে বলে, হেই ভগমান, ভালয় ভালয় যেন ফিরিয়ে আনতে পারি রতনের মা'রে। পথে যেন কোনও অনথ্থ না ঘটে।

মুখে বলে, একবার বাবার থানে গিয়ে পুডলি পরে, বুঝলা না রতনের মা, কোনও দুখদরজ থাকবি না। সব শান্তি।

রতনের মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, পোড়ারমুখো আবার কথা বলে। বাক্যি শুনলি গা জ্বলি যায়।

নন্দলাল আর কথা বাড়ায় না। দু'জনে আবার হাঁটতে থাকে। সেই কখন সাতসকালে ষাট আর সত্তর পেরোনো দু'টি মানুষ গ্রাম থেকে রওনা দিয়েছিল বাবার থানে যাবে বলে। গরজটা রতনের মা'রই, নন্দলাল কেবল তার সঙ্গী। রতনের মা নানা আধিব্যধিতে ভোগে সংবচ্ছর, ছেলে রতনের সংসারের এককোণে পড়ে থাকে উচ্ছিষ্টের মতো। মনে শান্তি নেই। ছেলেবউটার মুখে বড় চোপা, দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন দেয় বড়ই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। ছেলে রতন কুঁদুলে বউয়ের ভয়ে চুপ করে থাকে। অন্যের কাছে রতনের মা যতই মুখরা মেয়েমানুষ হোক না কেন, ছেলেবউকে ঘাঁটায় না। বয়স তো তিনকাল ঠেকেছে, শরীর স্বাস্থ্যও বয়সের সঙ্গে চলে গেছে। নিজের গতর খাটিয়ে মুখের অন্ন জোটাবে, সে ক্ষমতাও নেই। চুপ করে থেকে ছেলেবউয়ের ঝাঁটালাথি সহ্য করতে হয়। বড় দুঃখকষ্ট সহ্য করে তার থাকতে হয়। অনেকদিনের সাধ ছিল বাবার থানে যাবে বলে, এবার সেই সাধ পূর্ণ করতে চলেছে। লোকে বলে পাগলাবাবা খুশি হয়ে যার হাতে প্রসাদী ফুল দেয়, তার নাকি মনের বাসনা পূর্ণ হয়। মনে মনে যা চায়, তাই নাকি পায়। রতনের মা-ও বাবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলবে, বাবাঠাকুর, আমার বড় দুঃখ। তুমি আমার দুঃখ দূর করে দাও ঠাকুর। কারুর ক্ষতি চাই না আমি। ছেলে, ছেলের বউ, নাতি, নাতনি যেমন আছে, তেমনই থাকুক। তুমি শুধু আমাকে ভাল রেখো বাবা।

তা পাগলাবাবার থানে যাব বললেই তো যাওয়া যায় না। সে বড় দূরের পথ, সে বড় কষ্টের পথ। চোদ্দো মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে অনাবাদী মাঠের মধ্য দিয়ে। সে-মাঠ চোরকাঁটা আর আগাছায় ভরতি। এবড়ো খেবড়ো, অসমান। সামনে পেছনে কোনও জনবসতি নেই। মাঠ পার হয়ে পড়বে বুনো ঝোপের জঙ্গল। সে জঙ্গলও বড় কম নয়। জঙ্গল পার হলে তবে কিনা পড়বে পাগলাবাবার ডেরা। জঙ্গলের ধারে একটেরেতে শন আর হোগলার ছাউনি দেওয়া একচালা মাটির ঘর। সেই ঘরে থাকে পাগলাবাবা। মুখে কথা বলে না, সবই আকার ইঙ্গিতে সারে। দু'-চারটে তাগড়া চেহারার চেলা আছে, তারাই বাবার দেখাশোনা করে। বাবার মেজাজ ভাল থাকলে প্রসাদী ফুল জুটবে, বিগড়ে থাকলে হাজার কাকুতিমিনতিতেও বাবার মন গলবে না। ফুল তো পাওয়া

যাবেই না, উলটে শুনতে হবে কুকথা, গালিগালাজ। খেপে গেলে ত্রিশুল নিয়ে তাড়াও করতে পারে। সে না হয় ভাগ্যের কথা হল। যার যেমন কপাল, তেমনই তো জুটবে। কিন্তু কথা হল, রতনের মাকে নিয়ে যাবে কে! গাঁয়ের লোকের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই যে অলপ্পেয়ে বুড়িকে শখ করে বাবার থানে নিয়ে যায়।

তা যার কেউ নেই তার নন্দলাল আছে। আপনভোলা সাদাসিধে সরল মানুষ। হাটতলার একদিকে বাঁশবাতা আর টিনের ঘরে একাই থাকে। বাঁধাধরা কোনও রোজগারপাতি নেই। যখন যে যা কাজ দেয়, টাকা আধুলিটা দেয়, তাই পেয়েই সে খুশি। বামুন বলে আগে যা একটু টুকটাক যজমানি করত, এখন বয়স হওয়াতে তাও করে না। তা লোকটা ভালমানুষ বলে গাঁয়ের লোকেরা চালটা, কলাটা, মুলোটা দেয় মাঝেমধ্যে। তাতেই কোনওমতে দিন গুজরান হয়। বিয়ে-থা করেনি। তা নন্দলাল এখন যেমনই বুড়োথুবড়ো হোক না কেন, বয়েসকালে দেখতে শুনতে মন্দ ছিল না। এই যাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে বাবার থানে, সেই রতনের মা-ও কি একসময় ভাবভালবাসার চোখে দেখেনি যুবক নন্দলালকে। রতনের মা-ও তো এই গ্রামেরই মেয়ে। বেশ ডাগরডোগর ছিল সে সময়। বিয়ে হয়েছিল ভিন গাঁয়ে। বিয়ের দশ বছর পর স্বামীকে অকালে হারিয়ে একমাত্র ছেলে রতনকে নিয়ে আবার চলে এসেছিল বাপের ভিটেয়। বড় দাপুটে মেয়েমানুষ ছিল রতনের মা। শ্বশুরবাড়ির বাঁকা মুখ সহ্য না করতে পেরে সেই যে চলে এসেছিল, আর সে মুখো হয়নি। বাবা গত হলে ছেলে রতনকে নিয়ে একাই ছিল বাপের ভিটেতে। সেই ছেলে রতন বড় হল, বউ এল বাড়িতে। ছেলের বউ বড় দজ্জাল। প্রথম থেকে শাশুড়িকে বিষনজরে দেখতে শুরু করল। রতনের মা সরে গেল সংসারের এক কোণে। বদলে গেল মানুষটা। আগে নন্দলালের সঙ্গে যা একটু খুনসুটির সম্পর্ক ছিল, তাও রইল না। এখন নন্দলালকে দেখলেই বাক্যবাণে ধুইয়ে দেয়। কেন দেয় সেকথা নন্দলাল জানে না। জানে না রতনের মা'র ভোগভোগান্তির সব জ্বালা কেন তার ওপরই মেটায়। যৌবনে দু'জনের মধ্যে সামান্য কিছু আশনাইয়ের সম্পর্ক ছিল, তা বই তো নয়!

তবু নন্দলাল রাগ করে না। রতনের মা'র দুঃখটা বোঝে। এই যে কাঠফাটা রোদের মধ্যে জরা আর বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া এক চিলতে শুকনো মানুষটা ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে পাগলাবাবার কাছে, সে তো অথই জলে পড়া মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো একটা মিছামিছি ভরসা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন বয়সের এই ভাটির টানে রতনের মা'র কীই বা চাওয়ার আছে বাবার কাছে। কিন্তু সেকথা বলা যাবে না তাকে। অমনি ফোঁস করে উঠবে।

যেতে যেতে আবার থেমে যায় রতনের মা। বেশ বোঝা যায়, আর পারছে না সে। মনের জোরে এতটা এসেছে, এখন সেই জোরও নেই। মাঠের মধ্যেই বসে পড়ে। কথা বলারও সাধ্যি নেই। শরীরটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। দম নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

নন্দলাল তাড়াতাড়ি সামনে এসে দেখে রতনের মাকে। অবস্থাগতিক ভাল ঠেকে না তার। রতনের মা'র মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখ ঘোলাটে। রীতিমতো অসুস্থ সে। ও রতনের মা, কী হল? অমন করি বসি পড়লা কেন? কষ্ট হচ্ছে?

রতনের মা তাকায় নন্দলালের দিকে। বড়ই শূন্য দৃষ্টি। ঠোঁটদুটো কাঁপছে থরথর করে। থেমে থেমে বলে, শরিল খারাপ লাগে। আর যেতি পারব না।

একটুখানি জিরেন দিলি যেতি পারবা না? আর তো বেশি পথ নাই গো।

রতনের মা অধীরভাবে দু'পাশে মাথা নেড়ে জানায় সে আর যেতে পারবে না। এর বেশি এক পা-ও যাওয়ার ক্ষমতা নেই তার। বেশিক্ষণ বসেও থাকতে পারে না সে। মাঠের মধ্যে মাটির ওপরই শরীর এলিয়ে দেয়।

রতনের মা'র শুয়ে পড়া দেখে নন্দলাল হতবুদ্ধি হয়ে যায়। মহাবিপদে পড়ে যায় সে। মাঠের মধ্যে তীব্র রোদের তাপে বেশিক্ষণ থাকলে রতনের মা আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। বুড়ি কোনওক্রমে টিকে আছে। কী করবে নন্দলাল বুঝে উঠতে পারে না। চারপাশে তাকায় সে। কোথায়ও কোনও

মানুষজন, বাড়িঘর দেখতে পায় না। খাঁ খাঁ করছে দুপুরের শূন্য মাঠ। তখনই কিছুটা দূরে একটা গাছ চোখে পড়ে। কোনও বড়সড় গাছ নয়। তবু ছায়া দেবার মতো ডালপাতা আছে। ওখানেই নিয়ে যাবে রতনের মাকে। গাছের ছায়ায় কিছুটা শীতল হবে শরীর, ভাল লাগবে।

রতনের মা, উই যে গাছ। চলো ওখানে যাই। ঠান্ডা ছায়া পাবে।

রতনের মা আবার মাথা নাড়ে, আমি যেতি পারবনি নন্দঠাকুর, আমার সে সাধ্যি নাই।

তা বললি কি চলে। ইখানে এইভাবে থাকলি পরে, এই রোদতাপের মধ্যি— গাছের ছায়ায় একটুক্ষণ থাকলি আরাম পাবা।

আমি পারবনি নন্দঠাকুর, পারবনি।

পারতেই হবে রতনের মা। এই আমি ধরি তোমারে, এই আমার হাত ধরি ওঠো, কাঁধে ভর দিয়ে একটুকুনি কষ্ট করি চলো।

রতনের মা তবু ওঠে না। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়।

নন্দলালের কপালে ভাঁজ পড়ে। এখানে থাকলে রতনের মা আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে, ঘটে যেতে পারে খারাপ কিছু। জোর করেই নিয়ে যেতে হবে। জীবনে এই প্রথম বুঝি নন্দলাল শক্ত হয়। গলায় জোর এনে বলে, যেতিই হবে রতনের মা। যা বলি, তাই করতি হবে। আমি থাকতি তুমি বেঘোরে মরবা, সে কখনও হবেনি।

রতনের মা অবাক গলায় শুধায়, তুমি যা বলবা, তাই করতি হবে?

হ্যাঁ, তাই করতি হবে। চলো এখন।

রতনের মা বড় বড় চোখ করে একটুকাল তাকিয়ে থাকে নন্দলালের মুখের দিকে। সাদাসিধে মানুষটার রূপান্তর দেখে। নন্দলালকে এইভাবে জোর দিয়ে কথা বলতে কোনওদিনও শোনেনি সে। বোকাসোকা লোকটাকে 'সবল' পুরুষ বলে মনে হয় এই প্রথমবার। নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে দেয় নন্দলালকে ধরে উঠবে বলে। খুব বেশি দূরে নয় গাছটা। নন্দলাল দু'হাত দিয়ে রতনের মাকে জড়িয়ে ধরে অতিকষ্টে নিয়ে যায় গাছটার কাছে। টের পায় রতনের মা'র গায়ের তাপ। প্রবল জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। নন্দলাল সযত্নে রতনের মাকে বসিয়ে দেয় গাছের নীচে ছায়ায়। বলে, তোমার গা যে খুব গরম লাগে গো রতনের মা। জ্বর মনে হয় খুব। হায় হায়, কী হবে এখন!

গাছের নীচে ঘোরের মধ্যে বসে আছে রতনের মা, নন্দলাল উবু হয়ে বসল তার পাশে। বসে থাকতে থাকতে রতনের মা আস্তে আস্তে নন্দলালের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। উত্তর দেয় না কিছু।

রতনের মা'র কানের কাছে মুখ এনে নন্দলাল বলে, ও রতনের মা, আমি কী করি এখন? তোমার যে খুব জ্বর। বাবার থানে যেতিও পারবা না।

রতনের মা বিড়বিড় করে উত্তর দেয়, আর দরকার নাই বাবার থানে যাবার।

নন্দলাল কান পেতে শোনে অস্পষ্ট জড়ানো কথাগুলো। বলে, যাবা না? কিন্তু না গেলি যে মনের সাধ পূরণ হবে না।

রতনের মা সেইভাবেই বলে, আমার আর কোনও সাধ নাই। সব সাধ মিটি গেছে।

নন্দলাল ভাল করে শুনতে পায় না কথাগুলো। বলে, কী বলো, রতনের মা? ও রতনের মা, কী কও?

রতনের মা বলে, রতনের মা নয় নন্দঠাকুর, কনকলতা কও। তোমার কনক।

এবার কথাগুলো কানে যায় নন্দলালের। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেই কবেকার যৌবনবতী নারীর শীর্ণ জরাগ্রস্ত মুখের দিকে। এত জ্বর, এত কষ্টের মধ্যেও ভারী প্রসন্ন লাগে সে মুখ।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয় কনকলতার, তার কনকের জ্বরতপ্ত কপালে।

রোমিও মজনু দেবদাস ও তারাপদ

এই উপাখ্যানের নায়কের নাম তারাপদ। নাম দৃষ্টে তাহাকে অকিঞ্চিৎকর এবং বয়স্ক চরিত্রের ভাবিলে ভুল হইবে। শেক্সপিয়র সাহেব বলিয়াছেন, নামে কী আইসে যায়। আমাদের তারাপদ একজন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় শিক্ষিত যুবাপুরুষ। দেখিতে খর্বাকৃতি এবং কৃশকায় হইলেও আচার ও ব্যবহারে সে অতিশয় বিনয়ী, ভদ্র এবং শান্তচরিত্রসম্পন্ন। তাহার পিতা শহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং প্রভূত বিত্তের অধিকারী। তারাপদ তাহার একমাত্র সন্তান। সে কলেজ হইতে তৃতীয়বারের আপ্রাণ চেষ্টায় বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে নিরর্থক বিধায় লেখাপড়ায় আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। পিতা নলিনীকান্তের অভিপ্রায় ছিল তারাপদ পৈতৃক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করুক। তারাপদ সুপুত্র। পিতার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে তাহার কোনওরূপ অসুবিধার কারণ ছিল না। কিন্তু ইত্যবসরে তাহার মতিভ্রম হইল। জনৈকা যুবতী নারীর গভীর প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া সে হাবুডুবু খাইতে লাগিল এবং জগৎ সংসার বিস্মৃত হইল। পিতার অভিপ্রায় অপূর্ণ থাকিয়া গেল।

বিদিশা এই আখ্যানের অষ্টাদশী নায়িকা এবং এতদঞ্চলের উঠতি সুন্দরী। তারাপদদের গৃহের অনতিদূরে পুলিশের দোর্দণ্ডপ্রতাপ দারোগা ভৈরবচরণ হালদারের পৈতৃক নিবাস। বিদিশা তাঁহার কন্যা। তাহাকে কেবল সুন্দরী বলিলে ভুল হইবে। বঙ্গীয় সমাচার পত্রসমূহের 'পাত্র চাই' বিভাগের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে দেশের সকল অনূঢ়া কন্যাই প্রকৃত এবং পরমা সুন্দরী। বিদিশাকে সেই সুন্দরীদের অন্তর্ভুক্ত করিবার অর্থ হইবে সে সেইরূপ লক্ষ লক্ষ বঙ্গললনাদের অন্যতম। ইহা সত্যের চরম অপলাপমাত্র। বিদিশাকে বলা উচিত রোমহর্ষক সুন্দরী। সহৃদয় পাঠক, নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত বিশেষণ লেখকের জানা নাই। যদি কেহ অধিক শক্তিশালী কোনও শব্দ অবহিত থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক শব্দটি সুন্দরী শব্দের অগ্রে বসাইয়া লইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়।

বিদিশা এই পাড়ার কন্যা হইলেও এতাবৎকাল তাহার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য যুবা মহলে অজ্ঞাত ছিল। সকলে তাহাতে বুঁচি বলিয়া জানিত। বাল্যকালে সে সঙ্গীদের সহিত উল্লম্ফনযোগে এক্কাদোক্কা খেলিত, কৈশোরে বিদ্যালয়ের পোশাক পরিয়া স্কুলে যাইত, দুর্গোৎসবের সময় বন্ধু সমভিব্যাহারে কলহাস্য করিয়া ফুচকা খাইত এবং নিকটবর্তী চিত্রগৃহে মাধুরী দীক্ষিত নাম্নী চিত্রতারকার ছবি আসিলে মা, পিতামহীর সহিত সিনেমা দেখিতে যাইত। ইহার অধিক তাহার সম্বন্ধে সম্যক অবগত হওয়া যায় নাই। কিন্তু যে-দিবস তাহাকে রঙিন শাড়ি পরিহিত হইয়া বেণী দোলাইয়া প্রজাপতির ন্যায় উড়িয়া কলেজে যাইতে দেখা গেল এবং অচিরেই জানা গেল এক্ষণে তাহার নাম বুঁচি নহে, বিদিশা— সেই দিনই পাড়ার যুবমহলে জরুরি অবস্থা জারি হইয়া গেল। বুঝা গেল, এইবার পাড়ায় যথেচ্ছ বোমা ফাটিবে, সোডার বোতল নিক্ষিপ্ত হইবে, ছুরিকা আস্ফালিত হইবে, রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইবে। বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলতার সহিত জড়িত এবং পুলিশের এক্তিয়ারভুক্ত বলিয়া সংঘর্ষের সংবাদ অধিক প্রদানে বিরত হইলাম। পুলিশি হাঙ্গামায় কে না ভয় পায়। শুনিয়াছি, স্বয়ং পুলিশই পুলিশকে ভয় পায়। যাহা হউক, বিদিশার বৈপ্লবিক আবির্ভাবে যুবকদের মধ্যে হৃদকম্প শুরু হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মন উচাটন হইল, নাসিকা স্ফুরিত হইয়া ঘনঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। উক্ত যুবকদের কাহারও মনে আত্মঘাতী হইবার প্রবল বাসনা

জাগিল, কেহ উগ্রপন্থীদের দলে নাম লিখাইবার কথা ভাবিল, কেহ আধুনিক কবিতা লিখিবার কথা চিন্তা করিল, কেহ অন্নজল ত্যাগ করিয়া মুক্তপুরুষ হইয়া গেল, কেহ বা কেবল ওই অঞ্চলের জন্য দ্বাদশ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধ ডাকিবার কথা ভাবিল। মোট কথা পাড়ায় ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হইল। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপজনিত কারণে যেরূপ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্ট হয়, তদ্রূপ যুবাচিত্ত আন্দোলিত হইতে থাকিল।

বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করিয়া থাকিবেন এতক্ষণ তারাপদর নাম অনুক্ত রহিয়াছে। ইহার কারণ আছে। বিদিশার আবির্ভাবপর্বে তারাপদর কোনও ভূমিকা ছিল না। সে কিশোরী বুঁচিকে চিনিত, কিন্তু তাহার নবকলেবর সম্পর্কে অবহিত ছিল না। এক দিবস দিবালোকে রাস্তা দিয়া যাইবার কালে সে বিদিশার মুখোমুখি পড়িয়া যায়। বিদিশা তখন কলেজ হইতে ফিরিতে ছিল এবং তারাপদ ভিন্ন কাজে অন্যত্র যাইতেছিল। সেইসময় বিদিশা সম্ভবত কোনও ঘটনার কথা চিন্তা করিয়া আপন মনে হাসিতেছিল। নবযৌবনা নারীর রহস্যময় মনোজগতে হাসিবার জন্য কারণ না থাকিলেও সে হাসে। বিদিশা মুখে পূর্বের হাসি লইয়াই অন্যমনস্কভাবে তারাপদর দিকে চাহিল। ওই হাসির কোনও নিগূঢ় অর্থ নাই। উহা কোনও সরস স্মৃতির প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু তারাপদ তাহা বুঝিল না। তৎক্ষণাৎ সে পঞ্চশরে আমূল বিদ্ধ হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিত্তে ক্ষণকাল প্রস্তর মূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বোধোদয় হইলে তাহার হৃদয় উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। সন্দেহ নাই, বিদিশাকে সে জিনিয়া লইয়াছে। অশ্বমেধের দিগ্বিজয়ী ঘোড়াটিকে তাহার ধরিতে হয় নাই, দুরন্ত ঘোড়াটিই বশংবদ হইয়া স্বেচ্ছায় তাহার নিকট ধরা দিয়াছে।

তারাপদর নিজ কার্যে যাওয়া হইল না। সে প্রেমোন্মাদ হইয়া গ্রীষ্মের প্রখর দ্বিপ্রহরে রাস্তায় একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার নৃত্য করিয়া উঠিতেও ইচ্ছা করিল। রৌদ্রতাপ তখন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে, নিদারুণ গরমে আবহাওয়া উত্তপ্ত এবং বায়ুশূন্য। বৃক্ষপত্রটি পর্যন্ত নড়িতেছে না। পথ জনহীন, রাস্তায় পিচ গলিতেছে— কিন্তু না। আর নহে। গরমের বিবরণ দানে বিরত থাকাই শ্রেয় মনে করিতেছি। সরলমতি পাঠকদের উত্তপ্ত গ্রীষ্মের ভিতর টানিয়া আনিতে চাহি না। দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে কেহ কেহ সর্দিগর্মিতে আক্রান্ত হইতে পারেন এবং চিকিৎসক দেখাইবার ফলে অধিকতর অসুস্থ হইতেই পারেন। কাজ কী অন্যের অনিষ্ট করিয়া। পাঠকগণ তো আমার কোনও উপকার করেন নাই, তাঁহাদের ক্ষতি করিব কেন। তারাপদ যুবাপুরুষ, উপরন্তু তাহার চিত্তে নবরসের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার কিছু হইল না। তাহার পুলকিত হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বঙ্কিমী ঢঙে বলিয়া উঠিতেছিল— অহো! কী দেখিলাম। জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।

পরবর্তী দিবসে তারাপদ মুখমণ্ডলে পাউডার ও স্নো প্রলেপ করিয়া, আকর্ষণীয় পোশাকে সজ্জিত হইয়া, ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল অপেক্ষায় থাকিবার পর বিদিশাকে আসিতে দেখা গেল। অদ্য সে একাকিনী নহে, সঙ্গে সহপাঠিনী একজন সখীও রহিয়াছে। যথাসময়ে বিদিশা তারাপদর সম্মুখবর্তিনী হইল এবং তারাপদকে বিস্ময়াভূত করিয়া, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সখীর সহিত যথাবৎ আলাপচারিতায় নিমগ্ন থাকিয়া চলিয়া গেল। বিদিশার এবংপ্রকার ব্যবহারে তারাপদর হৃদয় নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল। সে বিমর্ষ মুখে ভাবিল, হায়, প্রাণাধিকা কি আমাকে বিস্মৃত হইল? পরক্ষণেই আবার তাহার মনে হইল ইহাই রহস্যময়ী নারীর চিরন্তন ছলাকলাও বটে। প্রাণেশ্বরকে অন্তরটিপ্পনি দিয়া প্রেম-ভালবাসাকে দুগ্ধের ন্যায় ফেটাইয়া তুলিবার কৌশল। তারাপদর শূন্য হৃদয়কোণে বিদিশা পুনরায় পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রসম স্বমহিমায় বিরাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু কেবল দর্শনসুখে প্রেম তৃপ্ত হইবে কেন। গভীর প্রেম ক্রমশ অন্তরলোকে প্রবেশ করিবার জন্য হাঁকুপাঁকু করিতে থাকে। তারাপদ শুনিল পূর্বরাগ পর্বে প্রেমপত্র প্রেরণের একটি আবশ্যিক ভূমিকা আছে। সে হরেক মালের দোকান হইতে নগদ মূল্যে একটি 'সহজ প্রেমপত্র লিখন পদ্ধতি' শীর্ষক পুস্তক ক্রয় করিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রেমপত্র রচনা করিল। অয়ি প্রাণাধিকা, তোমার বিহনে আমি মণিহারা ফণির মতো বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াছি, ইত্যাদি মর্মভেদী বাক্য সমন্বয়ে প্রেম নিবেদন করিয়া

পরিশেষে লিখিল— তোমার চিত্রাভিনেত্রী সুলভ পেলব তনু আমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ না করিতে পারিলে আমি ইহজীবন ত্যাগ করিব— ইহাই মনোবাঞ্ছা। আমি সহস্রবার মরিব, তবু তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে না পাইলে আমি মরিব, মরিব, নিশ্চয়ই মরিব। ইতি তোমার জন্মজন্মান্তরের প্রেমভিখারি তারাপদ। পত্রটি 'আই লাভ ইউ' মার্কা সুদৃশ্য কাগজে সযত্নে লিখিয়া ততোধিক সুদৃশ্য লেফাফায় ভরিয়া সে পূর্বস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। বিদিশা কাছে আসিলেই সে কৌশলে প্রেমপত্রটি তাহার হস্তে গুঁজিয়া দিবে। কিন্তু বিধি বাম হইলেন। সেই দিবস বিদিশাকে কলেজ হইতে আসিতে দেখা গেল না। তাহার পরবর্তী দিবসেও সে অনুপস্থিত থাকিল। হতবুদ্ধি তারাপদ অতঃপর খোঁজ লইয়া জানিল যে বিদিশা স্থানান্তরে মাতুলালয়ে গমন করিয়াছে এবং মাসাধিককাল থাকিবে।

এই দুঃসংবাদ শ্রবণে তারাপদর মানসিক অবস্থা কীরূপ হইয়াছিল, তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের কল্পনার উপর ছাড়িয়া দিলাম। তাঁহারা লায়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত প্রেমোপখ্যান পাঠ করিয়া সবিশেষ অবগত আছেন। আমি কাগজ এবং কালির অত্যধিক মূল্যের কথা বিবেচনা করিয়া বিস্তারিত বিবরণে ক্ষান্ত হইলাম।

বিদিশার অদর্শনে তারাপদ চক্ষুতে অন্ধকার, বক্ষে হাহাকার, জঠরে অগ্নিমান্দ্য লইয়া কায়ক্লেশে কোনওরকমে দুইটি দিন কাটাইয়া তৃতীয় দিবসে থাকিতে না পারিয়া সাব্যস্ত করিল সে বিদিশার বাটিতে যাইবে, বাটিতে গমনপূর্বক প্রেমপত্রটি তাহার হস্তে সমর্পণ করিবে। কিন্তু বিদিশার বাটির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পিতা ভৈরবচরণের ভয়ংকর মূর্তির কথা স্মরণ করিয়া সে অতিশয় ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। ভৈরবচরণের অক্ষিগোলক সর্বদা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে এবং ক্রুদ্ধ হইলে পিস্তল নামক আগ্নেয়াস্ত্রটি আস্ফালন করিতে থাকে এবং দুর্ভাগ্যবশত তিনি সর্বদা ক্রুদ্ধ হইয়াই থাকেন। ভৈরবচরণ অত্র জেলার মফস্সল শহরের থানার পুলিশবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত বড় দারোগা। কিন্তু বর্তমানে তিনি ছুটি লইয়া বাটিতে অবস্থান করিতেছেন। ইহাও তারাপদর মন্দভাগ্যের পরিচায়ক। সে হতোদ্যম হইয়া পড়িল। হায়, প্রেমের তরণী কি তীরে আসিয়া ডুবিয়া যাইবে। আমার ভাগ্যাকাশ কি কৃষ্ণমেঘে আবৃত— এবংবিধ ভাবিতে ভাবিতে সে বিদিশাদের বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল এবং সরোষে ভৈরবচরণের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে এই প্রেমোপাখ্যানে অন্য একটি পার্শ্বচরিত্র ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে চমকিত হইবার কারণ নাই। পাঠকগণ নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন যে রন্ধনকে সুস্বাদু করিয়া তুলিতে যেমন লবণ, লঙ্কা, গরমমশলার প্রয়োজন আছে, তদ্রূপ নায়ক-নায়িকার প্রেমকাহিনীকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে তৃতীয় চরিত্রের আবির্ভাবও আবশ্যিক। হিন্দি সিনেমায় উহারা প্রায়শই ভিলেন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই গল্পের তৃতীয় চরিত্রটি হইল বিদিশাদের পার্শ্ববর্তী গৃহের পাটের ব্যবসায়ী অনাদিবাবুর কন্যা পরী। নামে পরী হইলেও সে রূপে এবং গুণে পরীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, লোমবহুলা, দন্তরাজি সম্মুখে ধাবমান এবং কলহপ্রিয়া ও মুখরা। কোনও অকুতোভয় যণ্ডাজাতীয় (পড়ুন মাস্তান) ব্যক্তি বিপুল যৌতুকের বিনিময়েও তাহাকে বিবাহ করিতে সাহসী হয় নাই বলিয়া সে অদ্যাবধি অবিবাহিত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিধাতাপুরুষ চিরদিনই পরম পরিহাসপ্রিয়। তাঁহার রঙ্গকৌতুকের জালে আবদ্ধ হইয়া পরী বরাবরই তারাপদর প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলচিত্ত ছিল। তারাপদর সহিত দৈবাৎ দেখা হইলে সে বাক্যালাপ করিত এবং আশ্চর্যের বিষয় তাহাতে মধুরভাবের স্পর্শ থাকিত। যাহা হউক, ওই দিন জানলা দিয়া তাহাদের গৃহের সংলগ্ন পথে তারাপদকে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করিতে দেখিয়ে পরী ভাবিয়া বসিল তারাপদ নিশ্চয় তাহার জন্য ওইরূপ করিতেছে। ইহা মনে হইবামাত্র পরীর মনে পুলকের সঞ্চার হইল এবং ছুটিয়া গিয়া দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া সলজ্জভাবে হাসিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার মধ্যে লজ্জা নামক অনুভূতি অত্যন্ত কম থাকিবার কারণে হাসিটি মুখবিকৃতি হইয়াই ফুটিয়া রহিল। উহা দেখিয়া পরী রাগিয়া দর্পণে নিজের প্রতিবিম্বকেই মুখ ঝামটা দিল। তাহার হৃদয় উচ্চকিত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। নতুবা তাহার মনে তারাপদর সঙ্গলাভের বাসনা জাগিবে কেন?

কিন্তু পরীর মানসিক অবস্থার কথা তারাপদ জানিবে কী রূপে? সে তখন বিদিশার দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উহাদের গৃহের সম্মুখে ঘোরাঘুরি করিতেছে। তিন দিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, বিদিশার দেখা পাওয়া যায় নাই। তারাপদর হৃদয়ের হুতাশন বিধ্বংসী আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সুখ-শান্তি সব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অবশেষে চতুর্থ দিবসে সে বিদিশাকে দেখিতে পাইল। গৃহের জানলার সামনে দাঁড়াইয়া সে পথের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। তারাপদ আহ্লাদিত হইয়া জানলার সম্মুখে আসিয়া হাস্যমুখ করিয়া দাঁড়াইল। বিদিশা তাহাকে দেখিল, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে কোনওরূপ প্রেমভাবের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইল না। ভ্রূকুটি করিয়া সে জানলার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। প্রথমে তারাপদর হৃদয়ে দাগা লাগিলেও পরে বুঝিল যে ইহাই বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ। বিদিশার অভিমান হইয়াছে। কয়েক দিবস প্রাণবল্লভের অদর্শনে সে কোপান্বিত হইয়াছে। বিদিশাকে দ্বিতীয়বার দেখিবার আশায় তারাপদ দ্বিগুণ উৎসাহে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই জানলায় দেখা গেল, বিদিশা নয়, বিদিশার পিতা ভৈরবচরণের করাল বদন। সেই দৃশ্য দেখিয়া তারাপদর বক্ষ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করা সমীচীন মনে করিল।

সেইসময় পরী পথে চলিয়া আসিয়াছে। তারাপদ কাছে আসিতেই পরী নারীসুলভ লীলায়িত ভঙ্গি করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, আহা ঢং! মধু খাওয়ার ইচ্ছে, কিন্তু ফুলে বসতেই লজ্জা।

তারাপদ প্রথমে বুঝিল না পরী কাহাকে কথাগুলি বলিল। সে পথের চারপার্শ্বে তাকাইয়া দেখিল। কিন্তু সে ভিন্ন অন্য কোনও মনুষ্য নাই। একটি বৃহদাকার ষণ্ড দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিতেছে কেবল।

তারাপদ বলিল, কিছু বললে কি আমাকে?

তারাপদর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া পরী বলিল, আ মরণ আমার! আমার কি সাতভাতার আছে যে তোমাকে ছাড়া অন্যকে বলব? আমাকে ছেনাল মেয়ে পেয়েছ নাকি?

ইহার পরীর প্রেমবাক্য। ইহার অধিক মধুর ভাষ্য তাহার জানা নাই। ভাষাকে ইহাপেক্ষা নমনীয় করা তাহার পক্ষে সম্ভবও নহে।

তারাপদ একটি ঢোঁক গলাধঃকরণ করিয়া পরীর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। পরী উত্তম প্রসাধনে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার কৃষ্ণবর্ণ গণ্ড রক্তিম প্রলেপে বেগুনি বর্ণ ধারণ করিয়াছে, বিলাইতি ওষ্ঠদণ্ড রঞ্জিত ওষ্ঠযুগল দেখিয়া মনে হইতেছে সে সদ্য রক্তপান করিয়া আসিয়াছে। তাহার দন্তরাজি পূর্ববৎ অধরোষ্ঠের বাহিরে প্রদর্শিত। সেই ভীষণাকৃতি দেখিয়া তারাপদর বক্ষ ছমছম করিয়া উঠিল। ভৈরবচরণ অপেক্ষা পরী কম ভীতিপ্রদ নহে।

পরী তাহার শাড়ির প্রান্ত আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে আদুরে গলায় বলিল, তুমি নিজেও পাগল হয়েছ, আমাকেও পাগল করেছ।

তারাপদ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরী কদাপি কোনও ভয়ানক দুঃস্বপ্নেও তাহার চিন্তার ভিতর আসে নাই। এই বিকট নারীকে সহজে ভয় পাওয়া যায়, ভালবাসা যায় না। সে বলিতে গেল, কিন্তু—

এক ঝটকায় পরী তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, মেনিমুখো মিনসের মতো কিন্তু কিন্তু করছ কেন? আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেও জানি না। ও তারাদা, চলো না আজ দু'জনে সিনেমা হলে পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে বসে বই দেখি।

তারাপদ পুনরায় বলিতে গেল, কিন্তু—

পরী ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল, ন্যাকা, পেটে খিদে, মুখে লাজ। এই দুষ্টু।

তারাপদ অসীম চেষ্টায় বক্ষে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, কিন্তু আজ তো বই দেখা হবে না। আমার কাজ আছে।

পরী খপ করিয়া তারাপদর শীর্ণ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমি যখন বলেছি বই দেখব, তখন দেখবই। আমাকে সোজা সরল মেয়ে পেয়ে মজা লুটছ, পড়তে বুঁচিদির মতো দজ্জাল মেয়ের পাল্লায়, ডুবে ডুবে জল খাওয়া ছুটিয়ে দিত।

বুঁচিদি, অর্থাৎ বিদিশা। বিদিশা অপেক্ষা পরী বয়সে দশ-বারো বৎসরের বড়, কিন্তু পরী তাহাকে দিদি বলিতেছে। ইহাতে অবশ্য কোনওরূপ দোষ দেখিতে পাইতেছি না। ইহা নারীমাত্রেই স্বভাবগত ধর্ম। পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ করিয়া থাকিবেন, দুইজন মহিলার সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই উভয়কে দিদি বলিয়া সম্বোধন করে। মহিলারা চিরকাল অন্যের অপেক্ষা কমবয়সি থাকিতে চাহেন, উহাতে তাহারা কোনওরূপ কুণ্ঠাবোধ করে না। নিতান্ত সম্ভব নহে, নহিলে মাতাও বোধকরি কন্যা অপেক্ষা কনিষ্ঠা হইতে সচেষ্ট হইতেন।

বিদিশার কথা শ্রবণমাত্রই তারাপদর প্রাণ আনচান করিয়া উঠিল। সে স্খলিত কণ্ঠে বলিল, বুঁচি কী করেছে?

মুখ ভ্যাংচাইয়া পরী কহিল, কী আবার করবে, খাণ্ডারনিরা যা করে, তাই করেছে। সে নাগর ধরেছে গো। ফস্টিনস্টি করতে এসে অমলেন্দু আটকে পড়েছে ফাঁদে। প্রেমের ফাঁদ গো।

অমলেন্দু এই পাড়ার জনৈক পেশিবহুল যুবকের নাম। একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের যুব শাখার সে সক্রিয় সদস্য এবং সেই দলের ছত্রছায়ায় থাকিয়া নির্বিঘ্নে নানাবিধ অপকর্ম করিয়া গিয়াছে। বর্তমানে সে একটি বাণিজ্যিক সংস্থায় চাকুরি পাইয়া সুবোধ যুবকের ভেক ধারণ করিয়াছে।

এই নিদারুণ সমাচার শ্রবণে তারাপদর থরহরি কম্প আরম্ভ হইল এবং চক্ষুতে রাশি রাশি সরিষার ফুল দৃষ্ট হইতে থাকিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, পরী, আমার হাত ছেড়ে দাও। আমার বোধহয় বিসূচিকা অসুখ হয়েছে। আমি আর বাঁচব না।

পরী বিসূচিকা ব্যধির নাম শুনে নাই। উহা যে কলেরা তাহা তারাপদও জানিত না। কোথাও সে পড়িয়াছিল, গুরুগম্ভীর বিধায় বলিয়া দিয়াছে। পরী ভাবিল উহা নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর ব্যাধির নাম। সে তাড়াতাড়ি তারাপদর হস্ত ছাড়িয়া দিয়া প্রকাশ্য দিবালোকে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই সুযোগে তারাপদ যঃ পলায়তি সঃ জীবতি পন্থা অবলম্বন করিয়া অতি দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করিল।

তাহার পলায়নরত পথের দিকে তাকাইয়া পরী হিকহিক করিয়া হিক্কা তুলিতে তুলিতে কহিল, মুখপোড়া বান্দর।

২

পরীর নিকট হইতে পলাইলেও বিদিশার নিকট হইতে তারাপদ পলাইবে কেমনে! তাহার সমস্ত মনপ্রাণ যে বিদিশাময় হইয়া আছে। বিদিশা নাম্নী সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটি যে তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। তারাপদ দুইদিন মুহ্যমান হইয়া থাকিল। দাড়ি কাটিল না, গৃহের বাহির হইল না, নির্নিমেষ নয়নে আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। কোনও একটি পুস্তকে বিরহকালে নায়কের যেরূপ দশার কথা সে পড়িয়াছিল, সেই রূপই করিল। তৃতীয় দিবসে সে আর থাকিতে পারিল না, গাত্র ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ইতিকর্তব্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিল। অমলেন্দু হেন বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সে একা লড়িতে পারিবে না, সুহৃদগণের সাহায্য লইতে হইবে। তারাপদ ধনী পিতার সন্তান এবং উদারহস্ত বলিয়া তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর অভাব ছিল না। তারাপদ উহাদের স্বীয় সংকটের কথা জানাইল এবং সংকট নিরসনের ব্যবস্থা চাহিল। সুহৃদগণ বিদিশার নাম শুনিয়া উৎসাহিত হইল এবং অমলেন্দুর নাম শুনিয়া দমিয়া গেল। তাহারা সকলেই তারাপদকে রণে

ভঙ্গ দিবার পরামর্শ দিল। বন্ধুদের কাপুরুষোচিত ব্যবহারে তারাপদ যারপরনাই হতাশ হইয়া কহিল যে বিদিশাকে না পাইলে তাহার জীবন নিরর্থক এবং সে জীবন বিসর্জন দিবার জন্য প্রস্তুত। তারাপদ ইহাও জানাইল যে আধুনিক প্রমোটার নির্মিত বহুতল গৃহে বাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। তাহার এই দৃঢ় সংকল্পের সংবাদ শ্রবণে বন্ধুগণ প্রমাণ গণিল। তারাপদর অবর্তমানে তাহাদের সাড়ে-সর্বনাশ হইবে, ইহাতে কোনওরূপ সংশয় নাই। তাহাদের চা-পান, ধূমপান এবং সিনেমা দেখা অচিরাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহাদের সুখের পাখি কুহু কুহু রব ছাড়িয়া কা-কা করিয়া ডাকিতে থাকিবে। সুতরাং তাহারা পরস্পরের মধ্যে শলাপরামর্শ করিয়া তারাপদকে আশু বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইল। অবশেষে যে-পরামর্শটি তারাপদর নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহা এই প্রকার— এই জলপাইগুড়ি শহরের দূরবর্তী চা-বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলে আদিবাসী বলিয়া অভিহিত সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করে। প্রধানত চা-বাগিচায় শ্রমিকবৃত্তি করিয়া উহারা জীবন নির্বাহ করিয়া থাকে। এই আদিবাসী সমাজে এক অলৌকিক শক্তিধর প্রবীণ ব্যক্তি আছেন। তাঁহাকে জানগুরু বলে। এই জানগুরু ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি শক্তির বলে বলীয়ান হইয়া নানারূপ অপার্থিব কাণ্ডকারখানা ঘটাতেই পারেন। তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে বিষয়-সম্পত্তির ভোগ-দখলের ব্যাপারে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে (পড়ুন পথের কাঁটাকে) ডাইন অথবা ডাইনি বলিয়া নিদান দেন। তেলপড়া, সিঁদুরপড়া, বাণমারা ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া যে-কোনও অভীষ্টা নারীকে বশীকরণ করিয়া সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির প্রেমপাশে চিরতরে আবদ্ধ করিয়া দেন।

কালবিলম্ব না করিয়া তারাপদ এক বন্ধুকে লইয়া জনৈক জানগুরুর নিকট উপস্থিত হইল। স্থানটি গয়েরকাটা নামক চা বাগিচা সংলগ্ন। জানগুরুটি অতি বৃদ্ধ। তারাপদর নিদারুণ সমস্যার কথা শুনিয়া কহিল, ওই বেয়াড়া মেয়ের ঠিকানা এবং বাড়ির সঠিক অবস্থান আমাকে বলুন। আমি এমন বাণ মারব যে সে আপনার গলা ধরে সারাজীবন ঝুলে থাকবে।

তারাপদ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া কহিল, কিন্তু গলা ধরে ঝুলে থাকলে তো আমার দমবন্ধ হয়ে যাবে।

জানগুরু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, বিয়ের পরে তো সব পুরুষকেই দমবন্ধ করে থাকতে হয়।

তারাপদ কহিল, বেশ, তাই হবে। আপনি বাণ মারুন।

জানগুরু কহিল, মারব, কিন্তু এরজন্যে আপনাকে চারশো টাকা দিতে হবে। তা ছাড়া আধ কেজি খাঁটি সরষের তেল, এক কৌটো সিঁদুর আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা লাগবে।

বন্ধুটি কহিল, সব দেব। কিন্তু বিফল হলে?

জানগুরুটি বহুদর্শী মানুষ। হাসিয়া কহিল, কোনও ছাত্র পরীক্ষায় বিফল হলে কি শিক্ষক টাকা ফেরত দেয়।

তারাপদ কহিল, উত্তম কথা। আপনি বাণ মারুন, আমি টাকা দিচ্ছি। তেল, সিঁদুর, লঙ্কার জন্যেও টাকা ধরে দিচ্ছি।

জানগুরু টাকা গ্রহণ করিয়া কহিল, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি আজ পর্যন্ত বিফল হইনি। আমি শ্রীভৈরবচরণ ভট্টাচার্যের কন্যা শ্রীমতী বিদিশাকে মোক্ষম বাণ মারছি। আপনারা হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে যান। জয় প্রেমনাথ।

তারাপদ ও তাহার বন্ধু শহরে ফিরিয়া আসিল।

পর দিবস প্রভাতে জানগুরুর বাণ নিক্ষেপের ফলাফল জানিতে তারাপদ অধীব আগ্রহে পথে বাহির হইল। উদ্দেশ্য বিদিশার গৃহের সন্নিকটে বিচরণ করা। কিন্তু তাহার কী চিত্ত বিভ্রম ঘটিল, নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে সে যে গৃহে প্রবেশ করিল, তাহা বিদিশাদের গৃহ নহে, পরীদের গৃহ। বিস্মিত তারাপদ ভাবিয়া কূল পাইল না এরূপ কার্য সে করিল কেন! ইহা কি শুধুমাত্র ভ্রম? নাকি কোনও অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তাহাকে পরীদের গৃহে টানিয়া আনিয়াছে?

তাহাদের গৃহে তারাপদকে দেখিয়া পরী পাগলিনী প্রায় ছুটিয়া আসিয়া গদগদ গলায় কহিল, এসেছ তা হলে? আমি জানতাম যে তুমি আসবে।

তারাপদ কহিল, কেন?

পরী কহিল, আমি যে গতকাল দুপুর থেকেই তোমার কথা ভাবছি। ঘুমিয়েও তোমাকে স্বপ্ন দেখলাম। হ্যাঁগো, একেই কি প্রেম বলে?

তারাপদ অন্যমনস্ক গলায় কহিল, পরী, আমাকে এক গেলাস জল খাওয়াতে পারো?

পরী কহিল, ও মা। কী কথার ছিরি। আমি তোমার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, এক গেলাস জল খাওয়াতে পারব না? তুমি আমার পরমগুরু গো।

জল আনিতে পরী নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

সমস্ত ঘটনা তারাপদর বিস্ময়ের অবধি রাখিল না। বাণ মারা হইয়াছে বিদিশাকে, কিন্তু পঞ্চশরে জর্জরিত হইয়াছে পরী। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার, পরীকে তারাপদর খারাপ লাগিতেছে না। তাহার সম্মুখে প্রসারিত দন্তরাজি প্রস্ফুটিত কুন্দ ফুলের ন্যায়, কর্কশ কণ্ঠস্বর কুহুরবের ন্যায় মনে হইতেছে। ইহার কারণ কী?

পরদিবসই তারাপদ জানগুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সম্যক অবগত করাইল।

জানগুরু কহিল, ওই মেয়ের বাড়ির সঠিক অবস্থান জানাতে আপনার ভুল হয়নি তো?

তারাপদ মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

জানগুরু ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিল, গতকাল জলপাইগুড়ি শহরের আবহাওয়া কেমন ছিল?

গতকাল শহরের আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ ছিল। শনশন করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, ঝটিকা প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়াছিল, কিয়ৎকাল পরপর বৃষ্টি পড়িতেছিল। তারাপদ জানগুরুর প্রশ্নর উত্তরে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা জানাইল।

জানগুরু কহিল, পরীদের বাড়ি কোথায়?

তারাপদ জানাইল, ঠিক বিদিশাদের পাশের বাড়ি।

জানগুরু বলিল, হয়েছে।

তারাপদ শুধাইল, কী হয়েছে?

তারাপদর দিকে চাহিয়া জানগুরু কহিল, আমি বাণ সঠিক ঠিকানাতেই চালিয়ে ছিলাম, কিন্তু—

কিন্তু, কী?

কিন্তু প্রবল হাওয়ার জন্যে নিক্ষিপ্ত বাণের গতিপথ সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। বাণ হাওয়ার ধাক্কায় বিদিশাদের বাড়িতে না গিয়ে পরীদের বাড়িতে চলে গেছে। এখন আপনার পরীকে বিয়ে করা ছাড়া উপায় দেখছি না।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তারাপদ ভাবিল, নিয়তি কেন বাধ্যতে।

পুনশ্চ

দরজা খুলতেই অপার বিস্ময়। দিব্যেন্দু? দীর্ঘ চার বছর পরে এই মহিলা আবাসে সুদেষ্ণার কাছে? এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের তলায় অন্ধকার, অবিন্যস্ত বেশবাস, এই বিধ্বস্ত মানুষটার মধ্যে তার প্রাক্তন স্বামী সেই দাম্ভিক বেপরোয়া দিব্যেন্দুকে খুঁজে নিতে একটুসময় থমকে দাঁড়াতে হল সুদেষ্ণাকে।

তোমার কাছে এলাম সুদেষ্ণা।

দিব্যেন্দু হাসল। বড় শূন্য দেখাল সে হাসি। বড় কষ্ট করে মুখে টেনে আনা।

সুদেষ্ণা ঠোঁট কামড়ে ধরল। তার কাছে এসেছে দিব্যেন্দু। কিন্তু কেন? নিভে-যাওয়া আগুনের ভস্মস্তূপ থেকে উত্তাপ নিতে? কিন্তু যে-বিবাহিত সম্পর্ক একদিন শেষ হয়ে গেছে আদালতের রায়ে, তার কোনও অবশেষ নেই, সে তো দিব্যেন্দুর ভাল করে জানার কথা। তা হলে এসেছে কেন?

তবে কি অন্য কোনও মানবিক কারণ? এমন কোনও কারণ যার জন্যে মানুষই আসে মানুষের কাছে?

বেশ তো, শোনাই যাক না ওর কথা।

হঠাৎ আমার কাছে? কেন বলো তো?

দিব্যেন্দু কুণ্ঠিত গলায় বলল, আমি কি তোমার কোনও অসুবিধে করলাম সুদেষ্ণা?

সুদেষ্ণা কোনও জবাব না দিয়ে চোখের দেখায় চার বছর পরের মানুষটাকে জানতে চাইল। যে-কারণেই আসুক দিব্যেন্দুকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়েও থাকতে পারছে না যেন। চার বছর আগে শক্ত জমির ওপর যে-মানুষটা সদর্পে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে এখন একটা দোমড়ানো মোচড়ানো বাতিস্তম্ভের মতো মনে হচ্ছে। এমন অবস্থায় তাকে কঠিন কথা বলাও যায় না। রাগ করেও বেশিক্ষণ থাকা যায় না। সৌজন্যে বাধে। হঠাৎ আসার কারণটা যা-ই হোক না কেন।

এসো। ঘরে এসো বসো।

দিব্যেন্দু বাধ্য ছেলের মতো ঘরে ঢুকল। ঘরে একটি মাত্র চেয়ার। সেটিই দেখিয়ে দিল সুদেষ্ণা। বসো।

দিব্যেন্দু একইভাবে চেয়ারে বসল। খুব সংকুচিত দেখাচ্ছিল ওকে। যেন ভুল করে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। সুদেষ্ণার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়েও থাকতে পারছিল না। একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎই কাতর গলায়, আমি ভাল নেই, একটুও ভাল নেই সুদেষ্ণা।

কী হয়েছে তোমার?

ঘুম নেই। রাতের পর রাত আমার ঘুম হয় না। আমার ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না।

এই জিনিসটাই চাইছিল না সুদেষ্ণা। দিব্যেন্দুর কথাগুলো বড় বেশি কাছে এসে যাচ্ছে। অন্তর্গত হয়ে যাচ্ছে। চূড়ান্ত ছাড়াছাড়ির পরে কোনও ব্যক্তিগত কথা যে থাকতে নেই সে কি জানে না! আর এ-কথা সুদেষ্ণাকে শুনিয়েই বা লাভ কী! সুদেষ্ণা এখন অনেক দূরের মানুষ। সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে অন্য জীবন তার। থাকেও শিলিগুড়ি থেকে অনেক দূরে পশ্চিম ডুয়ার্সের এই ছোট্ট জনপদে। এখানে সে মেয়েদের স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষিকা। এই ভাড়াবাড়িতে অন্য এক শিক্ষিকা মন্দিরার সঙ্গে মেস করে থাকে। তা যেমনই থাকুক, সে নিজের মতো করে আছে। এর মধ্যে দিব্যেন্দু হঠাৎ

এখানে এসে অভ্যস্ত নিয়মের খুঁটিটাকেই যেন নাড়িয়ে দিতে চাইছে।

কিন্তু যতই হোক, সে কথা কি এখন দিব্যেন্দুকে বলা যায়? অনেকদিন ধরে মানুষটা কোনও খবরের মধ্যে নেই। কেমন আছে, কী অবস্থায় আছে, কিছুই জানে না সুদেষ্ণা। দীর্ঘ চার বছর দিব্যেন্দু তার কাছে সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার সম্বন্ধে কিছু জানে না সে। তবে লোকটা যে এখন ভয়ানক বিপর্যস্ত আর কাহিল, দেখেই বোঝা যায়। কী দরকার অপ্রিয় কথা বলে সমস্যা সৃষ্টি করার।

আসলে কোনও জটিলতার মধ্যে থাকতে সুদেষ্ণার ইচ্ছে করছিল না। আজ সারাদিন তাকে নানান কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। চার দিন পরেই ছোট বোন রুনুর বিয়ে। সেজন্যে কাল সকালেই সে বালুরঘাট চলে যাচ্ছে। আজ সারাদিনই কাজের মধ্যেই থাকতে হয়েছে। স্কুলে ছুটি নিতে হয়েছে, বিয়েতে দেবে বলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হয়েছে, কিছু কেনাকাটি করতে হয়েছে, জিনিসপত্র গোছগাছ করতে হয়েছে। এতসব করে যখন বিকেল ফুরানোর মুখে একটু জিরিয়ে নেবে ভাবছে, তখনই দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হল। দিব্যেন্দুর আসাটা ভাবনার মধ্যে না থাকলেও এসেই যখন গেছে তখন সবকিছু শিষ্টাচার দেখিয়ে কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কীই বা করার আছে। উদাসীন থেকে লোকটাকে উপেক্ষা করা যায় হয়তো, কিন্তু তারই বা কী দরকার। দু'-চারটে মামুলি কথা বলে পরিস্থিতিটা সামলে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অনেক দিন ধরে ঘুম হয় না বলছ, ডাক্তার দেখিয়েছ? কী বলে ডাক্তার?

ইনসোমিনিয়ার ওষুধ লিখে দিলেন। ক্যামপোজ আর কী কী সব। কাজ হয় না। দু'-আড়াই ঘণ্টা পরে যে-কে সেই। আর ঘুম আসে না। একটুও আসে না। আমি জানি অসুখটা শরীরের নয়, মনের।

সুদেষ্ণা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, বসো, চা নিয়ে আসি।

বলেই সে ভেতরের ঘরে চলে এল। দুটো ঘরে দু'জনে থাকে। সুদেষ্ণা সামনের ঘরে, মন্দিরা ভেতরের এই ঘরে। ভেতরে বারান্দার পাশে আরেকটা ছোট ঘর আছে। সে-ঘরে স্কুলের মাসিমা সাবিত্রী থাকে। বয়স্কা সাবিত্রী ওদের রান্নাবান্না করে দেয়, ফাইফরমাশ খাটে। সুদেষ্ণা যে কয়দিন থাকবে না সে কয়দিন সাবিত্রী দেখাশোনা করবে মন্দিরার।

মন্দিরা ঘরে বসে টের পেয়েছিল সুদেষ্ণার সেই দিব্যেন্দু এসেছে। দিব্যেন্দুর অনেক কথা সে সুদেষ্ণার মুখে শুনেছে। পরদার ফাঁক থেকে এক ঝলক দেখে নিয়ে কৌতূহলও মিটিয়েছে। সুদেষ্ণা ঘরে ঢুকতেই সে মুখ টিপে হাসল।

সুদেষ্ণা তখন রীতিমতো বিব্রত। বলল, এক কাপ চা বানিয়ে দে না মন্দিরা। চা খাইয়েই বিদেয় করি।

এখুনি দিচ্ছি চা করে। মন্দিরা গেল চা বানাতে।

কিছুক্ষণ পরে চায়ের কাপ আর বিস্কুটের প্লেট হাতে নিয়ে ফের ঘরে ঢুকে সুদেষ্ণা অবাক হয়ে গেল। দিব্যেন্দু চেয়ারে নেই, শুয়ে আছে সুদেষ্ণার বিছানায়। কাছে গিয়ে দেখল শুধু শুয়ে নেই, ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকতে গিয়েও থেমে গেল সুদেষ্ণা। ঘুমিয়ে আছে মানুষটা। অনেক দিন নাকি ঘুমায় না। মায়া লাগে ঘুম ভাঙিয়ে দিতে। একথা তো সত্যি একসময় দিব্যেন্দুর সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনের সম্পর্ক ছিল। সেই দু'বছরকে তো জীবনের ইতিহাস থেকে স্লেটের লেখার মতো মুছে ফেলা যাবে না। মন তো একটু নরম হতেই পারে। সুদেষ্ণা তাকিয়ে ছিল দিব্যেন্দুর মুখের দিকে। যেন রৌদ্রদগ্ধ নিদাঘ দ্বিপ্রহরে পথশ্রান্ত পথিক বিশাল বৃক্ষের ডালপাতার ছায়ার পরম শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে। চলে তো যাবেই দিব্যেন্দু, তার আগে একটু ঘুমিয়ে যদি নেয় তাতে কী এমন অঘটন ঘটবে।

সুদেষ্ণাকে চা নিয়ে ফিরে আসতে দেখে মন্দিরা অবাক গলায় বলল, কী হল? চা খাবে না?

সুদেষ্ণা একটা হতাশ ভঙ্গি করে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে। গিয়ে দেখলাম আমার বিছানায় অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। অনেকদিন নাকি ঘুমায় না।

মন্দিরা বলল, আহা, ঘুমাক না।

যদি সারারাত ধরে ঘুমায়?

ঘুমাবে। তুই এ-ঘরে থাকবি। অসুবিধের কী আছে।

সুদেষ্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, অসুবিধেটা অন্য জায়গায়। ঘরের আলমারিতে রুনুর বিয়ের দশ হাজার টাকা রাখা আছে। চার বছর লোকটার কোনও খবর রাখি না। তাই বড় চিন্তা হচ্ছে রে। ও ঘুমাবে, আমি কিন্তু সারারাত ঘুমাতে পারব না।

মন্দিরা কী জবাব দেবে বুঝে পেল না।

সবুজ রঙের শাড়ি

আঠাশে ফেব্রুয়ারি শনিবার। ছুটির দিন। তাই আজ সাতাশ তারিখে মাইনের টাকা হাতে আসবে। মাইনের দিন তেমন কাজ থাকে না। কাজ কি আর থাকে না, কাজ করে না কেউ। মাইনের টাকাটা হাতে পেতে পেতেই দিন গড়িয়ে বাড়িমুখো মন। সুধাময় ঘড়িতে সময় দেখলেন। তিনটে বেজে তিরিশ মিনিট। চারটে বাজলেই গুটিগুটি বেরিয়ে পড়বেন। এই আধঘণ্টা একটু জিরিয়ে নেবেন বলে সুধাময় চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন।

পাশের টেবিলের পরেশবাবু চেয়ারে নেই। তার টেবিলে একটা বাংলা খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখা। হাত বাড়িয়ে সুধাময় কাগজটা টেনে নিলেন। প্রধান প্রধান খবরগুলোতে চোখ বুলোতে গিয়েই আজকের তারিখে চোখ থেমে গেল। আজ ২৭ ফেব্রুয়ারি। বাংলা ১৪ ফাল্গুন। ১৪ ফাল্গুন তারিখটা খুব চেনাচেনা মনে হল। কী যেন, কী যেন, ভাবতে গিয়েই একটা কথা তাঁর মনে এসে গেল। ১৪ ফাল্গুন তাঁর বিয়ের দিন না? হ্যাঁ, তাই তো। তাঁর বিয়ের তারিখই তো। প্রথম প্রথম দু'-তিন বছর এই তারিখটা রীতিমতো পারিবারিক উৎসবের চেহারা নিত। তারপর সংসারের আর পাঁচটা বাতিল জিনিসের দলে চলে গেছে। এখন ১৪ ফাল্গুন কবে এল, কবে চলে গেল, কারুর খেয়ালই থাকে না। না সুধাময়ের, না মিনতির। কিছুদিন পরে হয়তো ভুলেই যাবে কী হয়েছিল ১৪ ফাল্গুন। এই আজই যেমন হয়েছে। ধন্দ থেকে ভাবা, ভাবা থেকে মনে পড়া।

কত বছর হল বিয়ের? সুধাময় মনে মনে হিসেব করেন। ধ্রুব হয়েছিল বিয়ের ঠিক দু'বছরের মাথায়। ধ্রুবর এখন বাইশ চলছে। বাইশ আর দুয়ে চব্বিশ। তার মানে চব্বিশ বছর হল বিয়ের। এত তাড়াতাড়ি সবকিছুর বিকেল হয়ে গেল? সুধাময়ের মনে হল এতদিন এসব নিয়ে কিছুই ভাবেননি। চোখে ঠুলি পরে শুধু সরলরেখা ধরে চলেই গেছেন। একবারও ফিরে তাকিয়ে দেখেননি পেছনে কী উজ্জ্বল সময়গুলো ফেলে আসছেন। অথচ চব্বিশ বছর জীবনকে দেউলিয়া করে দেবার মতো কোনও বিরাট সময় কি? মিনতির বয়েস কত হল? হিসেব করে দেখলেন বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের মতো হবে। কিন্তু এর মধ্যেই বয়সের হিংস্র থাবা তার জীবন থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই ফরসা, সুঠাম হাসিখুশি মেয়েটিকে কিছুতেই এখনকার হৃতশ্রী খিটখিটে মহিলার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুধাময়ের বুক থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস বেরিয়ে এল। আসলে যে-সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য মিনতিকে তৃপ্ত করতে পারত, তার কিছুই তিনি তাকে দিতে পারেননি। ঘিঞ্জি পাড়ার মধ্যে তিন-চারটে ছোট্ট ঘর, মাস মাইনের গোনাগুনতি টাকা, কোনওরকম জীবন নির্বাহ মতো মাপা সংস্থান ছাড়া আর কী দিয়েছেন তিনি। ফাল্গুন মাসের ১৪ তারিখ মিনতির জীবনে কোনও স্মরণীয় ব্যতিক্রম হয়ে আসে না, সংসারের ধুলোময়লার মধ্যে কোথায় হারিয়ে থাকে দেখাই যায় না।

সুধাময় কাগজটা ভাঁজ করে ফের রেখে দিলেন পরেশবাবুর টেবিলে। কাগজের একটা অক্ষরও তিনি পড়েননি। কাগজে আজকের বাংলা তারিখটা পড়ার পর কিছুতেই তিনি সুস্থিত হয়ে থাকতে পারছিলেন না। কবেকার হারিয়ে যাওয়া কোনও জিনিস হঠাৎই খুঁজে পেয়ে ভারী উতলা লাগছিল নিজেকে। মিনতির কথা বারবার মনে হচ্ছিল। আজ মিনতির খুশি মুখ দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সুধাময়ের।

অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তার একপাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সুধাময়। তাঁর সামনে কর্মব্যস্ত

শহর। মানুষের কোলাহল, চলাফেরা, বহমান জীবন। এর মধ্যে তো তিনিও আছেন। একইসঙ্গে নিশ্বাস এবং প্রশ্বাস নিচ্ছেন, একই সুখ দুঃখের শামিল হচ্ছেন। সত্যিই তো সবকিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি। নতুন করে হয়তো কিছু শুরু করা যাবে না, কিন্তু পুরনো জিনিসগুলো থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে নিলে খুব চকচকে না দেখালেও একটু তো উজ্জ্বল দেখাবেই। সুধাময় টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে শূন্যে হাত-পা ছুড়ে শরীরের আড় ভাঙলেন। বাড়িতে যাবার বাস আসছে।

বাস থেকে নেমে গলিতে ঢুকলেন না সুধাময়। গলির মুখ থেকে সামান্য দূরে বসু বস্ত্র বিপনি। শাড়ি কাপড়ের চালু দোকান। একটু ভাবলেন, তারপর সেই দোকানেই ঢুকলেন সুধাময়। এ-মাসে বেতনের সঙ্গে বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা পেয়েছেন দেড়শো টাকার মতো। মনে একটু সাহসও পেলেন। ঠিক করলেন ওই বাড়তি টাকার মধ্যে মিনতির জন্যে মোটামুটি একটা ভাল শাড়ি কিনবেন। মেয়েদের পছন্দের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকলেও তাঁর মনে আছে হালকা সবুজ রংটাই মিনতি বেশি পছন্দ করত। আজ এত বছর পরে সে রং ফিকে হয়ে গেছে কিনা কে জানে, কিন্তু সেসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালেন না সুধাময়। এ-শাড়ি ও-শাড়ি দেখতে দেখতে একটা কচিকলাপাতা রঙের শাড়ি পছন্দ হয়ে গেল তাঁর। নাড়াচাড়ি করে বুঝলেন শাড়ির জমিও ভাল। ঠিক করলেন এ-শাড়িটাই কিনবেন। দোকানের মালিক পরিচিত মানুষ। একশো সত্তর টাকা দামটাকে একশো চল্লিশে পেয়ে গেলেন। শাড়িটা ভাল করে কাগজে প্যাক করে দিল দোকানের কর্মচারী। সুধাময় সেটা তাঁর ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলেন।

বাড়িতে ঢোকার সময় মনের জোর কিছুটা কমে এল, কিন্তু মনটা ছেলেমানুষই রয়ে গেল। ভাবলেন এখনই নয়। একটু পরে সুযোগমতো মিনতিকে চমকে দেবেন। আহা, সারাদিন সংসারের হাজারটা ঝামেলা সামলাতে সামলাতে বেচারা শরীর স্বাস্থ্য মনমেজাজ সব হারিয়ে ফেলেছে। আজ শাড়িটা তার গুমোট জীবনে একটু টাটকা হাওয়া উড়িয়ে আনুক না।

সুধাময় সময় পেলেন হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়াদাওয়ার পর। আজ বাড়িতে মাইনের টাকা এসেছে। ভারী মুখগুলো একটু নরম থাকে আজ। মিনতি আজ ততটা সরব নয়। সাবলীলভাবেই চলছে ফিরছে, কথাবার্তা বলছে।

এ-সময় ছেলে ধ্রুব বাড়িতে থাকে না কোনওদিনও। আজও নেই। মেয়ে রীতা অন্য ঘরে কী একটা কাজে যেন ব্যস্ত। সুধাময় খাটের ওপর আরাম করে বসে পান চিবোচ্ছিলেন। একটু পরে মিনতি ঘরে ঢুকল।

সুধাময় বললেন, একটু কাছে এসে দাঁড়াও তো।

মিনতি একটু অবাক হয়ে বলল, কাছে এসে দাঁড়াব? কেন বলো তো?

আহা, যা বলছি তাই করো না।

ব্যাপারটা মিনতির ঠিক বোধগম্য হল না। তবু সে খাটের সামনে এসে দাঁড়াল।

এবার চোখ বন্ধ করো।

মিনতি বলল, এ আবার কী ঢং শুরু করলে? খামোকা চোখ বন্ধ করতে যাব কেন?

আহা করোই না বন্ধ।

সরু চোখে মিনতি সুধাময়কে তাকিয়ে দেখল একটু সময়। তারপর পেছনে তাকিয়ে দেখল কেউ আছে নাকি। বলল, বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে নাকি?

কিস্যু ধরেনি। তুমি শুধু চোখ বন্ধ করে দু'হাত বাড়াও। কী ভেবে মিনতি চোখও বন্ধ করল, হাতও বাড়াল। অমনি সুধাময় পেছনে লুকিয়ে রাখা শাড়ির প্যাকেটটা ঝপ করে মিনতির হাতে দিয়ে বললেন, নাও, এবার চোখ খুলতে পারো।

মিনতি চোখ খুলে প্যাকেটটা দেখে বলল, এটা কী? কী আছে এতে?

খুলে দেখলেই বুঝতে পারবে।

মিনতি ঝটপট প্যাকেটটা খুলে ফেলে শাড়িটা দেখে ভয়ানক অবাক হয়ে বলল, শাড়ি? কার?

সুধাময়ের মুখে মিটিমিটি হাসি। পা নাচাতে নাচাতে বললেন, তোমার।

মিনতি আরও অবাক, আমার? কে দিল?

আমি ছাড়া আর কে দেবে।

মিনতি ভাঁজ খুলে উলটেপালটে শাড়িটা দেখতে দেখতে বলল, তুমি কিনে এনেছ শাড়িটা?

সুধাময় বললেন, আজ বাংলা মাসের কত তারিখ মনে আছে? ১৪ ফাল্গুন। আজ আমাদের বিয়ের দিন গো।

মিনতির মুখের কোনও ভাবান্তর হল না। তীব্র গলায় বলল, মাইনের টাকা দিয়ে তুমি শাড়িটা কিনে এনেছ?

সুধাময় সতর্ক হয়ে গেলেন। কালো মেঘ উঠে আসছে আকাশে। ঝড় উঠবে। দুর্বল গলায় বললেন, না, মানে, ডি-এর বাড়তি টাকাটা পেলাম তো এ-মাসে। ওই টাকাতেই।

বিস্ময়ে হতবাক মিনতি একটু সময় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুধাময়ের দিকে। তারপর খরখরে গলায় বলল, তোমার লজ্জা লাগে না? ছেলেটার এখনও চাকরি হল না, মেয়েটাও বাড়ি বসে আছে, আর তুমি কিনা রংচঙে শাড়ি কিনে এনে বুড়ো বয়েসে পিরিতি দেখাতে এসেছ! ছি ছি, ছেলেমেয়ে দুটো জানলে কী ভাববে! সংসারের সব অভাব কি মিটে গেছে যে বাড়তি টাকা নয়ছয় করে এলে? বুদ্ধি বিবেচনা কি তোমার কোনওদিনই হবে না?

সুধাময় মিনমিন করে বলতে গেলেন, তা বলে একটুআধটু শখ আহ্লাদ—।

মিনতি শাড়িটা বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল. নিকুচি করেছে তোমার শখ আহ্লাদের। এই রইল তোমার শাড়ি, আমি মরলে ঘটা করে পরিয়ে দিয়ো।

আর দাঁড়াল না মিনতি। চোখে কাপড় চাপা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অভ্যাসমতো অবশ্য চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলল না। ব্যাপারটা জানাজানি হোক, এটা সে চাইল না। হলে সেটা নিঃসন্দেহে তাঁকে ভারী লজ্জায় ফেলে দেবে।

সুধাময় গুম হয়ে বিছানায় বসে রইলেন। খুবই দুঃখ পেলেন মনে মনে। কী চেয়েছিলেন আর কী হয়ে গেল। আসলে ভুল তাঁরই হয়েছে। বিয়ের তারিখটা বছর বছর ফিরে এলেও বিয়ের বছরটা কোনওদিনও ফিরিয়ে আনতে পারবেন না তিনি। সময়ের নদী সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বয়েস, শরীর, মন, সবকিছু। চব্বিশ বছর সুধাময়ের মতো আটপৌরে মানুষের জীবনে অনেক ক্ষত তৈরি করে দিয়েছে। সেগুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না কিছুতেই। সুধাময়ের বুকের মধ্যে চৈত্রদিনের শূন্য মাঠ ধু-ধু করে উঠল।

একসময় কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের বাইরে ছিলেন সুধাময়। ফিরে এসে দেখলেন শাড়িটা বিছানার ওপর নেই। কারুর চোখে পড়ার আগেই কোনও সময় ঘরে এসে মিনতি সরিয়ে ফেলেছে। সবাই জানুক সংসার যেমন ছিল তেমনিই আছে। কেউ কোনও ভুল করেনি। কোণ-কোনচির অন্ধকার জায়গাগুলো তেমনি অন্ধকার হয়েই আছে। কোনও আলো এসে অন্ধকার কমিয়ে দেয়নি। নিঃশব্দে রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে সুধাময় ঘরের সামনের এক টুকরো বারান্দায় এসে বসলেন। আলো জ্বালালেন না। অন্ধকারের মুখোমুখি হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে। বারান্দা থেকে একটু দূরের রাস্তাটার সামান্য অংশ দেখা যায়। অনেক রাত হয়েছে। রাস্তার লোক চলাচল কমে গেছে। আশেপাশের বাড়িগুলোর জানলা বন্ধ হয়ে গেছে, আলো নিভে গেছে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি এখন। রাত বাড়লে শীতও বাড়ে। সবকিছু থেমে যায়। চুপচাপ হয়ে যায়। কোথা থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসছিল। সুধাময় গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। আর বেশিক্ষণ বসে থাকা যাবে না। ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

এ-বাড়ির তিনটে ঘরের একটাতে শোয় ছেলে ধ্রুব, মাঝের ঘরে মিনতি আর মেয়ে রীতা, বারান্দা সংলগ্ন ঘরে সুধাময়। শীতের রাত। সবাই শুয়ে পড়েছে আগেই। সম্ভবত এখন ঘুমিয়েও পড়েছে। কেবল তিনিই এখনও বিছানায় যাননি। আরও বেশিক্ষণ অন্ধকার বারান্দায় বসে

থাকবেন। ভারী মন খারাপ হয়ে গেছে তাঁর। আজ এই ১৪ ফাল্গুন তারিখটাকেও তিনি কিছুতেই অন্য সব দিনের থেকে আলাদা করতে পারলেন না। তাঁর সামান্য একটা ইচ্ছেকেও মিনতি কোনও মূল্য দিল না।

খুট করে শব্দ হল। জ্বলে উঠল বারান্দার আলো। সুধাময় তাকিয়ে দেখলেন মিনতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আর, কী আশ্চর্য, পরে আছে সেই কিনে আনা সবুজ রঙের শাড়িটাই। মুখে লজ্জা পাওয়ার হাসি। বলল, ভাইবোন দু'জনেই এখন ঘুমোচ্ছে। তাই—।

সুধাময় কী বলবেন। শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন মিনতিকে।

পরনের শাড়িটা দেখতে দেখতে মিনতি বলল, কী সুন্দর রং না শাড়িটার? খুব সুন্দর হয়েছে। কই, বললে না তো আমাকে কেমন মানিয়েছে?

বিস্মিত সুধাময়ের মুখে তবু কথা আসে না। চুপ করে থাকেন তিনি।

আর সেই চুপ করে থাকার জন্যেই বুঝি মিনতির মুখে অভিমান ঘনাল। মুখভার করে বলল, জানি, বুড়ি বয়সে এ-শাড়ি মানাবে না। তবু তুমি কিনে আনতে গেলে কেন? বলো আনতে গেলে কেন?

সুধাময় কিছু বলবেন বলে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু কী বলবেন ভেবেই পান না। মিলন বিরহের এ রহস্যের কোনও কূলকিনারা পান না।

সন্ধ্যার মেঘমালা

কী কারণে যেন অনেকক্ষণ ধরে ফেরার বাস আসছে না। অনুপম শেয়ালদার উড়ালপুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে মাঝেমাঝেই হাতঘড়িতে সময় দেখছিলেন। আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। এ-সময়ের কলকাতার হাল হকিকত এইরকমই। হয়তো কোথাও অবরোধ কিংবা দীর্ঘ মিছিলে রাস্তা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আজকাল আবার কেউ গাড়ি চাপা পড়লেই গাড়িটাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে কিছু মানুষ। আসলে আজকাল নিয়ম ভাঙাটাই কলকাতার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কারণেই এই অস্থির অগোছালো শহরে অনুপম আসতে চান না। আজ শেয়ালদা স্টেশনে এসেছিলেন ভাগনে সুমিতকে গাড়িতে তুলে দিতে। সুমিত তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসে জলপাইগুড়ি ফিরে যাচ্ছে। তাকে তুলে দিয়ে ফ্লাইওভারের উত্তর দিকের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সোদপুরে ফিরবেন বলে। দরজার অদূরে শীত দাঁড়িয়ে। ঋতু পরিবর্তনের এ-সময়টা ইদানীং শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে। বয়েস তো থেমে নেই। ভেবেছিলেন বিকেলের অনেক আগেই সোদপুরে ফিরে যাবেন। কিন্তু বাসের না-আসাটা সবকিছু অনির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

অনুপম অপ্রসন্ন হচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেল বাসের দেখা নেই। কখন আসবে কে জানে। অনুপম পেছনের দোকানগুলোর দিকে তাকালেন। সামনেই একটা চায়ের দোকান। মোটামুটি ভালই মনে হল। দোকানে বসে অনেককাল চা খাননি। অধ্যাপনার দিনগুলোতে তো নয়ই। ভাবলেন আজ দোকানে বসে এক কাপ চা খাবেন। এক কাপ চা আর একটা সিগারেট সময়টাকে কিছুটা ছোট করে আনবে। বাস এলে দোকানে বসেই দেখতে পাবেন।

তিনি চায়ের দোকানে যাবেন বলে ঘুরেছেন। দেখলেন ছোটখাটো একটা ভিড় দাঁড়িয়ে গেছে বাস ধরার জন্যে। উত্তর দিক থেকে বাস আসছে। কিন্তু উত্তর দিকে যাবার বাস নেই। অপেক্ষমান লোকগুলোর মধ্যে কোনও তীব্র অসন্তোষ আছে বলে মনে হল না। এই অনিয়মবর্তিতা এখন মানুষের অভ্যাসের রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। অনুপম অনেক দিন পরে পরে কলকাতায় আসেন বলে অভ্যাসটা তাঁর হয়নি।

এক পা এগিয়েই অনুপম থেমে গেলেন। তাঁর মুখোমুখি এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। অনুপমের দিকে চেয়ে থাকা তাঁর মুখের ভাষাই বলে দিচ্ছে তিনি অনুপমের খুব পরিচিত। অনুপম ভদ্রমহিলার মুখের দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে থাকতেই দীর্ঘদিন অদর্শনের কুয়াশা কেটে গেল। কী আশ্চর্য, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সুতপার মুখোমুখি। বুকের মধ্যে তখনই গুমগুম করে উঠল ভরা বর্ষার গর্ভিণী মেঘ। আবছাভাবে হাসতে চাইলেন তিনি।

সুতপা বললেন, খুব অবাক লাগছে, তাই না? চিনতে তো সময় লাগল।

অনুপমের হাসিটা এবার কিছুটা স্বচ্ছ হল। বললেন, তা লাগল। তবে চিনতে নয়, ভাবতে। অনেকদিন বাদে তো। তুমি এখানে?

তুমি যেজন্যে দাঁড়িয়ে আছ। বাস ধরব বলে।

অনুপম অনেকটা সহজ হয়ে গেছেন এখন। বললেন, অনেকক্ষণ বাস নেই। কোথা যাবে তুমি?

সোদপুরে না। আমার অন্য বাস। ব্যারাকপুরের। আমার ঠিকানা এখন ওটাই।

তা হলে ব্যারাকপুরের বাপের বাড়িতেই সুতপা আছে এখন। কিন্তু সোদপুরে যে একটা ছোটখাটো বাড়ি বানিয়ে অনুপম থাকেন এখন, সুতপা জানল কেমন করে? অবশ্য জানাটা খুব কঠিন

কিছু নয়। খোঁজখবর রাখার মতো সূত্রই তো আছে। অথচ অনুপমের কাছে এই সুদীর্ঘকাল কোনও খবরের মধ্যেই নেই সুতপা। সেই অনুযোগ কি সুতপার কথার মধ্যে ছিল? কে জানে! আসলে স্পর্শকাতর অনুভূতিগুলোকে বয়েসের সঙ্গেই অনেক পেছনে ফেলে এসেছেন তিনি। প্রায় সাতাশ বছর পরে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়েসের উষ্ণ সময়ের উত্তাপ কেমন করে থাকে এই প্রবীণ বয়সে।

সুতপা বললেন, বাসে কেন, ট্রেনেই তো যাওয়া সুবিধা ছিল তোমার?

অনুপম অন্যমনস্ক গলায় উত্তর দিলেন, স্টেশন থেকে অনেকটা দূরে বাড়ি তো। বাস একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। তুমিও তো ট্রেনে যেতে পারতে?

পারতাম। কিন্তু শ্যামবাজারে একটা কাজ সেরে যেতে হবে। সুতপার মুখে সকৌতুক হাসি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে বলেই হয়তো ট্রেন ধরিনি।

অনুপমের মুখের হাসিটা চওড়া হল একটু।

দু'জনে ফুটপাথে অনেক লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে লোকজন যাওয়া-আসা করছে। সুতপাকে সামান্য একটু সরে দাঁড়াতে হয়েছিল; আবার কাছে এসে বললেন, বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, মনে হল সামনের মানুষটা তুমি। কাছে এসে দেখলাম ঠিক তাই।

সুতপা সাবলীল, তাই নিজেকেও হালকা করে নিতে পারলেন অনুপম। সময়ের ব্যবধানটা কাউকেই অনেক দূরের মানুষ করে দেয়নি। স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে কোনও অসুবিধে নেই।

কিন্তু ফুটপাথে বাসের জন্যে অপেক্ষায় দাঁড়ানোর এই সংক্ষিপ্ত জায়গায় কি কথা বলা যায়! সব কথা বাইরে বাইরেই থেকে যাবে। দু'-চারটে ছুটছাট সৌজন্যমূলক কথা, তারপরে বাস এসে যাবে, তারপরে দু'টি আলাদা গন্তব্য হয়ে যাবে দু'জনের। আবার কখনও এমন চকিত দেখা না-ও হতে পারে। অনুপম তাকালেন সুতপার আশেপাশে।

তুমি একা? নাকি সঙ্গে কেউ আছে?

সুতপা ক্লান্ত হাসল, কে আর থাকবে। একাই। অসুবিধে হয় না।

শেয়ালদায় এসেছিলে?

এন আর এস-এ। ভাই ভরতি আছে।

তোমার ভাই? গৌতম? কী হয়েছে?

যাক। গৌতমকে তা হলে এখনও মনে আছে।

বললে না কী হয়েছে গৌতমের।

ভয়ের কিছু নয়। এখন পুরো সুস্থ। যা ভেবেছিলাম তেমন কিছু নয়। দু'-একদিনের মধ্যে ছেড়ে দেবে। তুমি কেন?

সুমিতকে মনে আছে তোমার? মিলির ছেলে? জলপাইগুড়ির?

ওমা, মনে থাকবে না কেন?

সুমিত সোদপুরে এসেছিল। আজ চলে গেল তিস্তা-তোর্ষায়। অনুপম রাস্তার দিকে তাকালেন, কিন্তু বাসের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। কখন আসবে কে জানে।— ভাবছি কোথাও একটু বসে এক কাপ চা— সময় হবে তোমার?

সময়? সুতপাকে বড় দুর্বল দেখাল, আমার কাছে সময় চাইছ তুমি?

সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে অনুপম বললেন,'না, মানে, তাড়াও তো থাকতে পারে।

সুতপা সামনের দোকানটা দেখলেন। পছন্দ হল না মনে হয়। বড় বেশি খোলামেলা দোকান। বললেন, একটু দূরে একটা ভাল দোকান আছে। ওখানেই চলো। সময় আর কতক্ষণ পাওয়া যাবে। বাস চলে আসতে পারে।

দোকানের দিকে যেতে যেতে অনুপম বললেন, প্রথম বাসটাই ধরতে হবে? দেরি করা যাবে না?

সুতপা সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, বেলা থাকতেই ফিরতে পারলে ভাল হয়। আজকাল সন্ধের দিকে একটু টানের মতো হয়।

একটু চুপ করে থেকে অনুপম বললেন, আমারও প্রথম বাসটা ধরলেই ভাল হয়। শরীরে এটা সেটা লেগেই আছে। বয়স তো কম হল না।

সুতপা বললেন বাষট্টি। আমার সাতান্ন। আমিও থেমে নেই। এই যে সামনের দোকানটা। মালঞ্চ কেবিন। একদিন কার সঙ্গে চা খেয়েছিলাম যেন— বোধহয় গৌতমই। কেবিন আছে।

দু'জনেই পা চালিয়ে চলে এলেন মালঞ্চ কেবিনে। বাস না-আসা পর্যন্ত যতটুকু সময় পাওয়া যায়, ততটুকু সময়ই দু'জনের একসঙ্গে থাকা। ফেরার তাড়া দু'জনেরই। প্রথম বাসটা ধরতে পারলেই ভাল হয়। স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্কটা এখন বিচ্ছিন্ন ইতিহাস। শিষ্টাচারমাত্র। পেছনের কোনও ধারাবাহিকতা নেই। তবু ভারী অবাক হলেন অনুপম। একটুও সময় না-নিয়ে সুতপা তাঁর বয়েস ঠিকঠাক বলে দিল। ভেবেছিলেন অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছে সুতপা। বয়সের থাবা শুধু শরীরেই আঁচড় কাটেনি, মনেও আঁকিবুকি কেটেছে অনেক। সাতাশ বছর আগে ছেড়ে-আসা সম্পর্কের সব ছায়াই অপসৃত হয়েছে জীবন থেকে। ভুল, ভুল। অনুপম নিজেও কি ভুলে গেছেন জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়গুলোকে? স্লেটে চকখড়ির লেখা, মুছে দিলাম, ব্যস আর কিছু রইল না— তা তো নয়। স্মৃতি তো দ্বিতীয় শরীরের নাম।

ভাবলে এখনও ব্যাপারটা ভারী ছেলেমানুষি মনে হয় অনুপমের। সুতপার সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ির পেছনে বস্তুগত কারণ যতটা ছিল, সম্ভবত তার চেয়ে বেশি ছিল আবেগপ্রবণ বয়সের অন্তর্ঘাত। বিয়ের বহুদিন পরেও তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে দুর্ভাগ্যকে জীবনের অন্যতম শর্ত হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন দু'জনেই। তবু কোথায় যেন একটা চোরা শূন্যতা ক্রমশই সীমানা বাড়াচ্ছিল। শেষে এমন হল কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছিলেন না। উচ্চশিক্ষা দু'জনেরই ছিল। অনুপম কলেজে আর সুতপা স্কুলে পড়াতেন। সেই কারণেই বোধহয় রুচিবোধ আর জীবনযাত্রার দুটো আলাদা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত অনিবার্য হয়ে পড়ল ছাড়াছাড়ি। কোনও আইনি আদেশ ছাড়াই দু'জনে দু'পাশে সরে গেলেন। এখনও অনুপমের মনে হয় একটু ধৈর্য ধরতে পারলেই, একটু মেনে নিতে পারলেই, সংকটা এড়ানো সম্ভব হত। কোনও গুরুতর কারণ ছিল না, কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই ছাড়াছাড়িটাই দিন মাস বছর পার হতে হতে সাতাশ বছর পার হয়ে গেছে। সেই যে অবুঝ খেলাটা শুরু হয়েছিল, এখনও শেষ হল না।

রেস্তোরাঁর কেবিনে মুখোমুখি বসলেন দু'জনে। কেবিনের জানলার কাচের বাইরে দেখা যাচ্ছে চলমান শহরকে। ফেরার বাস এসে গেলে দু'জনেই দেখতে পাবেন।

রেস্তোরাঁর কর্মচারী কেবিনে ঢুকলে অনুপম বললেন, দুটো টোস্ট, দুটো চা।

সুতপা বললেন, একটা চা চিনি-দুধ ছাড়া শুধু লিকার।

অনুপম তাই-ই খান। বিয়ের আগে থেকে সুতপার ঠিক খেয়াল আছে। অনুপমের চোখ দুটোতে শান্ত হাসি। তিনি চাইলেন সুতপার দিকে। স্কুল থেকে সম্ভবত অবসর নিয়েছে। সুতপার এক আত্মীয়ার সঙ্গে বেশ কিছুদিন আগে দেখা হয়েছিল, তার মুখে সুতপার কথা শুনেছিলেন। অনুপম যেমন, সুতপাও তেমনি জীবনের সঙ্গে আর কোনও বিড়ম্বনা জড়ায়নি।

কিছুটা সময় দু'জনেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন। নীরবতা ভাঙলেন অনুপমই। কেমন আছ?

সুতপা ম্লান হাসলেন, এতক্ষণ পরে জানতে চাইছ? তুমি যেমন আছ, আমিও তেমনি আছি। প্রথম প্রথম অসুবিধে হত। একা একা লাগত। এখন হয় না। তোমার কথা বলো।

আমার আবার কী কথা। রিটায়ার করে সোদপুরে একটা ছোট বাড়ি করেছি। একাই থাকি। একজন সবসময়ের লোক আছে। মাঝেমাঝে বোনেরা, ভাগনেরা এসে থাকে।

দিব্যি আছ।

তাই কি? অনুপম হাসলেন, আসলে কী জানো, সবকিছুই অভ্যেসের ব্যাপার। একা থাকা দোকা থাকা, সব।

সুতপা রাস্তার দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না। অনুপম দেখলেন দক্ষিণ দিক থেকে এতক্ষণে বাস আসা শুরু হয়েছে। স্বভাবতই ভিড়ে ঠাসা। সুতপা কি মনে মনে ছটফট করছে! শ্যামবাজারের কাজ সেরে ব্যারাকপুর, অনেকটা যেতে হবে তাকে। টেবিলে দু'জনের জন্যে চা আর টোস্ট দেওয়া হয়েছে। সুতপা চায়ের কাপে এখনও চুমুক দেয়নি, টোস্টেও হাত দেয়নি। একটু দূরমনস্ক লাগছে তাকে।

অনুপম বললেন, দেরি করিয়ে দিচ্ছি না তো তোমার? সুতপা মাথা নাড়লেন, না না। ভালই তো লাগছে।

দেরি হয়ে গেলে তোমার অসুবিধা হবে। সন্ধের দিকে শ্বাসকষ্ট হয় বললে।

সবদিন হয় না। মাঝেমাঝে। আর আজ হলই বা। অনুপম কিছু বললেন না। উদাসীন চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাস্তা খুলে গেছে। বাস আসছে। বাসের নম্বর দেখতে পাচ্ছেন। তাঁরও তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। ঋতু পরিবর্তনের সময় যাচ্ছে। জামার ওপরের ঘরের বোতামদুটো আটকে নেবেন ভাবলেন। শেষপর্যন্ত আটকালেন না। বোতাম আটকানোটা বড় স্বার্থপরের মতো দেখাবে। মনে হবে এই সময়েও অনুপম নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না। চা-ও নয়।

চা? সুতপা যেন অনেক দূর থেকে ফিরে এলেন, ও হ্যাঁ চা-টা তো জুড়িয়ে গেল। বলে চায়ের কাপটা ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। একটু চুমুক দিয়ে আবাব নামিয়ে রাখলেন। কথা বললেন না কিছু।

অনুপমও চুপ করে রইলেন। যেটুকু বলা যায়, তার সবই তো বলে ফেলেছেন। সাতাশ বছর পরে জীবনের উপান্তে এসে এখন সুখ দুঃখ, রাগ অভিমানের কোনও কথাই বযেসের সঙ্গে মানাবে না। আবার কাছে ডেকে আনা— সেও তো পুরনো আসবাবে নতুন করা রঙের মতো আলগা আলগা হয়ে থাকবে। কী হবে সাতাশ বছরের নিয়মটা বদলে দিয়ে। এতটা পথ একা একা হেঁটে এসে আবার পিছিয়ে গিয়ে নতুন করে তো তেমন কিছু পাওয়া যাবে না। এই তো বেশ আছেন। গোধূলির মায়াবী আলোয় শান্ত স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকা।

একসময় রেস্তোরাঁ থেকে উঠতে হল দু'জনের। বেশি সময় বসে থাকা শোভন দেখাবে না। অনুপম রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছে আবার পরলেন। সুতপা শাড়ির আঁচল টেনে ঠিক করে নিলেন। এবার যেতে হবে। চা টোস্টের দাম অনুপমই দিলেন। সুতপা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। অধিকার প্রয়োগেব ক্ষেত্রে আগের মতোই অনুপমকে এগিয়ে রাখলেন। রাস্তায় এসেই সুতপা সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার বাস আসছে। এটাতেই যাই, কী বলো?

অনুপম হাসলেন, বললেন, তোমার যাবার একটা বাস কিন্তু আগেই চলে গেছে। বলিনি তোমায়।

সুতপাও হাসলেন, তাই নাকি? তোমারও একটা বাস চলে গেছে একটু আগে। আমিও বলিনি তোমাকে। বাস এসে থামল। সুতপা বললেন, আমি আসি। সুতপার বাস ছেড়ে দিল। অনুপম দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর যাবার দ্বিতীয় বাসটার জন্যে অপেক্ষা করে। একা একা। কিন্তু অনুপম জানেন তিনি কখনই একা নন। একঘরে না থাকলেই কি কাছে থাকা হয় না। তাঁর চারপাশে সুতপার জন্যে যে শূন্যতা সবসময় অনুভব করেন, সে শূন্যতাও তো অস্তিত্বময়। অনুপম রুমাল দিয়ে ফের চশমার কাচ মুছলেন, ফের পরলেন। তারপর প্রশান্ত মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন তাঁর বাসের জন্যে।

ক্রান্তিকাল

রেডিয়োর আবহাওয়া-সংবাদে বলা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে এবং কোথাও কোথাও মুষলধারে বৃষ্টি হবে। বলা ছিল না সে মুষলধারা আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে অবিরাম, অনর্গল হয়ে থাকবে, থামবে না কখনও, দিনে আলো নিভে গিয়ে সকাল, দুপুর, বিকেল একরঙা হয়ে থাকবে। দু'দিন, দু'রাত্রি পরে বৃষ্টি পড়া থামলে দেখা গেল চেনা জায়গাটা উধাও হয়ে গেছে। কোথাও মাটি ঘাস সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। চারধারে খলবল করছে শুধু জল আর জল। নদীনালা উপচে বাঁধনছাড়া উল্লাসে একসমুদ্র জল বিঘে বিঘে ফসলের জমি ডুবিয়ে, কুঁড়েঘরের বাঁশবাখারির কাঠামো ভেঙে, সবজিবাগান তছনছ করে ছুটে চলেছে। দেখতে দেখতে গেরস্তের উঠোন ডুবিয়ে দুর্বিনীত জল এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। যা ছিল কিছুটা কৌতূহল মেশানো অঘটন, এবার তা হয়ে গেল বিস্ফারিত আতঙ্ক। এ তো শুধু জল বাড়া নয়, শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, এ যেন এক উন্মাদিনী রাক্ষসী সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে আলুলায়িত কেশে ধেয়ে আসছে। জল আরও বাড়লে সংকটটা দাঁড়িয়ে যাবে আজন্ম স্থিতিশীলতার। ঘর ভাঙবে, ভিটে ডুববে। প্রাণ বাঁচাতে যেমন করে হোক ঘরদোর ছেড়ে অন্যত্র পালাতে হবে। আর দেরি নয়। এখুনি চাল, ডাল, বিছানা, বালিশ, জামা, জুতো সব ফেলে উঁচু জায়গায় চলে যেতে হবে।

আগেরবার বন্যা হয়েছিল হঠাৎই কোনও আগাম সংকেত না দিয়ে। সেটা ছিল আটষট্টি সালের অক্টোবরের চার তারিখের রাত। সে ঘটনাকে কেউ অবশ্যি নিছক ভয়াবহ বন্যা বলে মনে রাখেনি। মনে রেখেছে এক মহাপ্রলয়ের ঘটনা হিসেবে। সেবার পূর্ণগর্ভিনী এক পাহাড়ি নদী গতিপথ বদলে জলপাইগুড়ি শহর আর দোমহনীর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। তিস্তা নদীর দামাল জল দু'টি জায়গার ভূগোল রাতারাতি বদলে দিয়েছিল। এই দোমহনী হয়ে গিয়েছিল তিস্তার চর অঞ্চল। কত মানুষ, গোরু, মোষ, ছাগল, কুকুর মরেছিল তার হিসেব রাখেনি কেউ। এবারও কি তাই হতে চলেছে? নদীকে শাসন করার জন্যে যে মাটির বাঁধ দেওয়া হয়েছে, সেই বাঁধ টপকে জল এসে মানুষের ঠিকানা বদলে দেবে কি? স্মৃতিতাড়িত মানুষের চোখে বন্যার জল দুঃস্বপ্নের ঘোর এনে দিল। ভয়ে ছমছম করে উঠল বুক। কোনও সবুর করার সময় আর নেই। এইবেলা পালাও।

শুধু এই জল বাড়ার জন্যেই নয়, মণিমোহন কিংবা সুরমার উৎকণ্ঠা তাঁদের মেয়ে রত্নার জন্যেও। রত্না এখন শুধু অন্তঃসত্ত্বাই নয়, যে-কোনও মুহূর্তে আসন্নপ্রসবা হয়ে উঠতে পারে। এই দুর্যোগে তাকে কোথায় নিয়ে যাবেন, কেমন করেই বা নিয়ে যাবেন, সেই দুশ্চিন্তা তাঁদের বুকের মধ্যে একটা জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসল। মাস দুয়েক আগে মণিমোহনই নিজে গিয়ে রত্নাকে তার শিলিগুড়ির শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, প্রথম সন্তান বাপের বাড়ি থেকে হওয়াই সব দিক থেকে ভাল, ব্যবস্থাটা সেইমতোই হয়েছে। জামাই প্রিয়তোষ রেলে চাকরি করে। আজ এখানে কাল ওখানে থেকে যেতে হয় মাঝেমাঝেই। তার পক্ষে ছুটি নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। কথা আছে সব হয়েটেয়ে গেলে সে বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে দোমহনীতে থাকবে।

ঘরের মেঝের ওপর পায়ের পাতা ডোবানো জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুরমা ভয়ার্ত গলায় বললেন, এখন কী হবে? জল তো বেড়েই চলেছে।

মণিমোহন স্কুলে মাস্টারি করেন। সহজ সরল মানুষ। এ হেন জটিল পরিস্থিতিতে কী করবেন

বুঝে উঠতে পারলেন না। ভারী শরীর নিয়ে রত্না বিছানার ওপর সিঁটকে বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে ভাঙাভাঙা গলায় বললেন, তাই তো দেখছি? রত্নাকে তো এখান থেকে সরানো দরকার। ওর কি— মানে জীবনডাক্তার কবে— মানে, ডেট দিয়েছে কবে?

সুরমা শুকনো গলায় বললেন, সে ডেট তো আজকালের মধ্যে। মেয়ের শরীরের অবস্থা দেখছ না! যে-কোনও সময়ে— আজই হয়তো— আর দেরি না করে কিছু একটা ব্যবস্থা করো। হায় ভগবান, এ যে ভীষণ জল।

মণিমোহন দরজার বাইরে উঠোনের দিকে তাকালেন। থইথই করছে তিস্তার ঘোলাটে জল। ঘরের মধ্যেই যদি পায়ের পাতা ডোবানো জল, উঠোনে তবে তো এক কোমর। সেই জল ভেঙে কোথায় যাবেন, কেমন করে যাবেন, ভেবে উঠতে পারলেন না। তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পাড়ায় তখন তোলপাড় চলছে। চিৎকার চেঁচামেচি, প্রাণ বাঁচাবার আয়োজন। আশেপাশের বাড়ির মানুষজন কাঁধে বাচ্চা আর মাথায় পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে জল ভেঙে চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ে।

এ-অঞ্চলের সব মানুষই গরিব কিংবা আধা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। দোতলা বাড়ি নেই বললেই চলে। ঘরে জল ঢুকলে পালানো ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। ত্রস্ত মানুষগুলো তাই বিপন্নতার অভিঘাতে ছটফট করতে করতে কোমরজলের মধ্যে দিয়ে পালাচ্ছে জীবন বাঁচাবার তাগিদে।

পাশের বাড়িতে থাকেন পরেশবাবু। বহুদিনের প্রতিবেশী। পঞ্চায়েতের মেম্বার। পাশাপাশি দু'টি বাড়ির মধ্যে বহুদিনের সুসম্পর্ক। মণিমোহন চিৎকার করে পরেশবাবুকে ডাক দিলেন।

পরেশবাবু, ও পরেশবাবু, পরেশবাবু শুনছেন—।

পরেশবাবু ততক্ষণে সপরিবারে বাড়ি ছাড়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছেন। মণিমোহনেব ডাক শুনে ঘরের দরজার সামনে এসে মুখ বাড়িয়ে উঁচু গলায় বললেন, সেকী মাস্টারমশাই, আপনারা এখনও আছেন বাড়িতে? আমরা তো এখনই রওনা দিচ্ছি। জল যে-হারে বাড়ছে এখনই চলে না গেলে ডুবে মরতে হবে। না না, আর দেরি করবেন না। বেরিয়ে পড়ুন। বেরিয়ে পড়ুন।

মণিমোহন বললেন, সে তো বেরোবই। কিন্তু মেয়েটা কীভাবে যাবে?

রত্না? কী বিপদ, রত্না এখনও ঘরে আছে? বলিহারি আপনার বুদ্ধি! মরবেন, মরবেন। মেয়েটাকেও মারবেন, নিজেরাও মরবেন। দেখছেন না জল কী হারে বাড়ছে? পাহাড় থেকে নামছে, আবার শুনছি তিস্তা ব্যারেজ থেকেও জল ছাড়ছে। নাঃ। আর এক মুহূর্ত দেরি করলে নির্ঘাত অপমৃত্যু। চুলোয় যাক জিনিসপত্তর। আগে প্রাণটা তো বাঁচাই।

কিন্তু রত্নাকে কীভাবে নিয়ে যাব? ওর অবস্থা তো জানেনেই।

কোনওমতে নিয়ে যান। আর এক মিনিটও দেরি করবেন না কিন্তু।

কিন্তু কীভাবে নিয়ে যাব? ওর যে—

কোনওরকমে নিয়ে যান। আর এক মুহূর্ত দেরি করবেন না।

কিন্তু মেয়েটা যে— ও পরেশবাবু, মেয়েটা যে নিজে যেতে পারবে না।

কোনও উত্তর শোনা গেল না। পরেশবাবু দরজার সামনে থেকে সরে গেছেন। তখন তাঁর ঘর ছাড়ার তাড়া। এক্ষুনি সবাই মিলে রওনা দেবেন আশ্রয়ের খোঁজে।

বিপন্নমুখে মণিমোহন ঘরে ঢুকলেন। ঘরের জল তখন আরও বেড়ে গেছে। কলকল করে দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। একটু পরেই হাঁটু ডুবে যাবে, ছুঁয়ে ফেলবে বিছানা। বিছানার ওপর বসে আছে রত্না। কিন্তু বসে থাকতে পারছে না। চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ। দিশেহারা হয়ে পড়েন মণিমোহন। অসহায় চোখে তাকান স্ত্রীর দিকে।

জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুরমা মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কেঁদে ফেলেন, ওর যে ব্যথা উঠেছে গো। ও যে আর থাকতে পারছে না। ঠাকুর, ঠাকুর, এ কী মহাবিপদে পড়লাম। ওগো দ্যাখো না কাউকে ডাকতে পারো কিনা। চিৎকার করে লোক ডাকো।

মণিমোহন হাতে পায়ে সাড় পান না। মনে হয় বিবশ হয়ে তিনি জলের মধ্যে পড়ে যাবেন। হায়

ভগবান, এই দুর্বিপাকে কেমন করে রক্ষা করবেন আসন্নপ্রসবা মেয়েকে। নিজেরা হয়তো কোনও গতিকে যেতে পারবেন, কিন্তু রত্না কেমন করে যাবে। কে সাহায্য করবে ওকে। সবাই তো চলে গেছে বাড়িঘর ছেড়ে। একটু আগে বাইরের কথাবার্তা শুনে বুঝেছেন পরেশবাবুরাও চলে গেছেন। কে আসবে তাঁদের উদ্ধার করতে? কাকে ডাকবেন তিনি? সবাই তো বিপদগ্রস্ত। আশেপাশের সব বাড়ি খালি হয়ে গেছে। প্রাণপণ শক্তিতে জল ঠেলে তিনি বাইরের বারান্দায় এলেন। যত দূর দৃষ্টি যায় দেখলেন। কেউ নেই। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে এমন কাউকেও দেখলেন না তিনি। চারদিকে শুধু জল। সোঁদা সোঁদা আঁশটে গন্ধের ঘোলাটে জল উদ্দাম উল্লাসে শুধু বয়ে চলেছে। যেন লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুর হিংস্র জানোয়ার গর্জন করতে করতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। জল একটু একটু করে বাড়ছে, একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে এতদিনের দেখা স্থিরচিত্রটা। ঝুপ করে ওপাশের বাঁশের বেড়াটা পড়ে গেল জলে, মুখ থুবড়ে পড়ল একটু দূরের মাটির কাঁচা বাড়িটা। সামনের টিউবওয়েলটা দেখা যাচ্ছে না, তলিয়ে গেছে জলের তলায়। ঘরের পোষা ছাগল গোরু ভেসে যাচ্ছে। মুরগি বেড়াল টিনের ছাদের ওপর বসে ভয়ার্ত চোখে জল দেখছে। একটা মরা বাছুর ভেসে যাচ্ছে, তার ওপর বসে আছে দুটো কাক। আকাশে পাক দিচ্ছে শকুন। প্রবল স্রোতে একটা কুকুর সাঁতরে যাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে জলের আবর্তে। লোক নেই, জন নেই, গেরস্ত নেই, সংসার নেই, আছে শুধু সর্বনাশা বন্যার ঘোলা জল। হাজার লক্ষ জঙ্গি হানাদারের মতো ছুটে আসছে নদী পুকুর উপচে। কিছু থাকবে না। সবকিছু তলিয়ে যাবে হিমশীতল জলের তলায়। মণিমোহনের বুক কেঁপে উঠল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিপন্ন গলায় চিৎকার করে উঠলেন, কে কোথায় আছ, আমাদের বাঁচাও—

এই কালবেলায় কে শুনবে তাঁর আর্তনাদ! কেউ নেই। সবাই পালিয়ে গেছে। এতদিনের প্রতিবেশী পরেশবাবু, তিনিও থাকলেন না। সর্বনাশের সময়ে কেউ পাশে থাকে না, সবাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়, নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতদিন স্কুলে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছেন, নীতিজ্ঞান শিখিয়েছেন— আজ বুঝতে পারলেন ওসব মানুষের সুসময়ের জন্যে কেতাবি পাঠ মাত্র। দুঃসময়ে কোনও সমাজবদ্ধতা থাকে না, কেউ মানুষ থাকে না, সবাই হয়ে যায় এক একটা বিচ্ছিন্ন স্বার্থপর অস্তিত্ব মাত্র।

তবু তিনি আবার চিৎকার করে মানুষকেই ডাকলেন। বারবার ডাকলেন। সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তাঁর এখন ঘোরতর বিপদ। একমাত্র মেয়ের প্রসববেদনা উঠেছে। এত জলের মধ্যে দিয়ে তাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারছেন না। তিনি নিজে শক্তসমর্থ নন, বরাবরই রোগাভোগা মানুষ। মেয়েকে যে কাঁধে তুলে নিয়ে যাবেন, সে শক্তি তাঁর নেই। তাঁর স্ত্রী সুরমার পক্ষেও সে কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি আবার ডাকলেন, কিন্তু তাঁর কাতর ডাক আবারও হারিয়ে গেল অসীম শূন্যতায়। কেউ উত্তর দেবার জন্যে নেই। কোনও সাহায্যের কণ্ঠ শোনা গেল না। শুধু বন্যার কলোচ্ছ্বাস সেই বিপদবেলায় সদম্ভ উচ্চারণ হয়ে রইল।

ঘরের ভেতর থেকে সুরমার কান্নার শব্দ ভেসে এল। সুরমা এখন হাউহাউ করে কাঁদছে। জল ক্রমশই বাড়ছে। মণিমোহন নিজেই টের পাচ্ছিলেন তাঁর হাঁটুর কাছে উঠে আসছে জলের উচ্চতা। বুঝলেন চরম সর্বনাশ হতে আর দেরি নেই। এই ঘরের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে মরতে হবে তিনজনকেই। এখন ঘরের বাইরে উঠোনে একগলা জল হয়ে গেছে। তাঁর কিংবা সুরমার সাধ্য নেই সেই প্রবল স্রোতের জলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া। রত্নার তো কোনওভাবেই সম্ভব নয়। সব উপায়ই এখন অসম্ভব হয়ে গেছে।

সকাল শেষ হয়ে দুপুরের দিকে দিন গড়াচ্ছে। দুপুরও একসময় শেষ হয়ে যাবে। তারপরে বিকেল, বিকেলের পরে রাত্রি। চারধার অন্ধকারে ঢেকে যাবে। জলের সমুদ্র পার হয়ে তখন কে আসবে, কে খুঁজে পাবে এই আক্রান্ত পরিবারকে? রত্না তো আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। কিছু একটা হয়ে যাবার চূড়ান্ত সময় এসে যাবে। এখনই তো সেই কষ্ট আরম্ভ হয়ে গেছে। মেয়ে কাঁদছে ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে, মা কাঁদছেন ডাক ছেড়ে। মণিমোহন কাঁদছেন না। তরল কান্নাগুলো বুকের মধ্যে জমে কঠিন বরফ হয়ে আছে। হায় রে, মৃত্যুর কাছে কী অসহায় আত্মসমর্পণ। পরিত্রাণের আর কোনও উপায়ই নেই। মৃত্যুর কুটিল মুখ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে ঘরের ভেতরে। সময় হলেই সে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবে। হায় ভগবান, এখনই যে কিছু করতে হয়।

সুরমার হাহাকার শোনা গেল, কিছু করো, কিছু করো, তোমার পায়ে পড়ি কিছু একটা করো। এবার মেয়েটা যাবে, আমরাও কেউ বাঁচব না। কিছু একটা করো—।

মণিমোহন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আর কাউকে ডাকলেন না। জানেন ডেকে কোনও লাভ হবে না। মনের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় জড়ো করে তিনি ঠিক করলেন এই জলের মধ্যে দিয়েই তাঁরা রওনা দেবেন নিরাপদ জায়গার সন্ধানে। রত্নাকে যেমন ভাবেই হোক স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ধরে নিয়ে যাবেন। নিয়ে যেতেই হবে। বিকল্প কোনও উপায়ই যখন নেই তখন নিজেদেরই মরিয়া চেষ্টা করতে হবে।

মণিমোহন ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, হ্যাঁ, একটা কিছু করতেই হবে। নিজেদেরই করতে হবে। যদি বাঁচি, বাঁচব। মরি তো মরব। যখন কেউ এল না, তখন নিজেদেরই চেষ্টা করতে হবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরব না। চলো, রত্নাকে ধরে ধরে নিয়ে যাই। যেমন করেই হোক রত্নাকে নিয়ে যেতেই হবে। আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। চলো।

ঠিক তখনই কিছুটা দূর থেকে হাঁক শোনা গেল। কারা যেন চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে এদিকে আসছে। মণিমোহন দাঁড়িয়ে পড়লেন। কান সজাগ করে ওদের ডাকাডাকি শুনতে চাইলেন। ডাকটা এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, কারা যেন আসছে। এদিকেই আসছে। সম্ভবত কোনও নৌকো কিংবা কলার ভেলা চালিয়ে কেউ আসছে। নিশ্চয়ই আটকে পড়া মানুষদের সাহায্য করতে কোনও উদ্ধারকারী দল আসছে।

মণিমোহন সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললেন, এই যে ভাই এই দিকে— মণিমোহন চক্রবর্তীর বাড়ি— মণিমোহন মাস্টার— আমরা জলের মধ্যে— আমাদের বাঁচান—

এবার স্পষ্ট উত্তর এল, আসছি, আসছি মাস্টারমশাই, আমরা আপনার কাছেই আসছি।

সামান্য পরেই দেখা গেল দুটো কলাগাছের ভেলা চালিয়ে জনা চারেক ছেলে মণিমোহনের বাড়ির দিকেই আসছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের ওদের মুখগুলো মণিমোহন চেনেন। এককালে তাঁর ছাত্র ছিল কিনা জানেন না, তবে এখন কেউই পড়াশোনার মধ্যে নেই। ছেলেগুলোর এ-অঞ্চলে কোনও সুনাম নেই। সবাই বেকার এবং মস্তান গোছের। পাড়ার মোড়ে মোড়ে কিংবা চায়ের দোকানে এদের প্রায়ই আড্ডা মারতে দেখেন। তিনি সবসময়ই সযত্নে এদের থেকে দূরত্ব রেখে চলেন। কিন্তু আজ কোনও উপায় নেই। ভালমন্দ বিচারের সময় এখন নয়। এদের সাহায্য নিয়েই জীবনরক্ষা করতে হবে রত্নার, সুরমার এবং তাঁর নিজের।

উঠোনের জলের ওপর দিয়ে ভেলাদুটো ঘরের সামনে এসে পড়ল। দু'জন দুটো ভেলায় থাকল, অন্য দু'জন ঝটপট বারান্দায় নেমে পডল। যে-ছেলেটি লম্বা, সে প্রায় ধমকের গলায় বলল, আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি সব হাপিস হয়ে গেছে মাস্টারমশাই? মেয়ের এই অবস্থা, এখনও কিনা বাড়িতে? পরেশবাবু খবর না দিলে ঠিক ফুট্টুস হয়ে যেতেন। ওরা কোথায়?

ঘরের মধ্যে থেকে সুরমার কাতরোক্তি শোনা গেল, এই যে আমরা ঘরের মধ্যে। আমাদের বাঁচাও বাবারা।

ওরা দু'জন ঝটপট ঘরে ঢুকে গেল। পেছন পেছন মণিমোহন। তাঁকে মোটেই অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল না। এসব ছেলেদের কথা বলার ধরনই এরকম। কিন্তু এখন সেসব নিয়ে ভাবতে চাইলেন না হাইস্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই। তাঁর মূল্যবোধ এখন তাঁকে বাঁচাবে না। বাঁচাবে এই মস্তানরা। ভালমানুষেরা কেউ তাঁকে রক্ষা করতে আসেনি, এসেছে যাদের সমাজবিরোধী বলা হয়। এই দুঃসময়ে তাদের কর্কশ কথা জীবনের আশ্বাসের মতো শোনাচ্ছে। পরেশবাবু আর কিছু না করুন, ঠিক জায়গায় খবরটা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

ঘরের মধ্যে বন্যার জল তখন বিছানা ছুঁয়ে ফেলেছে। রত্না তার যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চেপে কোনওরকমে সহ্য করে আছে। রত্নার মা সুরমা বিছানার ওপরে উঠে বসে মেয়েকে সামলাচ্ছেন। লম্বা ছেলেটি বিছানার কাছে গিয়ে কোনও বাক্যব্যয় না করে রত্নাকে কাঁধে তুলে নিল আর অন্যজন সুরমাকে হাত ধরে নামিয়ে আনল। জল ঠেলে সবাই ঘরের বাইরে এল। বাইরে তখন ভেলা নিয়ে অন্য দু'জন অপেক্ষা করে ছিল। লম্বা ছেলেটি রত্নাকে ভেলায় বসিয়ে দিল। সুরমাকে তুলে দিল সেই ভেলায়। বিপুল জলের মধ্যে দিয়ে ভেলা রওনা দিল। জলের উচ্চতা তখন এক মানুষ ছাড়িয়ে গেছে। এলাকার ভূখণ্ড তিস্তার ঘোলাটে জলে পলিমাটির তলায় অদৃশ্য। মুক্তাঞ্চলে উথলে উথলে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে অবাধ জল। এত দিগন্তপ্রসারী জল! এ তো কেবল সমুদ্রেই দেখা যায়। ওই তো ওখানে ছিল বসন্ত মণ্ডলের মাটির দেয়ালের ঘর। সে ঘর কোথায় গেল? আর মকবুল মিয়ার ঘর? ওই তো দেখা যাচ্ছে সে ঘরের টিনের চালও ডুবুডুবু। মানুষদুটো, বসন্ত মণ্ডল আর মকবুল মিয়া, কোথায় গেল? ওদের পরিবারের লোকজন? হাঁস মুরগি ছাগল গোরু? মণিমোহন জবুথবু চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখেন। ওই তো লাইব্রেরির দরজাটা প্রায় তলিয়ে যাচ্ছে জলের নীচে। আহা রে, কত মূল্যবান বই ছিল ওই লাইব্রেরিতে। রবীন্দ্ররচনাবলী, শরৎরচনাবলী। সব পলিমাটির জলে নষ্ট হয়ে গেল। লাইব্রেরির পাশ দিয়ে ওটা কী ভেসে যাচ্ছে? একটা মানুষের লাশ না? একটা কোথায়, পেছনেও তো একটা বাচ্চা ছেলের লাশ ভেসে যাচ্ছে। ওরা কারা? মণিমোহন চিনতেন কি? বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মণিমোহনের মনে হল, রবীন্দ্ররচনাবলী, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী আবার হবে, লেপতোশক, ধানচাল, সোনাদানা, ঘরবাড়ি আবার হবে। টাকা দিয়ে কেনা যায় সে সবই, নতুন করে আসবে। কিন্তু যে-মৃত মানুষ গোরুমোষের সঙ্গে ভেসে চলে যাচ্ছে, তারা তো চলেই গেল। তাদের আর নতুন করে ফিরিয়ে আনা যাবে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন ধ্বংসলীলার দিকে। এ কোন ভয়ংকর দৃশ্য দেখছেন তিনি। রাতারাতি যেন জাদুকরের আশ্চর্য জাদুতে বদলে গেছে তাঁর আবাল্য পরিচিত জগৎটা। মহাপ্লাবন বাঁশবাখারির কাঠামো, মুখ-থুবড়ে-পড়া বাড়ি, আর ভেসে যাওয়া মৃতদেহের এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে এই ছোট্ট জনপদটাকে। সর্বনাশের এমন ভয়াল চেহারা আগে কখনও দেখেননি।

চারটি ছেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেলাদুটিকে চালিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ওরা বুঝতে পেরেছে রত্নার শরীরের গতিক মোটেই ভাল নয়। যে-কোনও মুহূর্তে চূড়ান্ত সময় এসে যেতে পারে। রত্না এখন ভেলায় বসেও থাকতে পারছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে কোনও নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। রত্নার চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ। ভেলায় কাত হয়ে বসে আছে। সুরমা তার পাশে বসে আছেন, ছটফট করছেন ভেতরে ভেতরে। ভগবান জানেন, শেষপর্যন্ত কোন অবস্থায় পৌঁছোবেন মেয়েকে নিয়ে।

মণিমোহন কাতর গলায় বললেন, শেষপর্যন্ত আমরা কোথাও আশ্রয় পাব তো?

এ-ভেলাটা চালাচ্ছিল যে-দুটি ছেলে, তাদের একজন মেজাজি গলায় বলল, চুপ মেরে বসে থাকুন মাস্টারমশাই। দেখছেন না আপনাদের বাঁচানোর জন্যে আমরা জান লড়িয়ে দিয়েছি।

মণিমোহন চুপ করে গেলেন। হ্যাঁ, তিনি দেখছেন। মেয়ের শরীরের জন্যে গড়িমসি করে তিনি অনেক দেরি করে ফেলেছেন। অনেক আগেই বাড়ি ছেড়ে আসা উচিত ছিল তাঁর। মনে করেছিলেন জল কত আর বাড়বে। বড়জোর ঘরের মধ্যে এক হাঁটু জল হবে। যেমন হয়েছিল দু'-একবার। যখন দেখলেন জল বেহিসেবি হয়ে যাচ্ছে, বাড়তে বাড়তে বিপদের শেষ সীমা ছুঁয়ে ফেলেছে, তখন কী করবেন, কোথায় যাবেন, মেয়েকে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা, এইসব সাতকাহন দুশ্চিন্তা তাঁকে দিশেহারা করে দিল। দেখলেন আর কোনও উপায়ই নেই। প্রবল জলের চক্রব্যূহের মধ্যে পড়ে গেছেন। তখনই এই চারটি ছেলে ভয়ানক বিপর্যয়ের মধ্যে মৃত্যুকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তাঁদের উদ্ধার করতে ছুটে এসেছে।

খেলার মাঠ পেরিয়ে দুটো ভেলা হাটখোলায় চলে এল। এখানে দু'-তিনটে দোতলা আর কিছু

একতলা বাড়ি আছে। জায়গাটাও অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চল। মণিমোহন দেখলেন একতলা বাড়িগুলোর ছাদে অনেক মানুষ। ঘর ছেড়ে আসা মানুষজন আশ্রয় নিয়েছে সেখানে। দোতলা বাড়িগুলোর একতলার অনেকটাই জলের নীচে। দোতলা বাড়িগুলোর ছাদেও মানুষ। জলের শব্দ ছাপিয়ে মানুষের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সবমানুষ নিশ্চয়ই এখানে নেই, বেশিরভাগই নিশ্চয় আশ্রয় নিয়েছে বাঁধ কিংবা রেললাইনের ওপর। যে যেখানে পেরেছে আস্তানা গেড়েছে, যে যা পেরেছে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কাঁথা, বিছানা, পোঁটলাপুঁটলি, চিঁড়েমুড়ি। শুধু অন্যত্র থাকলে তো চলবে না, মুখেও তো দিতে হবে কিছু। শুধু বসে থাকা তো যাবে না, শরীর ছড়াবার ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

রত্নার তখন অসহনীয় অবস্থা। ভেলার ওপরই প্রায় শুয়ে পড়েছে। মেয়ের অবস্থা দেখে সুরমা অধীর হয়ে পড়েছেন। ভগবানকে ডাকছেন বারবার। ছেলেগুলো পরিস্থিতি বুঝতে পেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেলা চালিয়ে নিয়ে চলল। একটু পরেই কাছাকাছি একটা একতলা বাড়ির ছাদ পাওয়া গেল। সেখানেও লোক, তবে খুব বেশি সংখ্যায় নয়। ওই ছাদটার কাছে গিয়ে দুটো ভেলা থেকে দুটো ছেলে প্রায় লাফ মেরে ছাদে চলে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে রত্না আর সুরমাকে ভেলা থেকে ছাদে তুলে নিল। অন্য ভেলা থেকে মণিমোহনও উঠে গেলেন ছাদে। ইতিমধ্যে একটা মাঝারি মাপের নৌকোও কাছে চলে এল। ওই ছেলেদেরই আর একটা দল দুটো নৌকো জোগাড় করে ফেলেছে। নানান জায়গা থেকে বানভাসি মানুষদের উদ্ধার করে নিয়ে আসছে উঁচু জায়গার নিরাপদ আশ্রয়ে।

লম্বা ছেলেটি নৌকোর ছেলেদের বলল, একটা নৌকো এখানে আন তো। এখান থেকে কিছু লোককে মাইনাস করতে হবে। বলেই ছাদে আশ্রয় নেওয়া লোকদের দিকে তাকাল, এই যে, আপনাদের সকলের এখানে থাকা চলবে না। আমরা নৌকো ম্যানেজ করেছি, কয়েকজনকে বাঁধের ওপর দিয়ে আসব। মাস্টারের মেয়ের ডেলিভারি হবে, তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।

বানভাসিদের মধ্যে থেকে কেউ একজন বেজার গলায় বলল, তা মানব কেন। আমরা আগে এসেছি, আমরাই থাকব।

লম্বা ছেলেটি ঝট করে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, অ্যাই কে? কে ডায়ালগটা দিল? ফের জিভ নাড়লে ছুড়ে ফেলে দেব বানের জলে। খুব হুঁশিয়ার।

অন্য যে-ছেলেটি ছিল, সে বলল, অ্যাই, তোর মা বোন কি বাজারের মধ্যে পেট খসিয়ে ছিল? সবাই শুনে রাখো, আমরা যা বলব, তাই করতে হবে। যাদের যাদের যেতে বলব, তারা সবাই যাবে।

এই অঞ্চলের সবাই এই ছেলেদের ভাল করেই চেনে। ওরা পারে না হেন কাজ নেই। ওদের কথাই অলিখিত আইন। সেটাই মানতে হবে। নীতিবদ্ধ সামাজিক জীবনের মসৃণ সরলরেখা ধরে ওরা হাঁটে না। ওরা অমার্জিত অসংযত সমাজবিরোধী বলেই এলাকার মানুষের কাছে পরিচিত। মারদাঙ্গা, বোমাবাজি ওদের জীবনের নিত্যদিনের ঘটনা। পুলিশ এসে মাঝেমাঝে ধরে নিয়ে যায় কাউকে কাউকে, আবার ছেড়েও দেয়। সাধারণ মানুষ তাই কক্ষনও এদের ঘাঁটায় না। কাজেই ছাদ থেকে বাছাই করা কিছু মানুষকে বিনা প্রতিবাদে বাঁধের ওপরে যাবার জন্যে নৌকোয় উঠতে হল।

লম্বা ছেলেটি সম্ভবত দলের নেতা। সে নৌকোর ছেলেদের বলল, শোন, ফেরার পথে কাপড়ের দোকানের অবনী সাহার কাছ থেকে দশ মিটার মতো থানকাপড় নিয়ে আসবি। গাঁইগুঁই করলে জোর করে নিয়ে আসবি। মাস্টারের মেয়ের জন্যে কিছুটা জায়গা ঘিরে দিতে হবে। আর যেখান থেকে পারিস, চিঁড়ে মুড়ি গুড় নিয়ে আসবি। এই লোকগুলো খাবে।

যারা থেকে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, একটু খাবার জলের ব্যবস্থা দেখলে ভাল হত বাবাসকল। বড় তেষ্টা।

লম্বা ছেলেটি তেরিয়া হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কী ভেবে সামলে নিয়ে বলল, খাবার জল?

আনা যাবে। শুধু জল কেন, সবই পাবেন কাল থেকে। খিচুড়ি, কম্বল, জামাকাপড়, ওষুধপত্র। এখন একটু একটু জল কমতে শুরু করবে। কাল অনেক কমে যাবে। কাল থেকে ঝান্ডা নিয়ে সব পার্টির দাদারা আসবে। জেন্টলম্যানরা দলে দলে আসবে। আমরা থাকব না। আজ আমরা যা দেব, তাতেই খুশি থাকতে হবে।

ছাদের বাড়তি লোকেদের নিয়ে নৌকো চলে গেল। ওরা থানকাপড় আর চিঁড়েমুড়ি নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, জলও আনবে কলসি কিংবা টিন ভরতি করে। এখন জল বাড়তে বাড়তে একটা জায়গায় অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে জলের গতি সামান্য হলেও টানের দিকে। সকাল থেকে আকাশ সাফাসুফা। বৃষ্টি নেই। আর কিছু সময় বাদে জল কমাটা পরিষ্কার দেখা যাবে।

দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে গেল। দুপুর শেষ হয়ে বিকেল হল। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধে নেমে এল। জল এখন কিছুটা কমলেও তার ভয়াবহতা কিছুই কমেনি। ঘরছাড়া মানুষদের ঘরে ফিরে যাওয়ার অবস্থা এখনও দুরন্ত। ছেলেগুলো ছাদের একটা পাশ কাপড় দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল। ঘেরাটোপের মধ্যে রত্না আর রত্নার মা থাকল। আর থাকল এই অঞ্চলেব পুরনো দিনের ধাইমা যশোদাবুড়ি। তাকে নৌকো করে তুলে আনা হয়েছিল। মোমবাতি, দেশলাই আর জীবন ডাক্তারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও এনে দিয়েছিল ছেলেরা। ডাক্তারকে বলে দেওয়া হয়েছে দরকার পড়লে তাকেও নৌকো করে নিয়ে আসা হবে।

বিকেল শেষ হয়ে রাত্রি নেমে আসতেই রত্নার প্রসবকালীন সময় এসে গেল। লম্বা ছেলেটি আর তার এক সঙ্গীও নৌকো করে চলে এল ছাদে। কী জানি কী আবার দরকার পড়ে মণিমাস্টারের মেয়ের জন্যে। অবস্থা দেখে লম্বা ছেলেটি নিচু গলায় সঙ্গীকে বলল, মাস্টারের মেয়েটা এবার বিয়োবে রে। টাইম এসে গেছে।

মণিমোহন ওদের দেখে কাছে এসে বললেন, তোমরা অনেক করলে দুঃসময়ে। তোমাদের কী বলে যে—

লম্বা ছেলেটি হাত তুলে মণিমোহনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ব্যস ব্যস। আমাদের কিছু বলতে হবে না। এখন শুধু ভগবানের কথা ভাবুন।

মণিমোহন কৃতজ্ঞ গলায় বললেন, না বাবা, ভগবান টগবান নয়, এখন তোমাদের কথাই ভাবব। শুধু তোমাদের কথা।

মণিমোহন চলে গেলে সঙ্গী ছেলেটি লম্বা ছেলেটির পাশে এসে বসল। মণিমোহনের কথা শুনতে পায়নি সে। বলল, কী বলল রে মাস্টারটা?

লম্বা ছেলেটি উত্তর দিল, মাস্টার চান্স পেয়ে লেকচার ঝাড়তে যাচ্ছিল। আমরা যেন ওর ইস্কুলের ছাত্তর। সামান্য সময় চুপ করে সে কিছু ভাবতে ভাবতে ফের বলল, শাললা জব্বর মজাক কিন্তু। এক দিকে ফ্লাডের জলে লোক টেঁশে যাচ্ছে। অন্যদিকে মাস্টারের মেয়েটা তখন— ভগবানটা হেভভি খচ্চর আছে মাইরি।

বলে সে খিকখিক করে হাসতে থাকল।

মাটির নীচে শেকড়

লম্বা ট্রেন জার্নির জামাকাপড় ছেড়ে ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে একটা চেককাটা লুঙ্গি আর একটা হাতাকাটা গেঞ্জি পরে সত্যসুন্দর সোফার ওপর পা মুড়ে আরাম করে বসে চা খেতে খেতে বললেন, তোর সঙ্গে কদ্দিন পরে দেখা রে ফুচু? তা বছর দশেক তো হবেই, কী বলিস? সেই সেবার চিনুর বিয়েতে— তারপর তো আর ময়নাগুড়ি যাসনি।

ফুচু অর্থাৎ অমিতাভর হাতেও তখন চায়ের কাপ। সে মধ্য কলকাতার এক কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। ক্লাসে কথাবহুল হলেও বাড়িতে কিন্তু কথাকৃপণ। সে-ই একটু আগে শেয়ালদা স্টেশন থেকে সত্যসুন্দরকে তার দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়িতে নিয়ে এসেছে। সত্তরোর্ধ্ব সত্যসুন্দর রবিবার সকালে দার্জিলিং মেলে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। তিন-চারদিন থাকবেন অমিতাভর কাছে। এখন সকাল সাড়ে ন'টা। রবিবার না হলে এ-সময় অমিতাভকে ব্যস্ত থাকতে হত কলেজে যাবার জন্যে নিজেকে তৈরি করতে।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে অমিতাভ বলল, তাই হবে। অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয়নি।

শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সত্যসুন্দর বললেন, আসলে তোরা এখন এদিককার লোক হয়ে গেছিস। দেশগাঁ তেমন ভাল লাগে না। ছুটিছাটকায় হিল্লি দিল্লি ঘুরে বেড়াস। কিন্তু নাড়ির টান বলে তো একটা কথা আছে। নাকি তাও নেই?

জবাবে অমিতাভ একটু হাসল শুধু। কিন্তু নিজের কাছেই হাসিটা নেহাতই তৈরি করা বলে মনে হল। হাতের সামনে সকালের ইংরিজি দৈনিকটা ছিল, খবর পড়ার অছিলায় সেটা চোখের সামনে এনে মুখটা আড়ালে নিয়ে গেল। আসলে সে সত্যসুন্দরের সঙ্গে কথায় সামাল দিতে পারছিল না। অমিতাভ বরাবরই শান্ত, ধীরস্থির, গোছানো মানুষ। সত্যসুন্দরের অনর্গল কথার স্রোতে খড়কুটোর মতো কেবলই ভাসছিল। ঠিক অস্বাচ্ছন্দ্য নয়, কেমন যেন বেমানান মনে হচ্ছিল নিজেকে।

ইন্দ্রাণীর কিন্তু ভালই লাগছিল। দূর উত্তরবাংলার মফস্‌সল থেকে এই খোলামেলা মানুষটা এসে হঠাৎই এলোমেলো করে দিয়েছেন তাদের এই ভাঁজে ভাঁজে সাজানো সংসারের নিস্তরঙ্গ জীবনকে। হইহই করে কথা বলছেন, হাহা করে হাসছেন, দুমদাম চলাফেরা করছেন। সত্তর পেরিয়েছেন কবেই। কিন্তু এখনও অটুট স্বাস্থ্য, সুগঠিত লম্বা শরীর শিশিরে ভেজা টাটকা সবজির মতো ঝলমল করছে। নিঃসন্তান মানুষটি, স্ত্রী গত হয়েছে বহুদিন আগে। এখন ঝাড়া হাত-পা। এমন মানুষকে পেয়ে মজাই লাগছিল ইন্দ্রাণীর। ডাক্তার দেখাতে এসেছেন। থাকবেন তো মাত্র দু'-তিনটে দিন। এই ক'টা দিন না হয় হাট করে খুলে দেওয়া জানলা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ুক বাইরের অবাধ্য হাওয়া। এলোমেলো করে দিক নিয়মবদ্ধ অভ্যেসটাকে।

ইন্দ্রাণী বলল, আমার কিন্তু মামা খুব যেতে ইচ্ছে করে আপনাদের ওখানে। নদী, পুকুর, গাছপালা, ফ্রেশ-এয়ার, সরল মানুষ।

শব্দ করে হেসে উঠলেন সত্যসুন্দর, বলো কী হে বউমা, এ যে শরৎ চাটুজ্যের পল্লিগ্রামের মতো শোনাচ্ছে। শোনো হে ভাগনে, তোমার বউয়ের কথা শোনো। বলে কিনা ফ্রেশ এয়ার, সরল মানুষ!

অপ্রস্তুতের মতো মুখ করে ইন্দ্রাণী বলল, কেন, ওসব নেই নাকি?

হাসি থামিয়ে সত্যসুন্দর দু'পাশে মাথা নাড়িয়ে বললেন, এখন ওসব কিছু নেই। পাবে শুধু মজাপুকুর, জলকাদা, মশামাছি আর আমার মতন চাষাড়ে মানুষ। আর আছে পলিটিক্স। ভিলেজ

পলিটিক্স বোঝো তো? আমাদের ওই শব্দদূষণ বায়ুদূষণের চেয়ে অনেক মারাত্মক জীবনদূষণ।

অমিতাভ আর ইন্দ্রাণীর মেয়ে পুপু পাশের ঘরে পড়াশোনা করছিল। এবার সে উচ্চমাধ্যমিক দেবে। আর কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা। ঝট করে সে দরজা খুলে এ-ঘরে এসে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে খরখর করে বলল, আমার কিন্তু ডিস্টার্ব হচ্ছে মা। এত জোরে কথা বললে পড়াশুনো হয়?

এ-ঘরে সত্যসুন্দরই জোরে কথা বলছিলেন। বোঝা গেল পুপুর আপত্তির কারণ তিনিই। কথাগুলো অমিতাভর কানে বাজল। মানুষটা সবে বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু এর মধ্যেই পুপু তার অপছন্দের কথাটা সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে। এটা একদম ঠিক কাজ করেনি পুপু।

মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে অমিতাভ বলল, পুপু, ডোন্ট বি সিলি। ওভাবে কথা বলছ কেন?

বা রে, খারাপভাবে কী বললাম?

একদম ঠিকভাবে বলোনি। একটু পোলাইট হতে পারো না?

অমিতাভর কথায় সামান্য ভর্ৎসনা ছিল। বাবার কাছ থেকে এমন গলা পুপু আশা করেনি। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল অমিতাভর দিকে।

অপ্রস্তুত অবস্থাটা সামাল দিতে সত্যসুন্দর বললেন, আহা, ওকে খামাকা বকছিস কেন ফুচু? সত্যিই তো জোরে কথা বলছি। সামনে পরীক্ষা, পড়তে হবে না।

পুপুর কথা বলার ধরন ইন্দ্রাণীরও ভাল লাগেনি। তবু প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিতে পুপুকে বলল, যা তো পড়গে যা।

সত্যসুন্দর বললেন, হ্যাঁ মা যাও, নিশ্চিন্তে পড়ো গিয়ে। মনোযোগ দিয়ে পড়তে তো হবেই। শাস্ত্র কী বলেছে জানো— উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুনৈতি লক্ষ্মী। উদ্যোগী মানুষেরই লক্ষ্মীলাভ হয়। তোমার বেলায় তো পুরুষসিংহ হবে না, তুমি হচ্ছ সিংহবাহিনী। বলে পুপুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এবার কিন্তু আর জোর নয়, নিঃশব্দে।

সত্যসুন্দর ভেবেছিলেন তাঁর কথাতে পুপু হেসে ফেলবে। কিন্তু তা হল না। পুপু তাকাল না পর্যন্ত সত্যসুন্দরের দিকে। নাক সিঁটকে দুড়দাড় চলে গেল তার পড়ার ঘরে।

ইন্দ্রাণী হতাশ গলায় বলল, সত্যি, ছেলেমেয়েগুলো এখন কেমন যেন হয়ে গেছে। একটুতেই রেস্টলেস হয়ে পড়ে।

সত্যসুন্দর হেসে ব্যাপারটাকে সামান্য করে দিতে চাইলেন। বাচ্চা মেয়ে, সবকিছু কি অত বুঝেশুনে চলতে পারে। ও বয়েসে আমরাও অমন ছিলাম।

সত্যসুন্দর হাসলেন, কথা বললেন, কিন্তু কোনওটাই ঠিক তাঁর নিজের মতো মনে হল না। একটু অপ্রতিভ মনে হল তাঁকে। অকারণেই দেয়ালের ক্যালেন্ডারের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সবসময় সবজায়গায় সবকিছু যে মানায় না, মানুষের পছন্দ অপছন্দের কথা যে মাথায় রাখতে হয়, একটু রাশ টেনে যে রাখতে হয়, এই সত্যটুকু যেন বুঝতে পেরেছেন।

অমিতাভও চুপ। ইন্দ্রাণীও এই অবস্থায় কী বলবে ভেবে উঠতে পারল না। পুপুর পড়ার ঘর থেকেও কোনও শব্দ আসছিল না। সবকিছু যেন তলিয়ে রইল শীতল স্তব্ধতার নীচে।

একটু পরে সত্যসুন্দর বললেন, তা হলে ফুচু, আজ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা যাবে না বলছিস?

অমিতাভ মাথা নাড়ল। আজ তো রবিবার। আজ ডাক্তার দাশগুপ্তের চেম্বার বন্ধ থাকে। তুমি চিন্তা কোরো না বড়মামা। কালই তোমাকে ডাক্তার দেখিয়ে দেব। দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার খুব ভাল রিলেশন আছে।

ইন্দ্রাণী বলল, আপনি এখন বরং একটু রেস্ট করুন মামা। লম্বা জার্নি করে এসেছেন। চান খাওয়াদাওয়া করে একটু ঘুমিয়ে নিন।

সত্যসুন্দর সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বললেন, এ-বাড়ি, মানে এই বিল্ডিংয়ে অনেক ফ্ল্যাট আছে, তাই না বউমা?

ইন্দ্রাণী বলল, এই বিল্ডিং সাততলার। সব তলাতেই পাশাপাশি ফ্ল্যাটে অনেক ফ্যামিলি আছে। এই তো আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে এক পাঞ্জাবি ফ্যামিলি থাকে। পাঞ্জাবি, মাদ্রাজি, গুজরাটি সব প্রভিন্সের লোক আছে। এখানে একটা মিনি ভারতবর্ষ পেয়ে যাবেন মামা।

বাঙালি পরিবার নেই?

আছে। চারটে।

জানলা দিয়ে এক টুকরো আকাশ দেখতে দেখতে সত্যসুন্দর অন্যমনস্ক গলায় বললেন, এত সুন্দর ফ্ল্যাট তোমাদের, একটু গাছপালা নেই কোথায়ও। একটু ফুলগাছটাছ থাকলে—

ইন্দ্রাণী আঙুল তুলে একখণ্ড বারান্দার টব দেখিয়ে মজা করা গলায় বলল, এই যে টব। ওই টবেই বাগান করার শখ মেটাতে হয়। গাছপালা বলতে ওই টবেরই গাছ, মাটি বলতেও ওই একমুঠো টবের মাটি।

উত্তরদিকের ঝুল বারান্দায় রাখা তিন-চারটে টবে তিন-চার রকম ফুলগাছ। ঘর থেকে দেখে সত্যসুন্দর চিনতে পারলেন না কী ফুলগাছ ওগুলো। চেনার মতো অবস্থায় নেই ও গাছগুলো। আকাশের দিকে শীর্ণ আঙুল বাড়িয়ে যেন মুক্তির অবলম্বন খুঁজছে। সত্যসুন্দর সেদিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

চানটা সেরে নিই কী বলো বউমা। চান করলে ভাল লাগবে।

ইন্দ্রাণী বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। তোয়ালে, মাথার তেল শ্যা— মানে সাবান—সবই পাবেন বাথরুমে।

সত্যসুন্দর হাসলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার অত ব্যস্ত হতে হবে না। সাবান হলেই আমার চলবে।

ইন্দ্রাণী বলল, ওর একটা পাজামা দেব কি চান সেরে পরার জন্যে?

সত্যসুন্দর বললেন, এই তো এই লুঙ্গিটা তো এখনই— আচ্ছা, ঠিক আছে। ব্যাগে আরেকটা লুঙ্গি আছে। সেটা বরং বের করে নিচ্ছি। পাজামা থাক।

ইন্দ্রাণী হাসল, পাজামা পরার অভ্যেস নেই?

সত্যসুন্দরও হাসলেন, কতকটা তাই। বাথরুমটা—

ইন্দ্রানী কাজের মাসিকে ডাক দিল, রতনের মা, এদিকে একটু এসো তো। আচ্ছা থাক। আমিই বাথরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

অমিতাভও আর বসল না। একটু পরে সেও উঠল। চলে গেল পুপুর পড়ার ঘরে। অমিতাভ আগে কখনও পুপুকে ওইভাবে কথা বলেনি যেভাবে আজ একটু আগে বলেছে। পুপু তাদের একমাত্র সন্তান। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়া ভাল ছাত্রী। ফরসা, সুদর্শনা, হাসিখুশি প্রাণোচ্ছ্বলা মেয়ে। সবই ভাল, শুধু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাঝেমাঝে মা-বাবাকে সমস্যায় ফেলে দেয়। পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে কখনই সে আপস করে নিতে পারে না। যেটা সে ভাল বলে মনে করে, তা সবসময়ই তার কাছে ভাল। খারাপ খারাপই। মাঝামাঝি কোনও বিকল্প পথ সে বেছে নেয় না। এরজন্যে মাঝেমাঝে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেলেও অমিতাভ কিংবা ইন্দ্রাণী সেগুলো মেনে নেওয়াই ভাল মনে করেছে। পুপু স্পষ্ট। তবে বড় বেশি চোখ ধাঁধানো স্পষ্ট।

পুপু পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে বইয়ের খোলা পাতার দিকে তাকিয়ে ছিল। উচ্চারণ করে কিছু পড়ছিল না। সম্ভবত একটু আগের ঘটনার রেশ রয়ে গেছে তার মধ্যে। চুপ করে বসে থেকে সেটা সামলাচ্ছিল।

পুপুর পেছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল অমিতাভ। মুখে সকৌতুক হাসি। নকল গম্ভীরস্বর করে বলল, এই বুঝি পরীক্ষার পড়া হচ্ছে?

পুপু ঝট করে মুখ ফিরিয়ে দেখল অমিতাভকে। মুখ আরও ফুলে উঠল বাবার ওপর অভিমানে। ঠোঁট কামড়ে ধরে মুখ আবার ফিরিয়ে নিল।

অমিতাভর মুখের হাসি আরও চওড়া হল। বলল, রাগ হয়েছে?

পুপু তবুও চুপ। যেমন বসে ছিল, তেমনই বসে রইল।

অমিতাভ কপট গলায় বলল, বেশ। কথা না বললে চলেই যাচ্ছি। কী হবে থেকে!

পুপু তবুও কোনও কথা বলল না। তুম্ব মুখ করে খোলা বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

চলে যাচ্ছি বললেও অমিতাভ কিন্তু তখনই গেল না। ফের কী বলবে ভাবছে, তখনই পরদা সরিয়ে ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকল। অমিতাভকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, মেয়ের রাগ এখনও ভাঙেনি বুঝি? কথা বলছে না?

পুপু মুখ না ফিরিয়েই এবার ঝরঝর করে বলল, কী কথা বলব? আমি তো কথাই বলতে জানি না। আমি সিলি, ম্যানার্স জানি না, এটিকেট জানি না। আমার চুপ করে থাকাই ভাল।

ইন্দ্রাণী এগিয়ে এসে পুপুর মাথায় হাত রেখে বলল, শোন মেয়ে, বোকামি করছিস কেন। তোর তো এখন শিখে নেবার বয়েস। মামা এই প্রথম এলেন আমাদের কাছে। ডাক্তার দেখাবেন, কী অসুখ নাকি সারছে না। দু'-তিনদিন থেকে চলে যাবেন। গ্রামগঞ্জের সরল মানুষ, একটু বেশি খোলামেলা, এই তো।

পুপু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, লোকটাকে আমার ভাল লাগছে না, তো কী করব আমি। দাড়ি না-কাটা, বিচ্ছিরি দেখতে লুঙ্গি পরা, গাঁউগাঁউ করে কথা বলা, হুসহাস করে চা খাওয়া— এসব সরলতা না ভালগারিটি? বাবাকে বারবার ফুচু ফুচু বলে ডাকছে, শাস্ত্র বচন বলছে—মোস্ট বোগাস।

অমিতাভ হেসে ফেলল, এই দ্যাখো, আমার ডাক নাম ফুচু, তো বড়মামা কী বলে ডাকবে আমায়?

ইন্দ্রাণী বলল, বেশ তো, মামাকে বলে দেব ওই নামে না ডাকতে। কী নামে ডাকবে বল তো? হ্যারি না ডিক? বিল না জন?

ইন্দ্রাণীর কথা শুনে পুপু হেসে ফেলে বলল, যাও!

বাইরে সত্যসুন্দরের গলার শব্দ শোনা গেল। তাঁর স্নান হয়ে গেছে। এখন কিন্তু হাঁকডাক করে কথা বলছেন না। সামান্য গম্ভীর গলায় ডাকলেন, বউমা?

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি করে উত্তর দিল, এই যে মামা, যাই।

ইন্দ্রাণী বাইরে এলে সত্যসুন্দর বললেন, তোমার ঠাকুরঘরটা কোথায় বউমা?

এঘর থেকে সব কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

অমিতাভও শুনতে পাচ্ছে, পুপুও। অমিতাভকে একটু বিব্রত দেখাল! এই বাড়িতে যে-জিনিসটা মোটেই নেই, সেটাই খোঁজ করছেন সত্যসুন্দর। ভারী মুশকিল হল তো।

আর পুপু মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসেই অস্থির,— যাও এবার, ঠাকুরঘর তৈরি করে সারাদিন হরে কৃষ্ণ, হরে রাম করো। কলকাতাকে গোবিন্দপুর সুতানটি বানিয়ে ফেলো।

অমিতাভ তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেল। দেখল সত্যসুন্দর প্রশান্ত মুখে হাসছেন। অমিতাভকে দেখে বললেন, এই দ্যাখ ফুচু। বউমা লজ্জা পেয়েছে ঠাকুরঘর নেই বলে।

অমিতাভ মাথা চুলকাল। বলল, না, মানে—

তাকে থামিয়ে দিয়ে সত্যসুন্দর বললেন, আরে বাপু, কলকাতা শহরে জ্যান্ত মানুষেরই থাকার জায়গা কম, তাতে পাথরের ঠাকুরের জন্যে আলাদা ঘর কোত্থেকে হবে। নেই তো কী হয়েছে। আমি বরং মনে মনে ঠাকুরের নাম করে নিই, কী বলিস।

ইন্দ্রাণী বলল, সেই ভাল মামা। ওই যে গান আছে না, জাঁকজমকে করলে পুজো, অহংকার হয় মনে মনে।

সত্যসুন্দর হেসে উঠলেন, দেখলি ফুচু, বউমা রামপ্রসাদী গেয়ে ব্যাপারটা কেমন ম্যানেজ করে নিল।

অমিতাভ বুঝল আকাশ আবার নির্মেঘ করে দিয়েছেন সত্যসুন্দর।

বিকেলে সত্যসুন্দর বাড়ির সামনের রাস্তাটা একটু ঘুরে ফিরে আসতে বের হলেন। অমিতাভ লম্বা ঘুম দিয়ে ছুটির দুপুর কাটায়। সত্যসুন্দর একাই বেরুলেন। ইন্দ্রাণীকে বললেন, বেশি দূরে যাবেন না, কাছাকাছি থাকবেন। কোথায় ঘুরলেন কে জানে। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলেন নাইলনের ঝোলায় বেশ কয়েকটা ল্যাংড়া আম আর একটা মাঝারি মানের পাকা কাঁঠাল হাতে করে। বললেন, কোথায় আর যাব বউমা! যা গাড়িঘোড়া ভিড়ভাট্টা। সামনেই একটা বাজার দেখে ঢুকে গেলাম। আমগুলো ভালই মনে হচ্ছে কী বলো। বলল তো বেনারসের ল্যাংড়া।

ইন্দ্রাণী বলল, দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব ভাল আম। আর কাঁঠাল? কতদিন পরে কাঁঠাল দেখলাম!

দিবানিদ্রা সারা অমিতাভ চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিল। বলল, আমাদের জলপাইগুড়ির বাড়িতে একটা হাজারি কাঁঠালগাছ ছিল, মনে আছে মামা?

ইন্দ্রাণী বলল, হাজারি কাঁঠাল, সে আবার কী?

সত্যসুন্দর বললেন, বুঝলে না? ওই কাঁঠাল গাছটাতে বিস্তর কাঁঠাল ফলত। গাছ ভরতি প্রতিটি ডালে কাঁঠাল আর কাঁঠাল। তা হাজারের কাছাকাছি তো হবেই। সবাই বলত হাজারি কাঁঠালগাছ। খুব মনে আছে রে ফুচু। তোর মনে আছে, আর আমার থাকবে না?

সত্যসুন্দর হো হো করে হেসে উঠেই কী ভেবে চুপ করে গেলেন।

অমিতাভ বলল, গাছটা এখনও আছে, না মামা?

সত্যসুন্দর মাথা নাড়লেন, নেই। একবার চোত মাসে কালবৈশাখি ঝড়ে গাছটা ভেঙে পড়েছিল।

অমিতাভ কাঁঠালটার দিকে তাকিয়ে বলল, কাঁঠাল খেতে ভাল হলেও ডাইজেস্ট করা কঠিন কিন্তু। খুব রিচ ফ্রুট।

সত্যসুন্দর বললেন, সে তোমাদের শহুরে লোকের বেলায়। বুঝলে বউমা, বয়সকালে এরকম দুটো কাঁঠাল আমি একাই খেতে পারতাম।

ইন্দ্রাণী হাসল। বলল, বললেন একটু ঘুরতে যাচ্ছেন, চলে গেলেন বাজারে?

সত্যসুন্দর বললেন, ঠিক বাজার যাব বলে কিন্তু বেরোইনি। আসলে কাছেই একটা বাজার পেয়ে গেলাম। আর কোথায় ঘুরব। এত লোক, গাড়িঘোড়া, হই-হট্টগোল— আমার মতন চাষাভুষা লোকের দম বেরিযে যাবাব জোগাড।

ইন্দ্রাণী হাসলেন, বাজারেও তো মানুষ কম ছিল না!

তা অবশ্যি কম ছিল না। তবে হাটঘাট করা লোক তো, ওর জন্যে তেমন অসুবিধে হয় না।

পুপু অন্য ফ্ল্যাটে গিয়েছিল বন্ধুর কাছে। ফিরে এসে কাঁটাল দেখে ওর চোখ কপালে উঠল, মাই গুডনেস! এটা আবার কী বস্তু?

ইন্দ্রাণী বলল, চিনিস না? ওটা হল কাঁঠাল।

কাঁঠাল? জ্যাকফ্রুট? মা গো, কী বিকট দেখতে। গা থেকে কেমন পাড়াগেঁয়ে-পাড়াগেঁয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে। এই বস্তুটিকে কে খাবে?

ইন্দ্রাণী আর অমিতাভ চুপ করে রইল। সত্তর পেরোনো সত্যসুন্দর কিন্তু অল্পবয়েসি পুপুর কথা গায়েই মাখলেন না। শান্ত গলায় বললেন, তুমিও খেয়ে দেখতে পারো। ভালই লাগবে।

কোনও উত্তর না দিয়ে পুপু গটগট করে চলে গেল নিজের ঘরে।

ইন্দ্রাণী মুখ দিয়ে একটা আক্ষেপের শব্দ করল। অমিতাভকেও খুব বিব্রত দেখাল। সে অসহায় চোখে তাকাল সত্যসুন্দরের দিকে। সত্যসুন্দরের প্রশান্ত মুখে কিন্তু কোনও পরিবর্তন নেই। অনেক উঁচু থেকে যেন দেখছেন কাছের সবকিছু। সব জিনিসই ছোট দেখাচ্ছে তাঁর কাছে। সবকিছু অকিঞ্চিৎকর করে দেবার আশ্চর্য হাসিটি তাঁর মুখে তখনও অমলিন।

অমিতাভর সঙ্গে পরের দিন সত্যসুন্দর ডাক্তার দাশগুপ্তকে দেখিয়ে এলেন। মাঝেমাঝে তাঁর বুকে অসহ্য ব্যথা হয়। অনেকভাবে দেখেও ডাক্তার তাঁর বুকে তেমন কোনও জটিলতা খুঁজে পেলেন না। তবু বুকের এক্সরে, রক্ত, সুগার— এসব পরীক্ষা করিয়ে নিতে বললেন। কয়েকরকম

ওষুধও লিখে দিলেন খাবার জন্যে। মেডিকেল টেস্টের রিপোর্ট সহ পাঁচ দিন পরে আসতে বললেন।

সত্যসুন্দর কিন্তু ততদিন থাকতে চাইলেন না অমিতাভর কাছে। সোদপুরে আত্মীয়তা সূত্রে কোন ভাই থাকে, তার কাছে চলে গেলেন। আসলে তাঁর নাকি ওঠার কথা ছিল ওই ভাইয়ের কাছেই। অমিতাভর কাছে থেকে ডাক্তার দাশগুপ্তকে দেখানোর সুবিধে হয় বলে, আর অনেকদিন ভাগনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই বলেই এ-বাড়িতে দু'দিনের জন্যে উঠেছিলেন।

সত্যসুন্দর যেদিন চলে গেলেন, সেদিন রাতে অমিতাভ দেখল ইন্দ্রাণী ঘরের নির্জন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা বড়ই নিঃসঙ্গ, বড়ই উদাস উদাস। অমিতাভ পাশে এসে দাঁড়াল। ইন্দ্রাণী একবার পাশে তাকাল, তারপর ফের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, মামাবাবু চলে গেলেন। মনে হচ্ছে কী যেন একটা নেই।

অমিতাভরও তাই মনে হচ্ছিল। কী যেন একটা নেই। সত্যসুন্দর নয়। অন্য কিছু একটা। একটু ভাবতেই পেয়ে গেল সেই নেইটাকে। অথচ সবই তো আগের মতোই আছে। টেবিল চেয়ার, দেয়াল মেঝে, দরজা জানলা, যেমন ছিল, তেমনই আছে। কোথায়ও কিছু কম হয়ে যায়নি। শুধু গত দু'দিন ধরে যে-মাটির গন্ধটা এ-বাড়িতে ভেসে বেড়াচ্ছিল, সেটা এখন আর নেই।

ইতিহাসের অধ্যাপক অমিতাভ একটু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল স্ত্রীর পাশে। তারপর মৃদু গলায় বলল, বুঝলে ইন্দ্রাণী, ইটকাঠ লোহালক্কড় নয়, মাটির সঙ্গেই থাকে নাড়ির টান। ভারতবর্ষের শতকরা আশি ভাগ মানুষের লোকসংস্কৃতির পরম্পরা তো দাঁড়িয়ে আছে মাটির ওপর। একে অস্বীকার করবে কেমন করে।

সামান্য সময় চুপ করে থেকে ভরা গলায় ইন্দ্রাণী বলল, পুপুটা মামাবাবুর সঙ্গে ওরকম আচরণ কেন যে করল।

অমিতাভ ম্লান হাসল,— পুপু নয়, আচরণটা এই প্রজন্মের। যে-প্রজন্মটা হল একটা পুরনো বইয়ের রঙচঙা সুদৃশ্য মলাট। মলাটের ভেতরে যে বইটা আছে, সেটা কিন্তু সত্যসুন্দরের গল্প।

যে-ফোন সত্যি ছিল না

১

আমার বন্ধু সোমদেব মিত্র শখের গোয়েন্দা। সে অবশ্য নিজেকে গোয়েন্দা বলে না, বলে সত্যসন্ধানী। গোয়েন্দা, বিশেষত শখের গোয়েন্দা, কথাটিতে তার ঘোরতর আপত্তি। অপরাধ জগতের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের ঘটনাকে শখের গোয়েন্দাগিরি বলে লঘু চরিত্রের করে দেওয়াটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সে অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছে। অপরাধ বিজ্ঞানের সঙ্গে যে মনোবিজ্ঞানের একটা সাযুজ্য রয়েছে, সেটা সে বারবার প্রমাণ করে দিয়েছে নানান ঘটনার রহস্য উন্মোচন করে। সে দেখিয়েছে, যে-মানুষ ভালবাসে, ক্ষমা করে, আবেগপ্রবণ হয়, সেই মানুষই আবার খুন করে, হিংস্র হয়, পাশবিক আচরণ করে। মনই মানুষের কার্যকলাপকে পরিচালনা করে। যার ফলে পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও ইতিমধ্যেই সে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে নিজস্ব পদ্ধতিতে কয়েকটা জটিল কেসের চমকপ্রদ সাফল্যের পর। পদস্থ পুলিশ অফিসারদের প্রায়ই সোমদেবের শরণাপন্ন হতে দেখেছি।

আমি ছুটিছাটার অবসর পেলেই সোমদেবের বাড়িতে আড্ডা মারতে যাই। চুরি-ডাকাতি, অপহরণ, খুনখারাপির আসামি পাকড়াও করার ব্যাপারে আমার যে আগ্রহ নেই তা বলব না। রহস্যঘন উত্তেজনাকর বিষয়ে সবারই আকর্ষণ থাকে, আমারও আছে। কিন্তু আমি যে ঠিক সেই কারণেই সোমদেবের কাছে যাই, তাও নয়। সোমদেব আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। সেই কলেজজীবন থেকে সোমদেবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। আমার অবসর সময় আছে অথচ সোমদেবের বাড়িতে যাইনি, এরকম ঘটনা খুব কমই আছে।

সোমদেব তার ধনী বাপের কনিষ্ঠ পুত্র। সোমদেবের বড় দুই ভাই জীবিকার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। একজন ডাক্তার, দিল্লিতে থাকে। অন্যজন পদস্থ সরকারি চাকুরে। বর্তমানে কলকাতায় কর্মরত। সোমদেবও সেরকম কিছু হতে পারত। লেখাপড়ায় সে যথেষ্ট ভাল ছাত্র ছিল। কিন্তু সে চাকরি কিংবা ব্যাবসা কোনও পথেই গেল না। আসলে প্রথাগত জীবনের প্রতি তার কোনওদিন কোনও টান ছিল না। সে তার রহস্যান্বেষণের পথকেই বেছে নিল। পৈতৃক অগাধ সম্পত্তির কিছু অংশ তার ভবিষ্যৎকে যথেষ্ট সুরক্ষিত করে রেখেছিল। তদুপরি রহস্যভেদের কাজে তার কিছু প্রাপ্তিযোগ তো থাকতই। সোমদেব বলত, তেমন দরকার পড়লে হাত-পা বিদ্যেবুদ্ধি তো স্ট্যান্ডবাই রইলই। সেগুলো ব্যবহার করে দিব্যি চালিয়ে নিতে পারব।

রবিবার, ছুটির দিন। আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে কালো মেঘে। সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি যথারীতি সোমদেবের বাড়িতে। এমন দিনেই আড্ডা জমে ভাল।

জলপাইগুড়ি শহরের সমৃদ্ধ এলাকায় সোমদেবের বাড়ি। দোতলার দক্ষিণের শেষ ঘরটাতেই সোমদেব থাকে। সোমদেব আমারই বয়েসি, ত্রিশ অতিক্রান্ত। আমার মতোই এখনও অবিবাহিত। সোমদেবের মা তাঁর ছেলের মতোই আমাকে স্নেহ করেন। সোমদেবের বাবা বিশ্বদেব মিত্রও আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। তিনি কাজের মানুষ, দ্যাখা হয় কালেভদ্রে। তবে দ্যাখা হলেই আমার ভালমন্দ খোঁজখবর নেন। এককথায় মিত্রবাড়িতে আমার অবারিত দ্বার।

সেদিন কী একটা কথাবার্তার সূত্রে আমি বললাম, তুই যা-ই বল না কেন সোম, নামকরা ডিটেকটিভদেরও আমাদের মতো দুটোই চোখ, তৃতীয় নেত্র বলে কিছু নেই। ওটা ঠাকুর দেবতাদের কপালেই থাকে। একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো কিংবা একটা ছেঁড়া কাগজ কী একটা দেশলাইয়ের দগ্ধ কাঠি দেখে কিছুতেই বলা সম্ভব নয় খুনি বেঁটে না লম্বা, রোগা না মোটা, কালো না ফরসা, সে ডানহাতি না বাঁহাতি। শার্লক হোমস কিংবা এরকুল পোয়ারোরা লেখকদের কল্পনা জগতের লোক, বাস্তবে তেমন কেউ হয় না।

সোমদেব বলল, কোনান ডয়েল কিংবা আগাথা ক্রিস্টি কিন্তু কখনও দাবি করেননি ওরা বাস্তব জগতের লোক। তবে কী জানিস, সবটা না হলেও অনেক সময় অনেকটা বলা যায় বই কী। এটা হল প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তির ব্যাপার। কোনও জিনিসকে আমরা সকলে যেমনভাবে দেখি, প্রবল ধীশক্তিসম্পন্ন অনেক মানুষ তেমনভাবে দ্যাখেন না। ঘটনাস্থলে একটা সিগারেটের টুকরো দেখে কিছুটা বলে দেওয়া যায় বই কী। যেমন, যে সিগারেটটা খেয়েছে সে কী ব্র্যান্ডের সিগারেট খায়, সিগারেট দামি হলে তার আর্থিক অবস্থা কেমন, চরম ঘটনার সময় সিগারেট খাওয়া মানে সে ঠান্ডা মাথায় ঘটনাটা ঘটিয়েছে এবং অবশ্যই সে ঘনঘন সিগারেট খেতে অভ্যস্ত। আসলে কী জানিস, কার্য ও কারণ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী হলেই অনেক কিছু বলে দেওয়া যায়। একজন ড্রাইভার বলে দিতে পারে তার গাড়ি কী কারণে ট্রাবল দিচ্ছে, একজন কৃষক বলে দিতে পারে তার উৎপাদন কম হচ্ছে কেন, একজন পকেটমার বলে দিতে পারে কোন লোকের পকেট মারলে সে লাভবান হবে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা ইনটিউশন আর কিছুই নয়, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসের ফসল।

আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম। নানান খবরে চোখ বোলাতে বোলাতে বললাম, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব সহজ। কিন্তু যেমন বুনো ওল আছে, তেমনি বাঘা তেঁতুলও আছে। ধুরন্ধর অপরাধীরা কোনও ক্লু রেখে যায় না। অথচ এসব ক্ষেত্রেও প্রায়ই দ্যাখা যায় রহস্যকাহিনীর গোয়েন্দারা সন্দেহভাজন অপরাধীকে ঠিক চিহ্নিত করে বসে। এ ব্যাপারে তুই কী বলবি?

সহজ ব্যাপার নিশ্চয়ই বলব না। তবে অপরাধের ধরনধারণ, যাকে বলে মোডাস অপারান্ডি, দেখে অপরাধীর একটি আবছা ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।

বাড়ির পুরনো কাজের লোক সনাতন চা নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে হালকা জলখাবার। এটা সোমদেবের বাড়ির নৈমিত্তিক ব্যাপার। সনাতনকে বলতে হয় না। অতিথি আপ্যায়ন সনাতনের নিয়মের মধ্যে পড়ে। চা আর একগাল হাসি নিয়ে সে ঠিকই উপস্থিত হবে। বয়স্ক মানুষ, সোমদেবের বাড়িতে দীর্ঘদিন আছে। বলতে গেলে সে রায়বাড়ির অন্যতম সদস্য হয়ে গেছে।

টেবিলে চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট রেখে সনাতন বলল, গপ্পে গপ্পে আবার চা ফেলে রেখোনি। জুড়িয়ে যাবেনে। কীরকম বিচ্ছিরি দিন পড়েছে দ্যাখো দিকিনি। ঘ্যানঘ্যান করে বিষ্টি পড়েই চলেছে।

সোমদেব সহাস্যে বলল, চা জুড়িয়ে গেলে তো তোমারই খাটনি বেড়ে যাবে সনাতনদা।

সনাতন বলল, কেন? খাটনি বাড়বে কেন?

বা রে, তোমাকেই তো আরেক কাপ গরম গরম চা বানিয়ে আনতে হবে। গজগজ করে কী যেন বলতে বলতে সনাতন চলে গেল। হাসতে হাসতে সোমদেব বলল, যত গজগজ করুক আধঘন্টা পরে দেখিস ঠিক আরেক কাপ চা নিয়ে আসবে সনাতনদা। পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।

আমার তখন খবরের কাগজের একটা খবরে চোখ আটকে গেছে। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হয়েছে পশ্চিম ডুয়ার্সের মালবাজার শহরের অদূরে তীব্রগতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে একটা গাছে সরাসরি ধাক্কা মেরে গাড়ির চালক সুশোভন মজুমদার ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। শ্রীমজুমদার শিলিগুড়ির বাসিন্দা এবং একটি পেট্রল পাম্পের মালিক। আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, এ কি সেই সুশোভন, রাজীবের বিজনেস কলিগ।

সোমদেব বলল, কেন? কী হয়েছে সুশোভনের? বললাম, এই তো পেপারে লিখেছে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে!

সোমদেব আমার হাত থেকে কাগজটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে খবরটা পড়ল। বলল, তাই তো দেখছি। তিনদিন আগের ঘটনা। নিউজটা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে।

বললাম, রাজীবের মুখে সুশোভনের নাম অনেক শুনেছি।

শুধু শোনা কী রে! মনে নেই একবার শিলিগুড়িতে ওর পেট্রল পাম্পে গিয়েছিলাম? রাজীব নিয়ে গিয়েছিল? টল, হ্যান্ডসাম, ইয়ংম্যান। মনে পড়ছে না?

আমার ঠিক মনে পড়ছিল না। স্মৃতির ধুলোময়লা ঝাড়াঝাড়ি করে একটু একটু ভাসাভাসা দেখতে পাচ্ছিলাম এইমাত্র। সে ব্যাপারে কিছু বলতে যাব, তখনই সনাতন ফের ঘরে এসে ঢুকল।

একজন মেয়েছেলে দেখা করতে এয়েছেন। খুব নাকি দরকার তেনার।

মেয়েছেলে? সোমদেব বলল, এই সক্কালবেলায় মেয়েছেলে কে আবার এসেছে! ঠিক আছে, নিয়ে এসো।

একটু পরে সনাতনের পেছন পেছন ঘরে ঢুকল সাতাশ-আঠাশ বছরের এক মহিলা। ভদ্রমহিলাকে নিঃসন্দেহে সুন্দরী বলা চলে। নির্মেদ ফরসা শরীর, আকর্ষণীয় মুখশ্রী। পরনে সাধারণভাবে পরা একটা একরঙা ধূসর শাড়ি। মলিন চোখমুখ দেখে মনে হল ভদ্রমহিলার সময় এখন ভাল যাচ্ছে না। অবশ্য সময় ভাল গেলে সোমদেবের কাছে আসবেই বা কেন।

সোমদেব চেয়ার দেখিয়ে বলল, বসুন।

ভদ্রমহিলা চেয়ারে বসে সামান্য সময় মাথা নিচু করে থাকলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন, আমি শিলিগুড়ি থেকে আসছি। চারদিন আগে মালবাজারের কাছে আমার স্বামী মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন, সেই ব্যাপারে—

তাঁকে থামিয়ে সোমদেব বলল, মাফ করবেন, আপনি কি সুশোভন মজুমদারের কথা বলছেন? এইমাত্র খবরের কাগজে এরকম একটা সংবাদ পড়লাম।

ভদ্রমহিলা মৃদুগলায় বললেন, হ্যাঁ। এই অবস্থায় অনেকটা বাধ্য হয়েই আপনার কাছে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি। পরে বললে হয়তো দেরি হয়ে যাবে।

সোমদেব সমব্যথী গলায় বলল, খুবই আনফরচুনেট ঘটনা। সুশোভনবাবুকে আমিও চিনতাম। চমৎকার মানুষ ছিলেন।

ভদ্রমহিলা চুপ করে রইলেন।

সোমদেব আবার বলল, একাই এসেছেন শিলিগুড়ি থেকে?

ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, সঙ্গে আমার ভাই আছে। নীচে গাড়িতে বসে আছে। আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি আমার স্বামীর মুখে। কাগজেও মাঝেমাঝে পড়ি। তাই কয়েকটা কথা আপনাকে জানানো উচিত মনে হল।

সোমদেব বলল, বেশ তো। বলুন, কী বলতে চান।

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না। কিছু ভাবলেন যেন। বোধহয় কী বলবেন, কতটুকু বলবেন, সাজিয়ে নিলেন মনে মনে। একবার আড়চোখে তাকালেন আমার দিকে। ইতস্তত করলেন আমার সামনে তাঁর কথা বলবেন কিনা। একান্ত ব্যক্তিগত কথাবার্তায় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ঠিক স্বচ্ছন্দ হতে পারছিলেন না।

সোমদেব বলল, ও আমার বন্ধু অমল। ওর সামনে অনায়াসে সব কথা বলতে পারেন। ওর সঙ্গে আলোচনা করেই আমি রহস্যভেদ করার চেষ্টা করি।

কথাগুলো অবশ্যই সোমদেবের অতিশয়োক্তি। কিন্তু তার জন্যে ভদ্রমহিলাকে কিছুটা সাবলীল দেখাল। ভদ্রমহিলা বললেন, আমি পারমিতা। পারমিতা মজুমদার। সবকথা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব কিনা জানি না। তবু বলছি।

২

পারমিতা যা বলল তা গল্পের আকারে বললে এইরকম দাঁড়ায়।

কয়েকদিন আগে সুশোভন আর তার বন্ধু অনিমেষ মালবাজারে তাদের আরেক বন্ধু রাজীবের বাড়িতে গিয়েছিল কাজ থেকে ছুটি নিয়ে নিছকই কয়েকটা দিন ডুয়ার্সের চা বাগান আর বনজঙ্গলের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কাটিয়ে দিতে। মালবাজারে রাজীবের পেট্রল পাম্প আর মোটর গ্যারেজের বিরাট ব্যাবসা। সুশোভনেরও পেট্রল পাম্প আছে শিলিগুড়িতে। ব্যাবসার সূত্রেই দু'জনের মধ্যে বেশ কয়েক বছরের বন্ধুত্ব। তৃতীয়জন অনিমেষ আবার সুশোভনের বাল্যবন্ধু। অনিমেষের শিলিগুড়িতে চালু ওষুধের দোকান আছে। তার সঙ্গে রাজীবের পরিচয় সুশোভনের মারফত। মালবাজারে পারমিতাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল সুশোভন। কিন্তু কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধের জন্যে পারমিতার যাওয়া হয়নি। ঠিক হল যে-কয়েকদিন সুশোভন শিলিগুড়িতে থাকবে না, সেই কয়েকদিন পারমিতার মা আর বোন এসে থাকবে বাড়িতে। সুশোভন প্রতিবছরই একবার মালবাজারে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যায়। কয়েকদিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসে তার কর্মব্যস্ত জীবনে।

এবার সুশোভন তার বন্ধু অনিমেষকে নিয়ে গিয়েছিল মালবাজারে। মঙ্গলবার আর বুধবার হইহই করে কাটিয়ে বুধবারই বিকেলের দিকে অনিমেষ চলে যায় মাইল দশেক দূরের এক চা-বাগানে। ওই চা-বাগানে অনিমেষের বোন থাকে। ভগ্নিপতি চা-বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। অনিমেষের কাছ থেকে ফোন পেয়ে ভগ্নিপতি দিব্যেন্দুই বুধবার বিকেলে গাড়ি নিয়ে এসেছিল অনিমেষকে নিয়ে যাবার জন্যে। বৃহস্পতিবার সারাদিন বোনের কাছে কাটিয়ে শুক্রবার সকালেই অনিমেষ ফিরে আসবে মালবাজারে। ওই দিনই তাদের শিলিগুড়িতে ফিরে যাবার কথা।

ঘটনাটা ঘটল অনিমেষ চলে যাবার পর বৃহস্পতিবার সকালে। বেলা দশটা নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে ফোন এল সুশোভনের কাছে। তাকে জানানো হল স্টোভ বার্স্ট করে পারমিতা গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছে। তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। সুশোভন যেন এক মুহূর্ত দেরি না করে শিলিগুড়িতে চলে আসে। ফোন পেয়ে তক্ষুনি সুশোভন তার টাটাসুমো গাড়ি চালিয়ে শিলিগুড়ি রওনা দিল। রাজীবকে বলে গেল অনিমেষ চা-বাগান থেকে এলে সে যেন বাসে কিংবা ট্যাক্সিতে শিলিগুড়িতে চলে আসে।

সুশোভন রওনা দেবার আধঘণ্টা পরে সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ আসে। মালবাজার থেকে কয়েক মাইল দূরে রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে সুশোভনের গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে একটা গাছের সঙ্গে। ঘটনাস্থলেই সুশোভনের মৃত্যু হয়। সুশোভনের গাড়ির পেছনে একটা ট্রাক যাচ্ছিল। সেই ট্রাকের ড্রাইভার এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

পারমিতা যতটুকু জানে আর যতটুকু শুনেছে, তা এইটুকুই।

পারমিতা থামলে সোমদেব একটু সময় চুপ করে থেকে ভাবল। তারপর বলল, অথচ দেখা যাচ্ছে আপনি অগ্নিদগ্ধ হননি এবং বহাল তবিয়তে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। আপনার বলার বিষয় তো এই?

পারমিতা বলল, হ্যাঁ। ব্যাপারটা ভারী আশ্চর্যজনক নয় কি?

সেইসঙ্গে রহস্যজনকও। কিন্তু সুশোভনবাবু এইরকম একটা ফোন পেয়েছিলেন, তা আপনি জানলেন কেমন করে? ঘটনার সময় তো আপনি শিলিগুড়িতে ছিলেন?

পারমিতা বলল, রাজীববাবু শিলিগুড়িতে আমার কাছে এসেছিলেন সমবেদনা জানাতে। তাঁর মুখ থেকে সব শুনেছি। তিনিও ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন আমার কিছু হয়নি দেখে। মিস্টার সোম, আমার বিশ্বাস অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটানো হয়েছে। সুশোভনকে ট্র্যাপে ফেলে হত্যা করা হয়েছে।

সোমদেব বলল, কিন্তু এসব তো পুলিশের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। পুলিশকে জানাননি আপনার সন্দেহের কথা?

পারমিতা হতাশ গলায় বলল, কী লাভ! পুলিশকে জানিয়ে কোনও লাভ হবে না। রুটিন ডিউটির বাইরে পুলিশ কিছু করবে না।

এবার আমি বললাম, আমারও সেরকম মনে হয়। পুলিশ খোসা ছাড়িয়ে কিছু দেখবে না। তুই কেসটা টেকআপ কর সোম। রহস্যটা অনেক গভীরে মনে হচ্ছে।

পারমিতা বলল, আর একটা কথা মিস্টার মিত্র। সুশোভন কিন্তু কক্ষনও মাথা ঠান্ডা না-রেখে কিছু করার লোক ছিল না। গাড়ি সে সাবধানেই ড্রাইভ করত। আমি কখনও তাকে রাশ ড্রাইভ করতে দেখিনি। হঠাৎ ফোন পেয়ে কোনও খোঁজখবর না করে তার এইভাবে বেরিয়ে যাওয়াটা কেমন অদ্ভুত মনে হয়। সন্দেহ হচ্ছে কোনও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে সে।

সোমদেব চিন্তিত মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। পারমিতার আয়ত চোখের কোলদুটো তখন টলমল করছে অশ্রুজলে। সুডৌল মুখ বিষণ্ণ হয়ে আছে প্রিয়জনকে সদ্য হারানোর শোকে। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে আবার সে বলল, সুশোভন তো চলেই গেছে। তবু তার চলে যাবার পেছনে কোনও শয়তানের হাত আছে কিনা জানতে পারলে কিছুটা শান্তি পেতাম। মিস্টার মিত্র, সেইজন্যেই আপনার কাছে এসেছি। একমাত্র আপনিই পারেন এই রহস্যভেদ করে প্রকৃত সত্যকে উদ্ধার করতে।

এক মিনিট। বলে সোমদেব উঠে গিয়ে নিজের ডায়রিটা দেখল। তারপর ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার হাতে নিয়ে নম্বরের বোতাম টিপতে টিপতে বলল, দেখি, রাজীবকে পাওয়া যায় কিনা।

রাজীবকে পাওয়া গেল। সোমদেব মালবাজারে ওর কাছে আসছে জেনে রাজীব স্বভাবতই খুশিখুশি। আরও দু'-চারটে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা সেরে সোমদেব ফোন নামিয়ে রাখল। ওকে একবারও কিন্তু গাড়ি দুর্ঘটনা কিংবা সুশোভন মজুমদারের মৃত্যু সম্পর্কে কোনও কথা বলতে শুনলাম না। মনে হয় সাক্ষাতেই সে এ-ব্যাপারে কথা বলবে। সোমদেবকে কখনও তড়িঘড়ি করে কিছু করতে দেখিনি। তা ছাড়া এসব কথা ফোনের আলোচনায় বিশেষ এগোয়ও না।

আমি ভাল করেই জানি এরকম একটা অদ্ভুত রহস্যের ব্যাপার সোমদেবকে আকর্ষণ করবেই। রহস্যটাকে সে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নেবে। যেখানে আপাতদৃষ্টিতে কিছু নেই মনে হয়, সেখানেই সোমদেব আঁতিপাঁতি করে খোঁজে কিছু পাবার জন্যে। কাজেই সে নির্দ্বিধায় কেসটা গ্রহণ করল।

চেন টেনে হাতের ব্যাগটা খুলে পারমিতা বলল, যদি কিছু মনে না করেন, আমি কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে চাই।

সোমদেব হাত তুলে পারমিতাকে থামিয়ে দিল।

আমি রহস্যের ফেরিওয়ালা নই মিসেস মজুমদার, আমি রহস্যসন্ধানী। সুশোভনবাবুকে আমি চিনতাম। আপনার দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য বলেই মনে করি। মনে হচ্ছে দুর্ঘটনাটা অন্তঃসারশূন্য নয়। যদি সত্যিই তাই হয়, সত্যিই যদি কেউ ঘটনার জন্য দায়ী থাকে, তার মুখোশ আমি খুলে দেব। অপরাধের সঙ্গে আমি কখনও আপস করি না।

অভিভূত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে পারমিতা বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সোমদেববাবু।

সোমদেব বলল, একটা কথা। ফোনটা কে করেছিল বলে আপনার মনে হয়?

সেরকম কাউকে তো মনে হচ্ছে না। রাজীববাবুকে কিছু বলেনি সুশোভন।

পুরুষকণ্ঠ না মহিলাকণ্ঠ, তাও জানা যায়নি?

পারমিতা মাথা নাড়ল। না, তাও জানা জায়নি।

তার মানে রাজীবকে কিছু বলেননি সুশোভন। সময় পাননি, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছেন।

পারমিতা বলল, রাজীববাবুকে শুধু বলেছিল পারমিতার মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হসপিটালাইজড হয়েছে। আমাকে এক্ষুনি শিলিগুড়িতে চলে যেতে হবে।

সোমদেব এক মুহূর্ত কিছু ভেবে নিয়ে বলল, অনিমেষবাবু নিশ্চয়ই শিলিগুড়িতে ফিরে এসেছেন?

পারমিতা মৃদুগলায় শুধু বলল, হ্যাঁ।

তাঁকে ঘটনার কথা কে জানিয়েছিল?

রাজীববাবু। তখনই চা-বাগানে ফোন করে জানানো হয়েছিল।

অনিমেষবাবু কী বলেন?

কী বলবে! সে তো ঘটনার সময় অন্য জায়গায়। চা-বাগানে। অনিমেষ এই ঘটনায় ভীষণ আপসেট। খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল তো।

অনিমেষ অনিমেষ বলছেন, আপনারও গুড ফ্রেন্ড নিশ্চয়ই অনিমেষ?

পারমিতা মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ জানিয়ে চুপ করে রইল।

সোমদেব বলল, ঠিক আছে। আমি দেখছি কতদূর কী করতে পারি। দরকার পড়লে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আপনার ফোন নম্বরটা দিন।

পারমিতা ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে সোমদেবের হাতে দিয়ে বলল, এতেই বাড়ির ফোন নম্বর পাবেন।

উঁকি মেরে দেখলাম কার্ডটা সুশোভন মজুমদারের নামের।

৩

পরের দিনই বিকেলে আমি আর সোমদেব মালবাজার পৌঁছে গেলাম। ছুটিছাটা নেবার অসুবিধের কথা বলে আমি দু'-একবার মৃদু আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু সোমদেব আমার কোনও ওজর-আপত্তির কথা শুনল না। একরকম বগলদাবা করেই আমাকে নিয়ে চলল। অবশ্য আমারও যে যেতে একেবারেই ইচ্ছে ছিল না তাও নয়। রহস্যময় ফোনের জন্যে কৌতূহল তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল ডুয়ার্সের দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি আকর্ষণ। খুশি মনেই সোমদেবের সঙ্গী হলাম।

রওনা হবার আগে রাজীবকে ফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৌঁছে দেখলাম রাজীব আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করার জন্যে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে আমাকে দেখে খুব খুশি হল। ডুয়ার্সের এক প্রান্তে থাকে, বন্ধুবান্ধব বেড়াতে এলে খুশিই হয়। ছেলেমানুষের মতো হইহই করে।

মালের একপাশে রাজীবের বাংলো প্যাটার্নের সুদৃশ্য বিরাট বাড়ি। বাড়ির একদিক থেকে শুরু হয়েছে চা-বাগান অঞ্চল, অন্যদিকে বিস্তৃত গহীন বনভূমি। উত্তরে অনেক দূরে আকাশ আর মাটির দিগন্ত পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয় পর্বতমালা। সবকিছু যেন এক দক্ষ শিল্পীর নিপুণ তুলিতে আঁকা সিল্যুয়েট। আমি এই প্রথম রাজীবের বাড়িতে এলাম। এসে মনে হল, না এলে এমন পরিবেশ অদেখা থেকে যেত।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ির কম্পাউন্ড। কম্পাউন্ডের মধ্যে ফুলের বাগান, দুর্লভ অর্কিড আর ঝাউ, দেবদারু, ফার্ন গাছ, দুর্বাঘাসের সবুজ লন। লনের বুক চিরে নুড়ি বিছানো রাস্তা। বৈভব আর রুচির সার্থক সমন্বয়।

আমাদের পেয়ে রাজীব খুশি হয়েছিল ঠিকই, তবু মাত্র কয়েকদিন আগের শোচনীয় ঘটনার মলিন ছায়া তখনও তার মুখে ভাসতে দেখলাম।

সোমদেব বলল, এ-সময়ে হঠাৎ এসে তোকে বিরক্ত করার ইচ্ছে ছিল না, আবার না এসেও পারলাম না।

রাজীব বলল, বন্ধুর কাছে আসার কোনও অসময় নেই। সব সময়ই সময়। কিন্তু তুই তো হঠাৎ

অকারণে আসার লোক নোস। তা বরাতটা কার দেওয়া? কার দরকারে আসা হয়েছে ডিটেকটিভ মহাশয়ের?

রাজীবের কথায় সামান্য আঁচড় ছিল, কিন্তু সেটা আমলে আনল না সোমদেব। বলল, তুই তো ভাল করেই জানিস আমি পরের মুখে ঝাল খাই না। ইচ্ছেটা একান্তই আমার। তবে ইচ্ছেটা অন্য কেউ তৈরি করে দিয়েছে, এমনও হতে পারে। আমি বললাম, ব্যস, বাচ্চাদের মতো শুরু হয়ে গেল ঝগড়া।

রাজীব বলল, এতদিন পরে দেখা, ঝগড়া না করলে বন্ধুত্বটা কেমন আলুনি আলুনি লাগে। কী বল সোম?

সোমদেব হা হা করে হেসে উঠল।

রাজীব ফের বলল, তবে ঝগড়া করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন থাক। এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে এসেছিস, হাতমুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে সন্ধে পর্যন্ত কমপ্লিট রেস্ট। সন্ধের পর কথাবার্তা বলা যাবে। কী রে সোম, পাখি মারতে যাবি তো? মাইলচারেক দূরে একটা জলামতো আছে। সেখানে মেলা পাখি আসে। তিতির, চখা, হরিয়াল।

আমি বললাম, পাখি মারতে তো বন্দুক লাগে। আছে? সোমদেব বলল, ডুয়ার্সের লাইফই হল ওয়াইল্ড লাইফ। মানুষের থাবা নেই, আছে বন্দুক। ওটা থাকতেই হবে। তবে পক্ষীনিধন, রক্তপাত, ব্যাপারটা এখন আর পছন্দ হয় না। যাক গে, এখন তো ফ্রেশ হয়ে নেওয়া যাক আগে। পরে ভাবা যাবে।

রাজীবের পিছু পিছু আমরা ভেতরে গেলাম।

রাজীবের বিরাট বাড়িতে অনেকগুলো ঘর, কিন্তু ঘরে থাকার লোক কম। রাজীব, রাজীবের স্ত্রী নন্দিনী, চার বছরের মেয়ে তিন্নি। আর আছেন রাজীবের বৃদ্ধা মা। কাজের লোক দু'জন, একজন মালী। মালী আর একজন কাজের লোক থাকে বাগানের উত্তরদিকে টিনের চালেব একতলা ঘরে। এতবড় বাড়ি, কিন্তু হইহই করে বাড়ি মাতিয়ে রাখার লোক কেউ নেই। চার বছরের তিন্নিই শুধু কখনও কখনও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়। ছোটাছুটি করে এঘর-ওঘর করে, অনর্গল কথা বলে চলে। ওইটুকুতেই যা বাড়ির প্রাণের স্পন্দন টের পাওয়া যায। রাজীবের মা সারাদিন গৃহদেবতার পুজো নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অবশ্য আমরা আসাতে তিনি আমাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা নিয়ে খোঁজখবর করেছেন, আমাদের ভালমন্দ খবরও নিয়েছেন। আর রাজীবের স্ত্রী নন্দিনী যে আমাদের যত্নআত্তির কোনও ত্রুটিই রাখবে না, প্রথম দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। শুধু আচার ব্যবহারে নয়, ছোটখাটো গোলগাল নন্দিনীর চেহারার মধ্যেও একটা শান্ত লক্ষ্মীশ্রী ভাব আছে। রাজীব স্ত্রীর হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে নিজের ব্যাবসা নিয়েই থাকে। সবই ঠিক আছে, তবু বাড়িটাকে কেমন যেন বড্ড চুপচাপ মনে হচ্ছিল। বোঝা যায়, মাত্র কয়েকদিন আগে যে-শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তার রেশ এখনও বাড়ি থেকে মিলিয়ে যায়নি। এমনটা তো হতেই পারে। মৃত্যু তো এ বাড়ির অতিথিরই হযেছে।

এ-সময় আরেকজন মানুষও ছিল বাড়িতে। নন্দিনীর ভাই সুকান্ত। শিলিগুড়ি থেকে মাঝেমাঝেই মালবাজারে আসে। দু'-চারদিন থেকে আবার চলে যায়। পুরো স্বাভাবিক মানুষ বলতে যা বোঝায় সুকান্ত সেরকম নয়। কিছুটা মানসিক অবসাদে আক্রান্ত। কাজকর্ম কিছুই করে না।

আমাদের থাকার জন্য একটা দুই বিছানার সুসজ্জিত বড়সড় ঘর দেওয়া হয়েছিল। সে-ঘরে আধুনিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থাই আছে। উত্তরদিকে বড় বড় দুটো জানলা। জানলার পরদার সরিয়ে দিলে বাইরের নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে পড়ে। সামনে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে একটা ছোট পাহাড়ি নদী, নদী পেরিয়ে চা-বাগান, চা-বাগানের পেছনে সবুজ বন। আরও দূরে নীল আকাশ আর ধূসর পাহাড়ের রূপবত্তার যুগলবন্দি। মোহিত হয়ে দ্যাখার মতো প্রাকৃতিক দৃশ্য।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখতে দেখতে বললাম, দারুণ সুন্দর জায়গা কিন্তু।

সোমদেব বিছানার ওপর বাবু হয়ে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল, শুধু সুন্দর নয়, রহস্যময়ও। রহস্যময়তা না থাকলে সৌন্দর্য কখনও গভীর হয় না। যেমন মোনালিসার ছবি।

যেমন জীবনানন্দের কবিতা।

সোমদেব বলল, রাইট।

তখনই রাজীব ঘরে ঢুকে বলল, অসুবিধা হচ্ছে না তো?

সোমদেব লঘু গলায় বলল, একটু হচ্ছে বই কী। এত আদরযত্ন আগে পাইনি তো। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম।

রাজীব হাসল, বিনয়ের অবতার দেখছি। এবার তোদের কথা বল। দাঁড়া, আরেক রাউন্ড কফি হয়ে যাক। নন্দিনীর আসছে উইথ কফি।

একটু পরেই একটা ট্রেতে কাপ আর কফির পট নিয়ে নন্দিনী ঘরে ঢুকল।

সোমদেব বলল, সেকী, আপনি কেন? কাউকে পাঠিয়ে দিতে পারতেন।

নন্দিনী কাপে কফি ঢালছিল। সে কিছু বলার আগেই রাজীব বলল, অতিথি আপ্যায়ন নিজের হাতে করাটাই গৃহস্থের কর্তব্য।

নন্দিনী শুধু হাসল। আমার কেন যেন মনে হল হাসিটা তৈরি করা শিষ্টাচার। নন্দিনী ঠিক সাবলীল নেই। তাকিয়ে দেখলাম সোমদেবও সেটা লক্ষ করছে।

সংসারে কত কী ঘটনা থাকে, বাইরে থেকে কতটুকুই বা জানা যায়! কফি খাওয়ার পর তিন বন্ধু বিছানায় গোল হয়ে বসলাম গল্প করতে।

সোমদেব বলল, তুই ঠিক ধরেছিস রাজু, অকারণে আমি আসিনি। খবরের কাগজে গতকালই সুশোভন মজুমদারের মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর খবর পড়লাম। অ্যাক্সিডেন্টটা তো এখানেই ঘটেছে।

রাজীব বলল, শুধু তাই নয়, সুশোভন আমার কাছেই বেড়াতে এসেছিল।

সোমদেব বলল, তাও জানি। সুশোভনবাবু তোর বন্ধু ছিলেন। আমার বেশ মনে আছে তোর সঙ্গে একবার ওর শিলিগুড়ির পাম্প স্টেশনে গিয়েছিলাম। খুব চমৎকার লোক ছিলেন।

রাজীব বলল, তা হলে সুশোভনের মৃত্যুর ব্যাপারেই তুই এসেছিস? আমি এইরকমই ধারণা করেছিলাম। তুই গোয়েন্দা, রহস্যের গন্ধ পেলে তুই তো আসবিই। কিন্তু বুঝতে পারছি না রহস্যের ব্যাপারটা তোকে কে বলল! পেপারে তো খবরটা ছিল না।

কোন রহস্যের কথা তুই বলছিস?

রহস্য তো একটাই। সুশোভন রওনা হবার পর একটা ফোন এসেছিল।

সোমদেব বলল, তোর কাছে পরিষ্কার থাকাই ভাল। সুশোভনের স্ত্রী পারমিতা আমার কাছে এসেছিল। সে-ই ফোনের কথাটা বলল। শুনে আমারও ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হল। পারমিতা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, অথচ সুশোভনকে ফোনে জানানো হল সে গুরুতর অগ্নিদগ্ধা হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছে। এমন একটা সংবাদে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে সুশোভন তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে শিলিগুড়ি রওনা দেয়। খুব সম্ভব দারুণ টেনশনে থাকার জন্যে সে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসে।

একটু চুপ করে থেকে রাজীব বলল, টেলিফোনের কথাটাও আমিই শিলিগুড়িতে গিয়ে পারমিতার সঙ্গে দেখা করে বলেছি। ঘটনার দিন সকালে কী একটা কিনতে যেন কাছের একটা দোকানে— মনে পড়েছে, একটা ব্লেড কিনতে গিয়েছিলাম। দশ-পনেরো মিনিটের ব্যাপার। বাড়িতে ফিরেই দেখি সুশোভন ওর টাটা সুমো গাড়িটাতে স্টার্ট দিচ্ছে। বলল এখনই তার শিলিগুড়ি যেতে হবে। আমি অবাক হয়ে কারণ জানতে চাইলাম। বলল পারমিতার খুব খারাপ অবস্থা। এইমাত্র ফোনে তাকে জানানো হয়েছে। আগুনে পুড়ে হাসপাতালে আছে। অনিমেষকে যেন ঘটনাটা জানিয়ে দেওয়া হয়। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে হুস করে বেরিয়ে গেল।

প্রথমে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। পরে ঠিক করলাম সুশোভনের বাড়িতে ফোন করে ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে। তেমন বুঝলে আমিও চলে যাব শিলিগুড়িতে। কিন্তু—

রাজীব একটা হতাশ ভঙ্গি করে চুপ করল।

সোমদেব বলল, কিন্তু যাওয়া হল না, তাই তো?

রাজীব বলল, তাই-ই। এসব করব বলে যখন ভাবছি, তখনই সেই ভয়ংকর খবরটা এল। এদিককার এক ট্রাক ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল, সেই জানকীরাম একজনকে দিয়ে খবর পাঠাল মাইল দশেক দূরে একটা টাটা সুমো গাড়ি গাছের সঙ্গে ধাক্কা মেরে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। সুশোভনকে ওই ড্রাইভার আমার এখানে দেখেছে, তাই আমার কাছে খবরটা পাঠিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি কয়েকজনকে নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি, কী বলব, হরিবল সিন! গাড়ির স্টিয়ারিংটা সুশোভনের বুকে চেপে বসে আছে— রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাথা— অলরেডি এক্সপায়ার্ড। কিছু করার নেই আমার।

সোমদেব বলল, বড় গাছের সঙ্গে ধাক্কা মেরেছিল গাড়িটা। কী গাছ ওটা?

জানি না কী গাছ, তবে বিশাল গাছ। ওখানে একটা কার্ভ আছে। ব্লাইন্ড কার্ভ। স্পিড কন্ট্রোল করতে না পেরে সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে গাছটার গায়ে।

অ্যাক্সিডেন্টটা কেউ দেখেছিল? প্রত্যক্ষদর্শী কেউ আছে?

ওই যে ট্রাক ভাইভার জানকীরাম। জানকীবামের ট্রাককে ওভারটেক করে একটু পরেই সুশোভনের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে। জানকীরাম সব দেখেছে।

সোমদেব বলল, সুশোভন কি ড্রিঙ্ক করত? সেদিন সকালে কি করেছিল?

রাজীব সোমদেবের দিকে তাকিয়ে থাকল একটু সময়। তারপর বলল, আগে অল্পস্বল্প করত ইদানীং একটু বাড়িয়ে দিয়েছিল। যদ্দুর মনে পড়ছে সেদিন সকালে কবেছিল।

ড্রিঙ্ক করে কি— কে জানে? তবে একটা ব্যাপার একটু আশ্চর্য ঠেকছে।

কোনটা?

সুশোভনের অ্যাক্সিডেন্ট তার চরিত্রের সঙ্গে ঠিক মিলছে না।

মদ খাওয়াটা?

উঁহুঁ, অ্যাক্সিডেন্ট করাটা। নিজের পাম্প আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ওই গাড়ি নিয়েই। গাড়ি চালানোর নিয়মকানুন ওর ভাল করেই জানার কথা। সেই কিনা ছেলেমানুষের মতো এরকম একটা মেজর অ্যাক্সিডেন্ট করে বসল। অবশ্য ওরকম একটা ফোন পেলে অতিরিক্ত টেনশন থাকবারই কথা? কিন্তু ফোনটা কে করেছিল, সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করিসনি?

কাকে জিজ্ঞেস করব? সে তো তখন অলরেডি রওনা দিয়ে দিয়েছে।

বাড়ির কেউ বলতে পারছে না? ফোনটা প্রথম রিসিভ করেছিল কে?

সুশোভন নিজেই। বাড়ির কাজের লোক তাই তো বলল। সুশোভন নাকি তখন ফোনের কাছে দাঁড়িয়ে তিন্নির সঙ্গে কথা বলছিল।

অনিমেষবাবু? অনিমেষবাবুর বক্তব্য কী?

রাজীব যেন থমকে গেল। একটু চুপ করে থেকে মৃদুগলায় বলল, অনিমেষবাবুকে আমি ঠিকমতো জানি না। সুশোভনের বন্ধু, এই পর্যন্তই। আলাপ পরিচয়ে যতটুকু জানা যায়, স্রেফ ততটুকুই জানি। তার একটুও বেশি নয়।

সোমদেবের কপালে ভাঁজ পড়ল।

কী ব্যাপার রে রাজু?

রাজীব বলল, কী ব্যাপার মানে?

তোকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। অনিমেষবাবুকে কি তুই—।

৪

রাজীব বলল, না না, সেসব কিছু নয়। সন্দেহ টন্দেহ্ করি না। আর সন্দেহ্ করারও বা কী আছে? পরিষ্কার অ্যাক্সিডেন্টে সুশোভন মারা গেছে। আই উইটনেস আছে। পুলিশের বক্তব্যও তাই। তবে—

কী তবে?

মানে অনিমেষবাবু আগে কোনও প্রোগ্রামের কথা বলেনি। হঠাৎ করেই আগের দিন বুধবার বিকেলেই চলে গেল বোনের কাছে। ভগ্নিপতি অবশ্য নিতে এসেছিল।

কোথায় গেল?

কাছেই এক চা-বাগানে। অনিমেষবাবুর ভগ্নিপতি ওই বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। তিনি নিয়ে যেতে এসেছিলেন। হঠাৎ থেমে গিয়ে রাজীব বলল, কেন, তুই জানিস না? পারমিতা তোকে সব কথা বলেনি?

সোমদেব হাসল। বলল, বলেছে। তবে ওর কথা বিশ্বাস করা কিংবা না-করা আমার ব্যাপার। তুই তো জানিসই আমি সত্যসন্ধানী। যাচাই না করে বিচার করি না কোনটা সত্য আর কোনটা সত্য নয়। কিংবা কোনটা অর্ধসত্য। তা ছাড়া পারমিতা কিছুই দ্যাখেনি। শুধু শুনেছে। তোর কাছ থেকে শুনেছে। তুই যতটুকু বলেছিস, ততটুকুই সে আমাকে বলেছে।

রাজীব বলল, শুধু আমিই যে পারমিতাকে বলেছি তা তো নয়। অনিমেষবাবুও নিশ্চয়ই বলেছে। অনিমেষবাবু শুধু সুশোভনের বন্ধু নয়, পারমিতারও বন্ধু। শিলিগুড়িতে সুশোভনের পেট্রল পাম্পের কিছু কর্মী তো এইরকমই ইঙ্গিত করল। লোকে অবশ্য কত কথাই তো বলে। তিলকে তাল করে।

সোমদেব চুপ করে রইল। তার কপালের ভাঁজগুলো এখন আরও স্পষ্ট। সোজা চলতে চলতে সে এমন একটা বাঁকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে রাস্তা দু'দিকে দু'ভাগ হয়ে গেছে। সোমদেব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কোন রাস্তা দিয়ে সে এগোবে। দীর্ঘদিন ধরে সোমদেবকে খুব কাছে থেকে দেখছি। তার এইরকম মানসিক পরিস্থিতির সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। নিশানাবিদ্ধ করার আগে ধনুর্ধরের বুঝি এইরকমই মনঃসংযোগ থাকে।

রাজীবকে খুবই বিরক্ত দেখাল। বলল, কী ডিসগাস্টিং ব্যাপার বল দেখি! আমার এখানে বেড়াতে এল আর এখানেই কিনা অ্যাক্সিডেন্টটা করে বসল। আর এমনই অ্যাক্সিডেন্ট করল যে এক মিনিটও বাঁচল না। স্পট ডেথ। বেশ ছিলাম, কোথা থেকে এক বিশ্রী ঘটনা এসে সব গোলমাল করে দিল। রাবিশ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফোনটা নিশির ডাকের মতো সুশোভনকে ডেকে নিয়ে গেছে।

সোমদেব কিছু বলল না। সিগারেট ধরিয়ে জানলার বাইরে দূরমনস্ক হয়ে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, কী আর করা যাবে। অ্যাক্সিডেন্ট তো আর আগাম জানান দিয়ে হয় না। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই।

সোমদেব হঠাৎ রাজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই পারমিতাকে আগে থেকে চিনতিস? বিয়ের আগে থেকে?

রাজীব প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, বিন্দুমাত্র না। চেনা তো দূরের কথা, তাকে দেখিওনি।

পরের দিন সকালে রাজীব তার কাজে বের হবে, সোমদেব বলল, আমরা আর ঘরে বসে থেকে কী করব, বরং চারপাশটা ঘুরে বেড়িয়ে দেখি।

রাজীব বলল দ্যাখার মধ্যে তো ওই চা-বাগান আর ফরেস্ট। আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব। যাবি নাকি আমার সঙ্গে?

সোমদেব বলল, তোর গ্যারেজ কিংবা পেট্রল পাম্প তো? ওসব দেখে কী হবে। চা-বাগান আর

ফরেস্টই তো ডুয়ার্সের মেইন অ্যাট্রাকশন। বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট। এমন নেশা ধরানো সৌন্দর্য সমঝদারকে সবসময় টানে।

রাজীব লঘু গলায় বলল, তুই নিজেকে সত্যসন্ধানী বলিস, এখন দেখছি তুই কবিও বটে।

সোমদেব বলল, কবিরাই তো প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা। আমরা যতদূর দেখি, কবিরা তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে দ্যাখে। অনাগত কালকে দেখে। তবে দুঃখের বিষয়, আমি এক শতাংশও কবি নই। কাজেই ও-প্রসঙ্গ থাক। কথা হচ্ছে, কাল সকালেই কিন্তু চলে যাচ্ছি। ব্যাক টু দ্য প্যাভেলিয়ান।

রাজীব বলল, ডিটেকটিভ মহাশয়ের তদন্ত কি শেষ?

তদন্ত? সোমদেব হাসল। বলল, তোকে তো আগেই বলেছি সামান্য একটা কৌতূহল মেটাতে আমার এখানে আসা।

সে কৌতূহল মিটেছে?

সোমদেব সামান্য ভেবে বলল, মিটেছে কিনা শেষ কথা এখনই বলতে পারছি না। তবে মনে হয় কেসটার মধ্যে গভীর কোনও রহস্য নেই। খুব স্পিডে গাড়ি চালাতে গিয়ে, সম্ভবত ড্রাঙ্ক থাকার জন্যেই, সুশোভনবাবু অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। ক্লিয়ারকাট কেস। সে-ব্যাপারে আই উইটনেসও আছে। এক ফোনের কথাটাই সামান্য ভাবাচ্ছে। কেউ কি মজা করার জন্যে এই অ্যানোনিমাস ফোনটা করেছিল, এখন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় চুপ করে আছে?

মজা? রাজীবের চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠল, এমন নিষ্ঠুর প্রাণঘাতী মজা কেউ করতে পারে? কী লাভ তার?

সোমদেব বলল, যে মজা করে, মজা পাওয়াটাই তার লাভ। যাক গে সে-কথা। তুই তো এখন বেরোচ্ছিস, আমরাও বের হব একটু পরে।

রাজীব বলল, কাছাকাছিই থাকিস কিন্তু, বেশি দূরে কোথাও যাস না। আমারও ইচ্ছে ছিল তোদের সঙ্গে যাবার, কিন্তু একটা বড় পার্টির ডেলিভারির ব্যাপার আছে। বুঝিসই তো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী লোক। শাঁসালো মক্কেলকে তোয়াজে রাখতে হয়। আমি তা হলে আসি।

রাজীব চলে গেল। একটু পরে আমরাও বের হলাম। বারান্দায় এসেই মুখোমুখি পড়ে গেলাম একটা রোগাটে ধরনের ছেলের। বয়েস বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। বড় বড় চোখে নির্বোধ দৃষ্টি। বুঝলাম এই হল সেই সুকান্ত। রাজীবের শ্যালক, নন্দিনীর ছোটভাই।

সামনাসামনি পড়ে গেছি, কিছু একটা বলতেই হয়। বললাম, কী খবর?

সুকান্ত একগাল হেসে বলল, তোমরাই বুঝি কাল এসেছ?

উত্তর দিল সোমদেব, হ্যাঁ এবং কালই আবার চলে যাব।

সুকান্তকে খুব খুশি দেখাল, কালই চলে যাচ্ছ? ভাল, খুব ভাল। খুব মজা হবে।

আমি বললাম, মজা কেন?

কী উত্তর দেবে, সুকান্ত ঠিক করতে পারল না যেন। মাথা চুলকোতে চুলকোতে একটু সময় উত্তরটা খুঁজল যেন। খুঁজে না পেয়ে বলল, কী জানি! বলে হি হি করে হাসতে থাকল।

তখনই বাড়ির ভেতরে নন্দিনীর কথা শুনতে পেলাম। সুকান্তকে একটু চঞ্চল দেখাল। সে চুপ করে গেল। আর কোনও কথা না বলে তাড়াতাড়ি সামনের ঘরটাতে ঢুকে গেল। আমরাও আর দাঁড়ালাম না।

রাস্তায় এসে আমি বললাম, ছেলেটার বোকাটে বোকাটে মুখ দেখেই বোঝা যায় ও জড়বুদ্ধি গোছের।

সোমদেব বলল, মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না বন্ধু। যারা বলে ফেস ইস দি ইনডেক্স অব দি মাইন্ড, তারা ঠিক বলে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথাটা মেলে না। আমরা যেসব মুখ দেখি, তার অধিকাংশ মুখ অভিনেতা অভিনেত্রীর মুখ, আসল মুখ নয়।

তার মানে আমরা সবাই অভিনয় করি?

অবশ্যই করি। যেহেতু আমরা সবাই মিথ্যে কথা বলি, তাই আমরা সবাই অভিনয়ও করি। তবে বোঝা যায় সুকান্ত সব ব্যাপারেই ভয়ানক ভয় পায়। দিদিকেও ভয় পায়, জামাইবাবুকেও। এরকম অনেকের হয়। ভয় পায়, মাঝেমাঝে চমকে চমকে ওঠে। এটাও একরকমের মানসিক প্রতিবন্ধকতা।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর চলে এসেছিলাম। কাছেই একটা চা-বাগানের শুরু হয়েছে। একদল চা-শ্রমিককে বাগানের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলাম। দলের মধ্যে নানান জাতি-উপজাতির মানুষ রয়েছে। শুধু অরণ্য, চা-বাগান, নদী আর পাহাড় নয়, নানান ভাষাভাষী জাতি আছে বলেই ডুয়ার্স এত বৈচিত্র্যময়।

একটা কথা মনে পড়ল। বললাম, তখন যে তুই রাজীবকে বললি কেসটার মধ্যে কোনও রহস্য নেই, বেশ জানি তুই ইচ্ছে করেই ঠিক কথা বলিসনি।

সোমদেব হাসল। বলল, বড় মাছ ধরতে হলে সুতো টানলেই চলে না, মাঝেমাঝে সুতো ছাড়তেও হয়।

আমি বললাম, তা হলে বলছিস রহস্যটা যথাস্থানেই বিদ্যমান। রাজীবের কথা শুনে তো মনে হয় অনিমেষ সেন একেবারে সন্দেহমুক্ত নয়।

তাই তো মনে হচ্ছে। অনিমেষের আগের দিন বোনের কাছে চা-বাগানে চলে যাওয়া, ফোনের সময় ওর বাইরে থাকা, এগুলোর জন্যে তাকে বেনিফিট অব ডাউট-এ রাখা যায় না।

কিন্তু অনিমেষবাবু এসব করতে যাবে কেন? মোটিভ কী?

সোমদেব বলল, সব মোটিভ সবসময় চর্মচক্ষে দেখা যায় না বন্ধু। রাজীবের কথায় একটা ত্রিকোণ প্রেমের ইঙ্গিত আছে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিস। ওর ধারণা, অনিমেষ আর পারমিতার মধ্যে একটা রোমান্টিক রিলেশন আছে। সেটা থাকলেও প্রশ্ন এসে যায় ওরকম ফোন করে সুশোভনকে লাভ কী? দুর্ঘটনা ঘটা তো একটা হাফচান্স ছাড়া কিছুই নয়। সুশোভন অস্থির ধরনের মানুষ নয়। আনাড়ি ড্রাইভারও নয়। সে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট না-ও করতে পারত। ধরা যাক, অপরাধীর প্ল্যান হচ্ছে সুশোভন ফুল স্পিডে চালিয়ে শিলিগুড়িতে ফিরে আসবে। তারপর। তারপর কী হবে? অ্যাক্সিডেন্টের চান্স থাকছে শতকরা পাঁচ থেকে দশভাগ মাত্র। একমাত্র মোটা বুদ্ধির মানুষ ছাড়া কেউ এই সামান্য সম্ভাবনাকে সামনে রেখে কাজ করবে না। এখন খুঁজতে হবে অন্য কোনও প্ল্যান ছিল নাকি?

অন্য কোনও প্ল্যান বলতে?

সেটাই তো ছাইয়ের তলায় লুকানো রতন। সেটাই খুঁজে বের করতে হবে। যেখানে পাইবে ছাই, উড়াইয়া দ্যাখো তাই।

পাইলে পাইতে পারি অমূল্য রতন?

অর্ধপ্রত্যয়ের গলায় সোমদেব বলল, দ্যাখা যাক।

রাজীবের বাড়িতে আমরা নিজেদের মধ্যে ফোন রহস্য নিয়ে কোনও কথাবার্তা বলিনি। ঘুরে বেড়াবার সুযোগে সেটা সেরে নিচ্ছিলাম। আলোচনা বলতে আমার প্রশ্ন আর সোমদেবের উত্তর।

আমি বললাম, আর রাজীব? রাজীবের ব্যাপারে কী বলবি?

সোমদেব বলল, আগে নিশ্চিত হতে হবে দুর্ঘটনাটা হঠাৎই ঘটে গেছে, না ম্যানমেড দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাটা সুপরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় ঘটানো হয়েছে, তবে এটা হত্যাকাণ্ড। ডেলিবারেট মার্ডার। তাই যদি হয়, দেখতে হবে সুশোভনকে সরিয়ে দিতে পারলে কার লাভ হচ্ছে। মোটিভ ছাড়া কোনও মার্ডার হয় না। সুশোভনের মৃত্যুতে রাজীবের কোনও প্রাপ্তিযোগ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। হত্যা কিংবা হত্যার ষড়যন্ত্রের পেছনে কতগুলো বাস্তব কারণ থাকে। মৃতের অবর্তমানে কেউ হয়তো আর্থিক লাভবান হবে, কেউ পুরনো শত্রুতার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে, কেউ পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিতে পারবে। স্থূল চোখে এর কোনওটাই রাজীবের ক্ষেত্রে খাটছে না। তা ছাড়া সে নিজেও সুশোভন আর অনিমেষকে ডেকে আনেনি। ওরা নিজের থেকেই

ঘুরতে এসেছিল। কাজেই রাজীবের কোনও পূর্বপরিকল্পনার সন্দেহ বাতিল করে দিতে হচ্ছে। সুশোভন রাজীবের ব্যাবসার পার্টনারও নয়। দু'জনের ব্যাবসার ক্ষেত্র আলাদা আলাদা জায়গায়। কী জানিস, আমার মনে হচ্ছে রহস্য যদি কিছু থেকে থাকে, সে রহস্য অনেক গভীরে। সেটা কোনও চতুর মস্তিষ্কপ্রসূত। সম্পূর্ণ অচেনা ঘোড়ার ওপর বাজি ধরতে হবে।

মানে?

আপাতত কোনও মানেটানে নেই। এখন আর কোনও কথা নয়।

৫

চুপচাপ হেঁটে যাওয়া শুধু।

আমরা দু'জনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। কিছুদূর গিয়ে সোমদেব আর সোজা গেল না। ডানদিকের পথ ধরল।

বললাম, এ-পথে আবার কী আছে?

আরক্ষা বাহিনীর চৌকি। অর্থাৎ পুলিশ স্টেশন। অর্থাৎ থানা। নিয়মমতো সুশোভনের দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটা সেখানেই থাকার কথা।

গাড়িটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এতবড় ঘটনার যে মূল কারণ, সুশোভন মজুমদারের সেই টাটা সুমো গাড়িটার তো স্থানীয় থানাতেই থাকার কথা। গাড়িটা দেখলেই অনুমান করা যাবে কীরকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

একটু পরেই আমরা থানায় ঢুকে গেলাম। থানার ওসি তাঁর চেয়ারে বসে একটা ফাইল দেখছিলেন, সোমদেবকে দেখে একটু সময় তাকিয়ে থেকে বললেন, মিস্টার মিত্র না? সোমদেব মিত্র?

সোমদেবের হাসিমুখ বলে দিল ওসি ঠিকই ধরেছেন।

ওসি মহা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হোয়াট এ হ্যাপি সারপ্রাইজ। বসুন বসুন, আপনার কথা আমাদের অফিসারদের মুখে খুব শুনি। আপনাকে দেখেছিও দু'-একবার। পরিচিত হবার এই প্রথম সুযোগ হল। একটু চা বলি?

সোমদেব বলল, ধন্যবাদ। চা থাক। ইদানীং অমৃতে সামান্য অরুচি ধরে গেছে। এতবার চা হচ্ছে যে এনাফ ইজ এনাফ হয়ে যাচ্ছে।

ওসি হাসতে হাসতে বললেন, তবে থাক। এবার বলুন আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?

সোমদেব বলল, এখানে এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে এসেছি। ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করে যাই।

খুব খুশি হলাম। বন্ধুর কথা বলছেন, কে বলুন তো?

রাজীব সোম। পেট্রল পাম্প আছে। চেনেন নিশ্চয়ই।

চিনি, খুব চিনি। মালে থাকব আর রাজিববাবুকে চিনব না? কী যে বলেন।

সোমদেব কাজের কথায় এল। বলল, একেবারেই যে বিনা কারণে এসেছি, তাও অবশ্য নয় ওসি সাহেব। কয়েকদিন আগে মালবাজার থেকে মাইল দশেক দূরে একটা কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। ওই অ্যাক্সিডেন্টে গাড়ির চালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সুশোভন মজুমদার। শিলিগুড়িতে পেট্রল পাম্প আছে। রাজীববাবুর বাড়িতেই উনি উঠেছিলেন। ওঁর বন্ধুলোক। ওসি একটু ঝুঁকে তাকালেন সোমদেবের দিকে, কোনও ফাউল প্লে আছে নাকি ঘটনাটার মধ্যে?

সোমদেব বলল, সেটা ঠিক পরিষ্কার নয় এখনও আমার কাছে। কোথায় যেন একটা ছোট্ট কাঁটা খচখচ করছে। খোঁজখবর করে দেখি ব্যাপারটার কাঁটাটা কোথায়।

ওসি বললেন, আমি তো প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে কেসটা রেকর্ড করেছি।

তাই-ই তো করবেন। আপাতদৃষ্টিতে তো তাই মনে হচ্ছে। সে যাক, আসল কথায় আসি। সুশোভন মজুমদারের সেই গাড়িটা কোথায় রাখা আছে? একটু দেখব।

ওসি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এই তো থানার পেছনেই রাখা আছে। চলুন দেখবেন।

ওসির সঙ্গে আমরা থানার পেছনে গেলাম। থানার কম্পাউন্ডের মধ্যে কিছুটা জায়গা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে দুটো ট্রাকের সঙ্গে সুশোভনের টাটা সুমো গাড়িটাও দেখলাম। সামনেটা ভেঙেচুরে একাকার। বনেট দুমড়ে-মুচড়ে আছে, উইন্ডস্ক্রিনের কিছুই অবশিষ্ট নেই, স্টিয়ারিং চেপে আছে চালকের আসনে। এমনতরো দুর্ঘটনায় গাড়ির চালকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা একশো ভাগ কম। সুশোভনও বাঁচেনি।

ওসি বললেন, কী কাণ্ড দেখুন। পরশুদিন অনেক রাতে থানার কম্পাউন্ডের মধ্যেই চোর এসেছিল। মনে হয় গাড়ির কিছু পার্টস হাতিয়ে নেবার তালে এসেছিল। সেন্ট্রি টের পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাছে যাবার আগেই চোর বেড়া ডিঙিয়ে চম্পট দেয়। কী সাহস দেখুন চোর ব্যাটার। একেবারে বাঘের ঘরে ঘোগ।

সোমদেব নিচু হয়ে গাড়িটা দেখছিল, ওসির কথা শুনে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

চোর এসেছিল? এই গাড়ির পার্টস চুরি করতে?

সেন্ট্রি তাই তো বলল, এই গাড়ির সামনেই চোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

ক'জন ছিল?

একজন। একজনকেই দৌড়ে পালাতে দেখেছিল সেন্ট্রি। এখন অবশ্য পাহারা জোরদার করেছি। পুরো নজর রাখছি গাড়িটার ওপর।

সোমদেব গম্ভীর গলায় বলল, শুধু নজরে রাখা নয়, কড়া নজরে রাখবেন। একজন কনস্টেবলকে স্পেশাল ডিউটি দিয়ে দেবেন। দেখবেন, কোনও লোকই যেন গাড়ির কোনও অংশে হাত না দেয়। বাইরের লোকও নয়, থানার লোকও নয়।

পুলিশের ওপরমহলে সোমদেবের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা ওসির বিলক্ষণ জানা আছে। সোমদেবের কথা তাই নির্দেশের কাজ করল ওসির ওপরে। মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে। তাই করব।

সোমদেব বলল, অ্যাক্সিডেন্টটা যে দেখেছিল, সেই ট্রাক ড্রাইভার জানকীরাম, তার স্টেটমেন্ট কী?

জানকীরাম তখন ট্রাক নিয়ে মাল থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। মাল ছাড়িয়ে মাইল নয়-দশ দূরে সুশোভন মজুমদারের গাড়ি পেছন থেকে ঝড়ের বেগে জানকীরামের ট্রাক ওভারটেক করে এগিয়ে যায়। কাছেই একটা টার্নিং ছিল, গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে সুশোভন মজুমদারের গাড়ি সোজা গিয়ে একটা গাছের গায়ে ধাক্কা মারে। জানকীরামের মতে অত স্পিডে গাড়ি ঘোরানোর জন্যেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়।

জানকীরামকে পাওয়া যাবে?

লং রুটের ড্রাইভার। পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারছি না। একটু বসুন, লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।

খোঁজ নিয়ে জানকীরামকে পাওয়া গেল না। সে তখন মালবোঝাই ট্রাক নিয়ে অনেক দূরে ইসলামপুরের পথে।

দু'-চারটা মামুলি কথাবার্তার পর আমরা উঠলাম। সোমদেব বলল, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম ওসি সাহেব। কিছু মনে করবেন না প্লিজ।

ওসি সহাস্যে বললেন, আবার এসে আবার সময় নষ্ট করলে খুশিই হব।

বিকেলবেলায় বাড়িতে ফিরে এসে রাজীব বলল, কী রে, থানায় যাবি একবারও তো বলিসনি?

সোমদেব বলল, আগে বলব কী! আগে তো থানায় যাবার কোনও প্রোগ্রামই ছিল না। যেতে যেতে থানাটা চোখে পড়ল, ঢুকে গেলাম। কিন্তু তুই জানলি কেমন করে?

ছোট্ট জায়গা। জানা হয়ে যায়। রাজীব রহস্য করে বলল।

থানার ওসি জানিয়েছে?

উঁহুঁ। তোকে চেনে এমন একজন বলল।

সোমদেব হাসল, আসলে কী জানিস, মাতাল যেখানেই থাক, শুঁড়িখানায় সে উঁকি দেবেই। চরিত্রের ধর্ম।

রাজীব হেসে উঠে কী বলতে যাচ্ছিল, দরজার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল। দরজার সামনে তখন সুকান্তর মুখ দেখা যাচ্ছে। যেন কতই মজার জিনিস দেখছে, চোখেমুখে এমনি ভাব।

রাজীবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কঠিন গলায় বলল, এখানে কেন? যাও বলছি।

সুকান্ত ছিটকে সরে গেল। রাজীবকে সে দারুণ ভয় পায় মনে হল।

রাজীব ম্লান হেসে বলল, ছেলেটার ওপর রাগ হয়, আবার মায়াও হয়। এমনিতে ভাল আছে, হঠাৎ হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক আচরণ করে যে কী বলব। ইদানীং দেখছি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

সোমদেব কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল।

পরের দিন চলে যাবার জন্য ব্যাগ হাতে করে বাইরে এসেছি, সুকান্তকে দেখি সোমদেবের গাডির সামনে দাঁড়িয়ে পরম মমতায় গাড়ির গায়ে হাত বোলাচ্ছে। আমাদের দেখেও সরে গেল না। বলল, কী সুন্দর দেখতে গো তোমাদের গাড়িটা।

সোমদেব বলল, তাই নাকি? খুব সুন্দর?

সুকান্ত মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, হ্যাঁ গো, খুউব সুন্দর। আমার খুব পছন্দ। আমি এরকম একটা মোটরগাডি কিনব। কত দাম গো?

আমি বললাম, সে তো অনেক টাকা।

সুকান্ত একইভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, তা হোক। আমার তো অনেক টাকা হবে, তখন কিনব। তারপর সারাদিন মোটরে চড়ে মজাসে ঘুরে বেড়াব। কলকাতা, দিল্লি, অসম, বিলেত, ভুটান।

রাজীবের কথা শোনা গেল। সে আসছে আমাদের বিদায় দিতে। সুকান্ত চমকে উঠে বাগানের দিকে দৌড়ে পালাল। আর তাকে দ্যাখাই গেল না।

জলপাইগুডিতে ফিরে এসে পরের দিন সন্ধেবেলায় সোমদেবের বাড়িতে গিয়ে তাকে পেলাম না। সনাতন বলল, এক্ষুনি আসবে। বসতে বলে গেছে।

প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সোমদেব এল।

বললাম, অনেকক্ষণ বসে আছি। উঠব ভাবছিলাম।

চা দিয়েছে তো?

বললাম, সনাতনদার কাজের কোনও ফাঁকি নেই।

সোমদেব চেয়ারে বসে বলল, কয়েকটা কাজ সেরে এলাম। একজন ভাল মোটর মেকানিকের সঙ্গে কথা বললাম। ফেরার পথে একবার থানায়ও টুঁ মেরে এলাম। মাল থানায় কিছু খবর পাঠাবার কথা বলে এলাম।

বললাম, মোটর মেকানিক আবার কেন? তোর গাড়ি তো ঠিকই আছে দেখলাম।

সোমদেব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, বাইরের রূপ দেখে ভেতরের চরিত্র সবসময় বোঝা যায় না বন্ধু।

সনাতন আবার চা নিয়ে এল। আমি চা একটু বেশিই খাই। কাজেই অতিরিক্ত এক কাপের জন্যে আপত্তি করলাম না। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, তোর হেঁয়ালির জট ছাড়াবার পণ্ডশ্রম করব না। এবার বল, সুশোভন মজুমদারের মৃত্যু রহস্য এখন কোন অবস্থায়?

সোমদেব একটু সময় নিয়ে চা খেল। তারপর কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, প্রথম প্রথম মোটর অ্যাক্সিডেন্টটা নিছক দুর্ঘটনা মনে হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে দুর্ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে এবং অবশ্যই ওই রহস্যময় ফোন এই দুর্ঘটনার পেছনে আছে। কিন্তু কেন? এই মৃত্যুতে কার লাভ? রাজীবের? কিন্তু রাজীবের সঙ্গে সুশোভনের সংঘাত হবার স্কোপ কোথায়? দু'জনেই এক ব্যাবসা করে বলে? বিজনেস ক্ল্যাশ? যতদূর জানি সুশোভনের চেয়ে রাজীবের ব্যাবসার টার্নওভার অনেক বেশি। প্রেম কিংবা প্রতিহিংসার সম্পর্কও থাকার কথা নয়। রাজীবের সঙ্গে পারমিতার বিয়ের আগে কোনও পরিচয়ই ছিল না, সম্পর্কও নয়। বিয়ের পরেও নেই।

আমি বললাম, রাজীব ছাড়া সন্দেহ করার মতো আরও দু'জনও তো আছে?

সোমদেব বলল, তাদের কথাও বলছি। অনিমেষকে ভাল করে এখনও জানি না। যতটুকু জেনেছি তা ওই রাজীব আর পারমিতার মুখ থেকে শুনে। তার শিলিগুড়িতে ওষুধের দোকান আছে। বড় দোকান, চালু ব্যাবসা। সুশোভন তার বন্ধু। সে মালবাজারে এসেছিল সুশোভনের সঙ্গে, ফিরে যাওয়ার কথা একসঙ্গে। তার সঙ্গে কথা না বলে কিছু বলাটা অনেকটা বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করার মতোই হয়ে যাবে। কাজেই অনিমেষের কথা আপাতত মুলতুবি থাক। পারমিতাও অস্পষ্ট। খুবই সুন্দরী মহিলা। সুন্দরী মহিলাদের পক্ষে নিজেকে ঘটনাবিহীন রাখা খুবই শক্ত। রাজীবের কথায় যদি কোনও সারবস্তু থাকে, তবে অনিমেষ আর পারমিতার সম্পর্কের মধ্যে একটা তিনকোনা গল্পের আভাস আছে। আজ দুপুরে পারমিতাকে ফোন করেছিলাম। তার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা হয়েছে আগামী রবিবার শিলিগুড়িতে যাচ্ছি এবং মিস্টার ওয়াটসন আমার সঙ্গী হচ্ছে।

সোমদেব মাঝেমাঝে আমাকে মিস্টার ওয়াটসন বলে মজা করে।

বললাম, তার মানে সুশোভনের মৃত্যুকে তুই স্বাভাবিক ভাবছিস না?

৬

অবশ্যই ভাবছি। দুর্ঘটনায়ই সুশোভনের মৃত্যু হয়েছে।

তবে?

তবে কতকগুলো খুবই সূক্ষ্ম অসংগতি লক্ষ করে একটা খটকা মনে থেকেই যাচ্ছে। যদি দুর্ঘটনাটা ঘটানোই হয়, তবে এর পেছনে এক চতুর ষড়যন্ত্র আছে।

বললাম, কিন্তু পারমিতার মধ্যে যদি সন্দেহ করার মতো কিছু থাকবে, তবে সে রহস্য সমাধানের জন্যে তোর মতো একজন দুঁদে গোয়েন্দার কাছে আসবে কেন? কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপও তো বেরিয়ে আসতে পারে?

সুশোভন বলল, খুব চালাক মানুষের উলটো চালও হতে পারে। নিজের ভবিষ্যৎ সন্দেহমুক্ত রাখার কৌশলও হতে পারে। অনেক কিছুই হতে পারে। তবে সব কথা বলার সময় এখনও আসেনি। শিলিগুড়িতে গেলে ছবিটা কিছুটা স্পষ্ট হবে মনে হয়।

রবিবার সকালে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম। সারাদিন থেকে সন্ধেবেলায় ফিরে যাব।

পৌঁছেই সোজা চলে গেলাম সুশোভন মজুমদারের বাড়িতে। প্রধাননগরে দোতলা ছিমছাম বাড়ি। গৃহস্বামীর রুচি এবং সচ্ছলতার ছাপ সর্বত্র। বাড়ির পরিবেশ আগে কেমন ছিল জানি না। এখন মাত্র কয়েকদিন আগেকার দুঃখজনক ঘটনার ছায়া বাড়িটিকে চুপচাপ শোকাহত করে রেখেছে। লোকজনের যাওয়া আসা চোখে পড়ল। সম্ভবত পারমিতার দুঃসময় এবং শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের সময় আপনজনেরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেখে পারমিতা বসার ঘরে নিয়ে গেল। বলল, কষ্ট করে এসেছেন, একটু বসে রেস্ট করুন আগে।

সোমদেব বলল, মোটেই কষ্ট করে আসিনি। আপনার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই।

এ-সময়ে একটা গোলগাল ফরসা বছর পাঁচেকের ছেলে ঘরে ঢুকে পারমিতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বাচ্চাটার মুখের আদল দেখেই বোঝা যায় সে পারমিতার ছেলে।

পারমিতা সস্নেহে ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, আমার ছেলে।

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে পারমিতার শাড়ির মধ্যে মুখ লুকাল।

সদ্য পিতৃহারা ছেলেটিকে দেখে মন খারাপ লাগল। ওর সামনে এখন অজানা ভবিষ্যতের লম্বা পথ। শুধুমাত্র মায়ের হাত ধরে সে পথ তাকে পাড়ি দিতে হবে। মাথার ওপর বিরাট আকাশের মতো ছাদ হয়ে বাবা সঙ্গে থাকবে না। কী হারাল, বোঝার মতো বয়েস এখনও ওর হয়নি।

সোমদেবের চোখেও দেখলাম বিষাদের ছায়া। হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে কাছে ডেকে নিয়ে বলল, কী নাম তোমার?

ছেলেটি মা'র মুখের দিকে তাকাল। পারমিতা বলল, বলো, কাকুকে নাম বলো?

ছেলেটি এবার বলল, তুতুন।

তখনই আঠারো-উনিশ বছরের এক সুশ্রী মেয়ে ঘরে ঢুকে পারমিতাকে বলল, পেলাম না রে, দিদি। এত জায়গায় খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও—

মেয়েটি আমাদের দেখে থেমে গেল। জিজ্ঞাসু চোখে পারমিতার দিকে তাকাল। পারমিতা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ জানাল যাদের আসার কথা, এরা তারাই।

সোমদেব পারমিতাকে বলল, আপনার বোন?

পারমিতা বলল, হ্যাঁ, আমার বোন মধুমিতা। ও এখন এখানেই আছে।

সোমদেব বলল, সে তো দিদি ডাক শুনেই বুঝেছি। কিন্তু ও কী খুঁজে পাচ্ছে না? যদি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার না হয়—

পারমিতা বলল, কী মুশকিল বলুন তো, একটা লটারির টিকিট কোথায় যে আছে, খুঁজেই পাচ্ছি না। অথচ যে-লোকটা তুতুনের বাবাকে টিকিট বিক্রি করেছিল, সে বলছে তার টিকিটে প্রাইজটা উঠেছে। ভুটান বাম্পার। সেকেন্ড প্রাইজ। পাঁচ লাখ টাকা। এখনও জানা যাচ্ছে না ওই নম্বরের টিকিট কে কিনেছিল।

মধুমিতা বলল, জামাইবাবু ওর কাছ থেকে মাঝেমাঝে লটারির টিকিট কিনত। এবারও কিনেছিল। আমি দেখেছি। ভুটান বাম্পার। রাজীববাবু জামাইবাবুর সব জিনিস দিয়ে গেছে। তার মধ্যেও নেই।

সোমদেব সোজা হয়ে বসল। দেখলাম ওর চোখদুটো ঝকঝক করছে। দীর্ঘদিন সোমদেবের সঙ্গে থেকে ওর মুখের এই ভাবের মানে বুঝি। যখন কোনও রহস্যের গোলকধাঁধার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার সঠিক রাস্তা খুঁজে পায়, তখনই তার এইরকম অবস্থা হয়।

লটারির টিকিট— সেকেন্ড প্রাইজ— পাঁচ লাখ— টিকিট সেলার কি বলছে ওই নম্বরের টিকিট সুশোভনবাবুকেই বিক্রি করেছিল?

পারমিতা বলল, ওকে বিক্রি করেছিল বলছে, তবে ঠিক ওই নম্বরেরই টিকিট কিনা বলতে পারছে না।

মধুমিতা বলল, আবার অন্য কেউ ডিমান্ডও করছে না যে সে ওই নম্বরের টিকিট কিনেছে।

সোমদেব বলল, এজেন্টের দোকানের নাম কী?

ওই তো সেবক রোডে। দোকানের নামটা ঠিক জানি না।

মধুমিতা বলল, আমি জানি। দোকানের নাম সৌভাগ্য।

সোমদেব তাকাল পারমিতার দিকে।

অনিমেষ সেন, অনিমেষবাবু কী বলেন? উনি তো সুশোভনবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন?

পারমিতাকে সামান্য অসন্তুষ্ট দেখাল। বলল, কী হয়েছে কে জানে। অনিমেষবাবু এখন আর আসেই না। মালবাজার থেকে ফিরে এসে একদিনই শুধু এসেছিল।

লক্ষ করলাম সেদিন পারমিতা শুধু অনিমেষ বলেছিল, আজ বলল অনিমেষবাবু।

মধুমিতা বলল, সকালে অনিমেষদার দোকানে ফোন করেছিলাম, পাইনি। কেউ একজন জানাল দোকানে আসছে না দু'দিন ধরে। অসুস্থ কিনা তাও বলতে পারছে না। এর আগে প্রায় প্রত্যেকদিন বাড়িতে আসত।

অনিমেষবাবুর বাড়িতে ফোন করেছিলে?

করেছিলাম। বাড়ির ফোন ডেড।

সোমদেব উঠে দাঁড়িয়ে পারমিতাকে বলল, আপনার ফোনটা ইউজ করতে পারি কি?

পারমিতা বলল, সেকী কথা। পারবেন না কেন?

ফোনের কাছে গিয়ে সোমদেব নম্বর মিলিয়ে কাকে যেন ফোন করল। একটু পরেই বুঝলাম জলপাইগুড়ির এস পি-কে ফোন করছে। নানান কথাবার্তার মধ্যে ফিঙ্গার প্রিন্ট, মোটর মেকানিক, মাল থানায় রাখা সুশোভনের গাড়িটা কড়া পাহারায় রাখা— এসব কথা বলতে শুনলাম। এস পি'র সঙ্গে সোমদেবের খুব ভাল সম্পর্ক। একাধিক অপরাধমূলক ঘটনায় সে পুলিশকে সাহায্য করেছে মূলত এস পি'র অনুরোধে।

টেলিফোন করা হলে সোমদেব বলল, অনিমেষবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার। ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা নিশ্চয়ই জানেন?

পারমিতা বলল, হাকিমপাড়ায় বাড়ি, হিলকার্ট রোডে ওষুধের দোকান। হাকিমপাড়ায় ঠিক কোথায় ওর বাড়ি—

মধুমিতা বলল, আমি একটা কাগজে ডিরেকশন দিয়ে লিখে দিচ্ছি।

ঠিকানা লেখা কাগজটা পকেটে পুরে সোমদেব বলল, এ-সময় আপনাদের আর বেশিক্ষণ আটকে রাখব না মিসেস মজুমদার। দেখি অনিমেষবাবুকে বাড়িতে পাওয়া যায় কিনা।

আমরা উঠলাম। পারমিতা অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যাবার কথা বলেছিল, কিন্তু সোমদেব সবিনয়ে অসম্মতি জানাল। একেই শোকের বাড়ি, তার ওপর নষ্ট করার মতো সময় নেই, সোমদেব আর একটুও অপেক্ষা করল না।

আমরা ট্যাক্সিতে শিলিগুড়ি এসেছি। সুশোভনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা ধরলাম। রিকশাওয়ালাই পৌঁছে দিল নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

অনিমেষকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। বছর ত্রিশের সুদর্শন চেহারা। আগেই জানতাম অনিমেষ এখনও বিয়ে করেনি। বাড়িঘর দেখে বোঝা যায় খুবই সফল ব্যবসায়ী। তাকে আগে কখনও দেখিনি। তবু মনে হল শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে খুব সুস্থ নয় এখন। খুব মলিন দেখাচ্ছিল তাকে। আমাদের দেখে একটু বিস্মিত মনে হল।

সোমদেব হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, আমি সোমদেব মিত্র। রহস্য টহস্য নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করি। ও হল আমার বন্ধু অমল বসু। একটা বিশেষ ব্যাপারে আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

অনিমেষ সোমদেবকে চিনতে পারল। কিন্তু কোনও উচ্ছ্বাস দেখা গেল না তার মধ্যে। আমরা আসাতে খুশি কিংবা অখুশি কোনওটাই মনে হল না তাকে। টেবিলের সামনের চেয়ার দেখিয়ে বলল, বসুন। আপনাকে আমি ভাল করেই জানি, তবে পরিচয় হয়নি কখনও। বলুন, কী সাহায্য করতে পারি আপনাকে?

সোমদেব বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে শরীর ভাল নেই!

হ্যাঁ। দু'দিন একটু ভুগলাম। ওই ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়েছিল।

সোমদেব বলল, তা হলে আপনার কাছ থেকে বেশিক্ষণ সময় নেব না। সরাসরি কাজের

কথাতেই আসি। আপনি তো মালবাজারে গিয়েছিলেন আপনার বন্ধু সুশোভন মজুমদারের সঙ্গে। ওখানে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে সুশোভনবাবুর মৃত্যু হয়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন হঠাৎ একটা ফোন পেয়ে সুশোভনবাবু তড়িঘড়ি রওনা দিয়েছিলেন শিলিগুড়িব দিকে। পরে জানা গেল ফোনটা সম্পূর্ণ ফল্‌স ফোন ছিল। এ-ব্যাপারে আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে কাইন্ডলি বলবেন।

অনিমেষ বলল, আমি কী বলব। ঘটনার সময় আমি মালবাজারে রাজীববাবুর বাড়িতে ছিলাম না। বাজীববাবুর মুখে পরে ব্যাপারটা শুনেছি। ঠিক কী হয়েছিল, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

মাল থেকে কিছুদূবে এক চা-বাগানে বোনেব কাছে। এসব কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন রাজীববাবুর মুখে।

শুনেছি। তবে আপনার কথা আপনার মুখেই শুনব, সেটাই ভাল নয় কি?

অনিমেষ একটু চুপ করে থেকে বলল, বেশ। বলুন আর কী জানতে চান?

বোনের কাছে যাবার প্রোগ্রামটা কি আগেই ঠিক কবা ছিল, না মালে এসে ঠিক করলেন?

মালে গিয়েই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এসব কথা—

সোমদেব অনিমেষকে শেষ করতে না দিয়ে বলল, উত্তব দেওয়া বা না-দেওয়া আপনার ইচ্ছে অনিমেষবাবু। আমি কোনও ইনভেস্টিগেশন করছি না, জাস্ট কয়েকটা কথা জানতে এসেছি।

বেশ। বলুন।

আপনার গাডি আছে? লাইট কার?

ছিল। এখন নেই। আগেবটা বিক্রি কবে দিযেছি।

নতুন একটা কিনবেন?

ইচ্ছে ছিল। তবে এখন ভাবছি, আপাতত থাক।

বন্ধুব শোচনায মৃত্যুব জন্যেই কি?

কী জানি। অনিমেষ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল, হতে পাবে।

একটু চুপ কবে থেকে সোমদেব আবাব বলল, সুশোভন মজুমদাব আপনাব কেমন বন্ধু ছিল? মোস্ট ইন্টিমেট?

হ্যাঁ। স্কুল লাইফ থেকে আমাদের বন্ধুত্ব।

সুশোভনবাবুর স্ত্রী পাবমিতার সঙ্গে?

বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে যেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত।

আপনার তো আরও বন্ধু আছে। সব বন্ধুর স্ত্রীব সঙ্গে কি একইবকম সম্পর্ক আপনার? একটু কম বেশি তো হতেই পারে। সম্পর্কটা বিলেটিভ।

অনিমেষ টেবিলের ওপবেব পেপাব ওয়েটটা নাডাচাডা করতে করতে একটু চুপ করে থেকে বলল, ভেবে দেখিনি।

সোমদেব বলল, সবটুকুই অবশ্য আপনার পিযোরলি প্রাইভেট ব্যাপাব। বন্ধুর মৃত্যুতে নিশ্চয়ই খুব নিঃসঙ্গ বোধ করেছেন?

ন্যাচারালি।

এবার অন্য কথায় আসি। সুশোভনবাবু ভুটান বাম্পাব লটারির একটা টিকিট কিনেছিলেন। জানেন নিশ্চয়?

না। জানি না।

আপনি লটারিব টিকিট কাটেন?

কাটি। মাঝেমাঝে।

ভুটান বাম্পাবের গত খেলার টিকিট কেটেছিলেন?

কাটতে পারি। মনে নেই।

ভুটান বাম্পারের পাঁচ লাখ টাকার সেকেন্ড প্রাইজ শিলিগুড়িতে উঠেছে। জানেন নিশ্চয়?

জানলাম। আপনার মুখ থেকে।

যদি দ্যাখেন সেকেন্ড প্রাইজটা আপনার টিকিটেই উঠেছে, কী করবেন।

আপনি যা করবেন, আমিও তাই করব। টাকাটা ক্লেইম করব। অনিমেষের মুখের হাসিটা বেঁকে গেল, মিস্টার মিত্র, আপনি কী সাহায্য চান এখনও বললেন না তো?

সোমদেব হাসল, সাহায্য তো আপনি করছেনই আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে।

দরজার পরদা সরিয়ে একটি বয়স্ক মুখ উঁকি দিল ঘরের ভেতরে। বাড়ির পরিচারক মনে হয়। অনিমেষ তার দিকে তাকিয়ে বলল, এঁদের চা দিয়ে যাও হরিদা।

সোমদেব বাধা দিয়ে বলল, চায়ের দরকার নেই অনিমেষবাবু। আমরা একটু আগেই চা খেয়ে বেরিয়েছি। আর একটা কাজ সেরে সোজা জলপাইগুড়ি। আপনার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চয়ই চান সুশোভনবাবুর মৃত্যুর জন্য যদি কারও চক্রান্ত থেকে থাকে, সে ধরা পড়ুক?

নিশ্চয়ই চাই। অবশ্য আপনি যা বলছেন, সেরকম কিছু যদি হয়ে থাকে। সুশোভন নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। স্পিড কন্ট্রোল না করতে পেরে— গাড়িতে অন্য কেউ ছিলও না। কাজেই অন্যরকম কিছু ভাববার সুযোগ কিন্তু অত্যন্ত কম।

সোমদেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দ্যাখা যাক, কম সুযোগ থেকে বেশি ঘটনা বের করে আনতে পারি কিনা।

আসার সময় অনিমেষের ফোন নম্বরটা সোমদেব একটা কাগজে লিখে নিল। দরকার পড়লে যোগাযোগ করবে।

৭

রাস্তায় এসে আবার রিকশা। এবারে আমাদের গন্তব্য সেবক রোডে লটারির টিকিটের এজেন্টের দোকান সৌভাগ্য।

যেতে যেতে সোমদেবকে বললাম, পারমিতা আর অনিমেষ দু'জনের সঙ্গেই কথা বললি, নতুন কোনও তথ্য হাতে এল?

সোমদেব সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, মানুষের অন্তর্জগৎ বড়ই দুর্জ্ঞেয় আর দুর্গম বন্ধু, দু'-চারটে কথায় সেখানে পৌঁছানো বড়ই কঠিন। বুঝতে পারছি না দু'জনেই সত্যি কথা বলছে কিনা, অথবা কেউ একজন অভিনয় করছে কিনা। অনিমেষ খুব স্পষ্ট নয়। পারমিতা অতটা অস্পষ্ট নয়। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে সেই আপ্তবাক্যটি মাথায় রাখতে হবে— দেবা না জানন্তি, কুতো মনুষ্যা! আর দু'জনের মধ্যে কোনও অন্যরকম সম্পর্ক থাকলেও আপাতত তা পাস্ট টেনস।

সেবক রোডে একটু খুঁজতেই লটারির দোকানটা পাওয়া গেল। নিজের পরিচয় দিয়ে সোমদেব বিক্রেতাকে বলতেই সে বলল, ওই পেট্রল পাম্পের মজুমদারবাবু তো? শুনলাম উনি মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। খুব ভাল লোক ছিলেন। মাঝেমাঝে টিকিট কিনতেন। খুব ভাল মনে আছে এবারও ভুটান বাম্পারের টিকিট কিনেছিলেন। কিন্তু সে টিকিট কত নম্বরের ছিল বলতে পারব না। কত লোক দৈনিক টিকিট কিনছে। সেকেন্ড প্রাইজ আমার কাউন্টার থেকে বিক্রি হয়েছে কিন্তু কে কিনেছে এখনও জানি না। মজুমদার বাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা এখনও কোনও টিকিট খুঁজে পায়নি।

সোমদেব বলল, সেকেন্ড প্রাইজের টিকিট নম্বরটা বলুন তো।

ওই তো বড় করে লিখে টাঙিয়ে দিয়েছি। লিখুন বলছি।

সোমদেব টিকিট নম্বর নোট বইয়ে লিখে নিয়ে বলল, কতদিন পর্যন্ত প্রাইজের টাকা দাবি করা যায়? বিশেষ করে ভুটান বাম্পারের?

এক মাস। দাবি করতে হবে ফুন্টশেলিঙে ভুটান সরকার লটারির অফিসে। ডাইরেক্টরেট অব লটারিসের কাছে।

বিক্রেতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা চলে এলাম রাস্তায়। আর কোনও কাজ নেই। এবার জলপাইগুড়ি ফিরে যাব।

কয়েকদিন পরে রবিবারের সকাল শেষ হবার মুখে রাজীব এসে হাজির হল সোমদেবের বাড়িতে। সে-সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। সোমদেব বলল, তুই এসে গেছিস? তোকে ফোন করব ভাবছিলাম।

রাজীব ধপাস করে সোফাতে বসে পড়ে বলল, কী ব্যাপার? হঠাৎ এই অভাজনকে স্মরণ?

ব্যাপার কিছুই নয়। মালবাজার থেকে ফিরে আসার পর তোর কোনও খবর পাইনি, তাই। তা আছিস কেমন?

যথা পূর্বম। ওই টেলিফোন রহস্যের কোনও সমাধান হল?

ধুস! রহস্যটহস্য কিস্যু নেই। আমার কী মনে হয় জানিস, সুশোভনবাবু ভুল শুনেছিলেন। রাম বুঝতে শ্যাম বুঝেছিলেন। সে-সময় মদ খেয়ে ইনটক্সিকেটেড ছিলেন বলেই বোধহয়।

রাজীব ম্লান হেসে বলল, সত্যিই সেদিন সুশোভন ওভার ড্রাঙ্ক ছিল। সকাল থেকেই। আমি অনেকবার নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু সুশোভনের মুখে ওই এক কথা— আমি একা। ভীষণ একা। আমার কিছুই ভাল লাগে না। মৃত বন্ধু সম্পর্কে অপ্রিয় কথা বলতে নেই, তাই আগে বলিনি।

সোমদেব বলল, হুম। ভদ্রলোক বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলেন না বলে মনে হয়। সেইজন্যেই হয়তো— কী জানি!

সোমদেবের কথা শুনে আমার ভীষণ অবাক লাগছিল। জটিল বিষয়ের কী সরল সমাধান! আমি এতদিন সোমদেবের সঙ্গে আছি। কখনও তাকে এত হালকা জলে ভাসতে দেখিনি।

রাজীবকে এত অন্যমনস্ক দেখাল। বলল, কার মনের কোথায় দুঃখ কে বলতে পারে। বেচারি।

সোমদেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এক মিনিট। একটু ভেতর থেকে আসছি।

একটু পরেই সোমদেব ফিরে এল।

কিছুক্ষণ পরে রাজীব উঠব উঠব করছে, সনাতন একটা ট্রে-তে তিন গেলাস শরবত নিয়ে ঘরে ঢুকল। কয়েকদিন ধরে বেশ গরম পড়েছে। তাই বোধহয় সনাতনের চায়ের বদলে শরবতের ব্যবস্থা।

রাজীবকে আরও একটু সময় বসে থেকে শরবত খেয়ে যেতে হল। খাবার সময় বলল, দু'-চারটে কাজ আছে। আজ আর বসব না।

রাজীব চলে যাবার পর সোমদেব একটা অদ্ভুত কাজ করল। রাজীব যে-গেলাসে শরবত খেয়েছিল সেই গেলাসটা দু'আঙুলে আলগোছে তুলে নিয়ে আলমারিতে রেখে দিল। বুঝলাম, গেলাসে রাজীব সদ্য আঙুলের যে ছাপ রেখে গেছে, সেই ছাপটাই সোমদেবের দরকার।

সোমদেবকে একটু আগেই সাধারণ চরিত্রের মানুষ বলে মনে হয়েছিল। এখন মনে হল, সেসব ছিল সাজানো ব্যাপার। সে আবার নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। বলল, পরিষ্কার আঙুলের ছাপের জন্যে গেলাসই দরকার, চায়ের কাপ নয়। গেলাস পাঁচ আঙুলে ধরতে হয়। তাই সনাতনকে বলেছিলাম শরবত দিতে।

একটু আগে সোমদেব ভেতরে কেন গিয়েছিল বুঝতে পারলাম।

বললাম, কিন্তু রাজীবের আঙুলের ছাপ মেলাবি কীসের সঙ্গে? সে তো সেদিন গাড়িতে ছিল না।

সোমদেব আলমারির ভেতর থেকে একটা কাচের পেপারওয়েট বের করে সতর্কভাবে হাতে নিয়ে দেখাল আমাকে।

শুধু রাজীব কেন, অনিমেষবাবুও তো সেদিন গাড়িতে ছিল না। পেপারওয়েটটা দেখে মনে পড়ল সেদিন অনিমেষবাবুর বাড়িতে ঠিক এইরকম একটা পেপারওয়েট দেখেছিলাম। আমরা টেবিলের যে-দিকে বসেছিলাম, তার উলটোদিকে অর্থাৎ মুখোমুখি বসে কথা বলছিল অনিমেষ। কথা বলতে বলতে পেপারওয়েটটা হাতে ধরে নাড়াচাড়া করছিল। সবার অজান্তে কখন যে সোমদেব সেটা সরিয়ে ফেলেছে টেরও পাইনি।

বললাম, অনিমেষবাবুর পেপারওয়েটটা না?

সোমদেব হাসল। শুধু পরে বলল, রাজীব গাড়িতে ছিল না। অনিমেষবাবুও ছিল না।

বললাম, তা হলে?

শারীরিকভাবে গাড়িতে ছিল না, কিন্তু দু'জনের একজন কেউ মানসিকভাবে তো গাড়িতে থাকতে পারে।

সোমদেবের কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না। ও মাঝেমাঝে হেঁয়ালির মতো এমন সব কথা বলে যার মাথামুন্ডু কিছু বোধগম্য হয় না। ওর কথার ধরন-ধারণই এমনি বলে চুপ করে রইলাম। জানি যথাসময়ে উত্তরটা ঠিকই পেয়ে যাব। এখন কিছুই ভাঙবে না।

সোমদেব সত্যিই কিছু বলল না। গম্ভীর মুখে ফোন তুলে বোতাম টিপে টিপে যোগাযোগ করল পুলিশের উপর মহলের কাউকে। আমি কান সজাগ করে শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু বুঝলাম, অনেকখানি বুঝলাম না। তবু মনে হল রহস্যের যবনিকা একটু একটু করে উঠতে শুরু করেছে।

রাস্তাটা পশ্চিমবঙ্গের একেবারে উত্তর সীমান্তে। কয়েক মাইল দূরে বিদেশি রাষ্ট্র ভুটান। ভুটানের প্রান্তিকশহর ফুন্টশোলিং পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারা থেকে প্রায় দশ-এগারো মাইল দূরে।

দুপুর এগারোটা নাগাদ একটা মারুতি গাড়িকে দেখা গেল দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ভুটানের দিকে। আর মাত্র চার মাইল পার হলেই গাড়ি পৌঁছে যাবে ফুন্টশোলিং। রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। মাঝেমাঝে দু'-একটা গাড়ি আসছে যাচ্ছে। তারপরই সুনশান। রাস্তার দু'পাশে কিছুটা মকাই আর ধানের খেত, কিছুটা অসমতল অনাবাদি পার্বত্যভূমি। দূরে দূরে কিছু বস্তিবাড়ি, কিছু গাছগাছালির জঙ্গল। গাড়িটা আর কিছুটা এগোতেই দেখা গেল রাস্তার ডানদিকে একটা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। মারুতি গাড়িটা কাছে আসতেই একজন পুলিশ অফিসার আর দু'জন রাইফেলধারী কনস্টেবল জিপ থেকে লাফ মেরে নীচে নেমে এল। পুলিশ অফিসার হাতের রিভলভার মারুতি গাড়ির চালকের দিকে তাক করে গলা উঠিয়ে আদেশ দিলেন, হল্ট।

জিপে দু'জন আরোহী। একজন বছর চল্লিশের চালক আর পেছনের সিটে বসা অন্যজন বছর বাইশের এক যুবক। ড্রাইভার দেখল গাড়ি না থামিয়ে কোনও উপায় নেই। আদেশ অমান্য করে পাশ কাটিয়ে যেতে গেলে তৎক্ষণাৎ রিভলভার কিংবা রাইফেলের গুলি ছুটে আসবে। কোনও সময় দেবে না তাকে। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করাটা চূড়ান্ত হঠকারিতা হয়ে যাবে। তা ছাড়া গাড়ির দ্বিতীয় আরোহী যুবকটি ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। গাড়ি থামিয়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল চালক।

পুলিশ অফিসার বললেন, দু'জনেই হাত তুলুন। কোনওরকম চালাকির চেষ্টা করলেই বিপদে পড়বেন।

চালক হাত তুলল। দ্বিতীয় আরোহীও তাই করল।

পুলিশ অফিসার দ্রুত জিপের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনি মালবাজারের রাজীব সোম?

রাজীব ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে সে ধরা পড়ে গেছে। চুপ করে রইল সে।

পুলিশ অফিসার বললেন, ইয়োর গেম ইজ ওভার রাজীব সোম। গাড়ি ঘুরিয়ে থানায় নিয়ে চলুন। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

পেছনের সিটে বসে সুকান্ত বুঝতে পারল কোনও বিরাট গোলমালে জড়িয়ে পড়েছে তারা। সে

হাউমাউ করে বলল, আমি কিছু জানি না। আমার লাখ লাখ টাকা লাগে না। ও টিকিট আমার নয়। আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি যাব।

চোপ! পুলিশ অফিসার এক ধমকে থামিয়ে দিলেন তাকে। এরপর গাড়িদুটো চলল থানার দিকে। প্রথমে মারুতি, পিছনে পুলিশের জিপ। রাজীব কিন্তু এবার চালকের আসনে নয়। সে বসেছে মারুতির পেছনের সিটে। একজন কনস্টেবল আর সুকান্তর মাঝখানে। গাড়ি চালাচ্ছেন পুলিশ অফিসার নিজে।

একটু পরে থানায় পৌঁছে রাজীবের পকেটের ভেতর খুঁজতেই সেই লটারির টিকিটটা পাওয়া গেল। ভুটান বাম্পার খেলার পাঁচ লাখ টাকার সেকেন্ড প্রাইজের টিকিট।

রাজীব প্রথমে টিকিটটা তার শ্যালক সুকান্ত কিনেছিল বললেও পুলিশের প্রবল চাপের মুখে পড়ে এবং সুকান্ত স্রেফ অস্বীকার করাতে শেষপর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হল যে টিকিটটা সে-ই চুরি করেছিল সুশোভনের ডায়েরির মধ্যে থেকে এবং সুশোভনের মৃত্যু হয় তারই পাতা ফাঁদে পড়ে।

৮

রাজীবের বলার দবকার ছিল না। সুকান্তই বলে দিল ওই টিকিট সে কখনও কেনেনি। তার ভগ্নীপতিই তাকে টিকিটের মালিক সাজিয়ে ফুন্টশোলিং নিযে যাচ্ছিল প্রাইজের টাকার দাবি পেশ করতে।

উপরে যে-ঘটনা বলা হল, সে-সময়ে ঘটনাস্থলে আমিও ছিলাম না, সোমদেবও নয়। সোমদেবের মুখে শুনে মনে হল ঘটনার ছবিটা এইরকম হতে পারে। সোমদেব আবাব শুনেছে পুলিশের মুখে।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে বললাম, এত ঘটনার পেছনে শেষপর্যন্ত রাজীব? কিন্তু সুশোভনের মৃত্যুর পেছনে রাজীবই যে দায়ী, তার প্রমাণ কী? আদালতে তো অস্বীকার করতে পারে তার আগের জবানবন্দি।

সোমদেব উদাস গলায় বলল, প্রমাণ আছে বন্ধু, অকাট্য প্রমাণ। তবে বন্ধুকেই শেষপর্যন্ত ধরিয়ে দিতে হল। এটাই সবচেয়ে খারাপ লাগছে। কী করা যায়! অন্যায়ের সঙ্গে আপস করাও তো অন্যায়।

একটু আগে সোমদেবের ফোন পেয়ে আমি ওর বাড়িতে এসেছি। সেখানে নাকি আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর অপেক্ষা করছে।

আমি আসার আগেই সোমদেব ফোন করে পারমিতা আর অনিমেষকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিয়েছে। পারমিতা জানিয়েছে সে সোমদেবের বাড়িতে আসার জন্যে এখুনি রওনা দিচ্ছে।

সোমদেব বলল, প্রথম থেকে তা হলে বলা যাক। পারমিতা আমার বাড়িতে সুশোভনের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে তার সন্দেহের কথা আমাকে জানিয়েছিল। ঘটনার দিন তার অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হবার রহস্যময় ফোন আসাটা তার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। ঘটনাটা আমিও কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিতে পারিনি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা ইনটিউশন যা-ই বলো না কেন, প্রত্যেক মানুষের কোথায় যেন একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি থাকে। সেটা কারও কম, কারও বেশি। কেউ টের পায়, কেউ পায় না। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন একটা ছন্দপতনের ব্যাপার আছে। সেটা ঠিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। কিন্তু আছে। ওই ভয়ংকর ফোন এমনি এমনি করা হয়নি। কী, সেটা জানার আকর্ষণেই আমি মালবাজারে রাজীবের বাড়িতে গেলাম। সব শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এটা একটা সাদামাঠা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা। ফোন আসার ঘটনাকে কেউ আমল

দিচ্ছে না। কিন্তু আমি দিলাম। ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হল। এই ফোনের ব্যাপারটা একমাত্র রাজীবকেই জানিয়েছিল সুশোভন। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে কেউ ফোন করলে রাজীবের ফোন নম্বর সে কোথায় পেল? রাজীবের মুখে অনিমেষ আর পারমিতার মধ্যে একটা রোমান্টিক সম্পর্কের কথা শুনলাম। তবে কি অনিমেষই অন্যরকম গলা করে সুশোভনকে ফোন করেছিল ভগ্নিপতির চা-বাগান থেকে? নাকি মালের কোনও পাবলিক বুথ থেকে রাজীব? রাজীবও তো সে-সময় বাড়িতে ছিল না! কিন্তু রাজীব করলে তার মোটিভ কী? সুশোভনকে সরিয়ে দিতে পারলে তার কী লাভ? একটা কথা বলে রাখি, পারমিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম সে অভিনয় করছে না, সে হালকা চরিত্রের মহিলা নয়। সে সুশোভনের বিশ্বস্ত স্ত্রী, তুতুনের স্নেহময়ী মা।

যা হোক, মালবাজারে গিয়ে একদিন বেড়াতে বেড়াতে চলে গেলাম থানায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটাকে দেখলাম। ওসির মুখে শুনলাম এই গাড়ির পার্টস চুরি করতে কোনও দুঃসাহসী চোর এসেছিল থানার কম্পাউন্ডের মধ্যে। তখনই বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা সন্দেহ মাথায় এল। গাড়ির পার্টস চুরি করতে নয়, গাড়ি অকেজো করে দেওয়া কোনও মেশিনকে পুনরায় ঠিক করে দিতে কেউ এসেছিল। তাই যদি হয় তবে দুর্ঘটনার মূল কারণ ওই গাড়িতেই আছে। ওসিকে গাড়িটা কড়া পাহারায় রাখার কথা বলে ফিরে এসে এস পি সাহেবকে সবকিছু জানিয়ে একজন মোটর মেকানিক ও ফোরেনসিকের লোক পাঠিয়ে গাড়িটা পরীক্ষা করাতে অনুরোধ জানালাম। যথাসময়ে জানা গেল গাড়ির ব্রেক সিস্টেম আগে থেকেই খারাপ করে রাখা হয়েছিল। যে-কারণে গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে স্পিড কন্ট্রোল না করতে পেরে সুশোভন সোজা গাছের সঙ্গে ধাক্কা মেরে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসে। গাড়ির ব্রেক পাইপে ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞ যে-আঙুলের ছাপ পায়, শরবতের গেলাসে রাজীবের আঙুলের ছাপের সঙ্গে সে-ছাপ মিলে গেছে। তা ছাড়া রাজীব প্রচুর টাকা দিয়ে যে-মেকানিককে ব্রেক সিস্টেমটা আবার ঠিক করে দেবার জন্যে রাতের অন্ধকারে থানার কম্পাউন্ডে পাঠায়, তাকে খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। সেও সব স্বীকার করেছে।

রাজীব থানায় যে-স্বীকারোক্তি দিয়েছে তা এইরকম— সুশোভন আর অনিমেষ মালবাজারে তার বাড়িতে আসার পর সুশোভনের ডায়েরির মধ্যে একটা লটারির টিকিট চোখে পড়ে রাজীবের। পরের দিন খবরের কাগজে রেজাল্ট বেরোলে তার কৌতূহল হল সুশোভনের টিকিটের নম্বর মিলিয়ে দেখার। সুশোভন আর অনিমেষ তখন কী কারণে যেন ঘরে ছিল না। ডায়েরিটা বিছানার ওপরই ছিল। ডায়েরি থেকে টিকিটটা নিয়ে নম্বর মিলিয়ে দেখতে গিয়ে সে চমকে উঠল। সুশোভনের টিকিটের নম্বরের সঙ্গে পাঁচ লাখ টাকার সেকেন্ড প্রাইজের নম্বর মিলে যাচ্ছে। হইচই করে উঠতে গিয়েও রাজীব থেমে গেল। তার মাথায় ভর করল মূর্তিমান শয়তান। লটারির টিকিট যার হেপাজতে থাকবে, সেই তার মালিক। রাজীব ব্যাপারটা চেপে গেল। ভয়ংকর টানাপোড়েনের মধ্যে সে সিদ্ধান্ত নিল সুশোভনের এমন অবস্থা করবে যাতে ভবিষ্যতে সে এই টিকিটের ব্যাপারে কোনও কথা বলার অবস্থায় না থাকে। রাজীবের নিজের গ্যারেজ আছে, গাড়ির কলকবজার খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে। গভীর রাতে সে নিঃশব্দে সুশোভনের গাড়ির ব্রেক অচল করে দিয়ে সকালবেলায় এক পাবলিক বুথ থেকে গলা অন্যরকম করে পারমিতার সংকটজনক অবস্থার কথা জানিয়ে সুশোভনকে অবিলম্বে শিলিগুড়ি চলে আসতে বলে।

তারপর কী হল আমরা তো সবই জানি। রাজীবের উদ্দেশ্য ছিল, সে নিজে নয়, তার হাবাগোবা নির্বোধ শালা সুকান্তকে টিকিট হোল্ডার হিসেবে প্রাইজের টাকা দাবি করাবে। সুকান্ত শিলিগুড়িতে থাকে। সে একটা টিকিট কিনতেই পারে। রাজীব থেকে যাবে সন্দেহের অনেক দূরে। সুকান্তর নিকটজন বলতে একমাত্র তার দিদি নন্দিনী আর জামাইবাবু রাজীব। প্রাইজের টাকা আত্মসাৎ করতে রাজীবের কোনওই অসুবিধে হবে না। টাকা দাবি করার যখন একমাস সময় পাওয়া যাচ্ছে, সময় শেষ হবার দু'-একদিন আগে সুকান্তকে ফুন্টশোলিং নিয়ে গিয়ে দাবি পেশ করাবে। মাল থানা

রাজীবের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল। তার গাড়ি নিয়ে মাল ছাড়ার কথা হাসিমারা থানায় জানিয়ে দেওয়া হয়।

সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপাব কী জানিস, রাজীব এখন ভীষণভাবে অনুতপ্ত। কেন সে এমন ঘৃণ্য কাজ করল, এমন সর্বনাশা ভুল কবল, শুভবুদ্ধি দিয়ে সে নিজেই বুঝতে পারছে না।

সোমদেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর ভারী গলায় বলল, অথচ এসব করা কি খুবই জরুরি ছিল? এটা আর কিছু নয়, একজন দুর্বল চরিত্রের মানুষের লোভ আর লালসা, পাপ, পতন আর বিপথগামিতার কাহিনী। মুহূর্তের প্ররোচনায় সে এমন কাজ করে বসল, যে-ঘটনা জীবনের সুপ্রতিষ্ঠিত একজন মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিল। যার জন্যে একজন নিরপরাধ গৃহবধূব ভাগ্যে নেমে এল অকাল বৈধব্য, একটি পাঁচ বছরের শিশুর মুখের সরল হাসি থেমে গেল। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল একটি সুখী পরিবাব। অথচ এসব না করলেও রাজীবের অবস্থার কোনওই ইতরবিশেষ হত না। লটারির টাকার চেয়ে অনেক বেশি টাকাই তো তার আছে! আরও অনেক টাকা দিনের আলোতে উপার্জন করার চওড়া ভবিষ্যৎও তো তার সামনে ছিল! কিন্তু ওই যে বহু ব্যবহৃত বহু পুবনো প্রবাদবাক্য আছে— লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু— তাই হল।

ভাল থাকা খারাপ থাকা

আজ বাবাকে চিঠি লিখবে ঝিনুক। প্রসাধন টেবিলের ড্রয়ার খুলতেই হাতে এসে গেল একটা রাইটিং প্যাড। হালকা নীল রঙের সুদৃশ্য কাগজের পাতা। মাত্র দু'-তিনটে পাতা খরচ করা হয়েছে। সন্দেহ নেই এটা বিয়েতে উপহার পাওয়া। আবার সন্দীপের নতুন শৌখিন বিলাসও হতে পারে। সদ্য বিয়ে হয়েছে তো! কথাটা মনে আসাতেই ঝিনুকের ঠোঁটের কোনায় কৌতুকের হাসি সামান্য আভাস দিয়েই মিলিয়ে গেল। আসলে ঝিনুকের মনের অবস্থা এই মুহূর্তে কোনও কিছুতেই মজা পাইয়ে দেবার মতো ছিল না।

রাইটিং প্যাড আর একটা ডটপেন নিয়ে সে বিছানায় এল। বিয়ের পর এই প্রথম আজ চিঠি লিখবে। দুটো বালিশ বুকের নীচে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে লেখার আগে সে মনে মনে মুসাবিদা করে নিচ্ছিল কী কী কথা বাবাকে লিখবে। কাল বিকেলের ডাকে বাবার চিঠি এসেছে। এর আগে শ্বশুরমশাইকে তাদের পৌঁছোনোর সংবাদ দিয়ে চিঠি দিয়েছিল সন্দীপ। বিয়ের পর তার কর্মস্থল দুর্গাপুরে এসেই। সেই চিঠির জবাবে ঝিনুকের বাবা শশাঙ্কশেখরের চিঠি কাল এসেছে। যেমন নানানরকম পরামর্শ দিয়ে নতুন জামাইকে চিঠি লেখা হয়, সেইরকম চিঠি। সন্দীপকে লেখার পর ঝিনুককে দু'লাইনের সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখেছেন শশাঙ্কশেখর, খুকু, তুই কেমন আছিস?

সেই চিঠির উত্তর লিখবে আজ ঝিনুক। একমনে রাইটিং প্যাডের রঙিন কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে মনে মনে চিঠির কথাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছিল। বাবা লিখেছে, খুকু, তুই কেমন আছিস? কথাটা ভাবতে গিয়েই ঝিনুকের বুকের মধ্যে এক সমুদ্র অভিমান ডুকরে উঠল। কেমন আছি আবার ছাই আছি! তোমাকে ছেড়ে মাকে ছেড়ে ভাইকে ছেড়ে এখন আমি কত দূরে! এখানে আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না। খালি কান্না পায়। আমি ভাল নেই বাবা, একটুও ভাল নেই।

তার মনের সব সত্যিকারের কথা ঝিনুক আজ চিঠিতে লিখবে। লিখবে যে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরের শান্ত শ্যামল পরিবেশ থেকে অনেক দূরের দুর্গাপুর শিল্পশহরের রুক্ষ কঠিন মাটির অচেনা পরিবেশে এসে কেউ ভাল থাকে না, সেও নেই। ভাল যদি থাকবে তবে চিঠি লিখতে বসে তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে কেন!

তখনই খপ করে প্যাডের নীলচে কাগজটা ঝিনুক হাতের মুঠোয় তুলে নিল। কাগজটা দলমুচড়া করে ছুড়ে ফেলে দিল। রঙিন কাগজে সে লিখবে না। সাদা কাগজে কালো অক্ষরে মনের কথা লিখবে। বাবা, সবসময় আমার ভীষণ একা একা লাগে। এখানকার কেউ আমাদের ওদিককার মতো নয়। তোমার জামাই কাজে চলে গেলে সারাদিন একা একা থাকি। তখন তোমাদের জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। তোমরা কেউই এখন আমার কাছে নেই ভাবতেই বুক শূন্য আকাশ হয়ে যায়।

ঝিনুক বিছানা ছেড়ে উঠে চিঠি লেখার জন্যে সাদা কাগজ খুঁজল। পেয়েও গেল। আবার চলে এল বিছানায়। দেয়ালঘড়িতে জলতরঙ্গের টুং টাং শব্দে দুটো বাজল। ঝিনুক অন্যমনস্কভাবে ঘড়িটার দিকে তাকাল। এখন এই মধ্য দুপুরে এই বাড়ির চারপাশটা ভীষণ চুপচাপ লাগছে। রাত খুব বেশি হলে যেমন সবকিছু থেমে থাকে, ঠিক তেমনটি। আসলে এই আবাসিক অঞ্চলে যারা থাকে, তারা সবাই শিল্প প্রকল্পেরই লোক। সকালে কাজে চলে গেলে সমস্ত দুপুরটাই কাজছুট হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ-সময় তাই ঝিনুকের ভীষণ একা একা লাগে। সন্দীপ কাজ থেকে ফেরে

সেই সন্ধে পার করে দিয়ে। স্টিল প্ল্যান্টের পদস্থ কর্মচারী সে। বিয়ের জন্যে বেশ কিছুদিন ছুটি নিতে হয়েছিল বলে এখন ইচ্ছে করলেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারে না।

ডটপেনের পেছনটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ঝিনুক। সন্দীপের সম্বন্ধে কী লিখবে সে? এখানকার কিছুই তার পছন্দের না হলেও সন্দীপকে তো কখনওই সেই অপছন্দের মধ্যে আনা যায় না। সন্দীপ খুব ভাল, দারুণ হাসিখুশি আর খোলামেলা। লম্বা ফরসা শরীরের মতো তার মনটাও খুব বড়। হবে না কেন. সন্দীপ তো জলপাইগুড়ির পাশের শহর শিলিগুড়িরই ছেলে। অবশ্য শিলিগুড়ির না হয়ে সন্দীপ এখানকার ছেলে হলেও একই রকম হত। কোনও জায়গার সবাই তো একবকম হয় না, কেউ কেউ অন্যরকমও হয়। এই যেমন তাদের কাজের বউ সুধামাসি। সেও তো খুব ভাল মানুষ। প্রথমদিন থেকেই নতুন বউকে কোনও অসুবিধের মধ্যে পড়তে দেয়নি। সুধামাসিও তো এ-বাড়িতে ঝিনুকের মতোই নতুন। সন্দীপের বিয়ের পর থেকেই এ-বাড়িতে কাজ করছে। সুধামাসি সারাদিন থাকে, সন্ধের পর নিজের বাড়িতে চলে যায়। জানো বাবা, সুধামাসি না ভীষণ ভাল। ও থাকলেই মনে হয় জলপাইগুড়ির বাড়িতেই আছি। তখন বাড়ির জন্যে খুব মন খারাপ লাগে। লালিব ছোট্ট বাছুরটা সেইরকম আছে? সেইরকম তিড়িং বিড়িং লাফিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়? এপ্রিল মাসে যখন বাড়িতে যাব তখন ও অনেক বড় হয়ে যাবে। এখানে কাছের এক কোয়ার্টারে একটা কুকুর আছে অবিকল আমাদের ভুলুর মতো দেখতে। সবার কথাই মনে হয়। এপ্রিল মাস আসতে এখনও অনেক অনেক দেরি। এতদিন কীভাবে অপেক্ষা করব জানি না।

ঝিনুক চিঠি লেখাব সাদা কাগজটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এতক্ষণ শুধু ভেবেছে কী লিখবে, একটা অক্ষরও লেখেনি। উত্তরের জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে। একটু শীতশীত লাগছে। একবার ভাবল উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ কবে দেয়। কিন্তু উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিতে ভারী আলসেমি লাগল। আসলে শীতশীত লাগলেও সে-শীত সইয়ে নেবার মধ্যেই। জানো বাবা, এখানকার শীত ওদিককার মতো নয়। খুব একটা কষ্ট হয় না। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ওখানে তো খুব শীত। তোমারও তো আবার অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যাবার ধাত। এ-সময়টা খুব সাবধানে থাকবে কিন্তু। মা ওষুধগুলো ঠিকঠাক খায় তো? ভাই গরমজামা পরে তো? নাকি শুধু শার্ট পরেই খেলার মাঠে চলে যায়? আমার কেমন যে লাগে! এতদূরে আছি, কিছুই জানতে পারি না। এপ্রিল মাসটা কবে যে আসবে। ইচ্ছে করে ক্যালেন্ডার থেকে ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসের পাতা ছিঁড়ে এপ্রিল করে দিই।

ঝিনুক সাদা কাগজে হাত বুলিয়ে নিল। এবার সে সত্যি সত্যিই লিখতে শুরু করবে। চিঠিটা কি সন্দীপকে দেখাবে? ধুস! তাই হয় নাকি। সন্দীপ মজা পেয়ে হইচই শুরু করে দেবে। চিঠিটা হাতে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করবে, কিছুতেই ঝিনুককে দেবে না। এ রাম, বোকা মেয়ে, বাচ্চাদের মতো মন খারাপ করে। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। ঝিনুক চিঠিটা পাবার জন্যে সন্দীপের পেছন পেছন ঘুরবে। এই, ভাল হবে না কিন্তু। দাও, চিঠিটা আমাকে দাও। সন্দীপ বলবে, দিতে পারি এক শর্তে। ঝিনুক জানতে চাইবে, কী শর্ত? সন্দীপ বলবে, কাছে এসো, কানে কানে বলছি। ঝিনুক অমনি লজ্জা পেয়ে যাবে। সে জানে না বুঝি তার বরকে। ভালমানুষ না ছাই। আস্ত একটা দস্যি। কিন্তু এ-চিঠি পড়ে সন্দীপ যদি দুঃখ পায়? ঝিনুকের এখানে কিছু ভাল লাগছে না জেনে তার যদি মন খারাপ হয়ে যায়? না না, তা কখনও চায় না ঝিনুক। বাবা, তোমার জামাই না প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলায় এত এত খাবার নিয়ে বাড়ি ফেরে। আমি যা যা ভালবাসি, সব নিয়ে আসে। অত কে খাবে! এত বাজে খরচ করা কখনও উচিত নয়, তাই না বাবা।

চিঠিটা সন্দীপকে দেখাবে কি দেখাবে না সেসব পরে ভাবা যাবে। আগে চিঠিটা লেখা হোক তো। লেখা হয়ে গেলে সেটা একটা খামে ভরে আঠা দিয়ে মুখ আটকে দিয়ে না হয় সন্দীপকে বলবে পোস্ট করে দিতে। তাতে সন্দীপকেও জানানো হল, আবার চিঠিতে কী লিখছে তা সন্দীপের অজানা থেকে গেল। সন্দীপকে না জানিয়ে কিছু করবে না সে। মা পইপই করে বলে দিয়েছে বরের কাছে কখনও কিছু গোপন করবে না।

খুব একটা চেনা শব্দ কানে আসছিল তখন থেকে। শব্দটা কাছে আসতেই ঝিনুক চিনতে পারল। অলস দুপুরের ঘুম ভাঙিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে কেউ রাস্তা দিয়ে আসছে। কে আবার, বাঁদর খেলানোর লোক। এমনি দুপুরে তাদের ওখানেও ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদর খেলা যায়। এটাও নিশ্চয়ই সেইরকম কোনও খেলা। ঝিনুকের শরীরের মধ্যে এক কিশোরী মন চঞ্চল হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল এক ছুটে রাস্তায় চলে যায়। কিন্তু তা তো করা যাবে না। নতুন বউয়ের ওসব নাকি করতে নেই। অন্য লোকে নিন্দেমন্দ করবে। একেক সময় আমার কী মনে হয় জানো বাবা, আমি যেন একটা অন্ধকার ঘরে বন্দি হয়ে আছি। ঘরের দরজার শিকল কেউ বাইরে থেকে তুলে দিয়েছে। এটা কেমনধারা নিয়ম বাবা? একটা মেয়ের দুটো জীবন কখনও হয়? বিয়ের আগে একরকম আর বিয়ের পরে অন্যরকম? বিয়েটা তবে কি মেয়েদের আত্মবিলোপের অনুষ্ঠান? আমি যদি তোমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম, তখন তো তোমাদের সবাইকে ছেড়ে এতদূরে এসে এইভাবে একা একা মন খারাপ করে থাকতে হত না।

তখনই ঝিনুকের মনে হল সামনের বাড়ির বারান্দা থেকে কে যেন চট করে সরে গেল। কেউ কি তবে এতক্ষণ খোলা জানলার ভেতর বিছানায় উপুড় হয়ে আধা শুয়ে থাকা ঝিনুককে দেখছিল? জানলায় পরদা আছে। কিন্তু সেই পরদা হাওয়ায় ওপরে উঠে উঠে যাচ্ছে। এই সুযোগে কেউ তার চোখ ঘরের ভেতর পাঠিয়ে দিয়েছিল? আর এই অবস্থায় তাকে দেখা মানে বুকের অনেকখানি খোলা অংশ দেখে ফেলা। ঝিনুক তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল। লোকটা কে? সেই লোকটাও হতে পারে। ঝিনুককে বাইরে দেখলেই যে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু সে লোকটা পাশের বাড়ির বারান্দায় কেমনভাবে আসবে। ঝিনুক উঠে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখল। কই, নেই তো। বাড়ির জানলা দরজা সব বন্ধ। ও বাড়িতে কয়েকদিন হল কেউ থাকে না। তা হলে কি সবটাই দেখার ভুল? হয়তো জানলার সামনে দিয়ে কোনও পাখি উড়ে গিয়েছিল কিংবা সামনের গাছ থেকে কোনও পাতা খসে পড়ছে, তাতেই ওরকম মনে হয়েছে। জানলাটা বন্ধ করে দেবে কি? ঝিনুক উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করল না অবশ্য, শুধু পরদাটা টানটান করে দু'পাশে টেনে দিল। এ-ক্ষেত্রে চোখের ফাঁকি হলেও ওই লোকটার তাকানোটা কিন্তু সত্যিই খারাপ। তার লোলুপ চোখদুটো যেন ঝিনুকের সারাশরীরে হেঁটে বেড়ায়। এক একটা মানুষ এরকম কেন যে হয়। আমার ভীষণ রাগ হয়ে যায় বাবা। কিন্তু সে-রাগ যে দেখাব, এখানে এরকম কেউ নেই। সন্দীপকে বললে সে তো হেসেই উড়িয়ে দেয় সবকিছু। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমি কেমন আছি।

ঝিনুক আবার বিছানায় এল। এবার সত্যি সত্যি চিঠি লেখা শুরু করবে। ঠিক তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। বেশ শব্দ করে কড়া নাড়ছে কেউ। কে আবার এল এই ভর দুপুরে। সন্দীপ তো কড়া নাড়ে না, ডোরবেল বাজায়। ঝিনুক উঠে দরজা খুলতে যাবে, তার আগেই সুধামাসি পাশের ঘর থেকে এসে দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলতেই এক এক করে চারজন মহিলা ঘরে ঢুকে পড়ল। সুধামাসি যে তাদের চেনে, তা তার মুখের খুশির হাসি দেখেই বোঝা গেল। ঝিনুক বুঝতে পারল চারজনই আশপাশের বাড়ির বউ। তাই সশব্দে কড়া নেড়ে নিজেদের সরব উপস্থিতির কথা জানিয়েছে।

ঝিনুক তাড়াতাড়ি করে চিঠি লেখার কাগজ আর ডটপেন বালিশের নীচে চালান করে দিল।

ঝিনুক তখনও বিছানায় বসে, ওরা সোজা চলে এলে বিছানার কাছে। সবারই বয়েস মনে হল ত্রিশের ওপরে। তার মানে বেশ কিছুদিন ওরা দুর্গাপুরে আছে।

একজন বলল, দেখা করতে এলাম গো নতুন বউয়ের সঙ্গে। আমরা সবাই তোমার মতোই। হাম পঞ্ছি এক ডাল কে।

ঝিনুক বিছানা থেকে নেমে বলল, বসুন আপনারা।

সোফায় বসে খুব ফরসা গোলগাল বউটি বলল, বসব বলেই তো এসেছি ভাই। তুমি তো যাবে

না। আমরাই তাই গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলাম। তোমার পতিদেবতাটির মতো আমাদের মিস্টাররাও স্টিল প্ল্যান্টে কাজ করে। আমি হলাম পৃথা। সুমন্ত সেনের বিটার-বেটার নয় কিন্তু বিটার-হাফ।

আরেকজন, সেও ফরসা, বলল, আর আমি হলাম কাকলি। কেয়ার অফ দেবাশিস মিত্র।

যার রং ততটা ফরসা নয়, কিন্তু মুখশ্রী ভাল, চোখে চশমা, সে নিজেকে দেখিয়ে বলল, আর এই কালো বউটি হল বিদিশা। একেবারে বিদিশার নিশা। অজয় নন্দীর বার্ডেন। আমার পাশের সুন্দরী বউটি হল পারমিতা। সুজিত রায়ের হার্টথ্রব।

পারমিতা বলল, কামাল কি বাত। বিদিশাদি, তোমার চশমার কাচ বদলাও। লেন্সের পাওয়ার কমে গেছে।

বিদিশা সহাস্য হল, কেন বলো তো?

বা রে, ভুলভাল দেখছ না। আমার মধ্যে সুন্দরী, হার্টথ্রব, এইসব দেখছ।

পারমিতা অবশ্য সত্যিই সবার মধ্যে সবচেয়ে ভাল দেখতে। লম্বা, ছিপছিপে, খুবই ফরসা। ওকে সুন্দরী বলাটা মোটেই অত্যুক্তি হয়ে যায়নি।

বিদিশা চোখ পাকিয়ে বলল, চালাকি হচ্ছে, না?

পারমিতা বলল, চালাকি কেন?

চালাকি না? তুমি চাইছ এখনই আমি তোমার চেহাবার একটা বিউটি সার্টিফিকেট দিয়ে বসি। সেটি হচ্ছে না কিন্তু।

পৃথা বলল, এই, তোমরা দেখি নিজেদের মধ্যেই কথা বলতে শুরু করলে, নতুন বউয়ের সঙ্গে কথা বলবে কখন।

কাকলি বলল, ঠিকই তো। তা তোমার নামটা কী যেন ভাই?

ঝিনুক বলল, ঝিনুক।

কাকলি উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, ওমা, কী সুন্দর নাম গো তোমার। বলেই গুনগুন করে গাইল, এমন একটা ঝিনুক খুঁজে পেলাম না যাতে মুক্তো আছে।

পারমিতা বলল, ওর মধ্যে কিন্তু মুক্তো আছে। দেখছিস না কেমন লক্ষ্মীঠাকুর লক্ষ্মীঠাকুর লাগছে। সন্দীপবাবুর পছন্দের প্রশংসা করতে হয় কিন্তু। কেমন খাসা মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে।

বিদিশা বলল, তা ভাই ঝিনুক, অমন আড়ষ্ট হয়ে বসে আছ কেন? আমাদের পছন্দ হচ্ছে না?

ঝিনুক লজ্জা পেয়ে গিয়ে বলল, না না, সেকী কথা। আমার খুব ভাল লাগছে। আপনারা বসুন, আমি চা করে আনি।

পৃথা মাথা নাড়ল, উঁহু, সেটি হচ্ছে না। চা করে আনার নাম করে পালানো চলবে না। আমাদের রেজিমেন্ট মাঝেমাঝেই অতর্কিত হানা দেব। কার্টসি দেখাতে গেলে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

ঝিনুক হেসে ফেলল। বলল, নিশ্চয়ই আসবেন। তবে আজ প্রথম দিন তো।

ঝিনুককে বলতে হয়নি, চায়ের ব্যবস্থা সুধামাসি আগেই করে ফেলেছিল। চা নয়, কফি। একটা ট্রেতে করে চার কাপ কফি আর প্লেটভরতি স্ন্যাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকল। লোকলৌকিকতার সব দিক খেয়াল আছে সুধামাসির।

পৃথা বলল, উষ্ণ কফি? তা চলতে পারে শীতের দুপুরে। কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? মাসি, তোমার বউদিদিমণিও তো আছে।

ঝিনুক বলল, আপনারা খান, আমি পরে খাব।

পৃথা রাজি হল না, সে তুমি যখন খাবে খেয়ো। মাসি, তুমি চট করে আরেকটা খালি কাপ নিয়ে এসো। চারটেকে পাঁচটা করে নেব।

কাকলি বলল, জলপাইগুড়ির মেয়ে না। চায়ের দেশ। তুমি বোধহয় চা-টাই প্রেফার করো।

ঝিনুক মাথা নাড়ল, আবার সামান্য হাসলও।

পৃথা বলল, কিন্তু তুমি দেখছি আমাদের কাছে মোটেই ফ্রি হতে পারছ না। এরকম করলে আমাদের কিন্তু আর আসা হবে না।

ঝিনুক ব্যস্ত গলায় বলল, না না আসবেন না কেন? নিশ্চয়ই আসবেন।

সুধামাসি খালি কাপ নিয়ে এল। চার কাপকে পাঁচ কাপ কফি করা হল। ঝিনুককেও একটা কাপ নিতে হল।

পারমিতা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, আঃ, মজা আ গিয়া। ফাইন বানিয়েছে মাসি। তা ঝিনুকভাই, তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে এখনও নতুন পরিবেশের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারোনি। বাড়ির জন্যে মন খারাপ লাগছে? আমারও বিয়ের পরে অমনি হত। এখন ভাবলেই হাসি পায়।

পৃথা বলল, আমরাও কেউ এখানকার লোক নই ভাই। আমাদেরও একদিন সবাইকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল। সব মেয়েদেরই তাই আসতে হয়। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। বরের ঘরই তখন নিজের ঘর হয়ে যায়। আর সন্দীপবাবু তো চমৎকার মানুষ। তোমার কোনওই অসুবিধে হবে না।

বিদিশা লঘু গলায় বলল, শুধু মা বাবা ভাই বোন কেন, আমার তো একটা জলজ্যান্ত লাভারকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল। সে বেচারা আমার বিয়ের কার্ড হাতে পেয়ে গেয়ে উঠেছিল এই কি গো শেষ দান? বিরহ দিয়ে গেলে, এই কি গো শেষ দান। ছেলেটা কবিতা টবিতা লিখত আর ভুল বানানে আমাকে এন্তার প্রেমপত্র পাঠাত। শুনেছি এখন পুলিশে চাকরি করে আর কবিটবিদের হাতের সামনে পেলে বেধড়ক পেটায়।

তুমুল হাসি। হেসে ফেলল ঝিনুকও। এমন মজার কথায় না হেসে পারা যায়।

বিদিশার পর পৃথা। সে বলল, আমার অবশ্য কোনও লাভার কিংবা বয়ফ্রেন্ড ছিল না। অসমে থাকতাম তো, ওখানে এক লোকাল মস্তান জাতীয় ছেলে খুব বিরক্ত করত। শুনেছি আমার বিয়ে হয়ে যাবার পর সে মনের দুঃখে সোজা উগ্রপন্থীদের দলে নাম লিখিয়ে সেই যে চলে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি।

আবার সবার হাসি। ঝিনুক তো শব্দ করেই হেসে ফেলল। তার মনে হল এতক্ষণ সে দরজা জানলা বন্ধ করে এক গুমোট ঘরের মধ্যে বসে ছিল, এখন খোলা জানলা দরজা দিয়ে অবারিত আলো বাতাস এসে তার মনের সব ধুলোময়লা উড়িয়ে দিয়েছে।

একটু পরে সে বলল, আপনারা এখানে সবাই বেশ ভাল আছেন, তাই না?

প্রথমে কেউই ঝিনুকের কথার কোনও উত্তর দিল না। একটু সময় সবাই-ই চুপ করে রইল। তারপর বিদিশা বলল, বেশ ভাল আছি কিনা জানি না। তবে ভাল আছি। সবাই পাশাপাশি আছি, সুখে দুঃখে সবার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। এই তো ভাল। আবার কী চাই। ভাল থাকা খারাপ থাকাটা নিজেরই তৈরি জিনিস ভাই।

তখনই পৃথা গম্ভীর গলায় বলল, আমি কিন্তু মোটেই ভাল নেই।

তোর আবার দুঃখে থাকার কী হল? কাকলি জানতে চাইল।

পৃথা মুখ ভার করে বলল, দুঃখে থাকব না? সুমন্ত্র বলে আমি নাকি ধারাবাহিক ভাবে মোটকু হয়ে যাচ্ছি। ও এখন আর আমাকে পৃথা বলে ডাকে না।

কী বলে ডাকে?

পৃথুলা বলে ডাকে। মানে স্থূলাঙ্গী। দুঃখ হবে না?

তুই কিছু বলিস না?

বলি না আবার। আমি ওকে লম্বুদাদা বলে ডাকি। কী পাজি জানিস। বলে, তোমার চোখে তা হলে আমি অমিতাভ বচ্চন। ব্যোঝো।

হাসি হাসি হাসি।

আরও কিছুটা সরস সময় কেটে গেল। তারপর সবাই উঠল। ঝিনুক দরজা পর্যন্ত গিয়ে বলল, আবার আসবেন কিন্তু।

পারমিতা বলল, আগে তুমি আমাদের বাড়ি যাবে, তারপর আমরা আসব। আমাদের প্রমীলা রেজিমেন্ট, একেক দিন একেক জনের বাড়ি গিয়ে তার দিবানিদ্রার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে আসি। এতদিন চারজন ছিলাম, এবার থেকে পাঁচজন হলাম। রাজি আছ তো?

ঝিনুক অনেকখানি ঘাড় কাত করে জানাল সে খুব রাজি।

ওরা চলে যাবার পর ঝিনুক বাবাকে চিঠি লিখতে বসল। আবার সেই নীল কাগজে প্রথমে যেমন লিখতে হয়, নানারকম খোঁজখবর, সেসব লেখা হয়ে যাবার পর সে চিঠির শেষে লিখল, এখানে আমি খুব ভাল আছি বাবা। মনেই হয় না নতুন কোনও জায়গায় আছি। এখানকার সব দারুণ ভাল। এপ্রিল মাসে যাবার কথা আছে। মাঝে তো মাত্র আর ক'টা দিন। তুমি আমার জন্যে মোটেই ভেবো না। প্রণাম নিয়ো। ইতি তোমার খুকু।

মাঝখানের দরজা

একটু আগেই ভাস্কর অফিস গেছে। বিয়ের পর এই প্রথম। সাত দিনের ছুটি কালই শেষ হয়ে গেছে। আজ সারাদিন পরমার একা থাকতে হবে। সেই সন্ধের পর ভাস্কর ফিরবে। অফিসটা বেশ কিছুটা দূরে। তার মানে সন্ধে পর্যন্ত পরমা একা। দরজার দিকে পরমা তাকাল। একা না আর কিছু। সারাবাড়ি জাগিয়ে আছে লোকজন। বাইরে থেকে আসা আত্মীয়স্বজন, এ-বাড়ির লোকজন তো আছেই। গুহ পরিবারের ডালপাতা বহুদূর ছড়ানো। এ-শহরের সব পাড়াতেই কেউ না কেউ আপনজন আছে। ভাস্করের কোনও ভাই নেই। দুই দিদি। পাটনা আর দিল্লির বাসিন্দা। এক বোন তিতলি। এখনও বিয়ে হয়নি। কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ চলছে।

একটু ফুরসত পেয়ে পরমা বিছানায় বসে বসে অ্যালবামের ফোটো দেখছিল। একটা না, দুটো অ্যালবামের ফোটো। একটা পুরনো, আরেকটা ঝকঝকে নতুন। পুরনো অ্যালবামে এ-বাড়ির নানান জনের নানান সময়ের ছবি। বেশ কয়েক বছর আগেকার ছবি দিয়ে অ্যালবামটা শুরু হয়েছে। কোনওটা পিকনিকের, কোনওটা কোনও পারিবারিক উৎসবের, কোনওটা বেড়িয়ে আসা বাইরের শহরের ছবি। আলাদা আলাদা করেও অনেক ছবি আছে। শ্বশুর-শাশুড়ির হাস্যমুখের ফোটো, দিদিদের ফোটো, অন্য অদেখা মুখের ফোটো। হারিয়ে যাওয়া কিছু মুহূর্ত স্থির হয়ে আছে ছবি হয়ে।

প্রথম অ্যালবামটা দেখা হলে পরমা দ্বিতীয় অ্যালবামটা হাতে নিল। এ-অ্যালবামটা বিয়ের সময়ের। সাতপাকে ঘোরা মালাবদল থেকে আরম্ভ করে বধূবরণ বউভাত আরও কত অনুষ্ঠানের হইহই মুহূর্ত। ফোটোগুলো দেখতে পরমার মজাই লাগছিল। বিশেষ করে ভাস্করের ছবি দেখে। কেমন ভালমানুষটির মতো মুখ করে বসে আছে। পরমা মুখ টিপে হাসল। ভালমানুষ না ছাই। আস্ত ডাকাত একটা। এক রাতেই পরমা টের পেয়ে গেছে।

ভাস্করের ছোটবোন তিতলি ঘরে ঢুকে পরমাকে অ্যালবাম দেখতে দেখে নিঃশব্দে পাশে এসে বলল, বিয়ের ফোটো দেখছ বউদি? সবই দাদার বন্ধু পার্থদার তোলা। দারুণ ফোটো তোলার হাত।

চকিতে পরমা অ্যালবাম বন্ধ করে তিতলির দিকে চেয়ে লাজুক হাসল। বলল, তাই তো দেখছি। খুব ভাল উঠেছে ছবিগুলো।

তিতলি ভাস্করের থেকে বেশ কয়েক বছরের ছোট। পরমারই কাছাকাছি বয়েসের হবে। এ-বাড়িতে আসার পর ওর সঙ্গেই একটু খোলামেলা সাবলীল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পরমার। তিতলির মধ্যে একটা মধুর সরলতা আছে, যা পরমাকে সহজ হতে সাহায্য করেছে।

তিতলি বলল, কিন্তু অ্যালবামটা বন্ধ করছ কেন? বেশ তো দেখছিলে। স্মৃতি সতত সুখের।

স্মৃতি? এখনই? পরমা সহাস্যে ভ্রূভঙ্গি করল।

নয়? চারদিন তো হয়ে গেছে বিয়ের। চারদিন মানে চব্বিশ ইন্টু চার— ছিয়ানব্বই ঘণ্টা। কাফি টাইম। ছিয়ানব্বই ঘণ্টায় একটা দেশের ইতিহাস বদলে যেতে পারে।

পরমার মুখে কৌতুক। বলল, তোমার তো অনার্স ইতিহাসে। তাই না?

ওয়াউ! তিতলির মুখ উজ্জ্বল হল। কামাল কি বাত বউদি। বিলকুল সহি। তবে এখন ইতিহাস ছাড়ো তো। চলো এ-বাড়ির ভূগোল দেখিয়ে দিই। কে কোন ঘরে থাকে, কোথায় কী।

পরমা পুরনো অ্যালবামটা হাতে নিয়ে পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল, আচ্ছা, এটা কার ফোটো বলো তো?

তিতলি অ্যালবামের দিকে তাকিয়ে বলল, কোনটা দেখি?

আরও দুটো পাতার পরেই পরমা ফোটোটা পেয়ে গেল। এক সুন্দর মুখশ্রীর মেয়ের ফোটো। একুশ-বাইশ বয়সের মনে হয়। ঝকমকে চোখে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটদুটো দেখে মনে হয় এক্ষুনি হেসে ফেলবে। ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে বলবে, কী গো নতুন বউ, কেমন লাগছে?

তিতলি একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখছিল, ফোটোটা দেখেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। নিস্পৃহ গলায় বলল, ওই তো মুক্তোদি— মুক্তোদির ফোটো।

মুক্তোদি কে?

তিতলিকে সামান্য গম্ভীর দেখাল। অস্বচ্ছ গলায় বলল, মুক্তোদি মুক্তোদিই। নেই। মারা গেছে। এত ফোটো থাকতে এ-ফোটোটাই তোমার চোখে পড়ল বউদি?

পরমার আরও কিছু জিজ্ঞাসার ছিল। কিন্তু তিতলির মুখ দেখে থেমে গেল। বুঝল ছবিটার সম্বন্ধে আর একটুও এগোবার ইচ্ছে নেই তিতলির। অ্যালবামটা বন্ধ করে বিছানার ওপর রেখে দিল সে।

তখনই যেন তিতলির জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেল। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এই রে, সাড়ে দশটা বেজে গেছে। সোমাদের বাড়িতে যেতে হবে। বলেই তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তিতলির ওইভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা ভারী অবাক ঠেকল পরমার কাছে। শুধু তাই নয়, তার আগে কেমন যেন বদলে গিয়েছিল তিতলি। পরমা বেশ বুঝতে পেরেছে মুক্তোদি নামে ওই মেয়েটির ছবিই অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল তিতলিকে। কিন্তু কেন? পরমা তো কিছুই জানে না। তা ছাড়া, এই ক'দিন ধরে তিতলিকে যতটুকু দেখেছে, যতটুকু বুঝেছে, তার কাছ থেকে এমনতর আচরণ কখনই প্রত্যাশিত ছিল না। তাকে মিষ্টি স্বভাবের পরিষ্কার মনের মেয়ে বলেই মনে হয়েছে। আর ছবির ওই মুক্তোদির সম্বন্ধে পরমার জানতে চাওয়া তো নেহাতই এক মেয়েলি কৌতূহল ছাড়া কিছুই নয়। সে কস্মিনকালেও মেয়েটিকে দ্যাখেনি, তার সম্বন্ধে কিছু জানেও না। সে-কথা তো তিতলিরও অজানিত থাকার কথা নয়। তবু সে এমন করল কেন কে জানে।

পরমা অনেকক্ষণ বিছানায় চুপ করে বসে থেকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল। মনটা হালকা করার জন্য বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে তিতলির ব্যাপারটা সাজাল। সাজাতে গিয়ে পেয়ে গেল একটা অল্পবয়েসি মেয়েকে, যার আচরণ সবসময় মাপাজোখা হিসেবের মধ্যে পড়ে না। সে একটু চঞ্চল, একটু মুডি মেয়ে হতেই পারে। আসলে সদ্য বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সব মেয়ের মনের মধ্যে একটা রহস্য গল্প তৈরি হয়েই থাকে। সেই গল্পটাই বারেবারে ফিরে আসে। যে যা-ই বলুক, নতুন পরিবেশ সম্বন্ধে একটা টানটান সাসপেন্স মনের মধ্যে থেকেই যায়। শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে বাপের বাড়ির লোকজন যা বলে তাতে অতিরঞ্জন থাকেই। সত্যি কথার মধ্যে শুভ কামনার খাদ মেশানো থাকে। সেই ভাবনা ছিল বলেই হয়তো তিতলির আচরণ এমন মনে হয়েছে। ধুত, এইসব মনগড়া সাতকাহন ভেবে মিছেই মনখারাপ করে আছে সে।

পরমা উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে আছে সে। এটা নতুন বউয়ের পক্ষে ভাল দেখায় না। এবার রান্নাঘরে যেতে হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চুলটা সামান্য আঁচড়ে নিল, শাড়িটা টেনেটুনে ঠিক করে পরে নিল। মুখ দেখল আয়নায়। কী কাণ্ড দ্যাখো! সিঁদুরের টিপটা কিছুটা ঘেঁরছে গেছে। অফিস যাবার আগে ভাস্করের পাগলামির চিহ্ন। তিতলি খেয়াল করেছে কিনা কে জানে। পরমা টিপটা ঠিক করে নিল। এখন ওর নিজেকে ভারমুক্ত মনে হচ্ছে।

কিন্তু আকাশটা বেশিক্ষণ মেঘমুক্ত থাকল না। ঘরের বাইরে এসে সেই ছবিটা দেখতে পেল না যেমন সে আশা করেছিল। বাড়িতে এত লোক, কিন্তু সবাই যেন অনেক দূরে। হঠাৎই সরে গেছে। তাকে দেখে হাসল, কথা বলল, কিন্তু সবই যেন চটজলদি বানানো মনে হল। উৎসবের বাড়ির সবই আগের মতো আছে, কিন্তু কোনওটাতেই প্রাণের স্পর্শ নেই।

ধুলোবালি সরিয়ে ছবিটা আরও স্পষ্ট হল দুপুরবেলায় খাওয়ার সময়। একটা গোল ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছে ভাস্করের দুই ভগ্নিপতি, বাইরের থেকে আসা পিসতুতো দাদা-বউদি, মেসোমশাই-মাসিমা, আরও দু'জন। ছোটদের আগেই খাওয়া হয়ে গেছে। শ্বশুরমশাইয়ের শরীর ভাল যাচ্ছে না, তিনিও খেয়ে নিয়েছেন। পরিবেশন করছিল পরমা আর ভাস্করের দুই দিদি। নন্দিনী আর ইন্দ্রাণী। আগের দু'দিন সবাই হইহই করে দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়েছে। আজ কেউই বেশি কথা বলছিল না।

শাশুড়ি সুপ্রিয়া রান্নাঘরে এলেন। পরমাকে দেখে তিনি হাসলেন। হাসিটা কিন্তু একটা মাপা সীমানায় এসে থেমে রইল। বললেন, কী বউমা, সবকিছু বুঝেশুনে নিয়েছ তো?

পরমা বলল, হ্যাঁ মা।

সুপ্রিয়া বললেন, এখন থেকে তোমারই তো সবকিছু দেখাশোনা করতে হবে। এ তো তোমারই সংসার।

নন্দিনী হালকা গলায় বলল, তুমি কিছু ভেবো না মা, পরমার বাবা নামকরা উকিল। ও ঠিক দেখেশুনে নেবে।

কথাটা যে নেহাতই কথার কথা নয়, সেটা পরমা বুঝল যখন সবাইকে চুপ করে বসে থাকতে দেখল। শাশুড়িও কিছু বললেন না। অথচ কথাটা একটা কৌতুকের কথা হয়ে যেত কেউ যদি সকৌতুক হেসে উঠত, কেউ যদি মজা করে আরেকটা মজার কথা বলত। কিন্তু এমন কিছুই হল না। পরমা বুঝল না হঠাৎ এমন কী ঘটল যার জন্য চার দিনের নতুন বউ চার বছরেব পুরনো হয়ে গেল। তা হলে কি উৎসবের পোশাকটা খুলে পড়েছে মুক্তোদির ওই ফোটোটার কথা জানতে চেয়ে? তিতলি কি কিছু বলেছে সবাইকে? পরমার মনে মেঘ ঘনাল।

সেই অস্বস্তি সারাদিনেও কাটল না। সমস্ত বাড়িটাই থম মেরে রইল দুপুর থেকে বিকেল, বিকেল থেকে সন্ধেবেলা পর্যন্ত। নতুন বউয়ের সঙ্গে যতটুকু কথা বলা দরকার, যতটুকু হাসা দরকার শিষ্টাচারের প্রয়োজনে, তার বেশি কেউ কথা বলল না পরমার সঙ্গে, কেউ হাসল না। কী এক দুর্বোধ কারণে তিতলিকে তো সারাদিন কাছেপিঠেই দেখা গেল না। আধুনিকমনস্ক শিক্ষিত পরিবার। কোনও মনোভাবই প্রকাশ্যে চলে এল না, কিন্তু আন্তরিকতার ঘাটতিটুকু বুঝতে পরমার কোনও অসুবিধা হল না। কেন সবকিছু এমন হয়ে গেল? অ্যালবামের ওই ফোটোর কথা জানতে চাওয়া, নাকি অন্য কিছু? অন্য কিছু হলে কী সেটা? পরমা ভেবে ভেবে থই পায় না।

সন্ধেবেলায় ভাস্কর অফিস থেকে ফিরল। ভাস্কর ঠিক তেমনি আছে। যে-মানুষটি সকালে অফিস গিয়েছিল, ফিরে আসার পরে সেই একই মানুষ থেকে গেল। তেমনি আনন্দে, উচ্ছ্বাসে, প্রাণময়তায় অফুরন্ত। সমস্ত বাড়িকে একাই সে মাতিয়ে রাখল। সারাদিনে যেটুকু কম হয়ে গিয়েছিল, সেটুকু সে একাই পুষিয়ে দিল। পরমা বুঝল অনভিপ্রেত ঘটনাটার কোনওই ছায়া পড়েনি ভাস্করের মনে। তার মানে কেউ কিছু বলেনি তাকে। অথচ তখনও কিন্তু বাড়ির সবাই পরমার সঙ্গে একই দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। স্থিতাবস্থা যেমন ছিল তেমনই রইল। সেই উদাসীন মুখ, সেই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকা, সেই আলো আঁধারির লুকোচুরি খেলা। পরমার বুকের ওপর থেকে জগদ্দল পাথরটা একচুলও সরল না।

রাতে শুতে যাবার আগে ভাস্কর ঘরের দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। এক বাড়ির মধ্যে থেকেও ঘরটা তখন এক বিচ্ছিন্ন কক্ষ হয়ে গেল। নিভৃত, অন্তরঙ্গ, আর আলাদা ঘর। কিন্তু সেজন্য আলাদা কোনও অনুভূতি আজ পরমাকে রোমাঞ্চিত করল না। আজ তার বুকের মধ্যে ওত পেতে আছে হিংস্র অভিমান। সে গুম হয়ে বসে থাকে বিছানায়। কে এই মুক্তোদি তাকে জানতেই হবে। ভাস্করকে বলতেই হবে মুক্তোদির সম্পর্কে জানতে চেয়ে কোন অপরাধ সে করেছে।

ভাস্কর কাছে এসে পরমার ভারী মুখ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, কী ব্যাপার বলো তো? অফিস থেকে আসার পর থেকেই তোমাকে অন্যরকম দেখছি। কী হয়েছে?

পরমা ঝরঝরিয়ে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তার মনে হল একটা মস্ত ভুল করতে যাচ্ছে সে। এই খোলামেলা মানুষটিকে অন্যের কারণে দূরে ঠেলে দেওয়াটা মস্ত বড় হঠকারিতা হয়ে যাবে। এক একটা মানুষ জীবনে অনেক আলো-বাতাস নিয়ে আসে। ভাস্করও তাই। তার সঙ্গে সামান্য চারটে দিনের সাহচর্য, তবু এই আদিগন্ত ছড়ানো পরিষ্কার মানুষটি চেনার পক্ষে ঢের সময়। কী লাভ আত্মবঞ্চনা করে!

পরমার পাশে এসে বসল ভাস্কর। স্নিগ্ধ গলায় বলল, বাড়ির জন্যে মন খারাপ করছে?

পরমা লজ্জা পাওয়ার গলায় বলল, করছিল।

ভাস্কর একহাতে পবমাকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে এনে বলল, করছিল? এখন করছে না।

গভীর আবেশে চোখ বুজে পরমা বলল, একটুও না।

এই তো ভাল পরমার। এই মুখ, এই আবেশ, সেও মিথ্যে নয়। পুরনো অধ্যায়ের পরে সব মানুষই তো আবার নতুন অধ্যায়ে আসে। কী লাভ ছবি হয়ে যাওয়া ওই মুক্তো নামের মেয়েটির কথা জেনে। সব সম্পর্কের মাঝখানেই তো একটা আবছা অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে থাকে। মুক্তো যদি একটা বিতর্কিত স্মৃতি হয, তাতেই বা কী আসে যায়। তার জন্য তো ভাস্করের কিছু কম হয়ে যায়নি।

পবমা আর ভাস্কবেব মাঝখানেও কি, দুর্বলভাবে হলেও, অনিমেষ থাকবে না!

এষা

সন্ধে সাতটা বাজতেই দার্জিলিং মেল যখন ছেড়ে দিল আর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা বড়মামার হাত নাড়াটা আড়ালে চলে গেল একটু পরেই, তখন ছেলেটি এল নিজের জায়গায়, সিট নম্বর পাঁচে। একটু আগেই এষা মনে মনে ভাবছিল যার সিট সে না এলেই ভাল হয়। শেষ মুহূর্তে যাত্রা বাতিল করে দেবার মতো কত কারণই তো থাকতে পারে। তেমন কিছু যদি হয়, তা হলে এষা বেশ মজা করে চলে যেতে পারবে জানলার ঠিক পাশের জায়গাটিতে বসে বসে। কিন্তু সে যখন সত্যিই এল, তখন আসাটা তো খুশি হবার মতো কিছু নয়, তাই সে সামনে এসে দাঁড়ালেও এষা যেন তাকে দেখেইনি, এমনিভাবে জানলার বাইরের অপস্রিয়মান কলকাতাকে দেখছিল।

সামান্য পরে তার গলা শুনল সে, শুনুন, আপনি বোধহয়—

এবার এষাকে মুখ ফেরাতেই হল। তখনই তাকে দেখল সে। সাতাশ-আঠাশ বছর বয়েসের একটি ছেলে। লম্বা, ফরসা, বুক খোলা নীল জামা, ফুল প্যান্ট। হাতে একটা ব্যাগ।

এটা আপনার সিট?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। পাঁচ নম্বর। আপনারটা বোধহয় পাশেরটা।

এষা জানলার পাশ থেকে পাশের সিটে নিজের জায়গায় সরে এল।

ছেলেটি কিন্তু নিজের জায়গায় বসল না। বলল, ঠিক আছে, আপনি ওটাতেই জানলার পাশেই বসুন। আমি আপনার জায়গায় বসছি।

কিন্তু এটা তো আপনার সিট।

তো কী হয়েছে। সরুন, বসতে দিন তো আগে।

এমনভাবে বলা, যেন কতদিনের পরিচয়, সরে বসতেই হয় এষাকে। জানলার ঠিক পাশে, যেখানে বসার ইচ্ছেটাও তার আগে থেকেই হয়ে আছে। ছেলেটি বাঙ্কের ওপর ব্যাগটা রেখে পাশে বসে বলল, এক জায়গায় বসলেই হল। বসে বসেই তো যেতে হবে।

এষা জানলার বাইরে তাকায়। গাড়ি এখনও ছুটছে না, আগের চেয়ে একটু জোরে যাচ্ছে শুধু। পেরিয়ে যাচ্ছে মাঠ, পুকুরের পার, লোকালয়, আলোকিত দোকানপাট, রাস্তা, মানুষজন। বড়মামা নিশ্চয়ই এখনও বাড়ি পৌঁছাননি, রাস্তাতেই, বাসে করে যেতে যেতে বড়মামা নিশ্চয় এষার কথা ভাবছেন। একা একা জলপাইগুড়ি যাচ্ছে এষা, বড়মামার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। গাড়ি ছাড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সতর্ক করে দিয়েছেন— এটা করবি না, ওটা করবি না, চুপ করে নিজের জায়গায় বসে থাকবি, গিয়েই একটা টেলিগ্রাম করে দিবি। যেন সদ্য গ্র্যাজুয়েট হওয়া একুশ বছরের এষা নয়, কোনও অবোধ বাচ্চা মেয়ে একা একা যাচ্ছে, যার বয়েস দশ-এগারো বছর। যেন কোনও রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র কিংবা শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্য পড়বে পথে। আসলে স্নেহ-ভালবাসার ক্ষেত্রে এসব হয়। তখন চিন্তা-ভাবনাগুলো বড় অদ্ভুত আর দুর্বল হয়ে যায়, স্বার্থপরও বটে। বড়মামার সময় থাকলে তিনি নিজেই এষাকে পৌঁছে দিতেন জলপাইগুড়ি। হঠাৎ বাবার চিঠি এসে গেল যে। অবিলম্বে এষাকে পাঠিয়ে দিতে লিখেছে। ইন্টারভিউ দিয়েছিল সেই চাকরির ব্যাপারেই। বড়মামার জন্যে মন কেমন কেমন লাগছিল এষার। মামি, মামাতো ভাই-বোনদের জন্যেও। হঠাৎই চলে আসতে হল।

জানলা দিয়ে জল ছিটকে আসছে। বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বেশ জোরে জোরেই। গায়ে লাগছে

এষার। জানলার কাচটা নামিয়ে দিতে হয়, কিন্তু নামাতে পারল না সে। শক্ত হয়ে এঁটে আছে। ছেলেটি তাড়াতাড়ি উঠে টেনে নামিয়ে দিল কাচটা। ইতিমধ্যে কামরার এ-পাশের সবক'টা জানলা বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টির জল ভেতরে আসছিল। এখন আর বাইরে তাকিয়ে দেখার কিছু নেই। এষা কামরার ভেতরের মুখগুলো দেখল এতক্ষণে। তার মুখোমুখি বসে আছে প্রায়-প্রৌঢ়া এক মহিলা। তাকিয়ে আছে এষার দিকেই। তার পাশের ভদ্রলোকটি সম্ভবত তার স্বামী। ও-পাশে আরও দু'জন ভদ্রলোক যাঁরা বসে আছেন, একজন চল্লিশ-একচল্লিশের, অন্যজন আরও কয়েক বছরের বেশি। আর এদিকে এষার পাশের ছেলেটির পাশে যাঁরা আছেন, দু'জনেই মধ্য বয়েসের পুরুষ। পুরো কামরার বসবার আসন রিজার্ভ করা। তবু কয়েকজন অতিরিক্ত যাত্রী, যেমন হয় সবসময়, উঠে পড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। বড়মামা স্লিপারের জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাত্র একদিন আগে তো, বসবার জায়গাই পাওয়া গেল শুধু।

বৃষ্টির মেঘ ছাড়িয়ে এল গাড়ি কিছুক্ষণ পরেই। এখন বৃষ্টি নেই। জানলাগুলো সবক'টা খুলে গেল। কিন্তু আবারও এষার সেই একই মুশকিল। কাচের জানলাটা ওঠানো যাচ্ছে না। তাকিয়ে দ্যাখে ছেলেটি হাসছে। যেন এষা যে কাচটা ওঠাতে পারবে না, সেটা ওর জানা কথাই। তারপর উঠে কাচটা তুলে দিয়ে নিজের জাযগায় বসল। ঠিক লজ্জা নয, লজ্জা পাওয়ার মতো মুখ করে এষা বসে রইল। ঠোঁটদুটোতে সামান্য হাসি লেগে রইল।

জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে। একটু আগের গুমট ভাবটা আব নেই। জানলার বাইরে এখন অন্ধকাব রাত। এষা হেলান দিয়ে শরীরটা একটু ছেড়ে দিয়ে বসল। ছেলেটি তখন পকেট থেকে সিগারেটেব প্যাকেট বেব কবেছে। একটা সিগারেট মুখে দিয়ে কী মনে করে সেটা জ্বালাল না, আবার প্যাকেটে রেখে দিয়ে চালান করে দিল পকেটে। দেশলাইটাও। এষার মজা লাগছিল। এখনও খুব লায়েক হযে উঠতে পারেনি ছেলেটি। বযস্কদের সামনে সিগারেট খেতে স্বচ্ছন্দ হতে পারছে না, কমবয়েসি দ্বিধাটা এখনও রযে গেছে।

খেলেন না সিগাবেট? এষা হাসছিল।

ছেলেটিও হাসল। বলল, এত লোকের মধ্যে ঠিক উচিত নয। অনেকের অসুবিধে হয়। তবে সারারাত তো আর শুধু শুধু বসে বসে যাওয়া যাবে না, দু'-একটা খেতেই হবে।

না খেলেই তো ভাল হয়।

বলছেন? খাব না তা হলে।

সারারাত শুধু শুধু বসে বসে এষারও ভাল লাগবে না। দু'-একটা কথা তো বলতেই হবে। অন্তত ঠিক পাশের যাত্রীটির সঙ্গে। বলল, কোথায় যাবেন?

আপনি যেখানে যাবেন।

অপাঙ্গে তাকায় এষা। প্রথম থেকেই ছেলেটির মুখ খুব অপরিচিত মনে হয়নি, এর আগে কখনও দেখেনি, তবুও। ভালই হল। যাওয়াটা একেবারে একা একা হয়ে যাবে না। ও যেখানে যাচ্ছে, ঠিক পাশের যাত্রীটিও ঠিক সেখানেই যাচ্ছে। তা ছাড়া ছেলেটিকে খারাপ লাগছে না। ভদ্র, মার্জিত, একটু যেন ছেলেমানুষও।

সঙ্গে কাউকেও দেখছি না, একাই যাচ্ছেন? ছেলেটি জানতে চাইল।

হ্যাঁ। হঠাৎ চলে আসতে হল তো।

জলপাইগুড়িতে কোথায় থাকেন?

কদমতলায়।

আমিও তাই ভাবছিলাম। কদমতলাতেই বোধহয় আপনাকে দেখেছি।

আমি কিন্তু আপনাকে— ঠিক মনে পড়ছে না—

দেখেছেন ঠিকই, কতটুকুই বা জায়গা। তবে মনে রাখার মতো চেহারা নয় তো, মনে নেই তাই। ছেলেটির বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল এষা। একেবারে অকপট সরল কথা। তবে কথার পিঠে

এষা এ-কথাও তো বলতে পারে— তা হলে এষাকে মনে আছে কেন? তার চেহারা মনে রাখার মতো বলেই কি? কিন্তু মনের কথা মনে মনেই বলা হয় শুধু। ঠোঁটের কোণে একফালি প্রসন্ন হাসিই শুধু ছুঁয়ে থাকে এষার। আসলে কথাগুলো বলতে চাইলেও, সেগুলো কিছুটা অন্তরঙ্গ বলে মনে হতে পারে, সে-সম্পর্ক দু'জনের মধ্যে নেইও, এত অল্প পরিচয়ে বলাও যায় না। তবু. এষা মনে মনে ভাবল, মনে রাখার মতো চেহারা পাশের মানুষটির নয়, এ-কথা একদম ঠিক নয়।

আলাপ পরিচয় হয়েছিল এইভাবেই। একসঙ্গে ট্রেনে যেতে যেতে। সে আলাপ দূর থেকে কিছুটা কাছেও সরে এসেছিল। খুব সাধারণ মেয়ের মতো অবশ্য এষা নয়। তার রুচি আছে, শিক্ষা আছে, যাকে বলা যায় স্মার্ট মেয়ে তাও সে। তাকে দেখতে সুশ্রীই বলা চলে। তার সুন্দর মুখশ্রীকে আরও ঝকঝকে করে তুলেছে তার দু'টি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, চশমার কাচের নীচে যা আয়ত হয়ে আছে। প্রগলভা তো সে কখনই নই। এই এক রাত্রির দীর্ঘ যাত্রাপথ তার চুপ করে বসে যাওয়াটাই তার পরিচিত জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবু তার মনে হল কখনও কখনও কোনও চমৎকার মানুষ হঠাৎ হঠাৎ আবিষ্কার হয়ে যায়, যার কাছে ইচ্ছে হয় কিছু উচ্ছল হতে। ভাল লাগে যার কথা শুনতে, যাকে কথা বলতে।

জংশন স্টেশনে গাড়ি থামে। ছেলেটি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চা-য়ালাকে ডাকে। দুটো চা দিতে বলে।

এষা বলল, একটা নিন।

আপনি খাবেন না?

এখন ইচ্ছে করছে না।

চা খান না?

খাই। তবে খুব কম। স্টেশনের চা তো একদমই না।

ছেলেটি একটু থেমে গেল যেন। চা-য়ালাকে বলল, একটাই চা দাও ভাই।

এবার একটু কেমন যেন লাগল এষার। কোথায় যেন একটু তাল কেটে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎই বলল, একটা না, দুটোই নিন। এই যে আরেকটা চা দাও তো।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করে। চা নিয়ে নিজের জায়গায় বসে ছেলেটি বলল, ভাল না লাগার ব্যাপারে কিন্তু কম্প্রোমাইজ কবা ঠিক নয়। চা-টা না খেলেই পারতেন। সত্যি কিন্তু খুব বাজে চা।

এষা বলল, চা খাই না বললে ঠিক হবে না। সকালবেলায় এক কাপ চা অবশ্যই চাই। ইটস এ মাস্ট।

মহাপুরুষ আর চা একই গোত্রীয় যে। ছেলেটি চায়ের ভাঁড়টা জানলার বাইরে ফেলে দিয়ে বলল।

এষা কথাটার মানে বুঝল না, কথাটা কোনও মজার কথা বলে মনে হলেও। বলল, মহাপুরুষ আর চা একই? কেন বলুন তো?

ছেলেটি গম্ভীর মুখে বলল, উভয়েই প্রাতঃস্মরণীয় বলে।

এষার মুখে হাসি প্রসারিত হয়।

চোখ ফেরাতে গিয়েই এষার চোখে পড়ল মুখোমুখি বসা ভদ্রমহিলার মুখ। খুব প্রসন্ন মনে হল না সেই মুখ। এসব, যা তিনি দু'টি অল্প বয়েসের চপলতা বলে মনে করেন, তাঁর পছন্দের মধ্যে বোধহয় পড়ে না। সম্ভবত তিনি অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছেন, শুনছেন ওদের কথাবার্তা। এষা মনে মনে হাসল। ভদ্রমহিলার সঙ্গী প্রৌঢ়টি চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। ও-পাশের একজন বই পড়ছেন, অন্যজন তাকিয়ে আছেন জানলার বাইরে। সমস্ত কামরাই এখন চুপ। এখনও খুব বেশি রাত হয়ে যায়নি, একটু একটু করে বাড়ছে। জানলার বাইরে তাকায় এষা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে ঘুমন্ত অন্ধকার। এখন শীতও চলে যায়নি, গরমও আসেনি। এ সময়টাকেই তো বসন্তকাল বলে। মার্চের মাঝামাঝি।

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বাঙ্ক থেকে তার ব্যাগটা নামিয়ে আনল, ব্যাগ খুলে একটা ম্যাগাজিন বের করে আবার ব্যাগটা রেখে দিল। ঝলমলে মলাটের বাংলা সাপ্তাহিক। সামনের পাতাটা উলটেও পড়ল না কিন্তু। এষার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, পড়বেন?

এষা তো পড়তেই চায়। তার প্রিয় সাপ্তাহিক। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন।

ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতেই এষার চোখে পড়ল ওপর হাতের অক্ষরে নাম লেখা রয়েছে। সামসুল রহমান। নামটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সে। ছেলেটি বুঝি লক্ষ করেছিল সেটা। মৃদু গলায় বলল, ওটা আমার নাম।

এষা দ্রুত অন্য পাতায় চলে গেল। তার শিক্ষিত পরিশীলিত সংস্কারমুক্ত মনের ভাবনা-চিন্তাগুলোকে অবশ্যই কোনও ভিন্ন খাতে বইয়ে দেবে না এ নাম, তবু দু'জনের কয়েক মুহূর্ত কথা না বলে থাকাটা তার ভীষণ নিস্তব্ধতা বলে মনে হচ্ছিল। খুব অশোভনও লাগছিল। এক্ষুনি একটা কিছু বলতে হয়। সত্যি কথা বলতে কী, ছেলেটির পরিচয় চেনা রাস্তায় আসেনি বলে সেই মুহূর্তে দারুণ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছিল তাব। ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রেখেই সে বলল, আর আমার নাম হল এষা।

এষা কী?

কী আবার? এষা এষাই। মানে অন্বেষণ, ইচ্ছে।

সামসুল হাসল, তারপর কী? বোস না ঘোষ, ব্যানার্জি না চ্যাটার্জি?

মনে হয় গাঙ্গুলী।

এষার কথা ফেব হাসিয়ে দিল সামসুলকে।

মনে হয়? মনে হয কেন?

সার্টিফিকেটে তাই লেখা আছে বলে।

সামসুল একটু শব্দ করেই হেসে উঠল এবার। এযা তখন ম্যাগাজিনের একটাব পর একটা পাতা উলটে যাচ্ছে। পড়া তো নয়ই, দেখাও নয়। কিছু পড়ার জন্যে কিছু দেখার জন্যে যেমন লাগে সেই মন এখন নেই, সমযও সেরকম না। অবাঞ্ছিত মুহূর্তগুলো কোনওরকমে পার করে দেওয়া শুধু। ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে সে হাসল। তারপর ম্যাগাজিনটা সামসুলের হাতে দিয়ে বলল, পড়ুন।

সামসুল ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে ভাঁজ করে পাশে রেখে দিল। ওর চোখ তখন জানলার বাইরে, বাইরের নিঃসীম অন্ধকারে। এষাও বাইরে তাকায়। দেখা যায় না কিছুই, কিছু দেখার জন্যে তাকাযওনি। অন্ধকারে ঢেকে আছে বাইরের দৃশ্যপট। হঠাৎ হঠাৎ দু'-একটা আলোর বিন্দু দূর থেকে কাছে ছুটে এসে আবার ছুটে চলে যাচ্ছে দূরে। যেন এখন এক অলৌকিক জগতের মধ্যে দিয়ে গভীর রাতের ট্রেন হুহু করে ছুটে যাচ্ছে অজানা গন্তব্যের দিকে।

কামরার মধ্যে এখন কোনও সাড়া নেই, কোনও শব্দ নেই, সবাই চুপ। চোখ বন্ধ করে ঘুমের আমেজ ধরে রেখেছে। এষা আর সামসুলই জেগে আছে শুধু। ইচ্ছে করেই জেগে আছে এষা। জেগে থাকতে ভাল লাগছে বলে। তার মনে পড়ে না, কখনও কোনও সারারাত জেগে থাকার যন্ত্রণাকে এমনি রোমাঞ্চিত মনে হয়েছিল কিনা।

একটু পরে সামসুল প্রায় ফিসফিস করে কেবল এষাই শুনবে এমনি গলায় বলল, কী হল আপনার বলুন তো?

এষা বলল, কী আবার হবে?

হঠাৎ চুপ করে গেলেন যে?

কই না তো। বাইরে থেকে চোখ ফেরায় না এষা।

চুপ করে নেই তবে?

নেইই তো।

তা হলে কথা বলছেন। ওই অন্ধকাবের সঙ্গে?

তাই-ই হয়তো বলছি। তবে উচ্চারণ করে নয়।

অন্ধকারে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে সামসুল তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বলল, আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে— এইটুকু বলেই থেমে গেল সে।

এ-গানের পরের লাইনটা, যেটা সামসুল বলল না, মনে এসে যায় এষার। তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে। নিজের অজান্তে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে সে। কথা বদলে নেয় তাড়াতাড়ি। বলল, রবীন্দ্রসংগীত বুঝি খুব ভাল লাগে?

খুব। আমাকে কেউ যদি সারাদিন ধরে শোনায়, আমি শুনব। সত্যিই আমি শুনব।

কার গান ভাল লাগে?

সুচিত্রা, কণিকা, হেমন্ত।

আর কী ভাল লাগে?

কবিতা, জীবনানন্দ, শক্তি, সুনীল।

গল্প উপন্যাস?

দুর্দান্ত কাউকেই মনে হয় না।

সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা?

অবশ্যই ভাল। কিন্তু ফেলুদা ফ্যানটাস্টিক।

ক্রিকেট?

পাগলের মতো। কপিল, ইমরান, শচীন।

রবীন্দ্রনাথ?

খুব বাজে প্রশ্ন।

কেন?

রবীন্দ্রনাথকে ভাল না লাগার সাধ্যি আছে কি, অন্তত কোনও বাঙালির?

কী অদ্ভুত মিল। এষার যা ভাল লাগে, সামসুলেরও ঠিক তাই। সামসুল নয়, যেন দর্পণে এষা নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছে। এমন মানুষের কাছাকাছি থাকা যায় দিনের পর দিন। শুধু কথা বলে অনেক রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে এষার মন খারাপ হয়ে যায়। সকাল হলেই এই রেলযাত্রা শেষ হয়ে যাবে। তারপর তাদের শহর। দেয়ালে দেয়ালে কালো কালিতে মোটা হরফে লেখা রাজনীতির স্লোগান। মিটিং, মিছিল, মন্দির, মসজিদ, আত্মীয়, পরিজন। এই এষা হয়ে যাবে অন্য এষা। নাম— এষা গঙ্গোপাধ্যায়, হিন্দু ব্রাহ্মণ, অমুক গোত্র, তমুক রাশি, নর গণ কিংবা দেব গণ—

এষার মনে হল সামসুল যেন কিছু বলল। মুখ ফিরিয়ে তাকায সে।

কিছু বললেন?

সামসুল হাসছিল। বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? মনোজগতে?

এষাও হাসল। হাসিটা বড় মলিন দেখাল যদিও।

সামসুলের হাতে চকোলেটের বার। এষার প্রিয় মিল্ক চকোলেট। বলল, নিন।

এষার নিজের কাছেও অনেক খাবার আছে। আসবার সময় মামি টিফিনক্যারিয়ার ঠেসে মিষ্টি, লুচি, ডিমসেদ্ধ, তরকারি দিয়ে দিয়েছেন, যত পারেন। যেন প্রচুর খাবারদাবার থাকলে মেয়েটা কোনও বিপদে পড়বে না পথে।

দাঁড়ান, আমারগুলোও বের করি।

সামসুল বলল, ওগুলোর এখন দরকার নেই। এইটে এখন খান।

এষা চকোলেট নিল। পাতলা মোড়কটা খুলতে খুলতে বলল, বেশ তো লোক আপনি।

কেন বলুন তো?

চকোলেটও খান, আবার সিগারেটও।

হ্যাঁ, কেরোসিন তেলের লাইনেও দাঁড়াই, ক্লাসিকাল মিউজিক কনফারেন্সের টিকিটের লাইনেও দাঁড়াই। একেবারে টিপিক্যাল বাঙালি চরিত্র। ভূগোলেও আছি, জিরাফেও আছি।

এষা চকোলেটে কামড় দিল। এটাও তার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস। কী আশ্চর্য, এখানেও সেই মিল।

সামসুল ঠাট্টা করে বলল, মুসলমানের হাতে খেলেন, জাত যাবে না তো?

এষা বলল, জাত তো যায় না, জাত থাকে। আর থাকে বলেই তো যত গণ্ডগোল। গেলেই তো ভাল হত। জাত গেলে মানুষ থাকত। থাকে কই?

সামসুল কিছু বলল না। হাসিমুখে চুপ করে রইল।

এষা হাতঘড়িতে সময় দেখল। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। এরপর একটা বাজবে, একটার পর দুটো, তারপর তিন, তিনটের পর চারটে, পাঁচটা, ছ'টা। তারপর ট্রেন পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। নিউ জলপাইগুড়ি, তারপর অন্য লাইনে জলপাইগুড়ি। সবই থামে। কথা থামে, চলা থামে, শরীর থামে, থামে না শুধু সময়। নিরবধি চলেছেই। সেকেন্ড পার হয়ে মিনিট, মিনিট পার হয়ে ঘণ্টা, রাত্রি পার হয়ে সকাল। একসময় এষার মনে হয়েছিল এক রাত্রির পথ অনেক দীর্ঘ, অনেক বিলম্বিত সময়ের ব্যবধান। এখন মনে হচ্ছে কী দ্রুত ছোট হয়ে আসছে পথ, বয়ে যাচ্ছে সময়। কেমন করে ওঠে মন, আদিগন্ত শূন্য মাঠের মতো। রাত্রি শেষ হলেই এই যাত্রা শেষ হয়ে যাবে। যাত্রা শেষ হলেই দু'জনে আলাদা পরিচয়ের মানুষ হয়ে যাবে। দু'জনের মাঝখানে দেয়াল তুলে দাঁড়াবে নিষেধ। মনের মিল নয়, আত্মার আত্মীয়তা নয়, রুচির অভিন্নতা নয়, ধর্ম। এষা জানে প্রথাগত জীবনের বাইরে কখনই সে আসতে পারবে না। কেন এমন হয়? জীবনকে সুন্দর করে মনের মতো করে কেন সে ভাবতে পারবে না?

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে আছে সামসুল। বহু দূরমনস্ক দেখাচ্ছে তাকে। তাকিয়ে আছে বাইরে, অনিমেষ। ভঙ্গিটা ভারী অসহায় লাগছে।

এষা বলল, জলপাইগুড়িতে কী করেন?

চাকরি। চা-বাগানের হেডঅফিসে। ধুর।

ধুর কেন?

ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দেব।

ছেড়ে দেবেন? সেকী, কেন?

আগে মনে হয়নি। এখন, আজ মনে হচ্ছে। ছেড়ে দেব। ভাল লাগে না।

তারপর কী করবেন?

তারপরের কথা তো এখনও ভাবিনি। এখন শুধু এই মুহূর্তের কথা ভাবছি।

এই মুহূর্তগুলো চলে গেলে? চলে যাবেও তো।

জানি না, জানি না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সামসুল বলল, হয়তো তখন এত সাহস হবে না। তখন হয়তো ভাবব, হযতো ভাবব—

কী?

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।

এষা চুপ করে থাকে। একটু আগে কত কথা ছিল, এখন সেই কথাও নেই। সব কথাই তো বলা হয়ে গেছে। এখন চুপ করে থাকা, চুপ করে বসে ভাবা। ভারী অবাক লাগে নিজেকে। কত পথ, পথের কত বাঁক, কত দিন-রাত্রির আলো-অন্ধকার পেরিয়ে এসেছে তার একুশ বছরের জীবন। কিন্তু এমন করে তো কখনও সুগন্ধী ফুলের মতো ফুটে উঠতে চায়নি সে। আজ তার কী হল, কেন হল, কেন এই অসম্ভবের বিলাস, সে বুঝে উঠতে পারে না।

এমন যদি হত— একটু পরে সামসুল যেন মজা করে, বিষণ্ণ গলা হলেও, বলল।

এষা ওর মুখের দিকে তাকায়, কী?

এই ট্রেন যদি আর না থামত। কোনওদিনও না, কোনও স্টেশনেও না। শুধু চলত, অবিরাম চলত, চলত—

এষা বলল, আর এই রাতও যদি শেষ না হত। কোনওদিনও না, কখনও না, কোনও সকালেও না। থাকত, শুধু থাকত।

তা হলে বেশ হত, তাই না? কিন্তু তা তো হবে না।

হতেও তো পারে।

কী করে হবে। বড় বিষণ্ণ শোনায় সামসুলের গলা, এই রাতও শেষ হবে, এই ট্রেনও থামবে।

না না, এমনও হতে পারে, নিশ্চয়ই হতে পারে, এই রাতও শেষ হবে না, এই ট্রেনও পৌঁছোবে না শেষ স্টেশনে।

ভারী ছেলেমানুষ আমরা, তাই না? সামসুল হাসে, কী সব আবোল তাবোল ভাবছি।

এষা বলে, আমি কিন্তু ঠিকই বলছি।

সামসুল তখনও হাসে, ঠিকই বলছেন?

হ্যাঁ, ঠিকই তো বলছি। একটু পরেই যদি এই ট্রেন এক ভীষণ দুর্ঘটনায় পড়ে, সেই দুর্ঘটনায় যদি—

যদি?

যদি মরে যাই, তা হলে?

তা হলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হলে সত্যিই এই রাত শেষ হবে না—

এই ট্রেনও পৌঁছোবে না—

হ্যাঁ, এই ট্রেনও পৌঁছোবে না, যদি মরে যাই ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে। কিন্তু—

না না, কোনও কিন্তু নয়। সত্যিই যদি তাই হয়?

সত্যিই যদি তাই হয়?

তখনই সুতীক্ষ্ণ সিটি বেজে ওঠে ট্রেনের। চাকায় চাকায় ইস্পাতের যান্ত্রিক শব্দ তীব্র হয়। কালো রাত্রির বুক চিরে ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে দার্জিলিং মেল।

সামসুল আর কোনও কথা বলে না, এষাও না। এষা তখন ভাবছিল। ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা, শোচনীয় মৃত্যু, কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই ভয়ংকরের ভাবনা এষার মুখে একটুও ভয়ের ছায়া ফেলে না। সে যেন বিভোর হয়ে বড় সুখের স্বপ্ন দেখছে।

স্বপ্নের তো কোনও ধর্ম নেই, মৃতেরও নেই যেমন।

বনমল্লিকা

পাহাড় যেখান থেকে পায়ে পায়ে উঠে গেছে শিলং শহরে আর যেখানে এক টুকরো শ্যামল ভূপৃষ্ঠ জুড়ে টলটল করছে স্ফটিক-স্বচ্ছ জলাশয়, তার নাম উমিয়াম লেক। শিলংয়ের অন্যতম টুরিস্ট স্পট। স্থানীয় নাম বড়াপানি লেক। কোম্পানির কাজটাজগুলো মোটামুটি সেরে নিয়ে এক রবিবারের দুপুরে বড়াপানি এসেছিলাম সেই বিখ্যাত লেক দেখব বলে। কিন্তু লেক দেখা হল না। তার আগেই দেখা হয়ে গেল মল্লিকা বসুমল্লিক, আমাব কিশোরকালের মলিদির সঙ্গে। মল্লিকা বসুমল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পর আর কিছুই তো দ্যাখার থাকে না।

প্রথমে চিনতে পারিনি। ট্যাক্সি আমাকে যেখানে নামিয়ে দিল, দর্শনার্থীরা সাধারণত সেখান থেকে লেক দেখে। সেখানে খুব বেশি লোকজন দেখলাম না। শুধু এক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম একটা পাইন গাছের নীচে ঘাসের ওপর চাদর বিছিয়ে বসে লেকের জলের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। সামনে একটা লাল রঙের মারুতি গাড়ি থেমে আছে। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সম্ভবত গাড়ির চালক। ভদ্রমহিলাব মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কারণ আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম। তবু মহিলার বসে থাকাব ভঙ্গিটি খুব চেনাচেনা মনে হল। শুধু তাই নয়, মহিলার শবীর, গায়ের উজ্জ্বল ফরসা রং, কেশবিন্যাস, আমাকে স্মৃতিমনস্ক করে তুলছিল। মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম কোথায় কবে এবকম কাকে দেখেছিলাম। একটু পরেই ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন, গাড়ির চালকের দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন। আর তখনই আমার মনের অন্ধকারে ঝলসে উঠল বিদ্যুতের আলো। সেই আলোতে চেনা হয়ে গেল ভদ্রমহিলাকে। মল্লিকা বসুমল্লিক। মলিদি।

মলিদির সঙ্গে এইভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটা অপ্রত্যাশিত ঠিকই, কিন্তু অবাক হবার মতো কিছু নয়। এমন তো হতেই পারে। এমন তো কতই হয়। কোম্পানির কাজে আমি শিলংয়ে আসতেই পারি, শিলংয়ে এসে বড়াপানি লেক দেখতেও আসতেই পারি, সেখানে মলিদির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেই পারে। আর সেই দেখাটা প্রায় তিন দশক পরে হওয়াটাও ভয়ানক আশ্চর্যের কিছু হয়ে যায় না। আশ্চর্য হলাম অন্য জায়গায়। আঠাশ-উনত্রিশ বছর আগেকার সেই মলিদি এখনও কেমন করে সেই আগের মতোই ঝলমলে হয়ে আছে? সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান তার অনুপম দেহবল্লরীর কিছুই কমিয়ে দিতে পারেনি। বরং বলা যেতে পারে, বয়সের শান্ত বিকেলে এসে মলিদির সৌন্দর্য যেন এক অথই সমুদ্রের মতো গভীর হয়ে গেছে। দামি শাড়ি আর পশমের চাদরে জড়ানো মলিদির শরীরে বিকেলের লালচে রোদ্দুর যেন তার রূপমাধুরীতে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে।

ফিরে যাবে বলে মলিদি গাড়িতে উঠতে যাবে, আমি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললাম, চিনতে পারছ?

মলিদি থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন চোরালণ্ঠনের আলো ফেলে পাহারাওয়ালার মতো আমার মুখ চিনে নিতে চাইল। একটু সময়, তার পরেই চিনে ফেলার আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পিন্টু না?

আমি হাসিমুখে চুপ করে রইলাম।

মলিদি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলল, কী কাণ্ড দ্যাখো দিকিনি। পিন্টু তুই? কত বড় হয়ে গেছিস। চেনাই যায় না। তা তুই এখানে?

বললাম, কোম্পানির কাজে শিলংয়ে এসেছি। পরশু চলে যাব।

মলিদি বলল, যেতে দিলে তো যাবি। এখন চল তো আমার বাড়িতে। যেতে যেতে সব শুনব।

যে-ট্যাক্সিতে এসেছিলাম সেটা একটু দূরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। বললাম, কিন্তু আমি তো গাড়ি ভাড়া করে এসেছি। ওই যে।

মলিদি আমার কথাকে পাত্তাই দিল না। বলল, ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেছিল তো কী হয়েছে। ড্রাইভারকে আপ ডাউনের ভাড়া— দাঁড়া, টাকাটা আমিই দিচ্ছি।

আমি কিন্তু কিছুতেই মলিদিকে ট্যাক্সির ভাড়া দিতে দিলাম না। নিজেই ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মলিদির গাড়িতে তার পাশে বসলাম। একটা খটকা ছিল মনে। মলিদি ওইভাবে একা একা এমন সময়ে লেকের ধারে বসে ছিল কেন? বললাম, তুমি কি লেক দেখতেই এসেছিলে মলিদি?

ধুস! বড়াপানি তো হাজারবার দেখেছি। নতুন করে দেখার কী আছে! আসলে আমি প্রত্যেক রোববারেই এখানে আসি। একা একা বসে থেকে একাকিত্বটা অভ্যেস করে নিই।

কেন?

মলিদি মলিন হাসল।— সে তুই বুঝবি নে।

আমিও আর প্রসঙ্গটার ভেতরে ঢুকলাম না। চুপ করে বসে রইলাম। তখনই সেই গন্ধটা পেলাম। যে-গন্ধটা সেই কিশোর বয়সে মলিদির কাছে গেলেই পেতাম। মলিদি বরাবরই প্রসাধন করতে ভালবাসত। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারতাম গন্ধটা কোনও প্রসাধন দ্রব্যের না। ওটা মলিদির শরীরের গন্ধ। সেই অল্প বোঝার বয়েসেই মনে হত মলিদির শরীরে যেন একটা সুগন্ধি ফুল সবসময়ে ফুটে থাকে। সেই ফুলের মদির গন্ধের টানেই বারবার ছুটে যাই তার কাছে।

একদিন মলিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার কাছে এলেই একটা গন্ধ পাই। কীসের গন্ধ বলো তো?

মলিদি রহস্য করে বলেছিল, আমি শুধু মল্লিকা নই রে, বনমল্লিকা। ওটা তার গন্ধ।

সেই বনমল্লিকার গন্ধই আমাকে স্মৃতির নদী দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল উজানে। আমার কিশোরকালে। উত্তরবঙ্গের তিস্তার গা-ঘেঁষা সেই শহরে আমরা যে-বাড়িতে থাকতাম, তার দুটো বাড়ির পরেই ছিল মলিদিদের বাড়ি। সে সময় আমাদের পাড়ার ওই অঞ্চলটা ছিল একটা পরিবারের মতো। সব বাড়ির মধ্যে অবাধ মেলামেশা ছিল। মলিদির বাবা অমরেশ জেঠু ছিলেন সরকারি অফিসার। অবস্থাও ছিল সচ্ছল। মলিদি ছিল তাঁর একমাত্র সন্তান। পাকা গমের মতো গায়ের রং, টানাটানা চোখ, একমাথা চুল। সব মিলিয়ে মলিদি দারুণ সুন্দরী। শুধু দেখতে নয়, স্বভাবেও ছিল শান্ত হাসিখুশি।

তা ছাড়া মলিদির গানের গলাও ছিল খুব সুন্দর। আমি তখন নিতান্তই তেরো-চোদ্দো বছরের এক বালক। তবু তখনই বুঝতে পারতাম মলিদির মধ্যে দারুণ একটা আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণটা অদ্ভুত এক শরীরী গন্ধের। বনমল্লিকা, নাকি কস্তুরী গন্ধ? আমার চেয়ে পাঁচ-ছ' বছরের বড় ছিল মলিদি।

একদিন মলিদি আমাকে বলল, এই পিন্টু, আমাকে একটা কাজ করে দিতে পারবি?

মলিদির কাজ করতে আমি একপায়ে খাড়া। বললাম, কী কাজ করতে হবে বলো?

মলিদি একটু সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। বোধহয় বিশ্বাস খুঁজে নিতে চাইল, আমি ঠিক পারব কিনা।

কিন্তু কাউকেও বলা চলবে না। পারবি তো?

বুঝলাম না এমন কী কাজ যে কাউকে বলা চলবে না! আর মলিদিই বা অমন চাপা গলায় বলছে কেন? তবু মলিদির কাজ, আমাকে পারতেই হবে।

না, কাউকেও বলব না।

মলিদি চট করে দরজার সামনে গিয়ে বাইরেটা তাকিয়ে দেখে নিল কাছে পিঠে কেউ আছে

কিনা। তারপর আমার কাছে এসে বলল, যদি পারিস, তোকে একটা নতুন পেইন্টিং বক্স দেব।
আমার বুক দুরদুর করছিল। তবু বললাম, কী করতে হবে বলবে তো?
মলিদি ব্লাউজের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা নীল খাম বের করে আনল।
শোন, এই খামটা মোড়ের ওই হলুদ বাড়ির নীলুদাকে দিয়ে আসবি। নীলুদাকে তো তুই চিনিসই। কারও সামনে দিবি না কিন্তু। মনে থাকবে?
সঙ্গে সঙ্গে কোনও উত্তর না দিয়ে আমি চুপ করে রইলাম। নীলুদাকে আমি ভালই চিনি। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের লম্বা, ফরসা, স্বাস্থ্যবান চেহারা। খুব ভাল ফুটবল খেলে। টাউন ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড। কী যেন একটা চাকরি করত। পাড়ার সবারই প্রিয় ছিল নীলুদা।
কী রে, চুপ করে আছিস কেন? পারবি না?
বললাম, নীলুদা যদি বকে?
মলিদি হেসেই ঝরনাধারা। বলল, দুর বোকা ছেলে। বকবে কেন। বরং তোর ওপর খুশিই হবে। জানিস তো, হেরে যাব এমন কাজ আমি করি না।
কথাটা অবশ্য একটুও ভুল নয়। মলিদি সব কাজেই জিতে যায়। গর্বিত রাজহংসীর মতো স্বচ্ছ সবোবরে সবসময় ভেসে বেড়ায়।
মলিদি আবার বলল, অবশ্যি তুই যদি ভয় পেয়ে যাস, তবে থাক।
ছেলে আব মেয়েদের মধ্যে ভাব ভালবাসার ব্যাপাবটা জানার বয়সে আমি তখন এসে গেছি। স্কুলেব বন্ধুদের মধ্যে প্রায়ই এসব নিয়ে আলোচনা হয়। চিঠি চালাচলি আর প্রেমপত্রের কথাও শুনেছি। মুখ আঁটা নীল খামে সাধারণ চিঠি থাকে না। বুঝলাম খামের ভেতরে প্রেমপত্র আছে। কথাটা মনে হতেই আমাব মধ্যে একটা নিষিদ্ধ নেশার আকর্ষণ এসে গেল। বললাম, দাও ওটা।
মলিদি ঠিকই বলেছিল। খামটা পেয়ে নীলুদা রাগও করেনি, অবাকও হয়নি। উলটে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিযেছিল।
তারপর থেকে অনেকবার মলিদির চিঠি নীলুদাকে আর নীলুদার চিঠি মলিদিকে দিয়ে এসেছি। মলিদি বারবাব আমাকে অনেকরকম জিনিস দিতে চেয়েছে। কখনও পেইন্টিং বক্স, কখনও ফাউন্টেন পেন, কখনও গল্পেব বই। কিন্তু আমি কিছুই নিইনি। নীলুদা একদিন আমাকে এক মুঠো টফি দিয়েছিল। সেই একবাবই নিয়েছিলাম।
শেষের দিকে আমার খুব ইচ্ছে করত খাম খুলে চিঠি বের কবে দেখি মলিদি কী লিখেছে আর নীলুদাই বা কী উত্তর দিয়েছে। খামের মুখটা পরে আঠা দিয়ে এঁটে দিলে কেউ বুঝবে না। অনেক কষ্টে সেই ইচ্ছে সংবরণ করেছিলাম। মলিদির বিশ্বাসের অমর্যাদা করিনি। চিঠির জন্যে মলিদির খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। এক সুন্দরী মহিলার শরীরের সুবাস পাওয়া, উঠতি বয়েসে সে-ই তো অনেক পাওয়া।
কিন্তু এই চিঠি দেওয়া নেওয়ার কাজ বেশিদিন চলল না। বাবার ছিল বদলির চাকরি। প্রায় দশবছর উত্তরবঙ্গে থাকার পর দক্ষিণবঙ্গে ট্রান্সফার হয়ে গেল। আমরা সবাই মেদিনীপুরে চলে এলাম। মলিদির সঙ্গে যোগাযোগ আর থাকল না। মেদিনীপুরে এসে মলিদিকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সে-চিঠির উত্তর আসেনি। আমার চিঠি মলিদি পায়নি, না ইচ্ছে করে চিঠির উত্তর দেয়নি জানি না। মলিদি আমার জীবন থেকে সেই যে হারিয়ে গেল, সেই হারিয়ে থাকা এই আঠাশ-উনত্রিশ বছর অব্যাহত ছিল।
বেশ মনে আছে শেষের দিকে একদিন মলিদি বলেছিল, তুই আমার এত কাজ করে দিস, তোকে আমি কিছুই দিলাম না। আজ বল কী নিবি?
হঠাৎই বলে ফেললাম, যা চাই তাই দেবে?
বল, কী চাস?
আমি মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, তোমার গালে একটা—

মলিদি সকৌতুকে বলল, একটা কী?

আমি লজ্জায় পড়ে গিয়ে চুপ করে রইলাম।

মলিদি ঝরঝরিয়ে হেসে উঠে বলল, ও ছেলে, তোমার মনে মনে এই? ঠিক আছে। তাই হবে।

আমি কি আর সেখানে থাকি। একছুটে পালিয়ে এসেছিলাম।

আমার তখন সদ্য গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

মলিদির গাড়িতে তার পাশে বসে সে সময়ের ছেলেমানুষির কথা মনে পড়তে হেসে ফেললাম। মলিদি আমার হাসি দেখতে পায়নি। বাইরে তাকিয়ে ছিল। একটু পরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শিলংয়ের সব জায়গা দেখা হয়ে গেছে? রবীন্দ্রনাথ যে-বাড়িতে বসে শেষের কবিতা, রক্তকরবী লিখেছিলেন, সেই জিৎভূমি দেখেছিস?

বললাম, এ-কয়দিন সময় পাইনি। ভাবছি কাল সবকিছু দেখব?

কোথায় উঠেছিস? হোটেলে?

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

মলিদি বলল, ঠিক আছে, কাল আমার গাড়িতে তোকে সবকিছু দেখিয়ে দেব। শিলং পিক, ওয়ার্ডস লেক, গলফ কোর্স।

শিলংয়ের এক অভিজাত অঞ্চলে এক সুদৃশ্য দোতলা বাড়ির সামনে মলিদির গাড়ি থামল। গেটের সামনে নেমপ্লেটে দেখলাম দুটো নাম লেখা। সুরজিৎ মজুমদার, মল্লিকা মজুমদার। মলিদির স্বামীর নাম তা হলে সুরজিৎ মজুমদার। নীলুদা তো নিয়োগী ছিল। নীলেশ নিয়োগী। তার মানে প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়ে থাকে, অসফল পরিণতির সেই পরিচিত গল্প। মল্লিকা বসুমল্লিক মল্লিকা নিয়োগী হয়নি।

মলিদির বাড়িতে ঢুকে সুসজ্জিত বসবার ঘরের সোফাতে বসতে যাচ্ছিলাম। মলিদি বলল, এখানে বসবি কী, চল আমার বেডরুমে বসবি। তুই কি বাইরের লোক!

মলিদির সঙ্গে গিয়ে তার শোওয়ার ঘরে বসলাম। মলিদি বলল, একটু বস। আমি আসছি।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম। বিরাট বেডরুম। সাজানো গোছানো। রুচির সঙ্গে সঙ্গতির সুন্দর সমন্বয়। বড় জানলা দিয়ে শৈল শহরের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। উঁচুনিচু রাস্তা, কিছু বাড়িঘর, পাইন, ফার্ন গাছ, সবুজ পাহাড়, নীল আকাশ। দক্ষ শিল্পীর আঁকা দৃষ্টিনন্দন ল্যান্ডস্কেপ।

একটু পরে মলিদি এসে ঘরে ঢুকল। শাড়ি ছেড়ে ম্যাক্সি পরেছে। বয়েস এখনও মলিদির শরীরে ভাঙন ধরাতে পারেনি। বরং পাকা ফলটির মতো টসটসে হয়ে আছে। পাতলা কাপড়ের ম্যাক্সিতে তার মেয়েলি শরীরের অঙ্গবিন্যাস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এসে আমার ঠিক পাশেই, প্রায় গা ঘেঁষেই বসে পড়ল। তারপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, খুব হ্যান্ডসাম হয়েছিস রে তুই। আজ কিন্তু আমার বাড়ি থেকে ডিনার খেয়ে একবারে ফিরবি।

এক মুহূর্তে মনস্থির করে নিয়ে বললাম, সরি মলিদি, থাকতে পারব না। রাতে হোটেলে একজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। খুব বিগ ম্যাগনেট।

কথাটা অবশ্য সত্যি নয়। হোটেলে কারওই আসার কথা নেই। তবু বলে ফেললাম মুখে এসে গেল বলে। আসলে মলিদি আমার এত কাছে বসেছিল যে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে বললাম, কই, তোমার বর মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে না তো?

একটা হতাশ ভঙ্গি করে মলিদি বলল, থাকলে তো দেখা করিয়ে দেব। দিল্লি গেছে। অফিসের কাজে মাসের অর্ধেক দিন বাইরেই থাকে। এতবড় বাড়িতে আমি সবসময় একা।

বললাম, অন্যরা?

কথাটা বুঝতে পেরে মলিদি বলল, নেই। কোনও ইসু নেই আমাদের।

তবে কি মলিদি ভয়ংকর নিঃসঙ্গতায় ভুগছে? তাই বড়াপানি লেকের সামনে ছুটির দিনের

অবেলায় কি অমনি করে একা একা স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল? তবে কি এই উজ্জ্বলতা, এই দর্পিত ভঙ্গি, এই রূপসি শরীরের মধ্যে আরেকটা মলিদি আছে। যার বুকের ভেতরের সবটুকু জুড়ে ধু-ধু করে এক আদিগন্ত মরুভূমি।

হঠাৎই মলিদি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আমার একটা হাত ধরে বলল, এই পিন্টু, তুই কী চেয়েছিলি মনে আছে?

বললাম, কী বলো তো?

আমার গালে চুমু খেতে চেয়েছিলি। আজ তা-ই দেব। তবে গালে নয়, ঠোঁটে।

তৎক্ষণাৎ আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বললাম, এই রে দেরি হয়ে গেছে। এক্ষুনি চলে যেতে হবে। জরুরি কাজ আছে। চলি মলিদি। বিভ্রান্ত মলিদি ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে কিছু বলতে চাইল। আমি ততক্ষণে দরজার কাছে চলে এসেছি। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল মলিদিকে কেমন দেখাচ্ছে।

কিন্তু দেখলাম না। নিঃসঙ্গ, অতৃপ্ত এবং হেরে যাওয়া মলিদিকে দেখতে মন চাইল না। অবজ্ঞা নয়, অশ্রদ্ধা নয়, মলিদির জন্যে এই প্রথম কষ্ট হল আমার।

মনের মধ্যে মন

সীতানাথ বলল, কালীর কিরে বলছি সুভোমাসি, গায়ে গতরে দেখতে শুনতে একেবারে ফাসকেলাস মাল। বয়েস, এই ধরো পনেরো, কি টেনেটুনে ষোলো। রং ওই ফরসাই বলা চলে। মুখের ছবি ভারী মিষ্টি। হাইট মোটামুটি। বুঝলে মাসি, এ একেবারে ফেরেস জিনিস। যাকে বলে খেত থেকে এইমাত্তর তুলে-আনা সবজি। গায়ে এখনও শিশির লেগে আছে। তা ছাড়া পেছুটানও নেই। মা-বাবা চোখ বুজেছে কবেই। কাকা ঘরে ঠাঁই দিয়েছে মায়া করে। তা কাকাটা হচ্ছে হাটঘাট করা তিকরমবাজ চিজ। কাকিটা আবার এক কাঠি ওপরে। গ্যাঁট খরচা করে এ-মেয়ের বে দিতে বয়ে গেছে। গোপনে বেচে দিয়ে মোটা দাঁও মেরে দিতে চায়। তা এ-মাল বাজারে পড়তে পাবে না মাসি, হেভি দামে বিকোবে— এক্কেবারে এই গেরানটি দিচ্ছি, হ্যাঁ।

দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খোঁচাচ্ছিল সুভদ্রা। চোখ বন্ধ। শুধাল, ছুঁড়িটার কী যেন নাম বললি সীতেনাথ?

রেশমি গো, রেশমি। বানানো নাম নয় গো, সত্যিকারের।

কান খোঁচানো বন্ধ করে সুভদ্রা ঠিক হয়ে বসে বলল, বলছিস দেশ গাঁয়ের আবোলা মেয়ে, ইদিকে নাম তো বাহারি, রেশমি।

সীতানাথ বলল, তা কী আর করা। নাম তো কেউ নিজে নিজে রাখে না। বাপে মায়ে সাধ আহ্লাদ করে রেখেছিল। তা তেনারা গত হয়েছে, কাকা কাকির সংসারে কষ্টেমষ্টে থাকলেও নামটা রয়ে গেছে, এই বেত্তান্ত আর কী।

সুভদ্রা ভাবল হবেও বা। নাম দিয়ে তো কেউ আর ধুয়ে খায় না। আর নাম দিয়ে হবেই বা কী। দরকার যার নাম, সেই মেয়েটিকে। বলল, খবর পাকা তো? নাকি মন ভজাচ্ছিস সীতেনাথ?

সীতানাথ তুম্ব মুখ করে বলে, অ্যাই দ্যাখো, মিছিমিছি না হক মন ভজাতে যাব কেন গো? চক্ষুকর্ণের ব্যাপার। তুমি দ্যাখোই না, বুঝতে পারবে সীতানাথ মিছে কথা বলেনি।

বলছিস?

না তো কী।

সুভদ্রা বলল, এতই যদি সাতকাহন হয়, তুই-ই তো সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারতিস। না-হয় কিছু আগাম মালকড়ি কাকাটাকে ঠেকিয়ে আসতিস। আমাকে আর অ্যাদ্দুর ঠেঙিয়ে যেতে হত না।

সীতানাথ অমনি জিব কেটে বলল, তাও কি হয় সুভোমাসি। গাঁ-গঞ্জের গেরস্ত ঘরের আইবুড়ো ডবকা মেয়ে, অমনি অমনি ছাড়ে নাকি কেউ? কাকাটা, বললাম না, মহা ঘোড়েল লোক। মালকড়ি এক হাতে নেবে, অন্য হাতে মেয়েকে ছাড়বে। আমি বলছি তুমি সোজামনে যাও সুভোমাসি। এই তো মাত্তর কয়েকঘণ্টার ট্রেন জার্নি। গেলেই দেখবে সীতানাথ গুলতাপ্পি মারেনি। দেখে তোমার চক্ষু সার্থক হবে। খরচাপাতি দশগুণো উঠে আসবে, এই দিব্যি গালছি, হ্যাঁ।

কৌটো খুলে পান জর্দা মুখে দিয়ে সুভদ্রা বলল, কিন্তু দামটা বড্ড চড়া হাঁকছে যে। পড়তা পড়বে তো?

সীতানাথের একগাল হাসি। বলে, বিবেচনা করো, খাঁটি সোনা মাসি, পেতলের দাম তো দিচ্ছ না।

বটে! সত্যি বলছিস সীতেনাথ?

সত্যি, সত্যি, সত্যি। এই তিন সত্যি।

চিনি না, জানি না, হুট করে চলে যাব? সুভদ্রা দোনোমনো করে।

আমিও তো থাকছি তোমার সঙ্গে। অতগুলো টাকার ব্যাপার। তবে রেশমির কাকার সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে দিয়েই আমি গা ঢাকা দেব। সেইমতোই ব্যবস্থা হয়েছে কাকার সঙ্গে। তুমি রাতের গাড়িতেই রেশমিকে নিয়ে কলকাতায় ফিরবে।

সীতেনাথ তঞ্চকতা করে না এটা সুভদ্রা জানে। একদিনের তো নয়, সংবচ্ছরের কামকারবার। তাই সে চলে এসেছিল রেশমির কাকার বাড়ি, যদি বঁড়শিতে বড় মাছ গাঁথা যায় সেই লোভে। এসেছিল ঠিক যেমনটি পাখি পড়ানো হয়েছিল, তেমনিভাবেই। যেন রেশমির এক মাসি ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে। বোনঝির সঙ্গে অনেককাল পরে দেখাসাক্ষাৎ। তাকে কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় নিয়ে গিযে নিজের কাছে রেখে দেবার বড় সাধ। এইসব জোড়াতালি দেওয়া সাজানো বৃত্তান্ত আর কী। সীতানাথের সঙ্গে রেশমির কাকা কাকিমার গোপন শলা হয়েছে এইমতোই। রেশমি সরল সিধে মেয়ে, ভেতরের ঘোরপ্যাঁচ অতশত বুঝবে না। কলকাতা যাবার পুলকেই নাচবে। বেচাকেনার টাকাটা পুরো হাতে হাতেই দিতে হবে। এসব ব্যাপারে লেখাপড়া হয় না। সাক্ষীসাবুদ থাকে না। যা কিছু হয মুখেমুখেই। কাকা হেঁকেছিল পনেরো হাজার। দরদস্তুরে রফা হয়েছে দশ হাজারে।

তবে বেশমিকে দেখে সুভদ্রা বুঝেছিল ঠিক জায়গাতেই সে এসেছে। মেয়েটির ব্যাপারে মোটেই দোকানদারি করেনি সীতানাথ, বরং আবেকটু বাডিয়ে বললে মোটেই বেশি বলা হত না। এ-মেয়েকে কলকাতায় স্বর্ণমাসির কাছে ফেলতে পারলে দু'হাত ভরে টাকা উঠে আসবে। একেবারে নধর ডগাটি। পনেরো-ষোলো বছরের নরম শরীরে ঢলঢল করছে কোমল মুখখানি। একমাথা চুল। গায়েব রং ফরসা না হলেও কালো নয়। যে-রং খদ্দেরের চোখে নেশা ধরায় সে-রং। সারা অঙ্গে থইথই কবছে নবীন যৌবন। কাকা কাকিমার তুচ্ছ তাচ্ছিল্যেও এমন যে রূপ, ঘষে মেজে নিলে মেঘের আড়াল থেকে চতুর্দশীর চাঁদ বেরিয়ে আসবে। না, সীতানাথের খবরে কোনও জল মেশানো নেই। দাঁড়িপাল্লায় চাপালে এ-মেয়ের দিকেই ভারের টানটা বেশি থাকবে। আর যা বুঝেছে সুভদ্রা, এ-মেয়েকে তুলে নিয়ে গেলে কোনও ঝক্কি ঝামেলা পোয়াতে হবে না। মুখ এঁটো না করে সুভদ্রা আডালে কাকাকে ডেকে নিয়ে ওই দশ হাজারই হাতে তুলে দিল।

সেই মেয়ে রেশমিকে নিয়ে সুভদ্রা রাতে গাড়িতে উঠল। ট্রেনের কামরায় তেমন ভিড়ভাট্টা ছিল না। বেঞ্চের এককোণে বসে সুভদ্রা ইতিউতি তাকাতেই নজরে এল একটু দূরে সীতানাথ দিব্যি ভালমানুষটি সেজে বসে আছে। যেন চেনেই না কে সুভদ্রা আর কে রেশমি। এতক্ষণ কোথায় কাটিয়ে দিয়েছে দিনমান। এ-দিকটা চেনে, যাতায়াত আছে। সময়মতো গাড়িতে উঠে বসেছে। চোখে চোখে রেখেছে সুভদ্রাকে। নিশ্চিন্ত হয়েছে কোনও আতান্তরে পড়েনি। সুভদ্রার কেনাবেচা ভালয় ভালয় মিটে গেছে। সুভদ্রা অখুশি হয় না। লোকটার বোধ বিবেচনা আছে। এবার সুভদ্রার লাভের ঘর বড়ই হবে।

ট্রেন চলেছে। রাত এখন মাঝবয়েসি। সুভদ্রার পাশে বসে বসে রেশমি ঢুলছে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, তার সুলুক সন্ধানের দরকার নেই। শুধু জানে তার আপন মাসির সঙ্গে সে কলকাতায় যাচ্ছে। জন্মইস্তক সে গ্রামের বাইরে পা ফেলেনি। কলকাতায় যাবার আনন্দে আজ সারাদিনই স্নেহের কাঙাল মেয়েটি সুভদ্রার সঙ্গে ছায়ার মতো ফিরেছে। সুভদ্রাও অভিনয়ের কোনও ফাঁকফোকর রাখেনি। স্নেহময়ী মাসির মতো হেসেহেসে কথা বলেছে, মাথায় গায়ে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। একবারও বুঝতে দেয়নি এই আদর এই সুখ দপ করে নিবে যাবে মেয়েবাজারের খাঁচার অন্ধকারে।

রেশমিকে ঠেলা দিয়ে সুভদ্রা বলল, এই মেয়ে, ঘুম পাচ্ছে তোর? খুউব?

রেশমি চোখের পাতা খুলল। অবোধ দৃষ্টিতে চারপাশ দেখল। বুঝল এখন সে ট্রেনে। মাসির সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছে।

ও মাসি, আমরা কখন পৌঁছোব গো?

এই আর কয়েকঘণ্টা মাত্তর।

আমরা শোব না মাসি? ঘুমোব না?

সুভদ্রা সস্নেহে হাসল, কোথায় শুবি রে বোকা মেয়ে? শোবার জায়গা কই?

রেশমি অবাক চোখে গাড়ির কামরা দেখে। কোথাও এক ইঞ্চি জায়গা নেই। সব বেঞ্চেই লোক। কেউ জেগে, কেউ চোখ বন্ধ করে ঢুলছে। রেশমি মুখ ভার করে সুভদ্রার দিকে তাকাল। রাগ না অভিমান কে জানে। সুভদ্রা ধন্দে পড়ে যায়। এমনতরো মেয়েকে আগে সামলাতে হয়নি কখনও।

এই মেয়ে, কী হল রে তোর?

মুখ গোমড়া করে রেশমি বলল, আমি কিন্তু জেগে থাকতে পারব না মাসি।

বেশ তো থাকিস না।

এমনি গতিকে পড়বে, সুভদ্রার হিসেবের মধ্যে ছিল না। রেশমি বড় বেশি আঁকড়ে ধরে আছে তাকে। সবকিছু সরল মনে বিশ্বাস করে বসে আছে। যাচ্ছে তো মেয়েহাটায় বিক্রি হতে, সুভদ্রা তার সাতপুরুষের কেউ হয় না। সুভদ্রা ভাবল একটু শক্ত হবে, মিছেমিছি মায়া বাড়িয়ে কী হবে। আবার ভাবল, থাক। আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনওরকমে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারলেই বাঁচোয়া।

রেশমি সামান্য সরে বসে সত্যি সত্যিই সুভদ্রার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজল। সুভদ্রার একটা হাত ধরে রেখেছে সে। দ্যাখো দিকি কাণ্ড। এ মেয়ে কি কিচ্ছুই বোঝে না। সুভদ্রা ভারী দোটানায় পড়ে যায়। এ-মেয়ে যে কেবলই কাছে টানে। এত দীর্ঘ সময় এ- লাইনে আছে, এমনতরো অবস্থায় কোনওদিনও পড়তে হয়নি তার। এতদিন যেসব মেয়েকে এনেছে হয় লাইনের এঁটোকাঁটা, নয়তো হাফগেরস্ত বাসি মেয়ে। অধরা অছোঁওয়া মেয়ে এই প্রথম। সীতানাথের দিকে তাকায় সে। সীতানাথের চোখদুটো হাসছে। কী গো সুভোমাসি, ঠিক বলেছিলাম কিনা। খেত থেকে তুলে আনা টাটকা সবজি কিনা। নাও, এখন ঠ্যালা সামলাও।

সুভদ্রার রাগ হয় না। সে ভালই জানে সীতানাথ তেমন কিছু ফেরেববাজ লোক নয়। সোনা বলে গিলটি চালায় না। একদিনের কারবার তো নয়। তবে কিনা ব্যাবসা বাণিজ্য বলে কথা, সবসময় কি সত্যি কথা বলে। যখন যেমন দরকার রং চড়াতে হয়। তবে রেশমির ব্যাপারে বেঠিক কিছু বলেনি।

রেশমি হঠাৎই চোখ খুলে তাকায় সুভদ্রার দিকে। বলে, কলকাতায় টারামগাড়ি চড়ব না। মাসি?

সুভদ্রা হাসে, চড়বি তো।

ওই যে মাটির তলা দিয়ে নাকি রেলগাড়ি যায়, তাতে?

তাতেও চড়বি।

রেশমি ভাবে। ভাবতে ভাবতে সুভদ্রার কোলে মাথা রেখে ফের চোখ বন্ধ করে। সুখের স্বপ্নটা চোখেই থেকে যায় তার। দশ মিনিট গেছে কি যায়নি হঠাৎ সে ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, কী গো মাসি, তুমি ঘুমোবে না?

সুভদ্রা বলে, এই তো বেশ আছি।

ঘুম পাচ্ছে না তোমার?

সুভদ্রা হাসে, পেলেই বা কী! ওই বসে বসে চোখ বন্ধ করে যেটুকু।

আমার কোলে মাথা রেখে একটুকু ঘুমোও না।

মজা পেয়ে সুভদ্রা হেসেই অস্থির।

তাও কি হয় নাকি রে পাগলি মেয়ে। এই ঠিক আছি। তুই ঘুমো দিকিনি।

রেশমি মুখ মেঘলা করে বলে, তুমি না ঘুমুলে আমিও ঘুমোব না।

শোনো মেয়ের কথা। সুভদ্রা আকুল হয়ে ওঠে। এমন করে কে কবে সেধেছে। এমন করে কে তাকে আপন করে ডেকেছে। বলে, বেশ তো। তুই আগে ঘুমিয়ে নে তো। পরে আমি ঘুমোবখন।

ঠিক তো? বলে রেশমি আবার সুভদ্রার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজল। সুভদ্রা হাসিমুখে তাকিয়ে দেখে। বয়সে অল্প, রেলগাড়িতে যাতায়াতের অভ্যেস নেই হয়তো, জেগে থাকতে পারছে না। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সুভদ্রা যে রেশমির কোলে মাথা রেখে ঘুমোবে না, সেই ছলনাটুকু ধরতে পারেনি।

রেশমির মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারে না সুভদ্রা। একমাথা চুলের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ মুখ তো নয়, যেন একপুকুর জলের মধ্যে ফুটে আছে শিশিরে-ভেজা এক পদ্ম। খুবই সাধারণ একটা ডুরে শাড়ি পরনে, পায়ে সস্তা চটিজুতো, লাল রিবন দিয়ে বাঁধা দুই বিনুনি, হাতে কাচের চুড়ি। বোঝা যায় কাকা কাকির সংসারে বড়ই তুচ্ছতাচ্ছিল্যে জীবন কেটেছে। কোনও সুখের দিন কখনও দেখেনি। ভাবতেই সুভদ্রার বুকের মধ্যে গুমগুম করে ওঠে। সে-ই বা তাকে কোন সুখের জীবনে নিয়ে যাচ্ছে। একপুকুর ময়লা জল থেকে একসমুদ্র ঘোলা জলে ডুবিয়ে দিতেই তো।

সুভদ্রা বিষণ্ন চোখে জানলার বাইরে তাকায়। আষাঢ় মাস। একটু আগেই বুঝি বৃষ্টি হয়ে গেছে একপশলা। এখন মেঘ সরে গেছে। পশ্চিম আকাশে গাছগাছালির ওপরে শেষরাতের রাঙারাঙা চাঁদ ভাসছে। ছুটে চলেছে ট্রেনের সঙ্গে। ট্রেনও ছুটছে, চাঁদও ছুটছে। এই আছে, এই নেই। এই চাঁদকে দেখা যাচ্ছে ফাঁকা মাঠ ধানের খেতের ওপরে, এই হারিয়ে যাচ্ছে বড় বড় গাছের পেছনে। আবার ভেসে উঠছে। পেরিয়ে যাচ্ছে টেলিগ্রাফের পোস্ট, ঝোপজঙ্গল, রেলের গুমটিঘর, পায়ে-চলা মেঠো পথ, মানুষের ঘরবাড়ি। চাঁদের নরম আলোর নীচে ঘুমিয়ে আছে নিস্তব্ধ চরাচর। কোথাযও কোনও ময়লা নেই, দাগ নেই, মানুষ কেনাবেচার কোনও কুটিলতা নেই। সবকিছু সাফসুতরো, পবিত্র।

হঠাৎ সুভদ্রার আচ্ছন্নতা কেটে যায়। অবাক হয়ে দেখে এতক্ষণ সে পরম মমতায় রেশমির চুলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। যেমন করে স্নেহময়ী মা তার মেয়েকে আদর করে।

সুভদ্রার বুকের মধ্যে উথালপাথাল ঢেউ ওঠে। এ কী হল। এ কী হল। এ-মেয়েকে সে কেমন করে ছুড়ে দেবে কামাতুর মানুষের হিংস্র থাবার নীচে। এ-মেয়ে যে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে। সে-বাঁধন ছাড়িয়ে নেবে সাধ্য তার কই?

সুভদ্রার প্রাণমন হাহাকার করে ওঠে। বড়ই অকিঞ্চিৎকর হীন মানুষ সে, বড়ই পাপাচারিণী। সে কেমন করে জানবে কখনও কখনও দামাল ঝড় এসে বন্ধ দরজার আগল ভেঙে দেয়, হাট করে খুলে দেয় জানলা দরজা, বাইরের ঝোড়ো হাওয়া ঘরে ঢুকে ওলোটপালট করে দেয় সাজানো গোছানো জীবনকে!

এ-মেয়ে নিয়ে এখন কী করবে সে।

অমৃতের পুত্র

গত কয়েকদিন ধরেই নানান গুজব আর প্ররোচনায় শহরটা ক্রমশই দাহ্য হচ্ছিল, আজ কেউ বা কারা তাতে ধরিয়ে দিল আগুন। ঠিক সন্ধের মুখে হঠাৎই শান্ত শহরটা অশান্ত হয়ে গেল। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বিদ্বেষের আগুন। কোথায় ওত পেতে বসে ছিল জাতধর্মের হিংস্র পশুটা, দাঁত নখ বের করে সেটা ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'টি ধর্মের অস্তিত্বের অধিকার নিয়ে লেগে গেল রক্তাক্ত দাঙ্গা।

হাইস্কুলের বাংলার মাস্টার সত্যসুন্দর আর তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করে ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন কখন তাঁদের একমাত্র সন্তান পার্থ ফিরে আসবে। সুপ্রভা কিছুদিন ধরে ভুগছেন শ্বাসকষ্টে। জরুরি ওষুধটা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে আর সে-ওষুধ সব দোকানে পাওয়া যায় না বলে, পার্থ সেটা আনতে গিয়েছিল শহরের অন্য অঞ্চলের দোকান থেকে। সে ফিরে আসার আগেই পরিবেশের চরিত্র বদলে গেল । লেগে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পার্থ কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে, সেই দুর্ভাবনায় সত্যসুন্দর আর সুপ্রভা ছটফট করছিলেন বন্ধ ঘরের মধ্যে। এদিকে বাড়ির ফোনটা কাল থেকে অচল হয়ে আছে। ইচ্ছে থাকলেও পার্থর ফোন করার কোনও উপায় নেই। যদিও পার্থ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের চালাক চতুর ছেলে, সে নিশ্চয়ই কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে আছে, এমন বিশ্বাস সত্যসুন্দরের মাথায় ছিল। কিন্তু যতবারই রাস্তা থেকে হইহই শব্দ ভেসে আসছিল, ততবারই সে বিশ্বাস ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছিল। পার্থর মাকে সাহস দিতে গিয়ে নিজেই সাহস পাচ্ছিলেন না। একমাত্র ছেলের জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে যুক্তি বুদ্ধি কাজ করছিল না তাঁর মস্তিষ্কে।

এমনই অবস্থা যখন, তখনই ঘরের দরজায় শোনা গেল কড়া নাড়ার অস্থির শব্দ। শব্দটা যেন আর্তনাদ করে শিগগির দরজা খুলে দিতে বলছে। কে এল এমন দুর্যোগের মধ্যে? পার্থ হলে কি এমনিভাবে কড়া নাড়ত? ডাকত না? দু'মুখো চিন্তায় পড়ে যান সত্যসুন্দর। স্ত্রীর দিকে তাকান। সুপ্রভার মুখে আশা ভরসার দোলাচল নেই। সেখানে অজানা শঙ্কার ছায়া ভাসছে। দুঃসময়ে তো অজানা ভয়টাই এগিয়ে থাকে।

সত্যসুন্দর তখনই দরজা খুললেন না। যদিও তিনি যেখানে থাকেন সেটা হিন্দুপ্রধান অঞ্চল, তবু কোনও ঝুঁকি নিতে সাহস পেলেন না। শহরের দখল নিয়েছে পাপপুণ্য ন্যায়অন্যায় বোধহীন একদল ধর্মান্ধ সমাজবিরোধী। জ্বলছে আগুন, চলছে খুন, অবাধ লুটতরাজ। পার্থ বাড়িতে নেই, স্ত্রী শয্যাশায়ী, এসময়ে হুট করে দরজা খুলে দেওয়া চূড়ান্ত হঠকারিতা হয়ে যাবে। দাঙ্গাকারীদের কাছে স্বাভাবিক মানবিকতা আশা করা মস্ত বোকামি হয়ে যাবে।

এবার দরজা ধাক্কা দেবার সঙ্গে কাতর গলাও শোনা গেল।

দরজা খুলুন মাস্টারমশাই! আমাকে বাঁচান! আমাকে বাঁচান!

সত্যসুন্দর ভারী বিচলিত বোধ করলেন। তাঁর কোনও বিপন্ন ছাত্র জীবন রক্ষার জন্য আশ্রয় চাইছে। দীর্ঘদিনের শিক্ষকের মন দুর্বল হয়ে পড়ছে ছাত্রের প্রাণ ভিক্ষার কাতর ডাকে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, যে দরজা খুলে দিতে বলছে সে একলা, অসহায়, বিপদাপন্ন। এমন অবস্থায় তিনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে তিনি নিজের বিবেকের কাছে, অর্জিত শিক্ষার কাছে অপরাধী হয়ে থাকবেন। যারা কাপুরুষের মতো নিরীহ মানুষের শবের ওপর দাঁড়িয়ে ধ্বংসের উৎসব করছে, তাদের সঙ্গে তাঁর দূরত্বই বা কী থাকবে! কাউকে সুযোগ থাকতেও বাঁচাতে না পারা আর তাকে বাঁচতে না দেওয়ার মধ্যে তফাতটাই বা কী! দুটোই হত্যার দু'রকম পদ্ধতি।

বাড়ির সামনের গলির পরেই বড় রাস্তা। সেই রাস্তা থেকে গোলমালের শব্দ ভেসে এল আবার। কারা যেন গলি দিয়ে ছুটে গেল আতঙ্কে কিংবা বর্বর উল্লাসে। কোথায় সশব্দে বোমা ফাটল। দরজার বাইরের কাতর গলা কান্নার মতো শোনাল।

মাস্টারমশাই, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচান। দরজা খুলুন। ওরা দেখলেই আমাকে খুন করবে।

বিব্রত সত্যসুন্দর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। সুপ্রভার মুখে ভয় আর বেদনা একাকার হয়ে আছে। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে তিনিও যেন চাইছেন, যা হবার হোক, সত্যসুন্দর দরজাটা খুলেই দিক। সত্যসুন্দর সামান্য ভাবলেন। কোনও লোকের খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে কি সে একা আসত কিংবা এতক্ষণ ধরে দরজা খুলে দিতে বলত? আহা, বাইরের মানুষ কী বিপদ্দশার মধ্যেই না আছে। দরজা খুলে দেবার ওপর ওর জীবন মরণ নির্ভর করছে। না, দরজাটা এখনই খুলে দেওয়া দরকার। তাঁর ভয় ভাবনার চেয়ে একটা জীবনের দাম অনেক বেশি। আপৎকালে শরণাগতকে যদি আশ্রয় না-ই দিলেন, তবে এতদিন ধরে তিনি ছাত্রদের বৃথাই নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। সত্যসুন্দর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। দু'বেলা গৃহদেবতার পুজোআর্চা করেন। এমনিতর দুঃসময়েও তিনি সত্যের প্রতি অবিচল থাকলেন। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। দরজা খুলে দিতেই দমকা হাওয়ার মতো একটা সাতাশ-আঠাশ বছরের ছেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ঢুকে সে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দরজার পাল্লায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। সত্যসুন্দর দেখলেন বড় বড ঢেউয়ের মতো ছেলেটার বুক ওঠানামা করছে। এইমাত্র যেন সে মৃত্যুর অন্ধকার থেকে জীবনের আলোয় ফিরে আসতে পেরেছে।

সত্যসুন্দর বললেন, কে তুমি? কী হয়েছে তোমার?

ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ওরা আমাকে দেখতে পেলেই মেরে ফেলত। তাড়া করেছিল। আমি এ-গলিতে ঢুকে পড়লাম ভাগ্যিস।

সত্যসুন্দর একটু বিস্মিত হলেন। বললেন, কিন্তু ওরা তোমাকে মারবে কেন? এ-পাড়া তো হিন্দুদেরই পাড়া।

ছেলেটি বলল, আমি এ-পাড়াতে থাকি না। ওরা আমার কোনও কথাই শুনত না মাস্টারমশাই।

সত্যসুন্দর চুপ করে রইলেন। ছেলেটি ভুল কথা বলেনি। যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করছে, এই মুহূর্তে তারা সবাই জঙ্গলের জীব হয়ে গেছে। ওরা ধর্মান্ধ পশুশক্তি। ওদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষের ভাষা ওরা বুঝবে না।

কী নাম তোমার?

ছেলেটি বলল, কদমতলা। কদমতলায় আমাদের বাড়ি।

বাড়ি নয়, তোমার নাম বলো?

নাম? মিন্টু। মিন্টু চৌধুরী।

স্কুলে আমার ছাত্র ছিলে?

ছিলাম মাস্টারমশাই। বছর দশেক আগে স্কুল ছেড়েছি, তাই আমায় চিনতে পারছেন না। আপনার বাড়ি আমি চিনতাম।

আবার বাইরের হইহই গোলমালের শব্দ ভেসে এল। কারা যেন রক্ত পিপাসায় নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠেছে। বোমা ফাটছে, আগুন জ্বলছে, লোকজন ছোটাছুটি করছে। মিন্টুর চোখে মৃত্যুভয়ের ছায়া। সে তাকিয়ে রইল সত্যসুন্দরের দিকে। যেন ভয়ংকর এক জীবনঘাতী ঝড় ধেয়ে আসছে তার দিকে। একমাত্র সত্যসুন্দরই রক্ষা করতে পারেন তাকে।

সত্যসুন্দর কিছুটা অবাক হলেন এবার। ছেলেটি তো তাঁর আশ্রয়েই তাঁর ঘরেই রয়েছে, যে-ঘরের দরজা জানলা ভাল করে বন্ধ করে দেওয়া। দরজা না-ভেঙে বাইরের কোনও আক্রমণ এ-ঘরে ঢুকতে পারবে না। তা ছাড়া শহরের এ-অঞ্চলে মিন্টুর নিজেকে নিরাপত্তাহীন মনে করার কোনও কারণ নেই। বিধর্মী হলেই যেখানে বিপদ, সেখানে এ-অঞ্চলটা যথেষ্ট নিরাপদ। তবুও

ছেলেটি এখনও নির্ভয় হতে পারছে না কেন? আবার ভাবলেন এমনটি হওয়া অবশ্য অবাক হবার মতো কিছু নয়। মৃত্যুভয় ছেলেটির কাছ থেকে সব বিশ্বাস কেড়ে নিয়েছে। এরকম অবস্থা থেকে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে সময় নেবে।

সত্যসুন্দর আশ্বাস দিলেন, ভয় পাবার কোনই কারণ নেই। তুমি আমার কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ মিন্টু। আমার ক্ষতি না-করে কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আমি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। আমার কথাকে বিশ্বাস করতে পারো।

মিন্টুর ভয় তবুও যায় না। বলল, মানে আপনি গোঁড়া হিন্দু?

সত্যসুন্দর বললেন, আমি ধার্মিক হিন্দু। নিত্য গৃহদেবতার পুজো করে আমি অন্ন গ্রহণ করি। এই পাশের ঘরটাই আমার ঠাকুরঘর।

সুপ্রভা কিছু বললেন যেন। ভাল করে শোনা গেল না। সত্যসুন্দর বিছানার কাছে গিয়ে বললেন, খুব কষ্ট হচ্ছে?

সুপ্রভার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। বুক ওঠানামা করছিল। প্রয়োজনীয় ওষুধটা পড়া দরকার ছিল এখনই। কিন্তু পার্থ কখন ফিরবে কে জানে!

একটু কষ্ট করে থাকো। পার্থ না-ফিরলে ওষুধ তো—

সুপ্রভা প্রবলভাবে মাথা নাড়লেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, না, না, ওষুধ না— ছেলেটা এখনও— ওর কী হল?

ওষুধ নয়, ছেলের জন্যে মায়ের প্রাণ ছটফট করছে।

মিন্টু কাছে এসে দাঁড়াল। সুপ্রভাকে দেখল। সত্যসুন্দরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, উনি কি খুব অসুস্থ?

সত্যসুন্দর বললেন, হ্যাঁ। হাঁপানিতে ভুগছে। আজ টানটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে।

পার্থ আপনার ছেলে? ওষুধ আনতে গেছে?

সে কি এখন আনতে গেছে। ওষুধটা নতুন। এ-পাড়ায় পাওয়া যায় না। কদমতলার একটা দোকানে শুধু— গেছে সেই সন্ধের বেশ আগে। তারপরেই তো—

ঘরের দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজল। রাত আটটা। মিন্টু ঘড়িতে সময় দেখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সত্যসুন্দর নিরাশ গলায় বললেন, ঘড়ি দেখে এখন সময়কাল বোঝা যাবে না হে। সময় এখন পেছনের দিকে হাঁটছে।

বাড়ির খুব সামনে সশব্দে বোমা ফাটল। একবার, আরেকবার। মিন্টু ভয়ানক চমকে উঠে সত্যসুন্দরের দিকে তাকাল। সত্যসুন্দর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হল না। তখনই শোনা গেল আবার ঘরের দরজা ধাক্কানোর শব্দ। এবার একজনের নয়, অনেক জনের হাত। অনুনয় নয়, হুমকি।

মাস্টারমশাই, দরজাটা খুলুন। আমরা পাড়ার ছেলে। মনাই, কানু, ভুলুরা। জরুরি দরকার আছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন।

সঙ্গে সঙ্গে মিন্টু এগিয়ে এসে সত্যসুন্দরের হাত ধরে প্রায় আর্তনাদের গলায় বলল, খুলবেন না, দরজা খুলবেন না। ওরা আমাকে দেখলে ঠিক মেরে ফেলবে।

দরজায় প্রবল শব্দ অব্যাহত। বাইরে যারা আছে, তারা ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে। দরজা না খুললে ভেঙেই ফেলবে।

সত্যসুন্দর তাকালেন মিন্টুর দিকে। বললেন, ওরা পাড়ার ছেলে। ওই নামগুলো আমি চিনি। দরজা খুলে দিতেই হবে।

আতঙ্কে মিন্টুর মুখের রং বদলে গেছে। ঠোঁটদুটো কিছু বলতে চেয়ে থরথর করে কাঁপছে। শেষপর্যন্ত সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বলল, মাস্টারমশাই, আমি— আমি— মিন্টু আমার ডাক নাম। ভাল নাম সামসুল চৌধুরী। আমি মুসলমান।

সত্যসুন্দর কিন্তু মোটেই অবাক হলেন না। তিনি জানতেনই এমন কথাই মিন্টু বলবে। জীবনের

দীর্ঘ সময়ে তিনি অনেক দেখেছেন, জেনেছেন, সংস্পর্শে এসেছেন অনেক মানুষের, অনেক ছাত্রের। প্রথমেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মিন্টু কোনও সত্যকে প্রকাশ করতে পারছে না। এবং সেটা করছে ভয় পেয়ে, হতবুদ্ধি হয়ে, আর প্রাণরক্ষার তাগিদে। তাঁর মনে হয়েছিল মিন্টু সম্ভবত হিন্দু নয়। মিন্টু চৌধুরী নামটা হিন্দুরও হতে পারে, মুসলমানেরও হতে পারে। কিন্তু সেসব নিয়ে ভাবাভাবির সময় এখন নয়। সত্যসুন্দর সতর্ক হলেন। ছেলেগুলোর কাছে মিন্টু আক্রান্ত হতে পারে। সত্যসুন্দর জানেন মনাই, ভুলু, কানু কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শান্তশিষ্ট ভদ্র ছেলের নাম নয়। মিন্টুকে ওদের চোখের বাইরে রাখতে হবে। তিনি মিন্টুর হাত ধরে তাড়াতাড়ি টেনে আনলেন অন্য ঘরের যাবার দরজার কাছে। বললেন, সামনের ঘরটাই ঠাকুরঘর। ও-ঘরে তুমি চট করে লুকিয়ে পড়ো।

আপনার ঠাকুরঘরে? আমি? মিন্টুকে দোমনা দেখাল।

আঃ! এখন কথা বলার সময় নেই, বাঁচতে চাও তো যা বলছি তাই করো। যাও।

মিন্টু আর দ্বিরুক্তি না করে ঠাকুরঘরে ঢুকে গেল।

সত্যসুন্দর ঘরে এসে দরজা খুলে দিলেন। অমনি হুড়মুড় চার-পাঁচটা উগ্র চেহারার ছেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। লাল গেঞ্জি পরা লম্বা চেহারার ছেলেটি ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল সত্যসুন্দরের দিকে।

দরজা খুলতে ফাল্টুস দেরি কেন? পাড়ায় থাকেন না?

পাড়ায় থাকা কথাটার অর্থ ওদের মান্য করা। সত্যসুন্দর শান্ত গলায় বললেন, দেরি হওয়ার কারণ একজন খুবই অসুস্থ। ওই যে বিছানায় শুয়ে আছে। তা তোমাদের দরকার কী বলছিলে?

কালো গাট্টাগোট্টা ছেলেটা বলল, আমরা ইয়ং ব্রিগেডের ছেলে। দুশমনদের টাইট দেবার জন্যে টাকা এবং আর্মস দরকার। আপনার ঘরে কী মাল আছে— ছোরা, ভোজালি, তরোয়াল— চটপট খালাস করুন দিকি। দেরি করবেন না।

সত্যসুন্দর বললেন, কিন্তু ওগুলো আমার কাছে নেই।

যা বাব্বা! তা হলে ঘরে আছেটা কী? নেকাপড়া শেখার কতকগুলো কেতাব? এই মনাই, তোরা ঘরগুলো সার্চ করে দ্যাখ তো মালকড়ি কিছু মেলে কিনা।

সত্যসুন্দর গলার স্বরকে স্থির রেখে বললেন, এ-ঘরে ওসব কিছু নেই। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো।

লম্বা ছেলেটি বলল, এ-ঘরে না-থাকলে অন্য ঘরে তো থাকতে পারে। বেকার কিচাইন না-করে আমাদের দেখতে দিন। ভুলু, যা মনাইয়ের সঙ্গে সব ঘর দ্যাখ। চটপট। টাইম কিন্তু খুব কম। এ-গলির সবকটা বাড়ি কালেকশনে যেতে হবে আজ রাতের মধ্যে।

মনাই আর ভুলু সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘর দেখতে ভেতরে ঢুকে গেল। সত্যসুন্দর বুঝলেন শুধুমাত্র মুখের কথায় ওদের প্রতিরোধ করা যাবে না। বেশি কথা বললে ওদের সন্দেহ আরও বেড়ে যাবে। তাতে মিন্টুরই বিপদ। এরা সামাজিক পাপ আর পতনের ফসল। ওদের নৈতিক মেরুদণ্ড নেই। টাকা দিয়ে এদের মুখ বন্ধ করতে হবে।

লম্বা ছেলেটি সামনের চেয়ারে বসল। পকেট থেকে একটা চটি খাতা বের করে বলল, কিছু ক্যাশ ডাউন করতে হচ্ছে মাস্টারমশাই। ইয়ং ব্রিগেডের চাঁদা।

সত্যসুন্দর কথা না-বাড়িয়ে বললেন, কত?

আপাতত এক হাজার টাকা দিন।

এক হাজার টাকা? দেখতেই পাচ্ছ আমার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে আছে। চিকিৎসায় খরচাপাতি করতে হচ্ছে।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই জন্যে মাত্তর হাজার টাকা। মাস্টারি আর প্রাইভেট পড়িয়ে তো হেভি কামাচ্ছেন। টাকাটা ফেলুন।

যে-ছেলেদুটো ভেতরের ঘর দেখতে গিয়েছিল, কিছু পরে তারা ফিরে এসে বলল, ধুস!

বেকালতু খোঁজা। কিস্যু পেলাম না। ওই খাট-চৌকি, আলমারি-আলনা। একটা পুজোর ঘর। ওই ঘরে কে যেন ঠাকুরের সামনে বসে আছে।

সত্যসুন্দর তাড়াতাড়ি করে বললেন, ও হল পুরুত, পুরুতমশাই। এ-সময়ে প্রত্যেকদিন আমার গৃহদেবতা রাধামাধবের পুজো করে দিয়ে যায়।

অ। পুরুতমশাই। বলে লম্বা ছেলেটি টাকার কথায় চলে এল, টাইম নষ্ট করছেন কেন! টাকাটা দিন।

সত্যসুন্দর অসুবিধের মুখ করে বললেন, কিন্তু এখন তো আমার কাছে অত টাকা নেই।

তখনই শোনা গেল বাইরে ভারী গাড়ি চলে যাবার শব্দ। পুলিশের ভ্যান সম্ভবত। দূরে কোথায় বোমা ফাটল। কারা যেন দৌড়ে চলে গেল। কে যেন চিৎকার করে উঠল, এই দিকে, এই দিকে! লম্বা ছেলেটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, দিন, এখন পাঁচশো টাকাই দিন। কুইক, কুইক।

সত্যসুন্দর আর দরাদরি করার ঝুঁকি নিলেন না। মিন্টুকে নিয়ে জল আর গড়াল না এতেই স্বস্তি। আলমারিতে কিছু টাকা রাখা ছিল। তার মধ্যে থেকে পাঁচটা একশো টাকার নোট বের ছেলেটির হাতে দিলেন। ছেলেটি টাকা পকেটে পুরেই সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত দরজার বাইরে চলে গেল।

মিন্টু দরজার পাশ দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারল। ওকে একটা কোণঠাসা জন্তুর মতো দেখাচ্ছিল। তখনও যেন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না এইমাত্র যে-হিংস্র ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, তা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে যখন বুঝল ছেলেগুলো কেউ নেই, তখন ঘরে ঢুকে চাপা গলায় বলল, আমার জন্যে আপনাকে মিথ্যে কথা বলতে হল।

উদাসীন গলায় সত্যসুন্দর বললেন, তা হল। উপায় ছিল না।

আপনি ওদের কীসের টাকা দিলেন মাস্টারমশাই?

সত্যসুন্দর বিষণ্ণ হাসলেন। বললেন, ওটা জিজিয়া কর। পাড়ায় যে নিরাপদে থাকব, তার সিকিউরিটি ট্যাক্স।

মিন্টু একটু সময় চুপ করে থেকে অপরাধী অপবাধী মুখ করে বলল, আমি মুসলমান, আপনার পুজোর ঘরে ঢুকে—

হাত তুলে মিন্টুকে থামিয়ে দিয়ে সত্যসুন্দর বললেন, তুমি বেঁচেছ তো? আমার ঠাকুরই তোমাকে রক্ষা করেছে। ওরা তো মারদাঙ্গা করতেই বেরিয়েছে।

ওরা কারা মাস্টারমশাই?

ওরা? সত্যসুন্দর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ওরাও মানুষ। অমৃতের পুত্র মানুষ।

আবর্তন

ঠিক স্বাভাবিক মানুষ বলতে যেমন বোঝায়, আমার বাবা সেরকম মানুষ ছিল না। আমার দুই কাকা কিংবা আশেপাশের বয়স্ক মানুষজন যেভাবে কথা বলত, ভাবত, চলত-ফিরত, বাবা সেরকম কিছুই করত না। বাবার সবকিছু ছিল বাবার মতোই। অন্যের সঙ্গে মিলত না। সবাই জানত বাবার মাথায় পাগলামির ছিট আছে। বাবা এমনিতেই খুব কম কথা বলত, কারও কোনও ব্যাপারে থাকত না, সবসময় গম্ভীর মুখে চলাফেরা করত। মনে হত বাবা কী যেন একটা অঙ্ক সবসময় মনে মনে কষেই চলেছে, অঙ্কটা কিছুতেই মেলাতে পারছে না। সে জন্যে মাঝেমাঝে বাবা ভারী অস্থির হয়ে পড়ত, দুড়দাড় পা ফেলে চলে যেত বাড়ির বাইরে।

পাশের গ্রামের একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করত বাবা। সাত মাইল দূরের সেই স্কুলে পায়ে হেঁটেই যেত। সবদিন তো আর যেত না। যেদিন খেয়াল চাপত, সেদিন যেত। আবার যেদিন স্কুলে পড়াত, সেদিন কোনও দিকে না তাকিয়ে একটানা পড়িয়েই যেত, ছাত্ররা শুনছে কিনা, বুঝছে কিনা, কিছুই দেখত না। তবে অধিকাংশ দিন বাবা নাকি ক্লাসে গিয়ে চুপচাপ বসেই থাকত। এসব কথা কাকাদের মুখেই শুনেছি। এতদ্‌সত্ত্বেও বাবার মাস্টারির চাকরিটা টিকে ছিল কোনও অজ্ঞাত কারণে। সে-সময় প্রাইমারি স্কুলের যৎসামান্য বেতনের শিক্ষকতাকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখা হত না, বা প্রশ্নটা ছিল রুজিরোজগারের, বা স্কুলে গিয়ে বাবা কোনও অস্বাভাবিক আচরণ করত না—এর যে-কোনও একটা কারণ হতে পারে। আর বাবা তো প্রথমাবধি এরকম ছিল না। আমার ছোটবোন মাধু যখন বছর তিনেকের, সে-সময়ই বাবার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়।

বেতন বাবদ বাবা যে-টাকাটা পেত, সে-টাকায় আমাদের চার মানুষের সংসার চলার কথা নয়। তবু চলে যেত পারিবারিক সূত্রে বাজারে একটা মুদির দোকান ছিল বলে। দুই কাকার সঙ্গে বাবারও সে-ব্যবসায় সমান অংশ ছিল। ছোট দোকান, খুব বেশি টাকা আসত না, তবু যা আসত তা-ই আমাদের সংসারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, দুই কাকা খুবই সজ্জন মানুষ ছিল। বাবার মানসিক প্রতিবন্ধকতার কোনও সুযোগ তারা নেয়নি। আমাদের কোনও অবহেলা করেনি। আমাদের ভালমন্দের খোঁজখবর রাখত সবসময়। আমার মা ছিল বাবার ঠিক উলটোটি। সংসারের সব ঝক্কিঝামেলা একাই সামলাত। বাবার যেটুকু ছিল না বা কম ছিল, মা সেটুকু ভরিয়ে দিয়েছিল। কোনও অসন্তোষ নেই, কোনও অভিযোগ নেই, মা'র মুখের হাসি কখনও ম্লান হত না। মা লম্বায় কিছুটা ছোটখাটো ছিল, কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ফরসা, বড় বড় চোখ, একমাথা চুল। এত দুঃখ, এত ভাগ্যবিড়ম্বনার মধ্যে মা এত প্রাণশক্তি কোথা থেকে পেত কে জানে! কারও সঙ্গে মনান্তর নয়, সতত সুখীমুখ মা সংসারের ঊনকোটি বায়নাক্কা একাই সামলাত। রাঙাকাকিমা বলত, দিদি দেখতেও দুগ্গা ঠাকুরের মতন, কাজেও দশভুজা।

বাবা অন্যের কাছে যেমনই থাকুক, মা'র কাছে কিন্তু ম্যাজিকের মতো বদলে গিয়ে নিপাট ভালমানুষটি হয়ে থাকত। পাগলপারা মানুষটি বেশ বুঝতে পারত মা-ই তার একমাত্র ভালবাসার আশ্রয়। মুখে কিছু বলত না অবশ্য, কিন্তু মা'র কোনও কথারই অবাধ্য হত না। মা কাছে থাকলে বাবার মনের জটিল ধাঁধাটার জট যেন কিছুটা খুলে যেত। মা কখনও-সখনও বকাবকি করলে বাবা চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকত। যেন এই বকাবকিগুলো তার প্রাপ্যই। মা মাঝেমাঝে নাপিত ডাকিয়ে এনে বাবার এক মুখ দাড়িগোঁফ আর অগোছালো চুল পরিষ্কার করে

কাটিয়ে দিত। আমাকে বলত, যা তো পরমেশকে ডেকে আন। তোর বাবার চুলদাড়ি কেটে দেবে।

পরমেশদা আমাদের বাড়ির নাপিতের নাম। বাড়িতে এসে সবারই চুলদাড়ি কাটত সে।

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা তাড়া দিত।

তুই আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, পরমেশকে ডেকে আন।

পরমেশদা এসে চুলদাড়ি কেটে দেবার পর মা বাবাকে কুয়োর পাড়ে দাঁড় করিয়ে সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে দিত, তারপরে পরিষ্কার জামা ধুতি পরিয়ে দিত। বাবা যেন তখন এক অবোধ শিশু। বড় বড় চোখ মেলে মা'র দিকে তাকিয়ে থাকত। কোনও ভুলের জন্যে এক্ষুনি মা যদি বকে বসে।

মা বলত, কী আর করা যাবে! মানুষটা তো ইচ্ছে করে এমন করে না। ভগবানই ওকে বোধবুদ্ধি দেয়নি।

মা কথাগুলো বাবার সামনেই বলত। বাবার কোনওই ভাবান্তর হত না। কোনও কিছুই তলিয়ে ভাবতে পারত না।

আমার তখন কতই-বা বয়েস হবে, পনেরো-ষোলোর বেশি না। হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ি। মাধু আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট। ক্লাস সেভেনে পড়ে। মা'র সবদিক খেয়াল থাকত। আমার আর মাধুর পড়াশোনা, শরীর-স্বাস্থ্য, সুবিধে-অসুবিধে, কোনও দিকেই নজর এড়াত না। শুধু দশ হাত নয়, দশটা চোখও ছিল মা'র। আমাদের দু' ভাইবোনের প্রতি বাবার কর্তব্য পালনের অসহায়তা বুঝতেই দিত না। বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদের মতো আমি আর মাধুও বড় হচ্ছিলাম।

বাবা অন্য রকম মানুষ হলেও রাঙাকাকা আর ছোটকাকা তাকে বড় ভাইয়ের মর্যাদাই দিত, আমাদের সংসারের ভালমন্দে পাশে এসে দাঁড়াত। দু'কাকিমাও কখনও আমাদের অবহেলা করেনি। রাঙাকাকা পঞ্চায়েত অফিসে কী একটা কাজ করত। ছোটকাকা বাসে চেপে একটু দূরে শহরে চাকরি করতে যেত। মুদির দোকান চালাত ব্রজজেঠু। বয়স্ক মানুষ। বিশ্বাসী আর সৎ। দোকানটা খুব ভাল চলত না কিন্তু। একান্নবর্তী না হলেও বাড়ির তিন পরিবারের সম্পর্কের অবনতি কোনওদিন হয়নি। রাঙাকাকিমা আর ছোটকাকিমার মধ্যে পরিবেশের চমৎকার প্রভাব ছিল। আমি আর মাধু খুড়তুতো ভাইবোনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতাম। সচরাচর যা ঘটে, বাবা আর দুই কাকা, এই তিন পরিবারের বাড়িটা গ্রাম্যজীবনের গল্প উপন্যাসের তিন ঘর এক উঠোনের বাড়ি হয়ে যায়নি। আসলে তিন পরিবারের মধ্যে কোনও খলচরিত্র ছিল না। আলাদা আলাদা হেঁশেল থাকলেও আমরা এক যৌথ পরিবারের মতোই একই আলোবাতাসে বড় হচ্ছিলাম।

এইভাবেই সুখে দুঃখে কেটে যাচ্ছিল দিন। বাবা ওই একই রকম রয়ে গেল। আমি আরও বড় হলাম। স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালভাবেই পাশ করলাম। মাধুরও ক্লাস নাইন হল। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতেই মাধু যেন এক লাফে বড় হয়ে গেল। মাধুর মধ্যে মায়ের আদলটা পুরোপুরি এসে গেল। একইরকম মুখের ছাঁচ, গায়ের রং, শরীর, গলার স্বর। বয়েসের তফাত না থাকলে মা আর মাধু দু'জনকে আলাদা করে চেনাই মুশকিলের ব্যাপার হত।

একদিন ছোটকাকিমা বলল, দিদিও মনে হয় বিয়ের আগে মাধুর মতো দেখতে ছিল।

রাঙাকাকিমা বলল, মনে হয় কী রে ছোট, অবিকল এই রকমই। বিয়ের পর প্রথম এ-বাড়িতে এসে এই মাধুর মতোই দিদিকে দেখেছিলাম।

এ-সময়ে মা'র মধ্যে অন্য একটা চিন্তা এসে গেল। মাধুর বিয়ের চিন্তা। বাবার তো ওই হালগতিক। থেকেও নেই। এখন থেকে তৈরি না হলে পরে মাধুকে পাত্রস্থ করা মুশকিল হবে। পাগল বাপের মেয়েকে কে আর আদর করে ডেকে নেবে।

রাঙাকাকিমা বলল, রাখো তো দিদি, মাধুর বিয়ের জন্যে অত চিন্তা কীসের! মাধু তো আমাদেরও মেয়ে। অমন চাঁদপানা মুখের মেয়ের বিয়ে আটকাবে না।

ছোটকাকিমা বলল, মাধু তো তোমার মতোই দিদি। তোমার যদি বর জোটে, ওরও জুটবে।

মা কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। দুটো বড় বড় বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ছোটকাকিমার দিকে। বাবার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। মাধুরও যদি ওরকম বর জোটে, সেটা কি খুব সুখের হবে!

ছোটকাকিমা ভেবেচিন্তে কিছু বলেনি, কথার কথা বলে ফেলেছে মাত্র। ভয়ানক লজ্জা পেয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল, আহা, বট্ঠাকুর তো আগে এমন ছিলেন না। আমি এসেও দিব্যি সুস্থ মানুষটি দেখেছি। চিরকাল এমনি যাবে না গো দিদি, আমি বলছি বট্ঠাকুর ভাল হয়ে যাবেন, তুমি দেখে নিয়ো।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, সবসময় তো তাই কামনা করে ঠাকুরকে ডাকছি।

কয়েকদিন পরে আমি শহরের স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ভরতি হয়ে গেলাম। ছোটকাকা আর রাঙাকাকা মিলে আমাকে একটা নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছিল। সেটা চালিয়ে আমি চার মাইল দূরের স্কুলে যেতাম।

আমরা যেখানে থাকতাম সেটা ছিল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার একটা ছোট শহর। সেখানে স্কুল, সিনেমাহল, ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস, দোকান-বাজার সবই ছিল। জনবসতি ছিল অনেক। প্রত্যেক রবিবারে সেখানে বিরাট হাট বসত।

হাটে মানুষজন কেনাকাটা করত। ভিড় হত খুব। সেখান থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার। সাতচল্লিশ সালে দেশ ভাগ হবার পরে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে দলে দলে মানুষ এসে শহর সংলগ্ন বাড়তি জমিতে ঘরবাড়ি তুলে বসবাস আরম্ভ করে দিয়েছিল। ছোট শহর ডালপালা মেলে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। ফাঁকা জায়গাগুলো ভরে গিয়েছিল ঘরবাড়িতে। যে-শহরটা এতকাল ঝিমোতে ঝিমোতে নিস্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছিল, সেটা অনেক মানুষের কোলাহলে হঠাৎই নড়েচড়ে বসল। দিনবদলের সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বেড়ে গেল। আমাদের সংসার চালানোর খরচও বেড়ে গেল দুনো। মা'র হাতে সঞ্চয় তো কিছুই ছিল না। প্রথম প্রথম বাবাকে চিকিৎসাপাতি করাতে ডাক্তারে ওষুধে অনেক পযসা চলে গিযেছিল। মা'র সামান্য সঞ্চয় তো চলেই গিয়েছিল, উলটে কিছু টাকা দেনাও হয়ে গিয়েছিল। কাকারা অবশ্য টাকার কথা কোনওদিন বলেনি, কিন্তু মা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবে যখন যেমন পেরেছে, কিছু কিছু দেনা শোধও করে দিয়েছিল।

ডাক্তার দেখিয়ে বাবার অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। বরং দিন দিন মাথার গোলমালটা বেড়েই চলেছিল। একটু হতোদ্যম হলেও কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি মা। বাবাকে ভাল করতে যে যা বলেছে তাই করেছে। কোথায় কোন সাধু এসেছে, সে নাকি ত্রিকালজ্ঞ, তার কাছে ছুটে গেছে। কে কোন জংলি গাছের শেকড়বাটা খাওয়াতে বলেছে, তাই খাইয়েছে। কোন ফকিরদরবেশের মাদুলি তাবিজ নাকি অব্যর্থ, তাই বাবাকে পরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মা'র কোনও চেষ্টাই সফল হয়নি। সব সঞ্চয় একটু একটু করে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। মাকে দেখে বোঝা যেত না। কিন্তু আমি জানতাম মা'র মনের ভেতরটা একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে।

তবু মা কোনওরকমে সংসার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একইভাবে আরও বছরখানেক কেটে গেল। আমি তখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি। মাধু ক্লাস টেন-এ উঠেছে। পরের বছর তার মাধ্যমিক। সে বছর ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি এক রবিবারের দুপুরে আকাশের নৈঋত কোণ থেকে ধেয়ে এল অন্ধকার মেঘ। নিমেষের মধ্যে সে মেঘ ছড়িয়ে গেল সমস্ত আকাশে। দিনের বেলাতেই সন্ধের অন্ধকার নেমে এল। একটু পরেই গুমগুম করে উঠল আকাশ। তারপরে ঝড় উঠল। দেখতে দেখতে সে-ঝড় ভয়ংকর হয়ে উঠল। পাতা উড়িয়ে, গাছ উপড়ে, ধুলোর তুফান তুলে ছুটে চলল দিগ্বিদিকে।

আমি আর মাধু সে-সময় ছোটকাকার ঘরে, বাবা বাইরে কোথায় কে জানে। মা ঘরে একা। ছোটকাকার ঘর থেকে আসতে পারছি না, মাকে চিৎকার করে ডাকছি। ঝড়ের শব্দে মা'র কথা

শুনতে পাচ্ছি না। হঠাৎ মড়মড় শব্দ করে পিছনের বিশাল পুরনো আমগাছটা ভেঙে পড়ল আমাদের ঘরের চালের ওপর। কাকারা ঘরের বারান্দায় এসে চিৎকার করে উঠল, কাকিমারা চেঁচামেচি করতে থাকল আর মাধু ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকল। আমি ঝড়ের মধ্যেই আমাদের ঘরের কাছে ছুটে এসে বিস্ফারিত চোখে দেখলাম অত বড় গাছের নীচে ভেঙেচুরে চাপা পড়ে আছে আমাদের টিনের চালের ঘর। মা'র কোনও সাড়াশব্দ নেই। তখনও জানি না কী সর্বনাশ আমাদের হয়ে গেছে। আমি, মাধু, কাকা-কাকিমারা পাড়া জাগিয়ে মাকে ডাকাডাকি করলাম। কোনও উত্তর পেলাম না। আমি দেখলাম কাকাদের চোখের উদ্বেগ তখন দারুণ ভয়ে পরিণত হয়ে গেছে। মাধু কাঁদছে আর আমি ভেঙে পড়া গাছের চারপাশে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে মাকে ডেকেই চলেছি। যদিও তখন বুঝে গেছি যা সর্বনাশ তা হয়েই গেছে। আমাদের মাথার ওপর থেকে আকাশটাই সরে গেছে।

একটু পরে ঝড়বৃষ্টি থামলে আশেপাশের লোকজন ছুটে এল। গাছের ডাল কেটে মাকে বাইরে আনা হল। ভুল বললাম। মাকে নয়, মার থ্যাঁতলানো শরীরটাকে। লোকজনের শূন্য দৃষ্টি দেখে বুঝলাম মা অনেক আগেই মারা গেছে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল, পাড়া ভেঙে লোক জড়ো হল বাড়ির উঠোনে। বাবা কোথায় ছিল যেন, কয়েকজন গিয়ে বাবাকে ধরে নিয়ে এল। মা'র মৃতদেহের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাকে দেখল বাবা, তারপর মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। ঝড় তখন থেমে গেছে। বৃষ্টিও নেই। নির্মেঘ সন্ধের আকাশে দু'-একটা করে তারা সবে ফুটতে শুরু করেছে। মলিন মহাশূন্যের সেই অসীম বিস্তারের মধ্যে বাবা কী দেখল কে জানে! কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার মুখের দিকে তাকাল, মাধুকে দেখল, মা'র মুখের দিকে আবার তাকাল, তারপর মাথা নিচু করে ধীর পায়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল। মাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় একজন খোঁজ করতে গিয়ে দেখল বাবা বাড়ির পিছনের পুকুরপাড়ে জলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে।

মেয়েদের কান্না আর মাধুর বুকভাঙা হাহাকারের মধ্যে শ্মশানযাত্রীরা রওনা হল। রাঙাকাকা আমাকে হাত ধরে নিয়ে চলল। আমি একমাত্র ছেলে, আমাকেই মুখাগ্নি করতে হবে।

অপঘাত মৃত্যু। শাস্ত্রবিধি মতো অশৌচের পর মা'র শ্রাদ্ধশান্তির কাজ হল। এ কয়দিন বাবা চুপচাপই ছিল। সারাদিন বাড়ির আশেপাশেই থাকল। শ্রাদ্ধের দিন সারাদিন পুকুরপাড়েই বসে রইল।

কয়েকদিন পরেই বাবা বদ্ধ পাগল হয়ে গেল। খায় না, দায় না, সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। মাঝেমাঝে বিড়বিড় করে আপনমনে কথা বলে। দুপুরে কোনওদিন বাড়ি আসে, কোনওদিন আসে না। অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। ঘরে ঢোকে না, দাওয়ায় শুয়ে থাকে। কোনও রাতে বাড়ি না ফিরলে গভীর রাতে খোঁজাখুঁজি করে বাবাকে ধরে আনতে হয়। বেশিরভাগ দিন শ্মশানের পাশে নদীর ধারে বাবাকে পাওয়া যেত। স্কুলের মাস্টারির পাট তো চুকেই গেছে। একমুখ কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ, একমাথা আলুথালু রুক্ষ চুল, ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড়। স্নান যে শেষ কবে করেছে তার কোনও হিসেব নেই। আগে কাকারা বকাঝকা করলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শুনত। এখন সে-সবের বালাই নেই। একদণ্ডও সেখানে দাঁড়ায় না। বিড়বিড় করতে করতে বাড়ির বাইরে চলে যায়।

মা'র শোচনীয় মৃত্যুর পর দুর্বিপাকের বাঁধভাঙা বন্যার তোড় আমাকে আর মাধুকে নড়িয়ে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। আসলে কাকা আর কাকিমারা অমন মানুষ না হলে আমাদের অথই জল ভাসিয়ে নিয়ে যেত। আমাদের ভেঙে যাওয়া ঘরটাকে কাকারাই মিস্ত্রি ডাকিয়ে সারিয়ে-সুরিয়ে দিয়েছিল। আমি আর মাধু রাঙাকাকার ঘরেই খেতাম। দু'-একদিন অবশ্য ছোটকাকার ঘরে। বাবাকেও তাই খেতে হত। সে-বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন কাকারাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একরকম জোর করেই আমাকে পরীক্ষার হলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। খুব একটা খারাপ ছাত্র ছিলাম না। পরীক্ষা দিয়ে বুঝলাম পাশ করে যাব। পাশ করাটা তখন একান্তই দরকার ছিল আমার কাছে। পরীক্ষার ফল বেরোলে যা হোক একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে হবে আমার। কাকারাও

চেষ্টা করবে বলেছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কাকাদের আশ্রয়ে তো চিরদিন থাকা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা মাধু বড় হচ্ছে। ওর বিয়ের কথাটাও মাথায় রাখতে হচ্ছিল আমার। মা বেঁচে থাকতে এত সব কথা ভাবতে হয়নি। এখন বুঝতে পারছি কত বড় বৃক্ষচ্ছায়া সরে গেছে পাশ থেকে।

বাবার মানসিক অসুখের ব্যাপারটাও আমার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ছিল। ইচ্ছে আছে কিছু টাকাপয়সা হাতে এলে বাবাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাব। বাবার যা চিকিৎসা হয়েছে, তা এদিককার ডাক্তারের কিংবা কোবরেজি বা হেকিমি ওষুধ আর পির-সাধুদের দেওয়া লতাপাতা শেকড়বাকড় খাওয়া। মা যতটুকু পেরেছে, করেছে। পাগল সারাতে মা নিজেই পাগল হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন যাবার পর মাধু আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে ফিরে এল। কতই বা বয়েস তার। মা'র মর্মান্তিক মৃত্যুটাকে সহজভাবে নিতে পারেনি সে। কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিল। মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না মা'র না-থাকাটা। একটু একটু করে ওর মন শান্ত হল। সংসারের কাজকর্ম করতে থাকল। সেই আগের মেয়েটি আর নেই, মনের দিক থেকে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। তবু বাবার প্রতি তার আড়ষ্টতা থেকেই গেল। কেমন যেন ভয়ভয় করত বাবাকে। বাবার জন্যে ওর ভীষণ কষ্ট হত, কিন্তু কিছুতেই বাবার কাছে আসতে পারত না। ওরই-বা কী দোষ। এই বয়সে মাকে ওইভাবে হারিয়েছে, বাবা থেকেও নেই। এত বড় দুটো আঘাত সহ্য করার মতো বয়েস তো ওর নয়।

কিছুদিন পরে মাধু নিজেই রান্নাবান্না করতে শুরু করল। কাকা-কাকিমাদের কোনও আপত্তিই শুনল না। আমারও তাই ইচ্ছে ছিল। আমাদের সামনে যখন বিকল্প কিছু নেই, তখন একটু একটু করে নিজেদের তো সাবলম্বী হতেই হবে। আমি তো এখন রীতিমতো বড হয়ে গেছি। এদিকে পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবার সময়ও কাছে এসে গেছে। ভালভাবে পাশ করা নিয়ে কোনও সংশয়ই নেই। ছোটকাকা শহরের কী একটা প্রাইভেট কোম্পানির অফিসে বলে রেখেছে। আপাতত সেখানেই ঢুকে পডব।

মাধু চমৎকার রাঁধে। ঠিক মায়ের মতো। মাধুর রান্না খেলে মন খারাপ হয়ে যেত আমার।

মাধুর রান্না খেয়ে একদিন ছোটকাকিমা বলল, মনে হল দিদির হাতের রান্না খাচ্ছি।

বাঙাকাকিমা বলল, শুধু রান্না নয়, মাধুর সবকিছুই দিদির মতন।

সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে, শুধু বাবাকেই সামলাতে পারছি না। পাগলামির মাত্রা দিন-কে-দিন বেড়েই চলেছে। কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কখন বাড়ি আসে, কিছুরই ঠিকঠিকানা নেই। আমার কাজই হল রাত গড়ালে বাবাকে খোঁজাখুঁজি করে বাড়িতে ধরে নিয়ে আসা। আসতে কি চায়। বারবার ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইত। কখনও কখনও অন্য লোকের সাহায্যও নিতে হত। অধিকাংশ দিন রাতে বাবা ঘবের বারান্দায় বসে থাকত। ঘুমাত না। সাবারাত বিড়বিড় করে কথাই বলে যেত। খেতে দিলে ইচ্ছে হল কিছু মুখে দিত, ইচ্ছে না হলে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকত। কখনও কখনও দিনের বেলায় সারা উঠোনে ভাত তরকারি ছড়িয়ে দিয়ে কাকপক্ষী কুকুর-বেড়ালকে খাওয়াত। একদিন সকালে দেখলাম বালিশ ফাটিয়ে সমস্ত তুলো সারা মাথা আর গায়ে মেখে উঠোনে গোল হয়ে ঘুরছে। আর একদিন কোথা থেকে মুখে কালো রং মেখে বাড়িতে ঢুকল। অন্য একটা ব্যাপারও লক্ষ করলাম। ইদানীং বাড়ির আনাচে-কানাচে, ঘরের এ-কোণে ও-কোণে, আলনা-আলমারির পিছনে, খাটের তলায়, মহা ব্যস্তভাবে কী যেন খুঁজত। খুঁজে না পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির বাইরে ছুটে যেত। আমি জানতাম বাবা কী খুঁজত, কাকে খুঁজত অমন করে।

মা'র মৃত্যু বাবাকে একেবারে লাগামছাড়া করে দিয়েছিল। এই মানুষকে নিয়ে কী করব ভেবে কূলকিনারা পেতাম না।

একদিন সারারাত বাবা বাড়ি ফিরল না। অনেক রাত পর্যন্ত বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও কোথায়ও

বাবাকে পাওয়া যায়নি। মাধু রাতে একটুও ঘুমাল না। সারারাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই সারা। পরের দিন বেলা একটু বাড়তেই বাবা নিজের খেয়ালেই বাড়ি ফিরল। কোথায় ছিল কে জানে! চোখ রক্তবর্ণ, সারা গায়ে ধুলোবালি মাখা। বাড়ি ফিরে ঘরের সিঁড়িতে চুপ করে বসে রইল। তারপর আবার বেরিয়ে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎই দেখি মাধু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তীব্র গলায় বলছে, এই যে! যাচ্ছ কোথায়? এক পা-ও বাড়ির বাইরে যাবে না বলে দিচ্ছি!

মাধুর ওই রূপ দেখে বাবা থমকে দাঁড়াল। কাছে এসে মাধুর মুখের দিকে একটু সময় নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। কী দেখল কে জানে! অন্ধকারের অতলান্ত হাতড়ে হারিয়ে যাওয়া কোনও অমূল্য নিধি খুঁজে পেল যেন। বাবাকে তখন খুব শান্ত দেখাচ্ছিল।

বাবাকে দেখে নয়, আমার অবাক লাগছিল মাধুকে দেখে। ঠিক মায়ের মতো দু'চোখে বেদনার ধমক নিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে সেই একই ভাবে।

বাবা চলে গেল না। চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। মাধু ঘরে গিয়ে একটা বেতের মোড়া নিয়ে এসে উঠোনের ওপর রেখে বাবাকে বলল, চুপ করে বসো এখানে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, যা তো দাদা, পরমেশদাকে ডেকে আন। চুলদাড়ি কাটিয়ে বাবাকে সাবান মাখিয়ে ভাল করে চান করিয়ে দেব আজ।

আমি বললাম, পরমেশদাকে ডাকতে গেলে বাবা যদি আবার কোথাও চলে যায়?

কাকিমারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। রাঙাকাকিমা বলল, কোথাও যাবেন না। দিদিকে পেয়ে গেছেন যে বট্‌ঠাকুর।

আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাধু তাড়া দিল, তুই আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন দাদা? যা, পরমেশদাকে তাড়াতাড়ি ডেকে আন।

আমার বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। এ কে কথা বলছে? মাধু? না আমার হারিয়ে যাওয়া মা? অবিকল সেই একই কথা, যেমন করে মা আমাকে বলত। আমি কি আর এক মুহূর্ত সেখানে থাকি! ছুটে গেলাম পরমেশদাকে ডেকে আনতে।

ছুটে গেলাম, না উড়ে গেলাম!

আমি জানি আমার এ উড়ে যাওয়া আর থামবে না।

অপত্য

সারাবছর সকালের সূর্য কোথায় থাকে, কোথা থেকে মাঝ আকাশে উঠে আসে, টেরই পাওয়া যায় না। টের পাওয়া যায় শুধু এইসময়। ডিসেম্বরের শেষের দিকে সূর্যের উত্তরায়ণের সময়। সাতসকালে বড অশত্থগাছের পাশ থেকে দেদার রোদ্দুর এসে পড়ে অমিতেশের বাড়ির সামনের এই এক টুকরো সবুজ ঘাসের জমিতে। বড় আরামের রোদ্দুর। মনে হয় করুণাময় ঈশ্বরের পরম স্নেহের পরশ ছড়িয়ে আছে সারাশরীরে। ষাটোর্ধ্ব অমিতেশ চোখ বুজে উপভোগ করেন উষ্ণতার সুখ। কাজের মেয়ে সরস্বতী ঘাসের ওপর দুটো বেতের চেয়ার পেতে রাখে সকাল আটটা বাজলেই। তার একটাতে এসে বসেন অমিতেশ। গায়ে জড়ানো থাকে পশমের চাদর। দুটো চেয়ারের মাঝখানে থাকে একটা বেতের গোল টেবিল। টেবিলে থাকে সকালের খবরের কাগজ আর অমিতেশের চশমা। কোনও কোনওদিন দ্বিতীয়বারের চা। চা থাকলে ধীরেসুস্থে চা খান অমিতেশ। না থাকলে খাপ থেকে চশমা বের করে চোখে দেন। তারপর খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে প্রথম পাতার খবরগুলো দ্যাখেন। পড়েন না। আলসেমি লাগে পডতে। কাগজটা ফের টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন। চোখ আর মনকে সব কাজ থেকে ছুটি দিয়ে দেন। এ-সময় এক কর্মহীন কালহীন নিবালম্ব অসীম শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে থাকতে ভালবাসেন।

একটু পরে স্ত্রী সুজাতা এসে বসেন অন্য চেয়ারটাতে। তাকিয়ে দেখেন অমিতেশকে। বড় প্রসন্ন দেখায় তাঁকে। ভাগ করে নেন স্বামীর এই পরিতৃপ্ত সুখকে। নির্মেঘ নীল সকালে নিজেকে আনন্দময় মনে হয়। স্মিতমুখে চুপ করে বসে থাকেন।

একটু পরে চোখ খুলে তাকান অমিতেশ। মুখোমুখি বসে থাকা সুজাতাকে দেখেন।

কতক্ষণ?

এই তো।

শীতের এই সকালগুলোতে রোজ এই হয়। রোজই এমনি করে বসে থাকেন অমিতেশ। এমনি করে চোখ বন্ধ করে, এমনি করে সমাহিত হয়ে। সুজাতা এসে বসার পরও অনেকক্ষণ একই ভাবে থাকেন। তারপর চোখ খোলেন। তাকিয়ে দেখেন সুজাতাকে। একটা-দুটো সংক্ষিপ্ত কথা বলেন। কিংবা কথা শোনেন। তারপর চুপ করে থাকেন। সেই কবে থেকে তাঁর পাশে দেখছেন জীবনসঙ্গিনীকে। দেখেছেন কতরকমভাবে। প্রথম জীবনে দেখেছেন এক লীলাচঞ্চলা দয়িতাকে, মধ্যজীবনে দেখেছেন কর্তব্যপরায়ণা গৃহিণীকে আব এখন প্রান্তিক জীবনে দেখছেন এক প্রত্যয়গভীর অবলম্বনকে।

একটু আগে চেয়ারে এসে বসেছেন অমিতেশ। আজ কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকতে পারছিলেন না। যতবারই তিনি মনকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন, ততবারই তাল কেটে যাচ্ছিল। খোলা দরজা জানলা দিয়ে বাইরে থেকে দমকা হাওয়া উড়ে এসে সুস্থিতিকে যেন অগোছালো করে দিচ্ছিল। কানে আসছিল শিশুকণ্ঠের হইহই করা হাসি আর অনবরত কথা। অমিতেশ তাকিয়ে দেখলেন সামনের বাড়ির ফাঁকা জমিতে চার-পাঁচ বছরের লাল সোয়েটার পরা এক বাচ্চা ছেলে ছোটাছুটি করে একটা লাল রঙের ঘুড়ির কয়েক হাত সুতো ধরে দৌড়ে দৌড়ে ঘুড়িটা ওড়াবার চেষ্টা করছে। ঘুড়িটা কেবলই লাট খাচ্ছে, উড়ছে না। কিন্তু তাতে ছেলেটার খেলা

থামছে না। ওর হাসি আর কথা বলার কিছুই কমতি হচ্ছে না। ঘুড়িটা না ওড়াই যেন ওর আরেক রকম খেলা। ভারী মজা পেলেন অমিতেশ। স্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটার দিকে। ছেলেটাকে আগে কখনও দেখেছেন কি ও-বাড়িতে? মনে পড়ল না। খুব সম্ভব দ্যাখেননি। এই প্রথম। নতুন এসেছে।

সুজাতা এসে বসলেন মুখোমুখি চেয়ারে। অমিতেশকে ওইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, কী হল? কী দেখছ অমন করে?

অমিতেশ তখনও ছেলেটির দিকে তাকিয়ে। তাকিয়ে থেকেই বললেন, ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার, বুঝলে। রথীনবাবুর বাড়ির সামনে যে একটা ছোট বাগানমতো আছে আজই প্রথম খেয়াল করে দেখলাম।

তাই?

একদম তাই।

সুজাতা ছেলেটির ঘুড়ি নিয়ে খেলা দেখতে দেখতে বললেন, আসলে ও-বাড়ি থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসত না তো, তাই খেয়াল করোনি। রথীনবাবুরা তো থাকেন মাত্র তিন জন। সকলেই বড়।

ওরা তবু তিন জন। আমরা আরও এক কম। দু'জন। আর দু'জনেই বয়স্ক। সরস্বতী কাজের মেয়ে। তাকে তো ঠিক পরিবারের মেম্বার বলে ধরা যায় না।

সুজাতা অন্যমনস্ক স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য সময় নিঃশব্দ থেকে বললেন, এই তো সঞ্জু আসছে। সঙ্গে বউমা, তোমার নাতি তাতাইও আসবে। তখন এই বাচ্চার মতো তাতাই সারাবাড়ি হইহই দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াবে। বাড়ি একেবারে ভরে উঠবে। আর তো কয়েকটা দিন মাত্র।

অমিতেশ আর সুজাতার একমাত্র সন্তান সঞ্জয় চাকরি করে গুজরাতের আমেদাবাদ শহরে। একটা বেসরকারি টেক্সটাইল সংস্থার পদস্থ অফিসার। বউ তানিয়া আর সাড়ে চার বছরের ছেলে তাতাইকে নিয়ে আমেদাবাদে থাকার সাত বছর হয়ে গেল। আগে বছরে তিন-চারবার জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ার এই বাড়িতে আসত। বিয়ের পর মাত্র তিনবার এসেছে। শেষবার দু'বছর আগে। কথা আছে এবার বড়দিনের সময় আসবে। অমিতেশ আর সুজাতার বিয়ের আট বছর পরে সঞ্জয় হয়েছিল। দীর্ঘকাল বাদে প্রসূত একমাত্র সন্তানের প্রতি স্নেহের টানটা তাই বরাবরই একটু বেশি। সেই ছেলে দু'বছর পরে বউ আর ছেলেকে নিয়ে আসছে, এমন একটা খুশির খবর স্বভাবতই অমিতেশ আর সুজাতাকে উচ্ছ্বসিত করে রেখেছে।

অমিতেশকে চনমনে দেখাল। সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। ব্যস্ততা দেখিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সঞ্জুরা তো কয়েকদিনের মধ্যেই এসে যাচ্ছে। দাদুভাইও তখন এমনি করে সারাবাড়ি ছোটাছুটি করে বেড়াবে, কী বলো? আসার তারিখটা কবে বলেছে বলো তো?

চেয়ারটা রোদের মুখোমুখি ঘুরিয়ে নিয়ে সুজাতা বললেন, ঠিক করে কোনও তারিখ বলেনি। ডিসেম্বরের শেষের দিকে, সেইরকমই তো চিঠিতে লিখেছে সঞ্জু।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে? মানে কয়েকদিনের মধ্যেই এসে যাবে। এবার ঠিক আসবে, কী বলো? ওরও তো মা বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে, না কী?

সুজাতা স্নিগ্ধ মুখে তাকালেন অমিতেশের দিকে। বললেন, তা তো ইচ্ছে করেই। তবে অদ্দূর থাকে, চাকরিবাকরির ব্যাপার, হুট করে তো—

সুজাতাকে শেষ করতে দিলেন না অমিতেশ। বললেন, আমেদাবাদ আবার অদ্দূর কোথায় হে? আমেরিকা জার্মানি ইংল্যান্ড থেকে লোকের ছেলেরা হামেশাই আসছে যাচ্ছে। কত দূর ভাবো দিকিনি!

সুজাতা হাসলেন? ছেলে আসার আনন্দে এখন থেকেই নাচছ। এলে কী করবে?

নাচব না? এক মাস, দু'মাস নয়, পাক্কা দু'বছর পরে আসছে। শুধু ছেলে নয়, সঙ্গে বউমা নাতিও আসছে। ভাল কথা মনে পড়েছে। ওদের জন্যে দুটো ঘর রং করিয়ে নেব ভাবছি। রং ম্যাচ করে জানলা দরজার পরদা। ঠিক হবে না?

সুজাতার হাসি প্রসারিত হল। বললেন, এ কি ছেলের নতুন করে বিয়ে দিচ্ছ? ঘরে রং, নতুন পরদা, আর?

সুজাতার কথায় কান না দিয়ে অমিতেশ সোৎসাহে বলেই চললেন, আর শোনো, সঞ্জু তো তোমার হাতের নারকেলনাড়ু খেতে খুব ভালবাসত। আমি কালই নারকেল কিনে ছাড়িয়ে নিয়ে আসব। বেশি করে বানিয়ে রেখো। তাতাই খাবে, বউমাও খাবে। মুগের পুলিও বানিয়ে— আচ্ছা, সে ওরা এলে হবেখ'ন। মনে আছে, সঞ্জু পাটিসাপটার জন্যে তোমার পিছু পিছু কেমন ঘুরঘুর করত?

সুজাতা উজ্জ্বল হলেন। বললেন, মনে থাকবে না আবার। খুব মনে আছে। পায়েসের বাটি একেবারে চেটেপুটে শেষ কবত। সেই ছেলে এখন কত বড় হয়ে গেছে। কত দূরে থাকে। ভাবলেই কেমন লাগে।

কোনও কথা না বলে অমিতেশ নির্নিমেষ তাকিযে রইলেন সুজাতার দিকে। সুজাতার চোখ তখন সামনের গাছটার দিকে। অমিতেশ ভালই জানেন সুজাতা গাছটাকে দেখছেন না। আসলে তিনি এই মুহূর্তে এই দৃশ্যমান জগতের কিছুই দেখছেন না। স্মৃতিসুখে মোহাবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। অমিতেশ ভাবলেন এমনই হয়। সন্তানের জন্যে গর্ভধারিণীর মনের সবটুকুই তো স্মৃতির রত্নঘর। সন্তানের শৈশব কৈশোর যৌবনের সব ঘটনার মণিমুক্তো সেখানে সযত্নে সাজানো আছে। সময়ের কোনও জলঝড়ের ধুলোবালি সেই স্মৃতিকে এতটুকু মলিন কিংবা অকিঞ্চিৎকর করে দিতে পারে না। সুজাতাও তাঁর থেকে কোনও ব্যতিক্রমী চরিত্র নন। তাই-ই হয়। স্বামীর মতো কর্মজীবনের বিপুল বিস্তার তাঁর নেই, নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের অভিজ্ঞতা তাঁর কম। তাঁর যা কিছু ভাবনাচিন্তা সন্তান, স্বামী আর সংসারের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। আহা, তাই থাকুক। স্বচ্ছ সরোবরের টলটলে জলে গর্বিতা মরালীব মতো ভেসে বেড়ান সুজাতা। মনে মনে স্ত্রীর জন্যে এমন কিছু চাইতে পেরে বুক ভরে উঠল অমিতেশের।

সামনের বাড়ির বাচ্চাটা তখনও একইভাবে খেলে যাচ্ছে। ঘুড়ির সুতো ধরে একবার সামনের দিকে দৌড়ে আসছে, আবার পেছনে দৌড়ে ফিরে যাচ্ছে। অবাধ্য ঘুড়ি কিন্তু একটুও উড়ছে না, আগের মতোই লাট খেয়ে নীচে নেমে আসছে। না উড়ুক, কিছুই এসে যাচ্ছে না ছেলেটার। ঘুড়ি ধরে ছোটাছুটি করাটাই তার কাছে মস্ত মজার খেলা। অমিতেশ ভাবলেন, সত্যি, ছোটরা কত সামান্য জিনিসের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়। মুখের ওই অদ্ভুত শব্দ, ওই ছোটাছুটি করা, সবই তার নিজের মনের মধ্যে তৈরি করা এক আশ্চর্য আনন্দলোকের ব্যাপার।

অমিতেশ ভরা গলায় হঠাৎ হাঁক পাড়লেন, সরস্বতী, সরস্বতী—

সরস্বতী হল এক চোদ্দো-পনেরো বছরের মেয়ের নাম। অমিতেশ আর সুজাতার সঙ্গে গত পাঁচ বছর ধরে আছে। বাড়ির সব কাজ করে। কখনও নিজে রাঁধে, কখনও সুজাতাকে রান্নায় সাহায্য করে। কাজের মেয়ে হয়েই এ-বাড়িতে ঢুকেছিল সরস্বতী, এখন বাড়ির মেয়ে হয়ে গেছে। অমিতেশ আর সুজাতা দু'জনের কাছেই সে অপরিহার্য। খুব শান্ত আর হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে সরস্বতী। সংসারের হেন কাজ নেই যা সে হাসিমুখে করে না।

সুজাতা বললেন, কী হল? সরস্বতীকে আবার ডাকছ কেন?

আরেক কাপ চা দিতে বলব।

চা? আবার চা কেন? দু'কাপ তো হয়েই গেছে।

অমিতেশ গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে আরাম করে বসে বললেন, খেতে ইচ্ছে করছে। আজ শীতটা ভালই পড়েছে, বুঝলে।

উঁহুঁ, শীত পড়েছে বলে নয়। সুজাতা মাথা নাড়েন।

তবে?

সুজাতা স্মিতমুখ হলেন। বললেন, আসলে মনটা তোমার খুশিখুশি লাগছে। ছেলে আসছে। নাতি আসছে। কেমন কিনা?

অমিতেশ হা হা করে হেসে উঠলেন। যদিও তিনি জানেন তাঁর চেয়ে ঢের বেশি খুশি হয়ে আছে ছেলের মা। কিন্তু সেই খুশি কখনওই অমিতেশের মতো প্রকাশ্যে আনেননি সুজাতা। বাইরে থেকে নিজেকে যতই স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা করুন না কেন, ভেতরে ভেতরে সুজাতা উৎসবের আনন্দের অপেক্ষায় দিন গুনছেন কবে ছেলে আসবে, বউ আসবে, নাতি আসবে।

বিকেলের ডাকে সঞ্জয়ের চিঠি এল।

সে-চিঠি অমিতেশ হাতে পেলেন সন্ধেবেলায়।

অমিতেশ তখন শোয়ার ঘরের বিছানায় জমিয়ে বসে টিভিতে একটা ধারাবাহিক অনুষ্ঠান দেখছিলেন। এ-সময় কাজটাজ থাকে না বলে সুজাতাও তাঁর সঙ্গে বসে টিভি দেখেন। আজ সুজাতাকে দেখলেন না। কোনও কাজে আটকে গেছে নিশ্চয়ই। সরস্বতী ঘরে কী করছিল, ভাবলেন তার কাছে সুজাতার কথা জিজ্ঞেস করবেন।

কিন্তু জিজ্ঞেস করতে হল না। তখনই সুজাতা ঘরে এসে ঢুকলেন। থমথম করছে মুখ। হাতে একটা মুখছেঁড়া খাম। ওই খামে যে সঞ্জয়ের চিঠি আছে এবং সে চিঠিতে খুশি হবার মতো কোনও কথা লেখা নেই, এ-কথা বুঝতে অমিতেশের একটুও ভাবতে হল না।

কী লিখেছে সঞ্জু? এবারও আসতে পারছে না?

সুজাতা মাথা নেড়ে বললেন, না।

কী অজুহাত দেখিয়েছে?

সুজাতা খামটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়েই দ্যাখো।

অমিতেশ খামটা নিলেন না। রিমোট কন্ট্রোলে টিভি বন্ধ করে দিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, না, পড়ব না ওই চিঠি। তোমার মুখেই শুনব।

সুজাতা অস্বচ্ছ গলায় বললেন, ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন নাকি আমেদাবাদে আসছে। সবাই মিলে গোয়ায় বেড়াতে যাবে।

তাই আসতে পারবে না?

তাই তো লিখেছে।

স্কাউনড্রেল!

সুজাতা অবাক হয়ে বললেন, ওকী! মুখ খারাপ করছ কেন? তুমি না বাবা?

ধক্ করে জ্বলে উঠল অমিতেশের চোখদুটো। তীব্র গলায় বললেন, বলেছি, বেশ করেছি। একশোবার বলব। বাবা! আমি বাবা হতে পারি, ও ছেলে হতে পারে না? কর্তব্য শুধু বাবা আর মা'র, ছেলের নয়? আমি জানতাম সঞ্জু আসবে না। গত দু'বছর যেমন আসেনি, এবারও আসবে না। এত বড় বাড়ি ফাঁকাই পড়ে থাকবে। ও আমাদের পছন্দ করে না, একটুও না। ও ইচ্ছে করেই আসে না। আসতে ভাল লাগে না।

সুজাতা বোঝাবার একটা দুর্বল চেষ্টা করলেন, ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন যদি আসে, ও কী করবে?

গত বছরও কি শ্বশুরবাড়ির লোক এসেছিল? তার আগের বছর? বছরে একটার বেশি চিঠি না দিতে, দু'-তিনটের বেশি ফোন না করতে কি শ্বশুরবাড়ি শিখিয়ে দিয়েছে? সব দোষ কি বউমার একার? ছেলের মেরুদণ্ড নেই?

সুজাতা চুপ করে রইলেন অসহায় মুখে। তাঁর বলার মতো কিছু নেইও। তিনি তো জানেন অমিতেশ একটাও অসত্য কথা বলছেন না। ঝোড়ো হাওয়া এতবার ঝাপট দিলে বিশ্বাসের খুঁটিটা আর কতকাল শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

অথচ এই সঞ্জুকে কত যত্ন করে, কত স্বপ্ন নিয়ে, একটু একটু করে বড় করেছেন সুজাতা আর অমিতেশ। দুঃখ কষ্ট রাগ অভিমানগুলো তো এমনি এমনি হয় না। অনেক আঘাত পাবার পর, অনেক সহ্য করার পর, আশাভঙ্গের ক্ষোভ আসে। ক্ষোভ সৃষ্টি করে ক্রোধকে। নইলে নিজেদের সবচেয়ে আদরের মানুষকে কে আর এমন করে কটু কথা বলে। সুজাতা সব জানেন, সব বোঝেন, তবু শূন্য জায়গাটা পূর্ণ করে রাখেন কতকগুলো বানানো কথা বলে। অমিতেশ মুখে বলছেন, কিন্তু সুজাতা মনে মনে পুড়ছেন।

একটু সময় থম মেরে বসে থেকে অমিতেশ বললেন, বুঝলে, ননসেন্সটার ফোন করে বলার সৎসাহস নেই, তাই চিঠি লিখে জানিয়েছে। না এল তো বয়েই গেল। তাই থাকুক, এ-বাড়িটা বৃদ্ধাশ্রমই হয়ে থাকুক। কাউকে লাগে না আমাদের। আজ থেকে মনে করব আমার কোনও ছেলে নেই।

ইস! সুজাতার মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠল।

উত্তেজনায় দুঃখে অমিতেশ হাঁপাচ্ছিলেন। সরস্বতী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তাড়াতাড়ি করে সামনে এসে অমিতেশকে বলল, জেঠু, ডাক্তার না তোমাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে বলেছে? প্রেশার বেড়ে যাবে।

সুজাতার দিকে তাকিয়ে অমিতেশ বললেন, দেখলে, দেখলে তো সরস্বতীর বোধবিবেচনা? আমাকে উত্তেজিত হতে মানা করছে। অথচ রক্তের সম্পর্ক যার সঙ্গে, সে খোঁজও রাখে না বুড়ো বাপ মা আছে না গেছে। ক্যালাস, অল ক্যালাস।

সুজাতা কী আর উত্তর দেবেন। সজল কান্নাকে গোপন করতে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে একইভাবে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বেতের চেয়ারে বসে ছিলেন অমিতেশ। সুজাতা এসে স্বামীকে উদ্‌গ্রীব হয়ে সামনের বাড়ির বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন। আজও সেই বাচ্চা ছেলেটা সেখানে হইহই করে খেলছে। তবে আজ তার হাতে ঘুড়ি নেই। আজ একটা রবারের লাল বল নিয়ে ফুটবল খেলছে। একবার ডানদিকে বলটাকে পা দিয়ে মারছে, সেখান থেকে বাঁদিকে, আবার অন্যদিকে। নিজেই কথা বলছে, নিজেই শুনছে, নিজেই হাসছে। মাঝেমাঝে কল্পিত বারপোস্টে বলটা পাঠিয়ে দিয়ে গোল গোঁল বলে চিৎকার করে উঠছে।

সুজাতা চেয়ারে বসলেন। তাঁকে দেখে অমিতেশ উত্তেজিত গলায় বললেন, দ্যাখো, দ্যাখো ছেলেটাকে। ঠিক যেন ছোট্ট সঞ্জু। ছোটবেলায় সঞ্জু এমনিভাবে খেলত না? এমনিভাবে বল মেরে গোল গোল চেঁচিয়ে উঠত না? একইরকম কথা বলা, একইরকম ছোটাছুটি। হুবহু সঞ্জুর মতো। তাই না? সঞ্জুরও ওরকম একটা লাল সোয়েটার ছিল, মনে আছে? দ্বিধাগ্রস্ত সুজাতা ভাবেন কাকে দেখবেন। ও বাড়ির বাগানের ছেলেটাকে, না ছেলেমানুষ হয়ে যাওয়া প্রবীণ মানুষটিকে, অমিতেশকে?

নিশিগন্ধা

সন্ধের পরপরই কোথা থেকে মোলায়েম বাতাস উড়ে এসে জুড়িয়ে দিয়ে গেল মাঝ চৈত্রের ঘেমো দিনটা। আকাশে ইতিউতি মেঘ ছিল, বৃষ্টি হবার কথাও ভাবা গিয়েছিল, কিন্তু বৃষ্টি হল না, মেঘও উধাও হয়ে গেল। তা যাক। গরমের ঝাপট থেকে কিছুটা স্বস্তি তো পাওয়া গেল।

মতিলালের মদের ঠেকের সামনে রাস্তার ধারে একটা অন্ধকার মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দুখু মনস্থির করবার চেষ্টা করছিল। দু'দিন হল কামাইধান্দা বলতে কিছু নেই। মনমেজাজও খিঁচড়ে আছে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিল মতিলালের দোকানের কাছে। পাকুড় গাছটার নীচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। মনটা একবার এদিক, আরেকবার ওদিক করছে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো। এই ভাবছে যাই, আবার ভাবছে, না, থাক। পকেটে রেস্ত কম থাকলে এই-ই হয়। সন্ধের মুখে গলাটা মনে হয় শুকনো কাঠ। ভিজিয়ে নেবার জন্যে মন আনচান করে, ঘোরাঘুরি শুরু হয় মতিলালের দোকানের সামনে। একবার ভাবে যাই, ঢুকে পড়ি মদের ঠেকে। আবার ভাবে ঢুকলেই মেজাজ এসে যাবে। পকেটের মালকড়ি বিলকুল হাপিস হয়ে যাবে। বাড়িতে বুড়ি পিসি আর তাকে নিয়ে দেড়জন মানুষ। আর কিছু না থাক একজালা পেট তো আছে। রাত পোয়ালে খাবেটা কী। ভারী দোনামনায় পড়ে যায় দুখু। মালকড়ির জন্যে সেই রাতবিরেতে বেরোতে হয় চুরিচামারির ফিকিরে। সেও তো অনিশ্চয়ের ব্যাপার।

মতিলালের মদের ঠেক বলতে তার বাড়ির সামনের ঘর। হাটতলার পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা তিস্তা সেতু পার হয়ে শহরের দিকে চলে গেছে, তার একপাশে অনেক গাছগাছালির মধ্যে। বাইরে থেকে গেরস্তের সাধারণ ঘর মনে হলেও সন্ধের পর অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ওই ঘরে গুটিগুটি ঢুকে পড়ে নেশাড়ু মানুষ। কাঠের বেঞ্চে বসে হাতের কাচের গেলাসে ঠোঁট ভেজায়। সবই দেশি পানীয়। ওই যাকে বলে কিনা কান্ট্রিলিকার। বিলেতি মালও পাওয়া যায় দু'-চার বোতল। ভুটানে তৈরি। ওগুলো সব রইস লোকেদের জন্যে। তারা কিনে নিয়ে যায় কখনও সখনও।

তা দুখুর মতো পাঁচ পয়সার এলেবেলে ফেকলুপার্টির পক্ষে তো ওসবে হাত বাড়ানো সম্ভব নয়। বলে কিনা দেশিমালেই কোনও না কোনওভাবে আট-দশ টাকা ভোগে চলে যায়। গভীর জলে সাঁতরাবে কেমন করে। অল্প জলেই তার মস্তি।

তা ছাড়া সে হচ্ছে রাতবিরেতের কারবারি। সোজা কথায় সে একজন চোর। চুরি করেই তার পেট চালাতে হয়। সেজন্যে একটু আড়ালে আড়ালে আঁধারে আঁধারে তাকে সিঁটকে থাকতে হয়। ঢাকঢোল পিটিয়ে তার ফুর্তি করা চলে না। কী থেকে কী হয়ে যায় বলা তো যায় না। কেউ কেউ তার দিকে আড়চোখে তাকায় বটে। তা কী আর করা। কারও চোখকে তো আর সে বেঁধে রাখতে পারে না। তা ওই তাকানো পর্যন্তই। আজ পর্যন্ত সে ধরাও পড়েনি, তার কাজকর্মের কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণও নেই। অবশ্য তাই বলে বুক চিতিয়েও চলা যায় না। বলে, সাবধানের মার নেই।

তার নিজের বয়েস ঠিক কত, দুখু জানে না। বুড়ি পিসিকে শুধুলে কোনওদিন বলে তিরিশ, কোনওদিন বলে বেয়াল্লিশ। পিসির হুঁশচেতনা ওই রকমই। তবে দুখুর মনে হয় তার বয়েস চৌতিরিশ-পঁয়তিরিশ হলেও হতে পারে। এও জানে, সে চোর হলেও ঠিক চোরচোর চেহারা নয়। ফরসা না হলেও খুব একটা কালোও নয়। চোখমুখের গড়নও খুব একটা খারাপ নয়। ধুতি-পাঞ্জাবি

পরলে ভদ্দরলোক ভদ্দরলোকই দেখাবে। আর সেই কারণেই লোকের সন্দেহের চোখ থেকে সে বারবার পিছলে যায়।

একান্তে এইসব ভাবছে দুখু, তখনই একটা মোটর সাইকেল এসে থামল মতিলালের দোকানের সামনে। দুখু তাকিয়ে দেখল কেষ্ট মিস্তির বাইক থেকে নেমে সোজা ঢুকে গেল দোকানের মধ্যে। তা কেষ্ট মিস্তিরের মতো এলেমদার লোক এরকম গটমটিয়ে যেখানে সেখানে ঢুকতেই পারে। কী সব ব্যাবসাট্যাবসা করে, দু'হাতে কাঁচা পয়সা উপচে পড়ে। লোকে বলে সবই নাকি দু'নম্বরি পয়সা। অবশ্য আড়ালে বলে। কেষ্ট মিস্তিরের মুখের সামনে দাঁড়ায়, এমন বুকের পাটা এ-অঞ্চলের কারও নেই। হরিণের পালে বাঘ পড়ুক, শখ করে কে-ই-বা চায়। তেত্তিরিশ-চৌতিরিশের টানটান শরীর, পরনে গোলগলা লাল গেঞ্জি আর জিনসের প্যান্ট। কে বলবে, লোকটা রাগলে একেবারে চণ্ডাল। কিছু ইয়ার দোস্ত আছে, তাদের সঙ্গেই ঘোরাফেরা। তবে আজ একাই।

মদের ঠেকে কেষ্ট মিস্তির ঢুকেছে, দুখুর সাহস নেই এসময় সেও ঢোকে। তার কিছু কিছু চড়ুই পাখি মন। সদাই পালাই পালাই ভাব। কে জানে ওকে দেখে কেষ্ট মিস্তির হয়তো ঘেঁটি চেপে ধরে চোখ পাকিয়ে বলবে, এইয়ো, এখানে কী মতলবে, অ্যাঁ? সে বড় অনাসৃষ্টির কাণ্ড হবে। তবে কিনা দুখুর ফিকিরবাজির কোনও খবর না-রাখারই কথা কেষ্ট মিস্তিরের। তবু দুখু সবসময় নিজেকে গুটিয়ে রাখে। ওই যে বলে না, চোরের মন পুলিশ পুলিশ, সেইরকম আর কী। বেখেয়ালে নিজের ছায়া দেখেই আঁতকে ওঠার মতন আর কী। কী দরকার বাহাদুরি দেখিয়ে। কোথা থেকে কী হয়ে যায়, কে বলতে পারে।

তা কেষ্ট মিস্তির তো চার আনা-ছ'আনা লোকের মতো বেঞ্চে বসে দিশি মাল খাবে না, বিলেতি মদের চ্যাপটা বোতল কিনে প্যান্টের পকেটে পুরে সোজা চলে যাবে। কেষ্ট মিস্তির চলে যাবার পরই দুখু না হয় বিচার বিবেচনা করে দেখবে মতিলালের ঠেকে ঢুকবে কিনা।

মনটাকে একটু থিতু করে দুখু পকেট থেকে বিড়ি বের করে মুখে দিল। ধরাবে বলে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছে, তখনই কেষ্ট মিস্তিরের গলা শুনল। ঠেক থেকে বেরোচ্ছে কাকে বলতে বলতে, টাউনে যাচ্ছি। কখন ফিরব বলতে পারছি না। কাল কথা হবে।

দুখুর হাতে ধরা দেশলাইয়ের কাঠির আগুনটা হঠাৎই কেঁপে গেল। বিড়ি ধরানো হল না। রাস্তার ধারে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থেকে কেষ্ট মিস্তিরের মোটরবাইকের চলে যাওয়ার শব্দ শুনল। যেমন কিনা জল-ঝড়ের আগে গাছগাছালি স্থির নিশ্চল হয়ে থাকে, তেমনিভাবে স্থির হয়ে একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কেষ্ট মিস্তির টাউনে যাচ্ছে মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে, এটা একটা খবরের মতো খবর হল বটে। তা কেষ্ট মিস্তিরের মতো ঘ্যামা লোকেরা তো টাউনের শোভা দেখতে যায় না, অন্য কাজ থাকে। মেয়েপাড়ায় যায় মৌজমস্তি করতে। ঘরের বউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে নষ্ট মেয়ের কাছে শরীরের সুখ খোঁজে। উড়িয়ে আসে পাঁচশো হাজার। দু'-দশ মিনিটের ফুর্তি নয়, খোঁয়াড়ি ভাঙতে মাঝরাত পৌঁছে যাবে। এসব বৃত্তান্ত গঞ্জের পাঁচজন লোকের মতো দুখুও জানে। ওই তো কখন ফিরবে নিজেই বলতে পারল না। দশ-বারো মাইল রাস্তা কিছু নয় কেষ্ট মিস্তিরের কাছে। মোটরবাইকেই তুফান মেল ছোটায়। টাকার ওমে শরীর ফিট।

তা যাক। কেষ্ট মিস্তির বেবুশ্যে মেয়েমানুষের কাছে যাক আর হরিকীর্তনই শুনতে যাক, তাতে দুখুর কিছু যায় আসে না। কথা হচ্ছে কেষ্ট মিস্তির অনেক রাত পর্যন্ত বাড়িতে থাকছে না। একরকম বাড়িটা পুরুষহীন থাকছে ততক্ষণ। দুখু এ-অঞ্চলে চরেবরে খায়। সবরকম সুলুক সন্ধান তার রাখতে হয়। কেষ্ট মিস্তিরের বাড়ির হালহদিশও তার অজানা নয়। অঞ্চলের একটেরেতে নতুন বাড়ি করেছে। বাড়িতে ছেলেমানুষ বউ। বউটা নাকি বাঁজা। একাই বাড়িতে থাকবে। কাজের মেয়ে কেউ থাকলেও থাকতে পারে। তাতে দুখুর কোনও অসুবিধে নেই। মেয়েছেলে একা হোক আর দোকা হোক, মেয়েছেলেই। রাতের বেলায় ঘরের মধ্যে ভিন্ পুরুষ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছো যাবে। কেষ্ট মিস্তিরের কাঁচা এবং কালো পয়সার পাহাড়। সেগুলো সব বাড়িতে থাকে নিশ্চয়ই। ওর বাড়িতে

ঢুকে মোটা দাঁও মারার এই মওকা। অন্ধকারে দুখুর লোভী চোখদুটো ধূর্ত শেয়ালের মতো জ্বলজ্বল করে উঠল। তবে কথা হচ্ছে, লোকটা হল গিয়ে কেষ্ট মিত্তির। অতীব ভয়ংকর লোক। রেগে গেলে সোঁদরবনের মানুষখেকো। ধরা পড়লে দুখুর হাড়মাস জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে। কিন্তু কীই আর করা। অতশত ভাবলে কি দুখুর চলে? তার কামকারবারই তো বলতে গেলে মস্ত ঝুঁকির। বেরিয়ে এলে তো এলেই, আটকে গেলেই চিত্তির। ত্রিভুবন অন্ধকার। তা ওই ঝুঁকিটুকু নিতেই হবে। জলে নামব আর চুল ভেজাব না, তা তো হয় না। কৌশল আর সাহসের ওপর নির্ভর করেই নিজের সুব্যবস্থার বন্দোবস্ত করতে হয় দুখুর।

মনে মনে ছকটা কাটা হলে সে-জায়গা থেকে দ্রুত সরে পড়ল দুখু। কেষ্ট মিত্তির যখন মতিলালের ঠেকে ঢোকে, তখন সে এখানে দাঁড়িয়ে ছিল, এটা কাউকে জানতে দিতে চায় না। অন্য কোনও ঠেকেও গলা ভেজাতে ঢুকল না। এসময় বোধবুদ্ধি সব তাজা আর টনটনে রাখতে হয়। নেশা করলে বুদ্ধির ধার কমে যায়। সব গোলে হরিবোল হয়ে যাবে। খুবই সতর্ক হয়ে চোখ-কান সজাগ রেখে তার ইধার কা মাল উধার করতে হয়। একটু ভুল হলেই সব কেঁচে যাবে। ব্যস, দেখতে হবে না। মানুষজন রে-রে করে তেড়ে এসে চোখে সরষের ফুল দেখিয়ে ছাড়বে। তা ছাড়া পুলিশের গোবেড়েন তো আছেই।

দুখুর এখন একমাত্র কাজই হল সোজা বাড়ি গিযে গুম মেরে বসে থাকা। তারপর রাত একটু গড়ালেই নিজেকে তৈরি করে নিযে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে কেষ্ট মিত্তিরের বাড়ির চৌহদ্দিতে পৌঁছে যাওয়া। পরনে থাকবে কালো প্যান্ট আর কালো গেঞ্জি। পকেটে একটা পেনসিল টর্চ আর কোমরে একটা ধারালো ছুরি। ছুরিটা মনে বাড়তি সাহস জোগায়। বিপাকে পড়লে আত্মরক্ষাব অস্ত্রও বটে। সেরকম পরিস্থিতিতে অবশ্য কোনওদিন পড়েনি সে। তবু কখন কী হয়ে যায়, বলা তো যায় না।

দুখু চারপাশ দেখে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়াল। বাড়ি বলতে বাঁশবাগানের পাশে পড়ো পড়ো দেড়খানা মাথা গোঁজার ঠাঁই। অ্যাজবেস্টরের চাল, বাঁশবাখারির দেয়াল, মাটির মেঝে। বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে তিনকেলে এক বুড়ি পিসি। কানেও তেমন শোনে না , চোখেও তেমন দেখে না। ওই পিসিই যা হোক দু'মুঠো চালে-আলুতে ফুটিযে দেয়। দুখু কী করে, রাতের অন্ধকারে কোথায় যায়, কোনও খোঁজও রাখে না। রাতে পিদিম জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর দরজা খোলা রেখেই ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঘরে অন্য একটা চৌকি আছে, তাতে দুখু শোয়। আগে যেমন-তেমন একটা বউও ছিল। কিন্তু দুখুর ভাবগতিক দেখে বিয়ের তিন মাস যেতে না যেতেই সেই যে পালাল, তারপর আর এমুখো হয়নি। দুখুও আর যায়নি বউকে ফিরিয়ে আনতে। বউ ফিরবে না জানত। শ্বশুরটা গাঁট্টাগোট্টা চোয়াড়ে ধরনের লোক। কাছে পেলে মেরে তক্তা বানিয়ে দিত।

যাক্ গে। ওসব নিয়ে দুখু ভাবাভাবি করে না। এখন ওর সামনে একমাত্র চিন্তা কীভাবে কেষ্ট মিত্তিরের বাড়ির মালকড়ি হাতিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা যায়। বাড়িটা ওই বিডিও অফিস ছাড়িয়ে যেখানে নতুন লোকালয় গডে উঠছে, সেখানে। এখনও সবটা গড়ে ওঠেনি, বিস্তর জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। কেষ্ট মিত্তিরের বাড়ির আশেপাশে নতুন বাড়িঘর উঠছে ঠিকই, কিন্তু এখনও লোকজন তেমন আসেনি। দুখুর খুব একটা বাধা টপকাতে হবে না। আর একটু-আধটু বাধা থাকলেই বা কী! কেউ তো সোনাদানা টাকাপয়সা সাজিয়ে দরজা খুলে রেখে বলবে না, এই যে দুখুবাবু, আসুন আসুন। আসতে আজ্ঞা হয়। সব আছে। যা নেবেন, নিয়ে যান।

দুখু গুটিগুটি পায়ে বাণিজ্যের সন্ধানে রওনা দিল।

২

গঞ্জের উত্তর দিকে কেষ্ট মিত্তিরের নতুন বাড়ি তৈরি এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। দুটো-তিনটে ঘর মোটামুটি সম্পূর্ণ হলেও অনেক কাজ এখনও বাকি আছে। একটা ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বোঝা গেল ওটা কেষ্ট মিত্তির আর তার বউয়ের থাকা-শোয়ার ঘর। অন্য দুটো ঘরের দরজা বাইরে থেকে শেকল টেনে বন্ধ। এ-দুটো ঘরের দিকে দুখু তাকাল না। তার নজর ভেতর থেকে বন্ধ ঘরটার দিকে। ঘরের তিনটে জানলার দুটো বন্ধ হলেও একটার পাল্লা হাট করে খোলা। দুখু বুঝল মন্দভাগ্য আজ তাকে ফেরাবে না। ওই খোলা জানলার পথ দিয়েই তাকে মধ্যরাতের বাণিজ্য করতে হবে। লোহার শিক বেঁকিয়ে সে দিব্যি নিজেকে ঘরের মধ্যে গলিয়ে নিতে পারবে। প্রথমে সে চারপাশের হাওয়াটা বুঝে নিতে চাইল, তারপর আকাশের দিকে তাকাল। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। কখন মেঘ এল, কখনই বা সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেল, সে টেরও পায়নি। সন্ধেব পব যে-হাওযাটা দিযেছিল সেটা এখন নেই। থম মেরে আছে সবকিছু। বছরের এ-সময়টা যেমন হয, কালো মেঘ যে-কোনও সময় ওতপাতা জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে জলঝড হযে।

ঘরের জানলাটা খুলে রাখা হয়েছে কেন, তারও একটা কারণ মনে মনে তৈরি করে নিল দুখু। ভযডব পাবাব লোক নয কেষ্ট মিত্তির। গরমের রাত বলেই ঘরের সবক'টা জানলা খুলে রাখে হযতো। জানে বাঘের ঘবে ঘোগ আসবে না। আজ কেষ্ট মিত্তির শহরে গেছে, বউটা বাড়িতে একা। তাই হযতো সবক'টা জানলা না খুলে রেখে একটাই খুলে বেখেছে।

দুখু একটা গাছের আডালে চুপচাপ দাঁড়িযে থেকে আবেকবার চারপাশ বুঝে নিল। গঞ্জের এ-দিকটাতে নতুন করে বসতি অঞ্চল গডে উঠছে। সবে শুরু। এখনও বাডিঘর তেমন ওঠেনি। কযেকটা আধা-তৈবি বাডি, কযেকটা শেষ হবার মুখে। একটু দূরে মাঠের ধারে স্থানীয নিম্নবিত্ত মানুষেব কিছু ঘরবাড়ি। চারধারে তাকিয়ে খটকা লাগার মতো কিছু চোখে পড়ল না। রাত এখন খুব বেশি হযনি, কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে বাতদুপুর। নিঝুম ঘুমে ঘুমিয়ে আছে গোটা অঞ্চল। তবু বেশি কেরামতি দেখানোব কোনও মানে হয না। বাড়িটা অন্য কারও নয়, কেষ্ট মিত্তিরের।

খোলা জানলাটার সামনে খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এসে দুখু ভেতরে উঁকি মারল। ভেতরটা অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবু মশারি টাঙানো বিছানাটা আবছা আভাসে দেখতে পেল। সে জানে কেষ্ট মিত্তিরের বউয়ের বয়েস বেশি নয। মনে হয বউটা অঘোবে ঘুমিয়ে রয়েছে। ঘরে অন্য কোনও বিছানা আছে বলে মনে হচ্ছে না। মনে হয বউটা একাই ঘুমোচ্ছে। ঘরের সিলিঙে একটা পাখা চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাখার হাওয়ায বউটা আবামে ঘুমোচ্ছে।

জানলার পাশে আবও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দুখু। শেষবারের মতো বুঝে নিতে চাইল পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিজের অনুকূলে কিনা। এসব কাজ একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে খুব সাবধানে করতে হয়। চালে একটু ভুল হলেই বিশবাঁও ঘোলা জলের তলায় তলিয়ে যেতে হবে।

একটু সময় অপেক্ষা করে দুখু জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। কী ভাগ্যিস জানলায় শক্ত গ্রিল দেওয়া নেই, লোহার শিক দেওয়া আছে। হাত দিয়ে দেখে বুঝল শিকগুলো খুব মজবুত নয়। জোরে চাপ দিলেই বেঁকে যাবে। এলেবেলে চোরছ্যাঁচোড় লোক হলে কী হবে, বরাবরই দুখুর স্বাস্থ্য ভাল, গায়ে ভাল শক্তি রাখে। সে প্রাণপণ শক্তিতে হাত দিয়ে চাপ দিতেই একটু পরে পাশাপাশি দুটো শিক অনেকখানি বেঁকিয়ে ফেলল। যে-ফাঁকটুকু হল, তার মধ্যে দিয়ে নিজেকে ভেতরে ঢোকানো যাবে। দুখু দেরি করল না। খুব কৌশলে ওই ফাঁক দিয়ে শরীরটা গলিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ভেবে নিল কীভাবে কী করবে। হাত দিয়ে দেখে নিল কোমরে গোঁজা ছুরিটা ঠিক আছে কিনা।

আর তখনই টর্চের জোরালো আলো আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার মুখে। হাত দিয়ে চোখটা আড়াল করতেই নারীকণ্ঠ শুনল।

উঁহু, নড়বে না। যেমনি দাঁড়িয়ে আছ, তেমনি থাকো। আমার ডান হাতে গুলি-ভরতি রিভলভার রয়েছে। পালাবার চেষ্টা করলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে দেব। আর আমার হাতও খুব সিধে চলে।

দুখু বুঝল কেষ্ট মিস্তিরের বউ বেশ আগে থেকেই টের পেয়ে রিভলভার আর টর্চ হাতে নিয়ে জানলার পাশে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অস্ত্রটা নিশ্চয়ই কেষ্ট মিস্তিরের। ওটা সঙ্গে নিয়েই ওর বউ বিছানায় শুয়েছিল। দুখু বুঝল কপাল ফেরে ঘোর বিপাকে পড়ে গেছে সে। ব্যাটাছেলে হোক আর মেয়েছেলে হোক, রিভলভারের গুলির হেরফের হবে না। একইরকম চলবে। হতবুদ্ধি হয়ে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। টর্চের আলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওঠানামা করে দুখুকে দেখে নিল কেষ্ট মিস্তিরের বউ। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, আবার বলছি, একটুও নড়বে না। বেঁচে থাকার ইচ্ছে থাকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি আলো জ্বালি।

সে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল।

সেই আলোতে কেষ্ট মিস্তিরের বউকে দেখল দুখু। দেখেই তার চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল। তার সামনে রিভলভার হাতে হুরিপরি দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক হিন্দি সিনেমার ছুকরি মেয়েদের মতো। ধবধবে গায়ের রং, একমাথা চুল, সমস্ত শরীরে থইথই করছে নেশা-ধরানো যৌবন। বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি হবে না। কিন্তু এসব নয়। আসলে দুখুর নিশ্বাস থামিয়ে দিল যা, তা হল বউটির পরনে শুধুমাত্র রাতের বিছানার পোশাক। শাড়ি নেই, শুধু সায়া। আর তার উদ্ধত বুকদুটো ধরে আছে শুধুমাত্র একফালি অন্তর্বাস। সারাঅঙ্গে দাউদাউ করে জ্বলছে কামনার আগুন। দুখুর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বেসামাল লাগে নিজেকে। বড়ই তুচ্ছ, দীনহীন জীবন তার। এ কী বিশাল বৈভব তার সামনে দাঁড়িয়ে।

বউটি দুখুর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসল।

ঘরে ঢুকেছ কেন? চুরি করতে?

দুখু কী বলবে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

বউটি আবার বলল, টর্চের আলোয় যা দেখলাম তাতে তো তোমাকে চোরের মতন দেখতে লাগছে না। দিব্যি ভালমানুষের মতো দেখতে। সেইজন্যেই গুলি চালালাম না। তোমাকে দেখে খুব খারাপ লাগছে না।

দুখু চুপ করে থাকে। ছলনাময়ী নারীর লীলারহস্য সে বোঝে না।

কী হল? একদম বোবা মেরে রইলে কেন? বললে না ঘরে ঢুকেছ কেন?

দুখুর অবাক লাগে। বউটির গলায় শাসানি নেই, বরং আশকারা রয়েছে। যেন কতদিনের আলাপ পরিচয় তার সঙ্গে।

দুখুর জিব অসাড় হয়ে গেছে। নিজের বুকের ওঠানামার ধড়াস ধড়াস শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। সেটা কেন হচ্ছে সে নিজেই বুঝতে পারছিল না। বউটির হাতে ধরা ওই ছোট্ট আগ্নেয়াস্ত্রটার জন্যে, নাকি ওর স্বল্পবাস মেয়েমানুষের শরীরের জন্যে! কী আশ্চর্য, রাত্রি অন্ধকারে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পড়া একজন মন্দলোককে সম্পূর্ণ একা থাকা ভরন্ত বয়সের মেয়েটি একটুও ভয় পাচ্ছে না, খোলামেলা যুবতী শরীরকে একটুও আড়াল করছে না। তবে কি ওর চোখে মুখের ছলাকলা, অথচ হাতে ধরা আত্মরক্ষার অস্ত্র, এই দ্বিচারণই দুখুকে অবাক অচল করে দেবার কারণ? ওর ওই প্রায়-বিবস্ত্র শরীর দেখিয়ে কি ইচ্ছাকৃতভাবে দুখুকে লোভী করে তুলছে? তার পুরুষালি জাগিয়ে দিচ্ছে?

বউটি দুখুর অবস্থা দেখে চোখের কোণ দিয়ে তাকাল। হেসে বলল, তুমি দেখি ভীষণ ঘাবড়ে গেছ। জল খাবে?

হতবুদ্ধি দুখু এবার মাথা নাড়ল। গলা শুকিয়ে গেছে। একটু জল খেলে কিছুটা ভাল লাগত।

খাব।

খাবে? খাবে তো বুঝতেই পারছি। এসো আমার সঙ্গে। আবার বলছি পালানোর চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে দেব। কী, সেরকম কোনও মতলব নেই তো?

দুখু মাথা নাড়ল। না না, কোনও মতলব নেই।

আমার কথা শুনে চললে তোমার কিন্তু ভালই হবে। এসো।

সম্মোহিতের মতো দুখু পিছুপিছু গেল। বিছানার কাছে এসে বউটি বলল, এখানে বসো।

তখন তখনই দুখু বিছানায় বসল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বউটি ঘরের এক কোণে রাখা কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে এসে বলল, কী হল, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসতে বললাম না? বসো।

দুখু বসল। জলের গেলাস হাতে নিয়ে ঢকঢক করে এক চুমুকে সবটা শেষ করে ফেলল।

বউটি বলল, কীরকম পুরুষমানুষ তুমি? এরকম গুটিয়ে থাকো কেন?

জল খেয়ে এতক্ষণে দুখুর স্বস্তি এসেছে। সে বউটির দিকে তাকাল। মনের চিন্তাভাবনার চারপাশে জমে থাকা কুয়াশা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে তার। সে বুঝতে পারল অন্যরকম এক খেলায় তাকে টেনে এনেছে কেষ্ট মিত্তিরের মরিয়া বউ। তবে কি এই পাগলপারা রূপ এই ভরা যৌবন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে কেষ্ট মিত্তির? তাই কি মতিলালের দোকান থেকে মদ কিনে শহরের বেপাড়ায় যায় মস্তি করতে? ঘরের মানুষের চেয়ে বেঘরের মানুষের টান অনেক বেশি সেইজন্যে? আর স্বামীর কাছ থেকে কিছু পায় না বলেই এমনি করে বাঘিনি রক্তের স্বাদ মেটাতে চাইছে? কোনও ভুল নেই, কেষ্ট মিত্তিরের অবহেলা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ঘরের বউকে এমনি বেপরোয়া করে দিয়েছে।

দুখু বিছানায় বসে আছে, বউটি তার পাশে এসে প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে বসে বলল, এই, কী নাম গো তোমার? মিথ্যে বলবে না কিন্তু।

বউটি এত কাছে বসেছে যে দুখু তার মেয়েলি শরীরের গন্ধ পাচ্ছিল। শুনতে পাচ্ছিল তার ঘনঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। দুখুর শরীর ঘেমে উঠল। হাত বাড়ালেই জীবনের সবচেয়ে আনন্দ সে পেয়ে যাবে।

কই গো, বললে না তোমার নাম? হাত দিয়ে দুখুর কাঁধ ছুঁল বউটি। অকারণে শব্দ করে হাসল।

দুখু। কোনওমতে নিজের নাম বলল সে।

দুখু? এ কেমন নাম গো তোমার। দুখু! বউটি হেসে গড়িয়ে পড়ে দুখুর গায়ে। হাসি পাবার মতো তেমন কিছু নাম নয়, তবু সেই নামের জন্যে অন্তরঙ্গ হবার অছিলা পেয়ে গেল যেন। বলল, কেমন দুখী দুখী নাম। ধুত, জমে না! এবার তুমি দুখু নও, সুখু। বুঝলে? আমার নাম শুধুলে না? যার কাছে এলে, তার নাম জানবে না?

কী, কী নাম তোমার? দুখু বুঝতে পারল সে জিবে সাড় পাচ্ছে।

আমার নাম? আমার নাম তিস্তা। শীতের মরা তিস্তা নয় গো, বর্ষার ভরা তিস্তা। বউটি আরও কাছে ঘেঁষতে ঘেঁষতে বলল, ভরা তিস্তার জলে ডুবতে ইচ্ছে করে না তোমার?

হঠাৎ কড়কড় করে ডেকে উঠল আকাশ। সেই শব্দে ভয় পাওয়ার বাহানায় বউটি জড়িয়ে ধরল দুখুকে।

এবার কিন্তু দুখু কেঁপে উঠল না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে মনে মনে নিজের প্রতিদিনের জীবনযাপনের পৃথিবীটা থেকে চক্রাকারে ঘুরে এল। চৈত্র-বৈশাখের শূন্য মাঠের মতো ধূসর, সঙ্গীহীন, একঘেয়ে। রাতের অন্ধকারে নিশাচর পশুর মতো এবাড়ি-ওবাড়ি করা ছাড়া তার আছেটা কী! কোনওমতে শুধু পেট ভরানো। ব্যস, তার সম্বন্ধে সব কথা শেষ। আজ বুঝল তার একটা শরীর আছে। সেই শরীরে খিদে আছে, জোয়ানমানুষের কামনা বাসনা আছে। সেও তো কিছু পায়নি। কবে কোনকালে একটা বউ ছিল, তাকে ভাল করে চেনার আগেই পালিয়ে গেছে। সেই থেকে সেও তো একা। ভয়ংকর একা। আজ বুঝল সে এতকাল নিজেকেই ঠকিয়ে এসেছে। চুরি

করে সে দু'মুঠো মুখে দেয়, শরীরকে দেওয়া হয় না কিছু। ধুস, এটাকে কি মানুষের মতো বেঁচে থাকা বলে! এই মুহূর্তে সে স্পর্শ পাচ্ছে একটি নিটোল মেয়েশরীরের। রূপসাগরে ডুব দেবার লোভ হাতছানি দিচ্ছে। নিজেকে স্থির রাখে এমন সাধ্য তার নেই। সে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে গিয়েও থেমে গেল।

বউটি বলল, কী হল? ইচ্ছে নেই?

দুখু বলল, না, তা নয়।

তবে? ভয় পাচ্ছ?

তা একটু পাচ্ছি। যদি ধরা পড়ে যাই?

কে ধরবে? আর কার কাছে ধরা পড়বে, ধরা তো তুমি আমার কাছেই পড়েছ। তবে ভয় পাচ্ছ কেন?

যদি কেষ্ট মিস্তিরের কাছে ধরা পড়ে যাই?

ধুত, ধরা পড়বে কেন?

যদি পড়ি? কেষ্ট মিস্তির তা হলে তো আমাকে শেষ করে দেবে।

সে তো শুধু তোমাকে নয়, আমাকেও। দুর, অত ভাবলে কি চলে। ওই বারমুখো স্বার্থপর মানুষটাকে ভয় পেয়ে নিজেকে শুকনো রাখি কেন। বলতে বলতে বউটি দুখুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ফালতু কথা ছাড়ো তো। আজ রাতে তুমি যে আমার নাগর গো। ধরো না তোমার মতো আমিও চোর। সুখের ঘরে চুরি করছি। বলে খিলখিল করে হেসে সে দুখুর গায়ে গলে গলে পড়ল। দুখুর পৃথিবী দুলে উঠল। সে জড়িয়ে ধরল কেষ্ট মিস্তিরের বউকে।

বউটি দুখুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আলোটা নিভিয়ে আসি।

তখনই বাইরে অস্থির হাওয়া উঠল। ঝরঝরিয়ে আকাশ ভেঙে পড়ল অন্ধকার রাতের নির্জন চরাচরে।

৩

রাত গভীর হতে হতে একসময় টুপ করে ডুবে গেল অথই অন্ধকারে। বিছানা থেকে নেমে এল দুখু। চটপট নিজের পোশাক ঠিক করে নিল। দেখে নিল ছোট টর্চ আর ছুরিটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা। দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছিল তার কানে। উৎকর্ণ হয়ে সে শব্দটা শুনল। হ্যাঁ, এবার পরিষ্কার বোঝা গেল শব্দটা একটা মোটরবাইকের এগিয়ে আসার। তবে কি ওটা কেষ্ট মিস্তিরের মোটরবাইকের শব্দ? শহর থেকে ফিরে আসছে সে? রাত কত হল? বাইরে জল বাতাসের কোনও শব্দ নেই। এ-সময় তো কেষ্ট মিস্তির ফিরে আসতেই পারে।

ভয়ার্ত গলায় সে বলল, একটা শব্দ শুনছি। শব্দটা মোটরবাইকের?

শব্দটা বউটিকেও উঠিয়ে দিয়েছে। বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বেশবাস ঠিক করে নিতে নিতে গম্ভীর গলায় বলল, হ্যাঁ।

গলার স্বরটা অন্যরকম ঠেকল। দুখু সামান্য সময় চুপ করে থেকে জানতে চাইল, কেষ্ট মিস্তিরের মোটরবাইকের?

হ্যাঁ হ্যাঁ। ও আসছে। ওই শব্দ আমি চিনি। মোড় ঘুরে দু'মিনিটের মধ্যে বাড়ির রাস্তায় চলে আসবে।

দুখু সভয়ে বলল, এখন আমি কী করব?

বউটি নিস্পৃহ গলায় বলল, এখন তুমি পালাবে। পালাও।

দিশেহারা দুখু বলল, কিন্তু কোথায় পালাব? রাস্তা দিয়ে কেষ্ট মিস্তির আসছে—

সাপিনির মতো ফণা তুলে হিসহিস করে বউটি বলল, সে আমি কিছু জানি না। কিন্তু তুমি এক্ষুনি না পালালে আমি চোর চোর, ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার করব। গুলি চালাব। পালাও পালাও।

বউটি বিছানার পাশে রাখা রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়েছে। ওর গলার স্বর শুনে বোঝা যায় যা বলছে, তাই করবে। দুখু ভয়ে সিটকে গেল। এতক্ষণ যে-মেয়ে তার শয্যাসঙ্গিনী ছিল, এ-মেয়ে সেই মেয়েই নয়। সম্পূর্ণ উলটোদিকে ঘুরে গেছে মায়াবিনী। কোনও ভুল নেই এই মুহূর্তে দুখু মহাবিপদে পড়ে গেছে। বউটির মর্জির খেলা শেষ। আর এক মুহূর্ত দুখু এ-ঘরে থাকলে সে পাড়া জাগিয়ে চিৎকার চ্যাচামেচি শুরু করে দেবে। চাই কী হাতের রিভলভারটাও চালিয়ে দেবে।

বিভ্রান্ত দুখুর গলার স্বর কেঁপে গেল, এত অন্ধকার! দরজা, দরজাটা কোথায়?

দরজা বন্ধ আছে। বন্ধই থাকবে।

তা হলে কোথা দিয়ে পালাব?

ন্যাকা। সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে নাকি। বউটি কঠিন গলায় বলল, তুমি তো একটা ছিঁচকে চোর। চুরি করতে জানো, আর পালাতে জানো না। শোনো, এক সেকেন্ড তোমাকে টাইম দিচ্ছি। যেখান দিয়ে এসেছ, ওই জানলার শিক বেঁকিয়ে, সেখান দিয়ে পালাও। যাও যাও, পালাও, হঠো এ-ঘর থেকে। এখনই আমি চোর চোর বলে চ্যাচাব। জানলার শিক বাঁকা কেন তার একটা কারণ দেখাতে হবে না। দরজা খোলা থাকলে বাইরের আলোয় দেখা যাবে। দরজা খুলব না।

ভয়ার্ত গলায় দুখু বলে, যদি ধরা পড়ে যাই?

বউটি অস্থির গলায় বলল, সে তোমার ব্যাপার, আমি কী জানি। ধরা পড়লে পড়বে। চোর তো ধরাই পড়ে।

মোটরবাইক সম্ভবত মোড় ঘুরে বাড়ির সোজা রাস্তায় চলে এসেছে। ঘরের বাইরে হেডলাইটের আলোর আভাস। শব্দ আরও কাছে চলে এসেছে। জবরদস্ত লোক কেষ্ট মিত্তির বাড়ির খুব কাছে এখন।

দুখু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, এখন আমার কী হবে। যদি জানলার শিকের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরোতে না পারি।

বউটি কঠিন গলায় বলল, এখন, এখনই ঘর থেকে না পালালে— আমি তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে না গেলে গুলি চালাব। এক-দুই...

তিন বলার আগেই দুখু ছিটকে গেল। ছুটে গেল জানলার কাছে। প্রাণপণ চেষ্টা করে জানলার বাঁকানো শিকদুটোর মধ্যে দিয়ে গলিয়ে নিল নিজেকে। লাফ দিয়ে মাটিতে নেমেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটল বাড়ির পেছনের ফাঁকা মাঠের দিকে। বাড়ির সামনের রাস্তায় মোটরবাইকের আলো দেখা যাচ্ছে। কানে এল কেষ্ট মিত্তিরের বউয়ের চিৎকার, চোর! চোর! সেই চিৎকার জাগিয়ে দিয়েছে ঘুমন্ত জনপদকে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে। দুখু ছুটছে। ছুটছে। অন্ধকার, আরও অন্ধকারের দিকে। দু'-তিনটে বেওয়ারিশ কুকুর ডাকতে ডাকতে দুখুর পেছনে ছুটে আসছে। কুকুরও ছুটছে, দুখুও ছুটছে।

মেঘবতী

আমি অংশুমান। অংশুমান রায়চৌধুরী। বয়েস আঠাশ। স্বাস্থ্য ভাল। হাইট পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। গায়ের রং ওই যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যাম। অপরিচিতারা তক্ষুনি তক্ষুনি আমার মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় না। কাজেই দেখতে শুনতে নিতান্তই বাতিল করে দেবার মতো নই । ভবানীপুরের যে-দোতলা বাড়িতে থাকি, পিতার অবর্তমানে সে-বাড়ির মালিক হব আমি। একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আমিই এখন একমেবাদ্বিতীয়ম। বাড়িতে শুধু মা আর বাবা। সরকারি চাকরি করি। সবদিক থেকে আমি একেবারে মুক্তপুরুষ। পাত্র চাইয়ের বাজারে দেড় কেজি সাইজের গঙ্গার রুপোলি ইলিশ। পঃবঃ, ২৮/৫´৭´´, সুঃউঃ , রাঃসঃচাঃ, দঃকঃ নিজ বাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু টুপিতে এতগুলো পালক থাকা সত্ত্বেও মেঘবতী এখনও আমার অধরা থেকে গেছে। আমার আর মেঘবতীর মাঝখানে লাইন অব কন্ট্রোলের কাঁটাতারের বেড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুধাময়। আমরা একই অফিসের একই সেকশনে কাজ করি। মেঘবতী টাইপিস্ট, সুধাময় ডেসপ্যাচে, আমি রেফারেন্সে। আরও কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে পাঁচজন মেয়েও আছে । কিন্তু মেঘবতী ওই একজনই। পাতিহাঁসের দঙ্গলে রাজহংসী। এই মেঘবতীকে আমি ভালবাসি। কিন্তু কিছুতেই আমার হৃদয়ের কথা তাকে জানাতে পারি না। এখনও জানি না মেঘবতী আমাকে ভালবাসে কিনা। সে-ধরনের কিছু ইশারা এখনও পাইনি। কাজ করতে করতে ওই দু'-চারটে কেজো কথাবার্তা, এর বেশি কিছু নয়। এই যেমন— অংশুবাবু, এসটাবলিশমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চিঠিগুলো টাইপ হয়ে গেছে। নিয়ে যাবেন। কিংবা অংশুবাবু, আজ হেভি লোড। প্লিজ, এই চিঠিগুলো রেবা কিংবা পামেলাকে দিয়ে টাইপ করিয়ে নেবেন। নিতান্তই আটপৌরে কথা। এর মধ্যে বেনারসি কিংবা মুর্শিদাবাদ সিল্ক খোঁজার কোনও মানে হয় না। তবু আমি মাঝেমাঝে কথাগুলো নাড়াচাড়া করে দেখি ওইসব হলুদ কথার মধ্যে কোনও লুকোনো সবুজ রং আছে কিনা। ওই যাকে বলে অন্তর টিপুনি, সেসব আছে কিনা। বলা বাহুল্য, ব্যর্থমনোরথ হতে হয়। টাইপ করতে করতে মেঘবতী মাঝেমাঝে আমার দিকে তাকায়। ওই তাকানোটা কটাক্ষপাত না নেত্রবাণ বুঝে উঠতে পারি না। একদিন দেখলাম মেঘবতী ওইভাবেই ক্যালেন্ডারে তারিখ দেখছে। আমি অনেকরকমভাবে মেঘবতীকে ডিসেকশন করে দেখেছি। কিন্তু কোনওভাবেই হুররে বলে লাফিয়ে ওঠার মতো কিছু পাইনি। তাই বলে হতাশ হয়ে আমি খেলায় ওয়াকওভার দিয়েছি, তাও কিন্তু নয়। হাবুলদা বলেছে, হাল ছাড়িস না অংশু। চেষ্টা চালিয়ে যা। চেষ্টায় কী না হয়! তেনজিং সাতবারের চেষ্টায় এভারেস্টের মাথায় উঠেছে। আমি নিজে তিনবারের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করেছি। তাই বলছি খামের গায়ে ডাকটিকিটের মতো লেগে থাক। একদিন তুই-ই হবি ম্যান অব দি ম্যাচ।

হাবুলদা হল হাবুল সমাদ্দার। পাড়ার সর্বজনীন দাদা। ওই ঘনাদা টেনিদার মতো উজ্জ্বল চরিত্রের লোক। আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও বটে। বাবার দিক থেকে লতায় পাতায় কী একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। বয়স সত্তর হাঁকিয়েছেন কবেই। তবু তিনি বড়-ছোট সবার কাছেই হাবুলদা। সকাল-সন্ধ্যা বাড়ির রোয়াকে বসে চেনা-অচেনা-হাফচেনা সবাইকে বিনি মাগনায় জ্ঞান দান করেন। মেঘবতীর কথা তাঁকে বলেছি। অবশ্য মেঘবতী না বলে তার পিতৃদত্ত গীতা নামটাই বলেছি। বলে হাবুলদার পরামর্শ চেয়েছি।

আমাকে একদিন বলল, ডাক অংশু, প্রাণ ভরে ডাক। ডাকলেই পেয়ে যাবি।

আমি ইতস্তত করে বলেছিলাম, ডাকব? মেঘবতী, ইয়ে, মানে গীতাকে ডাকব? কিন্তু ডেকে কী বলব? যদি রেগে যায়?

আমার বালসুলভ অবিমৃশ্যকারিতায় দার্শনিকসুলভ হাসি হেসে হাবুলদা বলেছে, ওরে অনার্য, এ-ডাকা সে-ডাকা নয়। এ-ডাকা হল মনে মনে ডাকা। সেরকমভাবে ডাকলে ভগবান পর্যন্ত সাড়া দেয় তো সামান্য নারী। সেরকমভাবে ডেকেছিল বলেই তো ঠাকুর রামকৃষ্ণ মা কালীর দর্শন পেয়েছিল।

অব্যর্থ যুক্তি। আমি আর টাঁ-ফোঁ কবতে পারলাম না। হাবুলদা অনেক জানে। অনেক দেশ-মহাদেশ নাকি তার ঘোরা আছে। তার কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না। আমার সামনে হৃদয়বিদারক সমস্যা। হাবুলদার টিপস একান্ত দরকার।

সে যাক। মেঘবতীর কথা বলি। আর মেঘবতীর কথা বলতে গিয়ে চালের সঙ্গে কাঁকরের মতো এসে যাচ্ছে সুধাময়ের কথা। ওই একটা লোকের জন্যে আমাকে প্রায় দিনই ঘুমের ট্যাবলেট কিনতে হচ্ছে। লোকটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। অথচ মেঘবতী কেমন হেসে হেসে ওর সঙ্গে কথা বলে। কথা বলার সময় কেমন দু'বিনুনি কিশোরী হয়ে যায়। দেখলেই আমার মনে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। আমি বুঝে উঠতে পারি না সুধাময়ের কাছ থেকে মেঘবতী কী পায়! ওই তো কালীপুজোর চাঁদা পার্টির মতো চেহারা। গায়ের রং বেশ ময়লা, চোয়াড়ে চোখমুখ। হ্যা-হ্যা করে হাসে, মোটা দাগের রসিকতা করে। দুয়োঠাকুরের অসুর হলে দিব্যি মানিয়ে যেত। অন্যদিকে চেহারা চালচলনে আমি সেন্ট পারসেন্ট শরিফ আদমি। সুধাময়ের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। শুধু নামের ব্যাপারটাই ধরা যাক না। ও হল সুধাময়। নামটার মধ্যেই কেমন মেয়েমেয়ে আলুনিআলুনি ভাব রয়েছে। সুধাময় মানে চাঁদ। চাঁদ তো একটা সখীসখী উপগ্রহ মাত্র। আর আমি হলাম অংশুমান। কেমন পুরুষালি নাম। হবে না! অংশুমান মানে হল সূর্য। প্রবল পরাক্রান্ত নক্ষত্র। সূর্যের সঙ্গে চাঁদের তুলনা! ফুঃ! আমি মোটেই সুধাময়কে পাত্তা দিই না। তবে ঘাঁটাইও না। মোটা মাথা ছেলে। কখন কী করে বসবে কে জানে! আমি ভদ্র সভ্য ঠান্ডা মাথার ছেলে। বলপ্রয়োগটা আমার ঠিক আসে না। ওসব বর্বর ব্যাপারে আমি নেই। মেঘবতীকে আমার চাই, সুধানয়কে আমার কী দরকার! ও তো মেঘবতীকে দীর্ঘমেয়াদি লিজ নেয়নি।

আগেই বলেছি, অফিসে মেঘবতী বলে কোনও মেয়ে নেই, আছে গীতা বসুমল্লিক। গীতার মেঘবতী নামটা আমার দেওয়া। শেক্সপিয়র সাহেব যাই বলুন না কেন, নামে অনেক কিছু যায়-আসে। রবীন্দ্রনাথের নাম যদি পাঁচু শর্মা হত তা হলে কী বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড হত, ভাবা যায়! যেমন মেঘবতী নামটা। তাকে দেখিয়ে কাউকে যদি বলি এই হল মেঘবতী, তো সে বলবে, হ্যাঁ, ঠিক কথা। এই হল মেঘবতী। এমন মেয়ের নাম মেঘবতী না হয়ে যায় না। তার দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যাবে না তার আজানুলম্বিত কেশরাশি থেকে। যেন বর্ষার গহিন কালো মেঘ তার মাথা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ডানাকাটা পরি না হলেও সে মোটামুটি সুন্দরী। হাসলে মণিমুক্তো না ঝরলেও মুখটা মাধুরী দীক্ষিতের মতো হয়ে যায়। চোখ পটলচেরা না হলেও বেশ টানাটানা। সে যখন টাইপ করে, টাইপের খটখট শব্দ আমার কানে রবিশঙ্করের সেতারের মতো বাজে। তার সবকিছু অন্যের চেয়ে আলাদা। কিন্তু এত সব থাকলেও সেসব তার মেঘবরণ চুলের কাছে কিচ্ছু না। আমার কাছে সে মেঘবতী। প্রেমিকার একটা গোপন নাম দিলে প্রেমকে কেমন নিভৃত বাসরঘরের মতো একান্ত ব্যক্তিগত বলে মনে হয়। সে জানুক আর না-জানুক, আমি জানি, সে মেঘবতী। আমার প্রথম রোমান্স, আমার যৌবনের সাইক্লোন। বাদলদিনের প্রথম কদমফুল।

কিন্তু গোলমাল বাধল অন্য জায়গায়। গভীর প্রেমে আক্রান্ত হয়ে আমি স্রেফ দেবদাস হয়ে গেলাম। মদ খেলাম না ঠিকই, কিন্তু মাতাল হয়ে গেলাম। কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীরাধা যেমন সদাই উদাস হয়ে থাকত, আমিও তেমনই দিওয়ানা হয়ে গেলাম। কাজে মন নেই, সব সময় আকাশপাতাল ভাবি, অধিকাংশ সময় চেয়ারে থাকি না, অফিসের করিডোরে পায়চারি করি। টেবিলে ফাইলের

পর ফাইল জমে ধাপার মাঠের চেহারা নিচ্ছে, সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই। শুধু অফিসে না, বাড়িতেও একই অবস্থা। ভাল করে খাওয়াদাওয়া করি না, মা-বাবার সঙ্গে ভাল করে কথা বলি না, তিন-চার দিনের দাড়ি গালে জমে থাকে। সবসময় মন উচাটন হয়ে থাকে, ঘনঘন নিশ্বাস পড়ে, কান গরম হয়ে যায়। বাড়ির লোকেরা ভাবগতিক দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, অফিসে ফিসফিসানি গুজগুজানি আরম্ভ হয়ে গেল। এমত অবস্থায় একদিন চলে গেলাম হাবুলদার কাছে।

হাবুলদা প্রথমে আমার কথা শুনল, আমার পা থেকে মাথা অবধি ভাল করে জরিপ করে নিল, তারপর বলল, খুব ভাল।

আমি বললাম, ভাল মানে?

হাবুলদা কান চুলকোতে চুলকোতে বলল, ভাল মানে, গুড। মানে, উত্তম। মানে, শুভ। ডিকশনারিতে দেখে নিস। মানে বলতে চাইছি, খুব প্রোগ্রেস করেছিস। মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস পড়া, বুক ধড়ফড় করা, খাবারে অরুচি, এসব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিকদের লক্ষণ। রোমিও-মজনুরও এসব হত। দেবদাসের অবস্থা তো আরও টাইট হয়ে গিয়েছিল।

হাবুলদা এমনভাবে বলল যেন রোমিও-মজনুরা বাস্তব চরিত্র, সে ওদের সামনাসামনি দেখেছে। কিন্তু সে-কথা তো তাকে বলা যায় না। হাজার হোক, সিনিয়ার লোক। ভালমানুষও বটে। এই একজনকে মনের সব কথা বলতে পারি। ধৈর্য ধরে শোনে। পরামর্শ দেয়। ক'জন আর লড়াকু প্রেমিকের মনের বেদনা বোঝে!

হাবুলদার কথায় খুব উৎসাহিত না হলেও নৈরাশ্য ভাবটা কেটে গেল। ভাবলাম মেঘবতীকে একটা প্রেমপত্র দিলে কেমন হয়। প্রেমপত্রই নাকি প্রেমের প্রথম পাঠ। জম্পেশ কোটেশন-টোটেশন দিয়ে একটা বৈপ্লবিক প্রেমপত্র, যা পড়ে মেঘবতী প্রথম বলেই ক্লিন বোল্ড হয়ে যাবে। কিন্তু অনেক ভেবেটেবে সে ইচ্ছেকে বাতিল করে দিতে হল। যদি উলটোটা হয়? বোল্ড না হয়ে যদি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দেয়? যদি সোজাসুজি চার্জ করে? শ্লীলতাহানির দায়ে অভিযুক্ত করে? সে এক মহা আতান্তরের ব্যাপার হবে। অফিসে জানাজানি-কানাকানি শুরু হয়ে যাবে। থাক বাবা, যা আছে তাই থাক। তলার আমই ভাল। গাছে উঠে বাহাদুরি দেখিয়ে কাজ নেই। আমও থাকুক, ছালাও থাকুক।

একদিন অফিসের ছোটসাহেব ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে দেখি সেখানে মেঘবতীও ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটসাহেবের মুখ গম্ভীর।

অংশুমানবাবু, আজকাল দেখছি কাজে আপনার তেমন মন নেই, সব ব্যাপারেই ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। ফাইলপত্র সময়মতো আমার টেবিলে আসছে না। কী ব্যাপার বলুন তো?

ছোটসাহেব খুব কড়া ধাতের মানুষ। কাজকর্মের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। কোনওরকম গাফিলতি একদম সহ্য করতে পারেন না।

আমি আড়চোখে একবার মেঘবতীকে দেখে নিয়ে বললাম, না, মানে—

ছোটসাহেব হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন।

শুনুন অংশুমানবাবু, কোনও লেম এক্সকিউজ আমি শুনতে চাই না। আমার দরকার কাজ, কথা নয়। কতকগুলো জরুরি ফাইল এখনও আমার কাছে আসেনি। ফাইনান্সের চিঠিটা এখনও সইয়ের জন্যে আসেনি। এই তো মিস বসুমল্লিক বললেন চিঠিটা তিনদিন আগেই টাইপ হয়ে গেছে। কী হয়েছে বলুন তো? আগে তো আপনার কাছে কিছু পেন্ডিং থাকত না। এখন তো দেখছি আপনি অফিসের বার্ডেন হয়ে গেছেন। দিস ইজ নট গুড।

বললাম, ইয়ে, মানে, মন— কথাটা বলেই কপ করে গিলে ফেললাম। আসলে তালেগোলে ভেবড়ে গিয়ে বলতে গিয়েছিলাম মন খারাপ। সেটা চেপে তাড়াতাড়ি বললাম, পে— পেট খারাপ।

খুক করে একটা অস্পষ্ট হাসির শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখি মেঘবতী হাত দিয়ে মুখ চেপে আছে।

ছোটসাহেব বললেন, পেট খারাপ? পেট খারাপ তো ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র খান। সুস্থ হয়ে কাজে মন দিন। নেগলিজেন্স অব ডিউটি ভাল নয়। যান, চিঠিগুলো পাঠিয়ে দিন। এ-ব্যাপারে সেকেন্ড টাইম যেন বলতে না হয়।

ঘটনাটা জেট গতিতে ছড়িয়ে গেল অফিসে। জানা গেল ছোটসাহেব মেঘবতীকে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, সে আগ বাড়িয়ে কিছু বলেনি। যা হোক, ব্যাপারটা নিতান্তই হাসাহাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমার গা জ্বালিয়ে সুধাময় ফিচলেমি করে বলল, পেটের অসুখ একটা ক্রনিক ডিজিজ। ডাক্তারের ওষুধে সাময়িকভাবে সারে শুধু। আমার খোঁজে এক ত্রিকালজ্ঞ সাধু আছে। আগরপাড়ায় থাকে। তার দেওয়া তাবিজ ধারণ করলে পেটের অসুখ বাপবাপ বলে পালাবে। মেঘ সরে গিয়ে আবার চাঁদমুখ ভেসে উঠবে।

মধুমিতা বলল, তাবিজ-কবচে কিছু হবে না, আপনি নিয়মিত দু'বেলা থানকুনি পাতার রস খান।

শান্তনু বলল, এক কাজ কর অংশু। যোগাসন শুরু করে দে। সকালে সন্ধেয় প্রাণায়াম কর। এক সপ্তাহে হাতেহাতে রেজাল্ট পেয়ে যাবি।

বুঝলাম সবাই মিলে আমাকে নিয়ে ইয়ারকি করছে। আমার দুরবস্থায় মজা পেয়ে গেছে। যে যা পারছে, উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। রাগে অপমানে লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে গেল। ফৌজি লোক হলে তক্ষুনি এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে দিতাম। বাধ্য হয়ে চুপ করে বসে থেকে সবার পরামর্শ হজম করতে হল।

একসময় মেঘবতী কাছে এসে বলল, অংশুমানবাবু, আপনি না একটা ক্যালাস। ছোটসাহেবের সামনে ওরকম মিউমিউ করছিলেন কেন? রীতিমতো তোতলাচ্ছিলেন।

মেঘবতী কিন্তু সবার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করেনি।

ছুটির আগেই অফিস থেকে চলে এলাম। সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। মেঘবতী আমাকে ক্যালাস বলেছে। হায় রে, প্রেমিকার গলায় বিসমিল্লা খানের সানাই বেজে উঠল না। মনে হল হাত থেকে একরাশ কাঁসার থালাবাসন সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল। আমি ক্যাবলা? আমি ক্যালাস? বেড়ালের মতো মিউমিউ করি? প্রতিজ্ঞা করলাম এর সমুচিত জবাব দিতে হবে। জানিয়ে দিতে হবে আমি বেড়াল, তবে হুলো বেড়াল। কালই অফিসে গিয়ে মেঘবতীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মুখোমুখি বলব, আই লাভ য়্যু। চলো দু'জনে মিলে ম্যাটিনি শো দেখে আসি, তারপর যা হবার তা হবে। এসপার কি উসপার। শুনেছি মেয়েরা নাকি হি-ম্যানদের বেশি পছন্দ করে। স্পাইডারম্যান, অরণ্যদেব, ধর্মেন্দ্র, ফেলুদা, কাকাবাবুরা ওদের প্রিয় চরিত্র। সোজা কথা স্পষ্ট করে বললে খুশি হয়। সারারাত ধরে আমার পরবর্তী অভিযানের ব্লু-প্রিন্ট মনে মনে তৈরি করে নিলাম।

পরের দিন অফিসে গিয়ে মেঘবতীকে দেখলাম না। শুনলাম ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়েছে। একদিন দু'দিন নয়, পাঁচদিন। খবরটা শুনে কিঞ্চিৎ দমে গেলাম। কিছুটা হাওয়া বেরিয়ে গেল ফোলানো বেলুন থেকে। মনে মনে হিসেব করলাম। পাঁচদিন মানে একশো কুড়ি ঘণ্টা। মানে সাত হাজার দুশো মিনিট। এতক্ষণ মেঘবতী দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে। ভাবা যায়।

আনমনে ফাইলের পাতা ওলটাচ্ছি, কাকে যেন বলতে শুনলাম, গীতার টানা পাঁচদিন ছুটি। দ্যাখো গিয়ে বিয়েটিয়ের ব্যাপার কিনা। বিয়েও তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। হয়তো আমাদের না জানিয়েই দুম করে বিয়ে করে বসল। পরে অফিসে এসে সারপ্রাইজ দেবে।

নেহাতই হাসিঠাট্টা করে বলা কথা। সেটা যে কখনই হবে না তা আমিও জানি। তবু কথাটা যেন কাবাবের মধ্যে হাড্ডির মতো মিশে রইল আমার মনে। ওই যে বলে না প্রেমিকের মনে সদাই হারাই হারাই ভয়! এই বুঝি বঁড়শি থেকে মাছ ছুটে গেল। আগে টের পাওয়া যায়নি এমন কত ঘটনাই তো ঘটে যায়। মাথার ওপর স্পুটনিক ভেঙে পড়ে, টাইটানিক জাহাজ ডুবে যায়, শূন্য রানে শচীন তেন্ডুলকরের মিডল স্টাম্প ছিটকে যায়, অফিস টাইমের বাসে বসার জায়গা পাওয়া যায়। অবশ্য জানি, সেরকম কিছুই হবে না। কিন্তু যদি হয়? এই 'যদি' ভয়টাই মনের সঙ্গে ফেভিকলের মতো সেঁটে রইল।

অগত্যা হাবুডুবু খাওয়া উত্তাল সমুদ্রে একমাত্র লাইফ বোট, অগতির গতি হাবুল সমাদ্দার। আমি হাবুলদার কাছে বডি ফেলে দিলাম।

কী হল রে? গরুচোরের মতো চোখমুখ লাগছে কেন?— হাবুলদার সস্নেহ উক্তি।

বললাম, এ-জীবন আমি রাখব না হাবুলদা।

কী করবি?

আমি আত্মহত্যা করব হাবুলদা।

গৌতম বুদ্ধের ভঙ্গিমায় হাত তুলে হাবুলদা বলল, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিতলে। মনকে শান্ত করো। আরে অনার্য, আত্মহত্যা করা এত সোজা নয়। অভিজ্ঞতা না থাকলে আত্মহত্যা করা যায় না। তা ছাড়া আত্মহত্যা করা মহাপাপ। গীতায় বলেছে—

এই রে, এখানেও গীতার কথা! তাড়াতাড়ি করে বললাম, না না, গীতা আমাকে কিছু বলেনি। ছোটসাহেবের কাছে ও কোনও নালিশ করেনি।

খামোস। হাবুলদা আমাকে থামিয়ে দিল, ওরে মূঢ়, এ-গীতা সে-গীতা নয়, এ হল ভগবদ্‌গীতা। মূল ম্যানাসক্রিপ্ট পড়া আছে আমার।

গীতায় কী লেখা আছে অবশ্য বলল না হাবুলদা।

না বলুক। তবু আমি জানি, হাবুলদা অনেক কিছু জানে। সংস্কৃত থেকে হিব্রু। এমনকী চাটগাঁর ভাষা পর্যন্ত। প্রেম থেকে পলিটিক্স, সব ব্যাপারে জ্ঞানের প্রশান্ত মহাসাগর। তর্ক না করে বললাম, মেঘ— মানে, গীতার ভাবগতিক ভাল ঠেকছে না হাবুলদা। ঘুড়ি কেবলই লাট খাচ্ছে, কখন ভোকাট্টা হয়ে যাবে কে জানে! এখন আমার করণীয় কী? একটা লম্বা প্রেমপত্র দেব?

হাবুলদা বলল, প্রেমপত্তর? দূর! ওসব রামায়ণ-মহাভারতের যুগে চলত। এখন মোবাইলের যুগ। এখন ধর তক্তা মার পেরেকের জমানা। টুকটুক করে পাঁচ দিনের টেস্ট নয়, ওয়ান-ডে গেম। হিট আউট অর গেট আউট। তুই চাম্পিয়ান মস্তানের মতো সোজা চলে যা মেয়েটার বাড়ি। গিয়ে বল, পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া। সোজা প্রোপোজ কর। শুনিসনি, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। অবশ্য ভয় পেয়ে যদি কেতরে যাস তো অন্য কথা!

ভয়? মেঘবতীর বাড়িতে যেতে ভয় পাব আমি? উঠে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বললাম, আমার শরীরে বিবেকানন্দ নেতাজি হাবুল সমাদ্দারের রক্ত বইছে, আমি কারে ডরাই!

হাবুলদা প্রসন্ন হয়ে বলল, এই তো চাই। এবার কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশি কা গীত গাতে যা। লেফট রাইট করতে করতে সোজা চলে যা বিপক্ষের শিবিরে। গিয়ে বল, আমি এ-বাড়ির জামাই হতে চাই।

উৎসাহিত হয়ে মেঘবতীর বাড়িতে যাওয়াই ঠিক করলাম। অফিস থেকে বাড়ির নম্বর, কোন রাস্তা, জেনে নিলাম। জায়গাটা একটু দূর বটে। তা আমার সবকিছুই দূরে দূরে। অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস। শুধু নিজের বাড়িটাই যা কাছে। যেতে হবে উত্তর কলকাতার সেই শ্যামবাজার। পুরনো কলকাতার ঘিঞ্জি গলি, বয়সের ভারে জরাগ্রস্ত বাড়ি, ধুতি পরা টিপিক্যাল বঙ্গসন্তান— মনে হতেই দমে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শ্যামবাজার নামটাই আমার বুকে শ্যামের বাঁশি বাজিয়ে দিল। আহা, সেখানে কদমতলিতে শ্রীরাধা অপেক্ষা করে আছে। শ্যামবাজারে কি একটাও কদমগাছ নেই?

শনিবার দুগ্গাদুগ্গা বলে রওনা দিলাম। বাসে বেজায় ভিড়। এখন অফিসটাইম আর ছুটির টাইম বলে কোনও আলাদা সময় নেই। সবসময়ই অফিসটাইম। মধ্যদুপুরেই বাসে গাদাগুচ্ছের মানুষের ভিড়। বাসে উঠে কোনওমতে একটু ফাঁক পেয়ে রড ধরে স্যান্ডউইচ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে পা চুলকোতে গিয়ে টের পেলাম আমি আমার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। ঠিক সামনের লোকটি বলছে, ও মশাই, খামোকা আমার পা চুলকে দিচ্ছেন কেন? আমার পা মোটেই চুলকোচ্ছে না।

বললাম, সরি।

ভুল বুঝে পা সরিয়ে নিলাম। একটু পরে সেই লোকটিই আবার বলল, একী মশাই, আমার পা মাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন!

আবার বললাম, সরি।

এবার লোকটা মহা খাপ্পা হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল, তখন থেকে কেবল সরি সরি করছেন, সরছেন কই?

কে যেন বলল, গোলমাল হচ্ছে কেন! এখানে বিধানসভার অধিবেশন চলছে নাকি?

শেষপর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছোলাম হিরোসিমা নাগাসাকি হয়ে। বেরিয়েছিলাম ফিটফাট ধোপদুরস্ত হয়ে, পৌঁছোলাম গণধোলাই খাওয়া পকেটমারের মতো। জামার বোতাম ছিঁড়ে গেছে, ফুলপ্যান্ট পাজামা হয়ে গেছে, চুল ধানগাছের মতো সোজা দাঁড়িয়ে আছে । গলির মুখে একটা পানের দোকানের আয়নায় নিজের মুখ দেখলাম। ভোটারের আইডেন্টিটি কার্ডের ফোটোর মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। নিজের মুখ দেখলাম না। এই অবস্থায় মেঘবতীর বাড়িতে যাব? যদি চোর-ছ্যাঁচোড় বলে হাঁকিয়ে দেয়?

হাত দিয়ে চুলটা কিছুটা ঠিকঠাক করে নিয়ে প্যান্ট জামা টেনেটুনে কিছুটা ভদ্রস্থ করে নিলাম। এত ঝামেলা সহ্য করে এত দূর যখন এসেছি, তখন ফিরে যাব না। তা ছাড়া আমার এই অবস্থার ইতিবাচক দিকও তো থাকতে পারে। আমাকে খলনায়ককে ঝাড় দেওয়া শাহরুখ খানও ভাবতে পারে।

একটু এগিয়ে গিয়েই থেমে গেলাম। রাস্তায় একটাও লোক নেই কেন! রাস্তাটা দিনের বেলাতেই মধ্যরাতের মতো থমথম করছে । দু'পাশের সব বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ। মানুষ তো নয়ই, একটা কুকুর-বেড়ালকেও দেখলাম না। কী ব্যাপার, এটা কলকাতা তো? নাকি গোবিন্দপুর সুতানুটি?

পানের দোকানে ফিরে এসে বললাম, কী হয়েছে এখানে? রাস্তায় লোকজন নেই। সব ফাঁকা।

দোকানদার বলল, খুন হয়েছে বাবু। পার্টি পার্টি লড়াই। খুন বোমাবাজি।

সেকী! তা কোন পার্টির লোক খুন হল?

ক্যা মালুম বাবু! কংগ্রেস বলছে কংগ্রেসের লোক, সিপিএম বলছে সিপিএমের লোক। পুলিশ র‍্যাফ নেমেছে রাস্তায়। পাবলিক বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়েছে।

তা হতে পারে। কলকাতার রোজনামচা এসব। দোকানদারকে বললাম, আপনি দোকান বন্ধ করেননি দেখছি?

দোকানদার নির্লিপ্ত গলায় বলল, হামি কংগ্রেস ভি নেই আছে, সিপিএম ভি নেই আছে। হামি নির্দল আছি।

তাও তো বটে। দোকানদার সাতেও নেই পাঁচেও নেই। কিন্তু বারোতে আছে। সে যা হোক, এখন আমি কী করি! এখানে কেউ আমাকে চেনে না। বিপদে পড়লে কেউ রক্ষা করতে আসবে না। খুনখারাপি পুলিশ র‍্যাফের মধ্যে না গিয়ে ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান হব নাকি?

কিন্তু এত কাছে এসে মেঘবতীর কাছে না গিয়ে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যেতে মন চাইল না। এই রাস্তাতেই তো মেঘবতীর বাড়ি। একটু খুঁজলেই পেয়ে যাব। মেঘবতী এত কাছে তবু এত দূর হয়ে থাকবে? আগ্রায় এসে তাজমহল না দেখেই ফিরে যাব। যা হয় হোক।

একটু এগিয়েই একটা তিনকোনা মোড়ের কাছে চলে এলাম। মোড়ে দেখলাম পুলিশের একটা কালো ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যানের কাছে কিছু সশস্ত্র পুলিশ। হঠাৎ কাছেই কোথাও একদল মানুষের হইহই শব্দ শুনলাম। শব্দটা শুনেই বুক থেকে সব সাহস কর্পূরের মতো ভ্যানিশ হয়ে গেল। এখানে আমাকে কেউ চেনে না। রামের দল হয়তো আমাকে শ্যামের লোক ভেবে , কিংবা শ্যামের দল আমাকে রামের লোক ভেবে নিশ্চয় লাঠিসোটা ছোরাছুরি নিয়ে ছুটে আসছে। বাসের চাপাচাপিতে চেহারাটাও সেইরকমই সন্দেহজনক বানিয়ে ফেলেছি। ভয়ে আমার হাত-পা পেটের

মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। আর কোনও ভাবাভাবি না করে আশ্রয় পেতে চোঁ-চাঁ দৌড় দিলাম পুলিশের কাছে। প্রেম-ভালবাসা মেঘবতী-কলাবতী ওসব পরে হবে। এখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। রইল পড়ে তেলের বাটি, চলল হরিদাস। এখন পুলিশই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

কিন্তু ফল হল উলটো বুঝলি রাম। আমাকে ছুটে আসতে দেখে পুলিশের দল ভেবে বসল বোমা হাতে কোনও দুষ্কৃতি পুলিশকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। অমনি পাঁচ-ছ'জন পুলিশ ঢাল লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর আমাকে কাবু করে মাটিতে ফেলে দিয়ে হাতকড়া পরিয়ে ধাক্কা দিয়ে ভ্যানে ঢুকিয়ে দিল। একজনকে বলতে শুনলাম, এ হচ্ছে এ-এলাকার সবচেয়ে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল। একে ধরতে পারা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বিরাট কৃতিত্ব।

আমি হাঁউমাউ করে বললাম, আমি ভাল মানুষ, আমি কিছু করিনি স্যার।

চোপ। বজ্রকণ্ঠে পুলিশ আমার পেটে রুলের গুঁতো দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিল।

তারপর থানায় গিয়ে কেমনভাবে ছাড়া পেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিলাম সে এক বিরাট কাহিনী। বলতে গেলে বিমল মিত্রের ঢাউস উপন্যাস হয়ে যাবে। ফোন করার অনুমতি পেয়ে বাড়ির লোক ও পাড়ার কয়েকজন রাজনীতি-করিয়ে দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম। তাদের চেষ্টাতে অনেক রাতে বাড়িতে ফিরে আসতে পেরেছিলাম।

সোমবার অফিসে গিয়ে দেখি অন্য পরিস্থিতি। চেনা ছবিটা সম্পূর্ণ উলটোদিকে ঘুরে গেছে।

হয়েছে কী, আমার পুলিশের হাতে ধরা পড়ার দৃশ্য এমন একজনের চোখে পড়ে গিয়েছিল যে ওই এলাকায় থাকে এবং আমাদের অফিসেই অন্য সেকশনে কাজ করে। সে সোমবার অফিসে গিয়ে বেশ ফলাও করে রটিয়ে দিল যে আমি নাকি ভীষণ মারদাঙ্গা বোমাবাজি করেছি। দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে সমস্ত এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলাম। পুলিশ অনেক চেষ্টা করে আমাকে গ্রেফতার করে ভ্যানে তুলে থানায় নিয়ে যায়। পরে অবশ্য আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পলিটিক্যাল প্রেশারে।

একটু দেরি করে অফিসে এসেছিলাম। এসেই টের পেলাম সবাই আমাকে কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছে। দৃষ্টিটা অবজ্ঞা কিংবা রাগের নয়। বরং ভয়ভয় সম্ভ্রম মেশানো। শুধু তাই নয়, অফিসে আমার স্থিতাবস্থাও পালটে গেল। যারা কোনওদিন আমাকে পাত্তাই দেয়নি, তারাই কাছে এসে হেঁ হেঁ করে সেধে সেধে আলাপ করছে, আমার ভালমন্দ জানতে চাইছে। সুধাময় পর্যন্ত কাষ্ঠ হেসে আমার সঙ্গে খেজুরে আলাপ করে গেল। অমন যে বড়বাবু, যিনি কিনা সবসময় বেগুন বেচার মতো মুখ করে থাকেন, তিনিও আমার টেবিলের কাছে এসে কৌটো থেকে সাজা পান বের করে আমার হাতে দিয়ে হেসেহেসে বললেন, নাও, পান খাও। বেনারসের স্পেশাল জর্দা দেওয়া। একটা খেলেই আর একটা চাইতে হবে।

বড়বাবু এমনভাবে হাসিটা প্রসারিত করলেন যেন নিত্যই তাঁর সঙ্গে আমার এমনই খোশ-আলাপের সম্পর্ক।

পান মুখে দিয়ে ভালমন্দ কিছুই বুঝলাম না। তবু বললাম, ফাইন।

বড়বাবু বললেন, ফাইন হবে না? এ যে তোমার সুপার ফাইন বউদির নিজের হাতে সাজা পান গো!—বলে বড়বাবু হাহা করে হাসলেন।

বড়বাবু হাসলে অধস্তনকে পেট কামড়ালেও হাসতে হয়, আমিও খ্যা খ্যা করে কিছুটা হাসলাম।

কিন্তু কী এমন হল যার জন্যে হঠাৎ ফুচকা থেকে ফাউল কাটলেট হয়ে গেলাম?

একটু পরে ফাইল নিয়ে ছোটসাহেবের ঘরে ঢুকতেই ছোটসাহেব সহাস্যে বললেন, আরে অংশুমানবাবু যে। বসুন, বসুন। আরে বসুন তো!

আমি কোনওমতে বসে বললাম, স্যার, এই ফাইলটা—

টেবিলে একটা চাপড় মেরে ছোটসাহেব বললেন, রাখুন তো মশাই ফাইল। ওসব পরে

হবে'খন। আগে বলুন কেমন আছেন? বাড়ির সব ভাল তো? আপনার কথা শুনলাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অমন বোল্ডনেস আজকাল ক'জনের আছে! ওসব আগে ছিল ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর মধ্যে। আপনার মতো লোক এই অফিসে কাজ করে এটা আমাদের গর্বের বিষয়। আপনি অফিসের অ্যাসেট।

মনে পড়ল এই ক'দিন আগে ছোটসাহেব আমাকে অফিসের বার্ডেন বলেছিলেন।

কী মনে হতে ছোটসাহেব বললেন, পাড়ার কয়েকটা বখাটে ছোঁড়া আমার মেয়েটাকে কলেজে যাওয়া-আসার পথে খুব জ্বালাচ্ছে। একটু রগড়ে দেবেন তো অংশুমানবাবু।

বুঝলাম একদিনের ব্যাপারেই জিরো থেকে হিরো হয়ে গেছি। সবকিছু একশো নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গেছে।

অফিস ছুটির পর বাস ধরতে যাচ্ছি, পিছন থেকে নারীকণ্ঠ শুনলাম, এই, একটু শুনুন না!

তাকিয়ে দেখি আর কেউ নয়, মেঘবতী হাসিমুখে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কাছে এসে ক্ষুব্ধ গলায় বলল, এই যে বীরপুরুষ, আমাদের কি মনেই থাকে না?

কী জবাব দেব, আমার বুকে তখন উত্তেজনায় আবেগে রোমাঞ্চে কালবোশেখি ঝড় শুরু হয়ে গেছে। মেঘবতী যেচে আমার সঙ্গে কথা বলছে। শুধু কথা বলছে না। অভিমান করে বলছে, তার কথা আমার নাকি মনেই থাকে না। টলোমলো গলায় কোনওমতে বললাম, কেন? মনে থাকে না কেন?

বিলোল কটাক্ষে মেঘবতী আমার দিকে তাকিয়ে বলল, গতকাল আমাদের পাড়ায় গেলেন অথচ আমাদের বাড়ি গেলেন না। আমার মনে আঘাত লাগে না বুঝি? কী নিষ্ঠুর আপনি। পাষাণহৃদয় আপনার।

ইহকাল পরকাল ভুলে গিয়ে আমি বললাম, ছিঃ, দুঃখ করে না মেঘবতী।

মেঘবতী? মেঘবতী আবার কে?

তুমি। তুমি আমার মেঘবতী।

আমি? উল্লসিত গলায় সে বলল, আমি তোমার কাছে মেঘবতী? ওয়াও! আমি মেঘবতী হলে তুমি আমার বিদ্যুৎকুমার!

ভাল মানুষ

তুয়া একটি চমৎকার মেয়ের নাম। তার চোখদুটো সজল দিঘির মতো। একমাথা আষাঢ়ের কালো মেঘের মতো চুল। ফরসা গায়ের রং। মোমের মতো শরীর। তুয়াকে দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। ও যখন হাসে, ওর মুখ জ্যোৎস্না-প্লাবিত হয়ে যায়। যখন কথা বলে, ওর শরীর গান গেয়ে ওঠে। তুয়া মানেই উজ্জ্বলতা আর সজীবতা। তুয়া কোনও মেয়ের নাম না বলে তুয়া একগুচ্ছ সুরভিত রজনীগন্ধার নাম বললে কিছুটা ঠিক বলা হবে।

তুয়ার সঙ্গে আমার জানাশোনা সেই ছোটবেলা থেকে। একই আলো বাতাসে আমরা বড় হয়েছি। তুয়াকে যেমন আমাদের পরিবারেরই একজন মনে হত, তেমনি আমিও তুয়াদের বাড়িতে ঘরের ছেলের মতোই ছিলাম। আমাদের মেলামেশার মধ্যে চঞ্চল শৈশব ছিল, প্রাণবন্ত কৈশোর ছিল, নির্মেঘ আকাশ ছিল, অবারিত সবুজ মাঠ ছিল। তুয়াকে দেখার মধ্যে আমার দৃষ্টিতে কোনও আবিলতা ছিল না। আসলে আমি বরাবরই অকপট মানুষ। আমার মধ্যে কোনও ঘোলা জলের আবর্ত নেই। এখন যেমন আমি, তেমনি সবসময় আমি সোজা সরল ছেলে। কালোকে আমি কালোই বলি, উজ্জ্বল শ্যাম বলি না।

এই যে আমি আর তুয়া সেই বাল্যাবস্থা থেকে পাশাপাশি দিন, মাস, বছরগুলো একই সরলরেখায় ধরে বড় হচ্ছিলাম, হোঁচট খেলাম তুয়া সতেরো আর আমি বাইশ হলাম যখন। একুশ বছরের যুবকের রোমাঞ্চ প্রথম সিগারেট খাওয়ায়। আর সতেরোর যুবতী শরীরের ডাকাডাকি। আমি আমার জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলাম, তুয়া হঠাৎই অনেক দূরে সরে গেল। আমি আমিই রয়ে গেলাম, কিন্তু দু'-বিনুনির মেয়েটি হয়ে গেল চতুর্দশীর চাঁদ। আমার সামনে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের জটিল পাটিগণিত এসে গেল।

অবশ্য এসব যে আমার মসৃণ কপালে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আঁকিবুকি কাটল তা কিন্তু নয়। আমি খোলা মনের মানুষ। সবকিছু সাদা চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তুয়ার মধ্যে অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও আমার মধ্যে কোনও চমক সৃষ্টি হল না। এমনটা তো হতেই পারে। এ সবই তো জিন অতিবাহনের অনিবার্য নিয়ম। একটা মেয়ের শরীর বয়সের এক সময়ে ঝড় তুলবে, ঝোড়ো হাওয়ায় চারপাশে ওলটপালট হবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে। কুটিল লোকেরাই এর মধ্যে গোলমেলে ব্যাপার খুঁজে পায়। ধান ভানতে শিবের গীত গায়। আমি ওসবের মধ্যে নেই। তুয়ার এই নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ হয়ে ওঠার জন্যে আমার মন উচাটন হয়ে ওঠবার কথা। কিন্তু আমার মধ্যে কোনও প্যাঁচানো মন নেই বলে আমার কোনও ভাবান্তর হল না। আমি যে কে সেই রয়ে গেলাম। আহা, তুয়া বড় ভাল মেয়ে। বয়েসকে তো সে আটকাতে পারে না। তার শরীরের নদীতে বান ডাকলে দু'কূল তো ভেসে যাবেই। এটাই নিয়ম। এমনটি তো নয় যে ব্যাপারটা কেবল তুয়ার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। এতে এত ভাবাভাবির কী আছে। সবকিছুই আমি স্বচ্ছ চোখে দেখি। তুয়া আমার কাছে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। ওদের বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। কথাবার্তা হাসিঠাট্টার কোনও রং বদল হল না। আমার মনের মধ্যে কোনও পাপ নেই বলে হঠাৎ জলস্ফীতিতে টালমাটাল হয়ে ভেসে গেলাম না। আসলে তুয়ার সঙ্গে আমার এই মেলামেশাটা কিছুটা ভৌগোলিক অবস্থান আর কিছুটা আমার বাবার কর্মক্ষেত্রের সুবাদে। তুয়ার বাবা নিখিলেশ সেন আর আমার বাবা বিমল দত্ত দু'জনে অনেক দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একই কেন্দ্রীয় সরকারের

অফিসে কাজ করে। দু'জনেই অফিসের অ্যাকাউন্ট সেকশনে অনেক দিন ধরে আছে। অফিসে যেমন, অফিসের বাইরেও তেমনি একইরকম ঘনিষ্ঠতা। তা ছাড়া শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে আমাদের বাড়ি থেকে তুয়াদের বাড়ি দু'মিনিটের পথ। কাজেই মজা করে বলা যায় তুয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা একরকম পড়ে পাওয়া। আমি যেমন তুয়াদের বাড়ি যাই, তুয়াও তেমনি আমাদের বাড়ি আসে। প্রসঙ্গত, তুয়া যেমন বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান, আমিও তেমনি একমেবাদ্বিতীয়ম।

আমি যাই, তুয়া আসে। এই আসা-যাওয়াটাই দু'জনের মধ্যে নৈকট্য এনে দিয়েছে। নইলে, বলতে দ্বিধা নেই, তুয়ার মতো এমন সুন্দর এক মেয়ের সংসর্গে আসার মতো কোনও ক্যারিশমা আমার মধ্যে নেই। সব ব্যাপারেই তুয়া আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে। সে শুধু সুন্দরী নয়, পড়াশোনায়ও তুখোড় ছাত্রী। এখন সে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় শিলিগুড়ির সংলগ্ন বলে বাড়ি থেকেই যাতায়াত করে। আমি বেশ জানি, তুয়া আমাকে তার সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে ভাল বন্ধু মনে করে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে বয়েসের এই পর্যায়ে এসে এখন আমি শুধু বন্ধুত্বে খুশি নই। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার আরও কিছু চাই। আমি আমার সারাজীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে তুয়াকে জড়িয়ে নিতে চাই। কিন্তু আমার রুচিবোধ কখনওই আমাকে অসহিষ্ণু করেনি। আমার চাওয়া বদলে দেয়নি আমার শরীরের ভাষা। আমাকে দেখলে কখনওই আগের চেয়ে এক চুলও অন্যরকম মনে হবে না।

আমার বয়স যখন সাতাশ আর তুয়ার বাইশ, এরকম সময়ের একদিন তুয়া বলল, এই পার্থদা, তোকে যেন আজকাল কেমন লাগে।

বললাম, কেন?

তুয়া বলল, তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, কেমন হয়ে গেছি?

এই কেমন যেন। একটু অন্যরকম হয়ে গেছিস।

বললাম, ধুস! কিছুই হইনি।

হয়েছিস, হয়েছিস। বল না কী হয়েছে তোর?

এই যে তুয়া আমার সঙ্গে ঝরঝর করে কথা বলছে, একটুও বাধো বাধো ঠেকছে না, আমাকে আগের মতোই 'তুই' বলছে, আমি কিন্তু এখন এভাবে কথা বলতে পারি না। তুয়াকে তুইও বলি না, তুমিও বলি না। অধিকাংশ কথা ছোট করে নে ভাববাচ্যে এমন করে বলি যাতে তুই কিংবা তুমি বলার অনিবার্যতা এড়ানো যায়। কেন বলি আমি নিজেও বুঝতে পারি না। এটা কি আমার আর তুয়ার মধ্যেকার এতদিনের সম্পর্কের মধ্যে একটা মানসিক পার্থক্য গড়ে দিয়েছে বলেই? আমার সরল মন কি তবে একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে? কিন্তু তাই বা হবে কেন! আমি তো তেমন মানুষ নই। আমি বিশ্বাস করি না আমার মধ্যে কোনও অনৈতিক দোলাচল এসে গেছে। কিংবা আমি তুয়ার শরীর-বিষয়ী হয়ে গেছি।

তুয়া বলল, এই পার্থদা, চুপ করে আছিস কেন? বল না?

কী বলব?

কী হয়েছে তোর?

কী আবার হবে। কিচ্ছু হয়নি।

তুয়া মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, হয়েছে, হয়েছে। তুই প্রেমে পড়েছিস।

ভ্যাট!

ভ্যাট বললে হবে না। ছেলেদের এই অবস্থা কখন হয় জানিস? প্রেমে পড়লে হয়। প্রথম প্রেম। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল।

একটু থমকে গিয়ে বললাম, তাই নাকি?

হ্যাঁ মশাই, তাই। এই বল না মেয়েটা কে? অফিসের কেউ?

কয়েক মাস হল আমি একটা কমার্শিয়াল অফিসে জয়েন করেছি। কোম্পানিটা ভাল। মাইনেকড়িও খুব একটা খারাপ দেয় না। আমি কম্পিউটারের দায়িত্বে আছি। কিন্তু কী অদ্ভুত সমাপতন। তুয়া আন্দাজে বললেও ব্যাপারটা কিছুটা মিলে গেছে। তবে এই মিলে যাওয়া আংশিক সত্যি। আমার দিক থেকে না হলেও সুপর্ণার দিক থেকে কথাটা মাপে মাপে ঠিক। অফিসে আমার কাছাকাছি চেয়ারে বসে যে-মেয়েটি টাইপ করে, সেই সুপর্ণার সঙ্গে আমার একটু কাছের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ-ব্যাপারে আমি কিছুটা অনাসক্ত হলেও বেশ বুঝতে পারি সুপর্ণা আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। সুপর্ণা দেখতে ভালই, ছিপছিপে গঠন, খুব ছেলেমানুষি স্বভাবের। সবসময় হাসে। আমার প্রতি ওর আচরণ ঠিক সহকর্মীর মতো নয়, তার চেয়ে একটু বেশি। এই একটু বেশিটা যে একজন প্রেমিকার আচরণ, তা না বোঝার কোনও কারণ নেই। সে অনেকদিন তাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। আমি যাব, যাচ্ছি বলে প্রথম প্রথম এড়িয়ে গেলেও দু'-দিন ওদের হিলকার্ট রোডের বাড়িতে যেতে হয়েছে। কী করব, না গেলে সুপর্ণা সত্যিই মনে দুঃখ পেত। আমার কোমল মন, কাউকে দুঃখ দিতে পারি না।

সুপর্ণা ওর মা'র সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। সুপর্ণার মা-ও ভাল মহিলা। আমাকে যে তাঁর খুবই ভাল লেগেছে, কথাবার্তায় সে-কথা কখনওই অস্পষ্ট থাকেনি। কিছুক্ষণ থেকেই সুপর্ণাদের বাড়ির পরিবেশ খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। শিক্ষিত, উদার, আধুনিক মনস্ক। সুপর্ণার বাবা রেলে চাকরি করেন, মা স্কুলের শিক্ষিকা। দু'মেয়ে। সুপর্ণা বড়। একমাত্র ভাই কলেজে পড়ে। এককথায় বলতে গেলে পছন্দ হবার মতো পরিবার। কিন্তু মুশকিল হল পরিবারের ভালমন্দ নিয়ে অন্যরকম কিছু ভাবার মতো আমার অবকাশ ছিল না। সুপর্ণা ভাল, খুবই ভাল, এর বেশি আমার চিন্তাভাবনার মধ্যে নেই। তুয়াই আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ কথা। অবশ্য তুয়ার কথা কোনওদিনও সুপর্ণাকে বলিনি। বলার দরকারই বা কী। দু'জনে দু'জনের জায়গায় থাকুক। তুয়ার কথা যেমন সুপর্ণা জানে না, সুপর্ণার কথাও তেমনি তুয়া জানে না।

সুপর্ণা মাঝেমাঝেই রাতের দিকে আমাকে ফোন করে। ফোনে আকাশ পাতাল গল্প করে। আমারও সৌজন্যের খাতিরে ওদের বাড়ির ফোন নম্বরের বোতাম টিপতে হয় মাঝেমাঝে।

তুয়া এসব জানে না। তাই তার কথার কোনও জবাব না দিয়ে ম্লান হাসলাম শুধু।

আসলে তখন আমার মধ্যে অদ্ভুত এক হতাশা এসে গিয়েছিল। তুয়া কেমন অনায়াস উচ্চারণে অবলীলাক্রমে আমার সঙ্গে কোনও কল্পিত মেয়েকে জড়িয়ে লঘু গলায় কথা বলছে, যেন কিছুই নয়। কই আমি তো ওর মতো সাবলীল হতে পারছি না। আমার চারপাশে কুণ্ঠা যেন চারটে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া কোথায় যেন একটা ক্ষীণ ইচ্ছে আমার মধ্যে কাজ করছে যে তুয়ার মধ্যে একটু লাজুক লাজুক ভাব থাকুক। আমার চোখ থেকে ওর নির্নিমেষ চোখদুটো সরিয়ে নিক। ওর আমার মধ্যে আলাপচারিতার সময়টা একটু নিভৃত হোক, একটু আত্মমুখী হোক। অথচ আমি থেকে গেলাম নিঃশব্দ কুণ্ঠিত প্রেমিকের মতো, তুয়া রয়ে গেল কপাট-খোলা বন্ধুর মতো। আমি চাইছিলাম নীল আকাশে কিছু মেঘ এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকুক, কিছু এলোমেলো হাওয়া থাকুক। কিছু আড়াল আবডাল থাকুক দু'জনের মধ্যে। চাইলাম—

হঠাৎ আমি থেমে গেলাম। সবকিছু এত ঘোরালো করে ভাবছি কেন! আমি তো সেরকম মানুষ নই। অস্বচ্ছতা আমার মধ্যে থাকবে কেন? কথাটা মনে হতেই এক ঝটকায় মন থেকে অনভিপ্রেত চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেললাম। মনকে শক্ত করলাম।

তুয়া বলল, ঠিক আছে। তুই না বললেও মেয়েটার খোঁজ ঠিক পেয়ে যাব।

বললাম, যা নেই, তা পাওয়া যাবে কেমন করে।

তুয়া ছেলেমানুষের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আছে, আছে, ঠিক আছে। মেয়েদের চোখ ঠিক ধরে ফেলে।

মনে মনে বললাম সব মেয়ের চোখের কথা বলতে পারব না, কিন্তু তোমার মেয়েলি চোখ কিছুই

ধরতে পারেনি তুয়া। ধরতে পারলে অন্য মেয়ের খোঁজ করতে না। আমার এক এক সময় বড় ক্লান্ত লাগে। তুয়া ভাল, কিন্তু বড্ড বেশি ভাল। এই ভাল থাকাটা একটানা বয়ে যাওয়া নিস্তরঙ্গ নদীর মতো মনে হয়। ধার নেই, খাঁজ নেই। গোল গোল, গোটা গোটা।

সে যাই হোক, তুয়া যেমন আছে তেমনি থাকুক। আমি আর ভাবাভাবির মধ্যে গেলাম না, বেশি ভাবতে গেলে ভাবনার নানান বাঁক হয়ে যায়। সবকিছু জট পাকিয়ে যায়। মনের সরল রেখাগুলো এঁকেবেঁকে যাক, আমার কাছে কখনই তা কাম্য নয়।

তুয়ার তখনই যেন অন্য কিছু মনে পড়ে গেল। বলল, কী কাণ্ড দ্যাখ পার্থদা।

আমি বললাম, কই কোনও কাণ্ড তো দেখতে পাচ্ছি না।

দ্যাখার মতো চোখ থাকলে তো দেখবি। তুয়া ডান হাতটা তুলে বলল, এই দ্যাখ আঙুলে কী হয়েছে। কড়ে আঙুলটা দ্যাখ।

আমি একটু কাছে এসে তুয়ার ডান হাতের কড়ে আঙুলটা দেখলাম। ফরসা আঙুলের একপাশে একটা কালচে দাগ। মনে হয় কিছুতে পুড়ে গেছে। বললাম, পুড়ে গেছে?

হ্যাঁ রে। খুব জ্বালা করছিল।

কীসে পুড়ল?

তুয়া বলল, অ্যাসিডে। ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে অ্যাসিড নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে হয় তো, ভাগ্যিস অনেকটা পুড়ে যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে অনেক রকম জিনিস নিয়ে তুয়ার অনেক কিছু পরীক্ষা করতে হয়। তার মধ্যে অ্যাসিডও আছে।

খুব বেশি পুড়ে যায়নি। দাগও সামান্য। অ্যাসিডে পোড়ার ব্যাপারে আমার তেমন ভাল জানা নেই। তবু মনে হল সময়ের ব্যবধানে দাগটা মিলিয়ে যাবে। তুয়ার আঙুল আবার আগের মতো হয়ে যাবে। দেখলাম মলম জাতীয় কিছু লাগানোও আছে আঙুলে। তবু আমার মন খারাপ হয়ে গেল। তুয়ার কোনও কষ্টই আমি সহ্য করতে পারি না। মনে হয় নিজের কষ্ট।

বললাম, ওসব এক্সপেরিমেন্টগুলো একটু সাবধানে করতে তো হয়। তবু ভাল, অল্পের উপর দিয়ে গেছে।

এ-সময় কাকিমা ঘরে ঢুকলেন। আমার কথা তাঁর কানে গিয়েছিল। বললেন, আর বলো কেন। কত সাবধান হতে বলি, তা মেয়ের কানে গেলে তো।

তুয়া বলল, মা, বোঝো না কেন, সাবধানে থাকলেও সবসময় অ্যাকসিডেন্ট এড়ানো যায় না। তাই না রে পার্থদা?

আমি কী বলব। চুপ করে রইলাম।

মাসিমা বললেন, আমার সবসময় তোকে নিয়ে এই এক চিন্তা। গাড়িতে যাস, এক্সপেরিমেন্ট করিস, কখন কী যে হয়!

তুয়া বলল, তা হলে আমাকে ইউনিভার্সিটিতে না পাঠিয়ে ঘরের মধ্যে পুতুল হিসেবে সাজিয়ে রেখো, সেই ভাল। এ তো সামান্য ব্যাপার, ল্যাবরেটরিতে আরও কত কী হয়।

মেয়ের কথা শুনে মা'র মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনাল। সামান্য ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। বললেন, থাম তো তুই। সব ব্যাপার একেবারে জেনে গেছিস। একটু সাবধানে থাকতে ক্ষতি কী!

কাকিমার মতো দুশ্চিন্তা না হলেও আমার মধ্যে কিন্তু উদ্বেগ থেকেই গেল। তুয়ার খারাপ কিছু সে তো আমারই খারাপ।

তুয়ার একটা ব্যাপার কিন্তু ভারী আশ্চর্য লাগে। কৈশোর পেরিয়ে গেলেই মেয়েরা নাকি ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি প্রাপ্ত মনস্ক হয়। নানান জিজ্ঞাসা এসে যায় শরীরে। তাই যদি হবে তুয়া কেন এর ব্যতিক্রম? কেন সে বুঝতে পারে না, আমি এখন আর তার এক্কাদোক্কা খেলার সঙ্গী

নই, অন্য এক খেলায় মেতে উঠেছি। কেন বুঝতে পারে না আমাদের চাওয়া পাওয়াগুলো বদলে গেছে। নাকি বুঝতে পারে, কিন্তু সে বোঝাটা লুকিয়ে রাখে, শরীরের ভাষায় জানায় না। সেই চিরকালীন নারীমনের রহস্য। অধরা সোনার হরিণ।

কী জানি কী! বড় দোটানায় পড়ে যাই।

একদিন তুয়া তার পড়ার বইয়ের পাতার ভেতর থেকে একটা ফোটো বের করে বলল, এই দ্যাখ পার্থদা, হরপ্রীত সিং।

আমি ফোটোটা হাতে নিয়ে দেখলাম। এক পাঞ্জাবি যুবকের ছবি। হাসিহাসি মুখে তাকিয়ে আছে। ছবি দেখেই বোঝা যায় ছেলেটি লম্বা স্বাস্থ্যবান এবং সুদর্শন।

বললাম, এ কে? কার ফোটো?

তুয়া বলল, বললামই তো। হরপ্রীত সিং।

হরপ্রীত নামে কাউকে মনে পড়ল না। ফোটোর ছেলেটিকে আগে কখনও দেখিওনি।

বললাম, সে আবার কে?

কে আবার, আমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। খুব স্পোর্টিং ছেলে।

কৌতুক করে বললাম, বয়ফ্রেন্ড?

ফ্রেন্ড তো বটেই। তবে যে-অর্থে বয়ফ্রেন্ড বলছিস, ওরকম কিছু না। ক্লাসমেট। হরপ্রীত পাঞ্জাবি হলেও ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল্ড। কার্শিয়াঙে ওদের বাড়ি। দারুণ রবীন্দ্রসংগীত গায়।

রবীন্দ্রসংগীত গায়? বাহ্!

দাঁড়া, একদিন বাড়িতে আসতে বলব। তখন ওর গান শুনিস।

ফোটোটা তুয়ার হাতে ফেরত দিয়ে বললাম, তা হলে তো ভালই হয়।

ভাল বললাম বটে, কিন্তু কোথায় যেন একটা খারাপের কাঁটা বিঁধে রইল। হরপ্রীত সিংকে খোলা মনে নিতে পারলাম না কেন কে জানে। অথচ এমন তো হওয়া উচিত ছিল না। সে তুয়ার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, তুয়ার বন্ধু। পরিচ্ছন্ন, সাদাসাপটা সম্পর্ক। তা ছাড়া ছেলেটি পাঞ্জাবি বলে এই বন্ধুত্বে একটা বাড়তি মাত্রা যোগ হতেই পারে। সে তুয়াকে তার একটা ফোটো প্রেজেন্ট করতেই পারে। এর মধ্যে অন্য কোনও অর্থ খোঁজার কোনওই মানে হয় না। বিশেষ করে আমার মধ্যে সেরকম কোনও সংকীর্ণতা কোনওদিনই নেই। ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর ভাবতে চাইলাম না। সময় এখন অনেক খোলামেলা হয়ে গেছে। ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে সেই প্রাচীন ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু মানসিকতা নেই।

তুয়াকে আমি সেই এতটুকু বয়েস থেকে চিনি। বরাবরই মুক্তমনের মেয়ে। তার মধ্যে কোনও লুকোচুরি নেই, কোনও অস্পষ্টতা নেই। আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। যেদিন স্বচ্ছসলিলা নদী শুধু বয়ে যাবে না, তার মধ্যে গভীরতা আসবে, যেদিন বিপুল জলরাশি তাকে কানায় কানায় ভরিয়ে রাখবে। ঢেউ উঠবে, ঢেউ পড়বে। এমন দিন তো একদিন আসবেই। সেদিন আমি তুয়ার দিকে নির্ভরতার হাত বাড়িয়ে দেব। আমি সেই বাঞ্ছিত দিনের অপেক্ষায় আছি।

এক শনিবার রাতে সুপর্ণা টেলিফোন করল।

কাল দুপুরে একটা জায়গায় যাবেন পার্থদা?

কোথায়?

বুকফেয়ার হচ্ছে। চলুন না যাই।

বইমেলায় যাবার খুব ইচ্ছে আমারও। সঙ্গে সুপর্ণা থাকলে ক্ষতি কী। কিন্তু যাবার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও না করে দিতে হবে।

যাবেন পার্থদা?

গেলে তো খুবই ভাল হত। কিন্তু কাল যে সময় পাব না। কাজ আছে।

ধুত। কাজফাজ বাদ দিন। চলুন না।

সত্যিই বলছি সময় হবে না।

আপনার খালি না আর না। ভাল্লাগে না ছাই।

বিশ্বাস করো।

করলাম, করলাম। বিশ্বাস করলাম।

ঠকাস করে সুপর্ণার ফোন রেখে দেবার শব্দ পেলাম। মনে মনে সুপর্ণার ঠোঁট-ফোলানো রাগী মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম। তাকে কেমন করে বোঝাই এখন তাকে নিয়ে হইহই করে বইমেলায় যাওয়া যায় না। অন্য সমস্যা আছে। মহা মুশকিলে পড়ে গেছি। সুপর্ণা এমনভাবে ডাকে আমাকে যে তার মনে আঘাত দিতে কষ্ট হয় আমার। মেয়েটা সত্যি ভাল।

কয়েকদিন পরে এক শুক্রবারে সন্ধেবেলায় আমাদের বাড়ির ফোন বেজে উঠল। সুপর্ণার ফোন নয়। সে এ-সময় ফোন করে না। বাবা ঘরে ছিল। ফোন ধরল বাবা-ই।

হ্যালো!

ওপাশ থেকে কে কথা বলছি জানি না, কিন্তু তার কথা শুনতে শুনতে বাবার মুখের রং বদলে যেতে দেখলাম। একটু পরে চমকে ওঠার গলায় বাবাকে বলতে শুনলাম, এসব কী বলছিস নিখিলেশ? এ তো ভয়ানক চিন্তার বিষয়...ঘাবড়াস না নিখিলেশ, সব ঠিক হয়ে যাবে... হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে যাচ্ছি .. আরে, অত ভাবছিস কেন? এখন মেডিক্যাল সায়েন্স অনেক উন্নত... হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখনই তোর বাড়িতে যাচ্ছি... ঠিক আছে। রাখছি।

বাবাব মুখ থেকে সব ব্যাপার শোনা গেল। তুয়ার বাবা ফোন করেছিল। ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে তুয়া কী কারণে যেন হঠাৎ পড়ে যায়। তার হাতের পাত্রের অ্যাসিড সে-সময তার মুখের ডানদিকের গালে ছিটকে পড়ে গালটা পুড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তুযাকে নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করে দিয়ে একটু আগেই তুয়াদের বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে।

তুয়ার আজ ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছিল বলে বাড়ির সবাই চিন্তা করছিল। এমন সময় টেলিফোন এই দুঃসংবাদ নিয়ে এল। কে জানত অ্যাসিডে হাতের আঙুলের সামান্য পুড়ে যাবার মধ্যেই এই দুর্ঘটনার ইঙ্গিত ছিল। তুয়া একমাত্র সন্তান, মা-বাবার আদরেব পাত্রী, তার এই বিপদের সংবাদে সবাই ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। এমনকী আমাদের বাড়িতেও একই অবস্থা। বাবা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না কবে তাড়াতাড়ি করে .লে গেল তুয়াদের বাড়ি। সেখান থেকে তুয়ার বাবাকে সঙ্গে নিযে ট্যাক্সিতে চলে যাবে নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ। ইউনিভার্সিটির লাগোয়া। বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

মা'র মুখে কান্না আর উদ্বেগ একইসঙ্গে ফুটে এল। তুয়াকে সবাই ভালবাসে। নিখিলেশকাকু আর কাকিমার সঙ্গে আমাদের বাড়ির বহুদিনের একান্ত সম্পর্ক। তাদেব এই বিপদ আমাদেরও পারিবারিক বিপদ।

মা বলল, তুইও বাবার সঙ্গে গেলে পারতিস পার্থ।

বললাম, যাবার তো খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বাবা এত তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল, বলতে পারলাম না।

মা বলল, কোথা থেকে কী হয়ে গেল।·একেই বলে ভবিতব্য। মেয়েটার অমন সুন্দর মুখেব একটা দিক কিনা অ্যাসিডে পুড়ে গেল। বেচারির ভাগ্যটাই খারাপ। আহা, ও-বাড়িতে গেলে কাকিমা কাকিমা করে—

মাকে থামিয়ে দিতে বললাম, তুমি এমনভাবে বলছ যেন তুয়া আর কাকিমা কাকিমা করবে না।

মা বলল, সে-কথা বলছি না। এই বয়েসের কোনও আইবুড়ো মেয়ের মুখে একটা খুঁত হয়ে যাওয়াটা মহা চিন্তার ব্যাপার। শুধু তুয়া নয়, ওর মা-বাবারও ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেল। তুয়া দু'জনের

নয়নের মণি। ও-মেয়ের জন্য এখন তেমন ছেলে পাওয়াই মুশকিল হবে। তোর তো কাল অফিস নেই, যা বাবা, একবার দেখে আয়। তোরা দু'জনে তো পিঠোপিঠি মানুষ হয়েছিস।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে বাবা বলল, তেমন ভয়ের কিছু নেই। গালে একটি ইঞ্জুরি হয়েছে বটে, কিন্তু সাংঘাতিকভাবে পুড়ে যায়নি। ডানদিকের গালে কিছু অংশ পুড়েছে। তুয়া সুস্থ সবলই আছে। সেরে যাবে।

মা বলল, এখানেই চিকিৎসা হবে?

বাবা বলল, না। নিখিলেশের এক পিসতুতো ভাই বোম্বেতে আছে। নাম করা স্কিন স্পেশালিস্ট। তার কাছে সামনের মাসে তুয়াকে নিয়ে যাবে।

মা বলল, মুখটা আগের মতোই হয়ে যাবে তো?

বাবা ম্লান হেসে বলল, তাই কি হয়। অ্যাসিডবার্ন। কিছুটা দাগ থেকেই যাবে মনে হয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলল, এত সুন্দর মেয়ে, এত সুন্দর মুখ, অথচ কী কপাল!

বাবা বলল, কী আর করা যাবে। সব ঘটনা তো আগাম খবর দিয়ে আসে না।

পরের দিন সকাল হতেই মা ছুটল তুয়াদের বাড়ি। আমাকেও মেডিক্যাল কলেজ যাবার কথা বলেছিল মা, কিন্তু আমি গেলাম না। তুয়ার ওই পুড়ে-যাওয়া মুখ কিছুতেই দেখতে পারব না আমি। তার এই বিপর্যয় কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। হাজার চেষ্টা করেও সত্যের মুখোমুখি হতে পারলাম না আমি।

দু'দিন পরেই তুয়াকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হল। বোম্বে যাবার আগে এই শহরেরই ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন থাকবে সে।

তুয়াদের বাড়িতে আমার যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিছুতেই তার কাছে যেতে পারলাম না আমি। আবার না গিয়েও মনে শান্তি পেলাম না। এরকম পরিস্থিতিতে কী করব, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। হ্যাঁ এবং নায়ের টানাপোড়েন চলতেই থাকল মনের মধ্যে। মা বারবার বলে তুয়াকে দেখে আসতে, আমি যাই না। নানা অছিলায় এড়িয়ে যাই। মা অবাক হলেও আমার কিছু করার ছিল না। এ এক গভীর সমস্যা। না গেলেও খারাপ, গেলেও খারাপ। না গেলে তুয়া ভাববে স্বার্থপর, সুবিধেবাদী, গেলে ভাববে করুণা দেখাতে এসেছে। অফিসের কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চেষ্টা করলাম। আমার এখন শুধু কাজ আর কাজ। মনে করেছিলাম লাগাতার কাজ আর কম্পিউটার মেশিন আমাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মনের চোরাগলি দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো ভাবনা চিন্তাগুলো এসেই যাচ্ছিল। চোখের সামনে ভেসে থাকল তুয়ার মুখ। একটা নয়, দুটো মুখ। একটা এতদিনের দেখা ফরসা, স্নিগ্ধ, কান্তিময়ী মুখ। আরেকটা অ্যাসিডদগ্ধ অমসৃণ দগদগে গালের মুখ। উঃ, কী ভীষণ? আমি চোখ বন্ধ করলাম। চোখ বন্ধ করে তুয়ার দ্বিতীয় মুখটা তাড়িয়ে দিতে চাইলাম।

সুপর্ণা টাইপ করতে করতে আমার দিকে চেয়ে বলল, মন মেজাজ ভাল নেই?

কেন বলো তো?

কয়েকদিন ধরেই দেখছি অন্যমনস্ক, গম্ভীর।

না না, ঠিকই তো আছি।

একটুও ঠিক নেই। বলুন তো, কী এত ভাবেন?

কই, কিছু না তো। আসলে সিজন চেঞ্জের এ-সময়টা শরীর সবসময় ফ্রি থাকে না। ভেবো না। কিছু হয়নি আমার।

কিছু না হলেই ভাল। তবু সাবধানে থাকবেন।

মুখে হাসি এনে বললাম, ও কে।

সুপর্ণাও হাসল।

হাসলাম বটে, কিন্তু আমি জানি কী অশান্তি তাড়া করে ফিরছে আমাকে।

সেদিন রবিবার সকালে এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলাম। ফেরবার পথে সামনে পড়ল দীনবন্ধু মঞ্চ। সেখানে ঋত্বিক ঘটকের রেট্রোসপেকটিভ চলছে। ভাবলাম সিনেমা দেখলে কিছুক্ষণের জন্য মনের কষ্ট ভুলে থাকতে পারব। অ্যাডভান্স টিকিট বিক্রি হচ্ছিল। সন্ধের শোয়ের দুটো টিকিট কেটে ফেললাম।

বাইরে এসে টিকিটদুটো আবার দেখলাম। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। পাশাপাশি নম্বরের টিকিট। টিকিটদুটো পকেটে রেখে সামনের পাবলিক বুথ থেকে ফোন করলাম।

ফোন ধরে সুপর্ণার মা বললেন, ও তুমি, পার্থ। কী ব্যাপার?

বললাম, সুপর্ণাকে একটু দিন না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিচ্ছি। তুমি একটু ধরো।

ফোন ধবে আমি দাঁড়িযে বইলাম।

অতল জল

গাছকোমরের মতো শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে সুচরিতা মজুমদার চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বারান্দায় এল। ফরসা, টানটান চেহারা। বড় বড় চোখদুটো দেখলে মনে হয় এইমাত্র কাজল টেনে এসেছে। বয়স চল্লিশের সামান্য নীচে। কিন্তু না বলে দিলে চোখ ঠকে যাবে। মনে হবে আঠাশ-উনত্রিশ। মহিলার চোখেমুখে সবসময় একটা চপল হাসি ছুঁয়ে থাকে, যার বহুবিধ অর্থ হয়। সুচরিতা কাপ হাতে শান্তিময়ের কাছে এসে কিছু বলে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল।

শান্তিময় মজুমদার বারান্দায় একটা বেতের মোড়ায় বসে সম্ভবত ব্যাবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিল। সকালটা রবিবারের বলে কিছুটা সময় বাড়ির সবার সঙ্গে থাকতে পারছে। শান্তিময়ের পরনে গেঞ্জি আর পাজামা। বয়স তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ। উজ্জ্বল শ্যাম, সুঠাম স্বাস্থ্য, মুখের গড়ন সামান্য লম্বাটে। ভদ্রলোক স্থানীয় পৌরসভার কাউন্সিলার। বামপন্থী রাজনীতি করে। শহরের ব্যস্ততম রাস্তায় একটা চালু ওষুধের দোকান আছে। তার দুটো মুখ। একটা রক্তমাংসের, অন্যটা কাগুজে।

শান্তিময় চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে সুচরিতার চোখে চোখ রেখে হাসল। হাসিটার মানে, থ্যাঙ্ক য়্যু।

সুচরিতা উত্তরে একটা লীলায়িত ভঙ্গি করল শুধু। যার উচ্চারণ হল, ঢঙ। তারপর বারান্দার অন্য দিকে বসা যার চোখ এই মুহূর্তে খবরের কাগজের পাতায় নিবদ্ধ, তাকে কিছু বলল। সম্ভবত, তোমাকে চা দেব?

ভদ্রলোক কোনও কথা না বলে মাথা নেড়ে না জানাল। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে শান্তিময়ের মুখের গঠনের মিল আছে। ভদ্রলোকের সবকিছুই ভাসাভাসা, পালাই পালাই ভাব। চড়ুইপাখির মতো এই আছে, এই নেই। চাকরি করে ভারতীয় রেলে। টিটি। রেভিনিউ স্ট্যাম্পে সই করে যে-টাকাটা মাসান্তে পায়, তার অনেক বেশি উপার্জন করে। অধিকাংশ দিনই ট্রেনের চাকার ওপর কেটে যায়। মাঝেমধ্যে বাড়িতে। যেমন আজ। সে থাকাটা শরৎকালের আকাশে বাউন্ডুলে মেঘের ভেসে বেড়ানোর মতো। নাম সুধাময় মজুমদার। শান্তিময়ের তিন বছরের বড় ভাই। সুধাময়ের মধ্যে একটা লোকদেখানো সারল্য আছে। অনেক কিছু বোঝে, কিন্তু না-বোঝার ভান করে থাকে। গায়েও মাখে না। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, তার পিঠটাই শুধু দেখা যায়।

এই যে তিনজনের কথা বলা হল, তারা সবাই আমার নিকটতম মানুষ। সুধাময় হল আমার বাবা, সুচরিতা আমার মা, শান্তিময় আমার কাকা। আর একজনের কথা বলতে হয়। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তাকে বারান্দায় দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত রান্নাঘরে আছে। ওটাই তার সবচেয়ে নিরাপদ গৃহকোণ। মহিলার নাম আরতি। আরতি মজুমদার। শান্তিময় মজুমদারের স্ত্রী। স্ত্রী না বলে ধর্মপত্নী বলাই ভাল। আমার একমাত্র কাকিমা। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের ছোটখাটো চেহারা। ফরসা রং। আদ্যন্ত গৃহবধূ। ভদ্রমহিলা খুব বেশি হাসিখুশিও না, গম্ভীরও না। একই রকম মুখের ভাব মাঝেমাঝে একঘেয়ে মনে হয়। একটা দম দেওয়া পুতুলের মতো মনে হয়। যে ধরনের মানুষ সমস্যার মোকাবিলা না করে পাশ কাটিয়ে যেতে ভালবাসে, আরতি মজুমদার সেই ধরনেরই বিশেষত্ববর্জিত মানুষ। কমও নয়, বেশিও নয়, প্রয়োজনের মাপে মাপে সে তৈরি। স্বামীর প্রবল ব্যক্তিত্বের ছায়ায় অস্পষ্ট হয়ে থাকে সবসময়।

এই পারিবারিক দৃশ্যটাকে কোনও নাটকের দৃশ্য বলা যায় এই কারণে যে, চরিত্রগুলোর একটিরও মুখে মনের প্রতিফলন নেই। যে যার নিজের নিজের ভূমিকায় অভিনয় করছে শুধু।

এবার আমার কথা বলি। আমি কেমন, আমার এতক্ষণের কথায় তার কিছুটা জানা গেছে নিশ্চয়ই। বাকিটা বলি। আমি স্নেহ। মানে আমার ডাকনাম স্নেহ। আমারও ভাল নামের সঙ্গে বাবা-কাকার মতো একটি অর্থসূচক প্রত্যয় আছে। ময় শব্দটি। আমি স্নেহময় মজুমদার। হাইট পাঁচ সাড়ে নয়। বুকের মাপ ছত্রিশ। বয়স বিশুদ্ধ কুড়ি। সুধাময় আর সুচরিতা মজুমদারের একমাত্র সন্তান। গত বছর মাধ্যমিক পাশ করেছি। ক্লাস নাইনে একবার ফেল করেছিলাম। তাই মাধ্যমিকটা একটু লেটে হয়ে গেছে। এখন একাদশ শ্রেণী। আর পড়ার ইচ্ছে নেই। গন্তব্যটা, ইচ্ছে আছে, উচ্চ মাধ্যমিকেই শেষ করে দেব। বয়স দিয়ে আমার গতিপ্রকৃতি বোঝা যাবে না। আমার মনের মধ্যে সবসময় আদিগন্ত শূন্য মাঠের অশান্ত ঘূর্ণি পাক খায়। আমি ভেতরে ভেতরে ছটফট করি। ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো লাট খাই। ক্রিকেট ফুটবল আড্ডার বয়সে আমি ঘরের মধ্যে গোমড়া মুখে বসে থাকি। আমার বন্ধুরা আড়ালে আমাকে জ্যাঠামশাই বলে। কথাটা যে খুব অসার, তা কিন্তু নয়। অকালপক্কতা আমি অস্বীকার করি কেমনভাবে!

চারজনের কথা বললাম। বাড়িতে আরও মানুষ আছে। কিন্তু তারা সব পার্শ্বচরিত্র। বাবাই আর তাতাই। কাকার সাত বছরের ছেলে আর পাঁচ বছরের মেয়ে। দু'ঘরের সবসময়ের কাজের লোক হরিপদ আর পঞ্চানন। সারাদিন কাজ করে রাতে নিজের নিজের বাড়িতে চলে যায়। খুব সকালে আবার আসে। ওরা আমাদের বাড়িতেই রাতে থাকতে পারত। কিন্তু কাকার আপত্তি ছিল। বাইরের লোকের বাড়িতে রাত্রিবাস ঠিক নয়। কোনও অঘটন ঘটতে কতক্ষণ!

কাকার ছেলে বাবাই ক্লাস ফোর আর মেয়ে তাতাই ক্লাস টুয়ে পড়ে। রোজ সন্ধেবেলায় প্রাইভেট টিউটর এসে ওদের পড়িয়ে যায়। একশো ভাগ গেরস্ত পরিবার বলতে যা বোঝায়, এ-বাড়িতে তার সবই আছে। বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজো আছে, সন্ধেবেলায় শাঁখ বাজানো আছে। পুজোয় নতুন জামাকাপড় আছে, বিজয়ায় মিষ্টিমুখ আছে, দোলে রং মাখানো আছে, পৌষ-পার্বণে পিঠে-পাটিসাপটা আছে। বাড়িতে তিনটে নারকেল, চারটে সুপুরি, একটা টগর, একটা আম, একটা পেয়ারা গাছ আছে। একটা পাতকো আর একটা উঠোন আছে। দুটো পরিবারে দুটো রঙিন টিভি, কাকার একটা মোটরবাইক আর আমার একটা সাইকেল আছে। একটা কুকুরও আছে। রাত নিঝুম হলে সেই কুকুরের ডাকাডাকি আছে। তিন-চারটে বেড়াল আছে। বেড়ালগুলোর রান্নাঘর থেকে চুরি করে খাওয়াও আছে।

এই যে-বাড়ির কথা বলছি, লোকে বলে মজুমদারবাড়ি। বাড়ির কোথায়ও কিন্তু এই নাম, মজুমদারবাড়ি, লেখা ছিল না। নামটা লোকমুখনিঃসৃত। কাকা কিছুটা প্রভাবশালী বলে কেউ কেউ বলত শান্তি মজুমদারের বাড়ি। মনে হতে পারে একান্নবর্তী পরিবারের নাম। আসলে কিন্তু তা নয়। দু'ভাইয়ের দুটো আলাদা হেঁশেল ছিল। অবশ্য দুটো আলাদা হেঁশেল সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। বাবা আর কাকা দু'জনেই যথেষ্ট বুদ্ধিধর। বাসনকোসন এক জায়গায় থাকেনি বলে ঠোকাঠুকিও লাগেনি। ভেতরের ফাঁকিবাজিটা বাইরে থেকে বোঝা যেত না।

আমাদের বাড়িটা অনেকটা ইংরেজির ইউ অক্ষরের মতো দেখতে। একতলা হলেও আধুনিক স্থাপত্যের ছিমছাম বাড়ি। একদিকে রান্নাঘর বাথরুম নিয়ে চারটে ঘর, অন্য দিকেও ঠিক তাই। মাঝখানে একটা ঘর। বেশ বড়সড় ঘর। বৈঠকখানা। এসোজন-বসোজনদের জন্যে। ঘরে একটা সোফা, চারটে গদি আঁটা চেয়ার। মাঝখানে একটা গোল সেন্টার টেবিল। সামনের দেয়ালে দরজার ওপরে পিতামহ পিতামহীর তেলরঙে আঁকা দুটো বড় বড় ছবি। ওটা হল আমাদের আর কাকাদের দুই পরিবারের কমন ড্রইংরুম। কাকাই বেশি ব্যবহার করে ঘরটা। বাবা ক'টা দিন-বা বাড়িতে থাকে! পৌরসভার কাউন্সিলারের কাছে ওয়ার্ডের লোকজন আসে নানান আবেদন আর

অভিযোগ নিয়ে। মাঝেমাঝে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আসে। অবশ্য যারা কাকার দলের রাজনীতি করে, তারাই বেশি।

বাড়ির ঘরগুলো নতুনভাবে সংস্কার করা হয়েছে বছর তিনেক আগে। রং করাও হয়েছে। খরচটা বাবা আর কাকার আধাআধি। দু'জনেরই সচ্ছল অবস্থা। কাকার চালু ওষুধের দোকান। লাভের অঙ্কটা ভালই থাকত। তা ছাড়া পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সূত্রে নানান অন্ধকার পথেও টাকা আসত কাউন্সিলারের হাতে। এসব আগে বুঝতাম না। এখন বুঝি। কুড়ি বছর বয়সেই আমি পরিণতমনস্ক।

শুধু কাকা কেন, বাবার ব্যাপারটাও বুঝি। সিগারেট খায় না, মদ খায় না, একমাত্র নেশা দু'নম্বরি টাকা। গভীর প্রেমের মতো গভীর নেশা! যেমন ভাবেই হোক, বাড়তি টাকা তার চাই। তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই। সোনার হরিণের পিছনে ছোটার জন্যে বাবা বাড়ির বাইরে পড়ে থাকত দিনের পর দিন। সংসারে কী হচ্ছে না হচ্ছে কোনও দিকেই আর নজর ছিল না। ভাবটা— আজ বাড়িতে আছি, কাল চলে যাব, কী হবে মাথা ঘামিয়ে, বাড়িতে যখন থাকত, অতিথির মতো থাকত। যে-জন্যে বাবা আর মা'র মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যে-ফাঁকা জায়গায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল, অন্য কেউ নয়, আমার কাকা শান্তিময় মজুমদারের।

এই যে ফাঁকা জায়গার কথা বলছি, সেটা আমার প্রথম চোখে পড়েছিল যেদিন শেষ রাতে কাকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম, চমকাবেন না, আমার মাকে।

আমার তখন কতই বা বয়স হবে, তেরো-চোদ্দোর মতো, ক্লাস সিক্সে পড়ি। যে-দিনের কথা বলছি, সেদিন বাবা বাড়িতে নেই। অনেক দূরে কোথাও কোনও ট্রেনে হয়তো টিটির ডিউটিতে ব্যস্ত। কাকার পরিবারেরও কেউ নেই। কাকিমা ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে। মেয়ে তাতাই তখন জন্মায়নি, কিন্তু জন্মাবার সময় কাছে এসে গেছে, এইরকম অবস্থা। কাজের লোক পঞ্চানন আর হরিপদ তো রাতে নিজেদের বাড়িতে চলে যায়। সে-রাতে মজুমদার বাড়িতে আমরা তিনজন। আমাদের ঘরে আমি আর মা, কাকার ঘরে কাকা— এই তিনটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ নেই। আমাদের দিকের ঘরগুলোর দুটো পাশাপাশি ঘরের প্রথমটাতে বাড়ি থাকলে বাবা, অন্য ঘরের দুটো বিছানার একটাতে আমি, অন্যটাতে মা শোয়। সেদিন শেষ রাতে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল। এরকম সময় মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায় আমার। জড়ানো চোখে ঘোলাটে অন্ধকার দেখি, দেখতে দেখতেই আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সে রাতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম না। মনে হল কী যেন দেখার ছিল, কিন্তু দেখলাম না। কী দেখলাম না দেখতেই মা'র বিছানার দিকে তাকালাম। মনে হল মা বিছানায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম। তারপর মা'র বিছানার কাছে গিয়ে দেখলাম সত্যিই বিছানা খালি, মা নেই। আমি কিন্তু ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম না। মনে পড়ল আগের দিন রাতেও যেন একই দৃশ্য দেখেছিলাম। মা বিছানায় ছিল না। কিন্তু কিছুটা ঘুম, কিছুটা জেগে থাকা, কিছুটা অস্বচ্ছ আলো, কিছুটা অন্ধকারে, সে দেখাটা অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে। আজ নিশ্চিত হলাম শুধু আজ নয়, কালও, কিংবা গত পরশুও এ-সময় মা বিছানায় ছিল না। ঘরেও না। ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত লাগল। তাড়াতাড়ি বালিশের পাশ থেকে টর্চটা নিয়ে আলো ফেলে চারপাশটা দেখলাম। ঘরে কোথাও মা নেই। বাইরে গিয়ে দেখব বলে দরজার কাছে এলাম। দরজার পাল্লাদুটো খুব সাবধানে এমনভাবে ভেজানো আছে, যাতে মনে হতে পারে দরজাটা খিল আটকে ভেতর থেকে বন্ধ। তার মানে মা বাইরে গেছে। কিন্তু এত রাতে মা কোথায় গেল! ভারী ভাবনায় পড়ে গেলাম। কোনও বিপদ-আপদে পড়ল না তো? মাকে খুঁজতে দরজা খুলে বাইরে প্রথম পা ফেলেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। শেষরাতের ফিকে আলোতে দেখলাম মা ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি করে আসছে। তখনই কাকার ঘরের দরজা বন্ধ হতেও দেখলাম। বুঝলাম আমাকে দেখেই দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হল। আমাকে দরজার বাইরে দেখে মা চমকানো মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল, পিছন ফিরে একবার কাকার ঘর দেখল, তারপর খুব দ্রুততার সঙ্গে মুখের ভাবে স্বাভাবিকতা এনে বলল, আর বলিস

না। অসহ্য মাথাব্যথা করছিল, শুয়েই থাকতে পারছিলাম না। ঠাকুরপোর কাছে ওষুধ আছে। একটা ট্যাবলেট খেয়ে এলাম। চল, ঘরে চল।

আমি কিন্তু মাকে কিছু বললাম না। এমনকী গম্ভীর হয়ে গিয়ে কোনও মানসিক শাস্তিও দিলাম না। যেন কিছুই বুঝিনি এইরকম সুবোধ বালকের মতো মুখ করে মাকে বললাম, খুব ব্যথা করছে? আমি মাথা টিপে দেব?

মা বলল, দরকার নেই। ওষুধ খেয়ে সেরে গেছে। নে, তুই শুয়ে পড়।

আমি আর কোনও কথা না বলে বিছানায় চলে এলাম। আসলে আমার বয়ঃসন্ধির কৌতূহলী মন দেখতে চাইছিল খেলাটা কত দূর পর্যন্ত এগিয়েছে।

সেদিন থেকে আমার মনের বয়স যেন এক লাফে শরীরকে ছাড়িয়ে গেল। এই যেমন একটু আগে মাকে দেখলাম কাকাকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে। স্বাভাবিক ঘটনা। এমনটা তো হতেই পারে। অথচ আমি এই দৃশ্যের মধ্যে অন্য একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, চা দেবার সময় আমার মা কাকার চোখের দিকে তাকিয়ে চা দিচ্ছে। ওভাবে সরাসরি তাকিয়ে দেখাটা আমার কাছে নিষিদ্ধ কিছু শব্দেব নিঃশব্দ উচ্চারণের মতো মনে হল।

আমি আরও তিন-চারদিন শেষ বাতে মাকে বিছানায় দেখিনি। আর একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়ত। কাকিমার ব্যাপার। কাকিমা কেন যেন যতদিন এ-বাড়িতে থাকত, তার চেয়ে বেশি দিন বাপের বাড়িতে থাকতে ভালবাসত। কিছু সন্দেহ করত কিনা জানি না। অন্য কিছু নিয়ে তখন আমি ভাবাভাবি করতাম না। আমাব মনের মধ্যে ভয়ংকব বাগ তখন সীমানা বাড়াচ্ছিল। রাগটা বেশি ছিল বাবা সুধাময় মজুমদারের ওপর। বাবাব কাপুরুষেব মতো উদাসীন হয়ে থাকাটাই শেয়ালকে ভাঙা বেড়া দেখিয়েছে। রাগে আমার গা রি-রি কবত। এ বাড়ির কারও মুখ নিজের মুখ নয়। সব মুখ ধার করা। বুঝতাম বাড়িতে অতিরিক্ত ঘর থাকা সত্ত্বেও হরিপদ আর পঞ্চাননের বাড়িতে থাকার ব্যাপারে কাকাব কেন আপত্তি ছিল।

২

আমার পনেরো বছর বয়সে এক ঘটনায় আমি মরতে বসেছিলাম। আমাদেব বাড়ি থেকে একটু দূরে যে পুকুরটা আছে, শিবপুকুর, তার জলে আর একটু হলে তলিয়ে যেতাম। আমি তখন সাঁতার জানতাম না।

অথচ সাঁতার জানাটা খুব জরুরি ছিল। বলতে গেলে জলের মধ্যেই আমরা বাস করতাম। উত্তর বাংলার যে-শহরে আমরা থাকতাম তাব গা ঘেঁষে বইত এক খামখেয়ালি নদী, তিস্তা। হিমালয় পাহাড় থেকে নেমে আসা এক আপাতশান্ত নদী। সারাবছর সে-নদী সোনালি বালুর ওপর অলস দেহ ভাসিয়ে দিয়ে তিবতির করে নিজের মনে ভেসে যেত। তার দুই তীরে বিস্তৃত হয়ে থাকত দিগন্তপ্রসারী বালুর চর। সারাবছরই এক সুশীলা বালিকাব মতো গালে হাত দিয়ে আনমনে কত কী ভাবত সে নদী। তারপর গ্রীষ্ম শেষ হয়ে যখন বর্ষা আসত, জলগর্ভ মেঘে সারাআকাশ রাতদিন অন্ধকার হয়ে থাকত, অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ত, তখন যৌবনের বিস্ফোরণ ঘটে যেত বালিকার শরীরে। সে তখন আর এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারত না। তার লীলাচঞ্চল পায়ের মল বেজে উঠত। বিপুল জলরাশি নিয়ে দু'কূল ছাপিয়ে চলে আসত শহরে। ঢুকে যেত গেরস্থবাড়ির উঠোনে। এক হাঁটু থেকে এক কোমব, এক কোমর থেকে এক বুক, জল বেড়েই চলত। সে-জল ঢুকত শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া এক ঝিমানো নদী করলার জলে। নতুন জল পেয়ে ফুলেফেঁপে উঠত করলা। দুটো নদীর জল মিলেমিশে ছোটখাটো প্লাবন ঘটিয়ে দিত। বছরের সে-সময় কুকুর বেড়ালের সঙ্গে গোরু ছাগলও ভেসে যেত। কোনও কোনওবার মানুষও। বন্যা

আসত দুদ্দাড় ছুটে, ফিরে যেত হাঁটিহাঁটি পা পা। মানুষের ভোগান্তির আর শেষ থাকত না। কাজেই সাঁতার শিখে নেওয়াটা খুব দরকারি ছিল। দুটো নদীর ঠিক মাঝখানে ছিল বলে বন্যার জলে আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হত প্রথমেই। এপার তিস্তা, ওপার করলা, মধ্যিখানের ভূখণ্ডে আমাদের নড়বড়ে থাকাথাকি।

এমনই সময়ে এক রবিবারে কাকা স্নান কবতে যাবার আগে বারান্দায় আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অ্যাই স্নেহ, সাঁতার শিখবি? চল আমার সঙ্গে।

জলকে আমার ভীষণ ভয় ছোটবেলা থেকে। তার ওপর করলাকে কেমন যেন ভুতুড়ে নদী মনে হত। সাঁতার শিখতে হলে তো ওই করলা নদীর জলে নামতে হবে। দেখতে রোগাভোগা নদী মনে হলে কী হবে, প্রত্যেক বছর কাউকে-না-কাউকে টেনে নিত। একদিন দু'দিন পরে দূরে কোথাও ভেসে উঠত তার নিষ্প্রাণ শরীর। লোকে বলত, ওপরে স্রোত না থাকলে কী হবে, করলার নীচ দিয়ে বয়ে যায় চোরা স্রোত।

আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাকা বলল, এই দ্যাখো, অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সাঁতার শিখবি না?

মা কী কাজে বাইরে এসেছিল। বলল, কী হয়েছে ঠাকুরপো?

কাকা বলল, আর বলো কেন বউদি। তোমার ছেলেকে বলছি চল, একটু একটু করে সাঁতার কাটা শিখবি। তা ছেলের কোনও গরজ দেখছি না। এখন সাঁতার না শিখলে শিখবে কবে!

মা বলল, ঠিকই তো। যা যা, আর দাঁড়িয়ে থাকিস না স্নেহ। আজ থেকে একটু একটু করে সাঁতার শিখে নে। কাকা তো সঙ্গে থাকছেই। ফি বছরই তো দেখছিস বাড়িতে বন্যার জল ঢুকে এক গলা। গতবারই তো ল্যাংড়া দাসুর ছেলেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এত বড় ছেলে সাঁতার না জানলে লোকে কী বলবে!

বললাম, করলা নদী তো কচুরিপানায় ভরতি। নোংরা।

কাকা বলল, দুর বোকা, করলা নদীতে কে যাবে! ও নদীতে তো শহরের সব আবর্জনা ভাসে। আমরা যাব শিবপুকুরে। পরিষ্কার টলটলে জল। বাড়ির কাছেই।

শিবপুকুরের নাম শুনে আমার সাঁতার শেখার ইচ্ছেটা চাগিয়ে উঠল। বাড়ি থেকে তিন মিনিটের হাঁটাপথ। ঝকঝকে পুকুর। সারা বছরই জল থাকে। পুকুরের উত্তর দিকে ডালপাতা ছড়ানো জোড়া বট-অশ্বত্থগাছের তলায় একটা অনেক দিনের ভাঙাচোরা শিবমন্দির আছে। তার থেকেই বোধহয় শিবপুকুর নাম। বাড়ির কাছে বলেই পুকুরটাকে খুব ঘরোয়া মনে হত। ভয় পেতাম না। তা ছাড়া কাকা তো সঙ্গে থাকছেই।

আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে একটা হাফপ্যান্ট আর একটা গামছা নিয়ে এসে কাকাকে বললাম, চলো।

পুকুরের ঘাটে জলে নামার জন্যে বাঁধানো সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা নীচে নেমে গেলাম কাকার সঙ্গে। প্রথম প্রথম ভয় লাগছিল। পরে ভয় ভেঙে গেল। তো এই ভয় ভাঙাটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। অতি উৎসাহে বেশি জলে চলে গিয়েই বুঝতে পারলাম আমি ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি। চিৎকার করে কাকাকে ডাকব, তাও পারছি না। আগ্রাসী মৃত্যুর ভয়ে আমার শীতল শরীর থেমে আসছে। আমার চারপাশে তখন খলবল করছে কালো জল। হঠাৎ টের পেলাম একটা হাত এসে আমার ডান হাতের কবজি চেপে ধরেছে। বুঝতে পারলাম ওটা কাকার হাত। কাকা আমাকে ওপরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। সেই হাতের টানে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি ভেসে ওঠার জন্যে। কিন্তু অতি সামান্য সময় মাত্র। পরক্ষণেই কাকার হাত ছুটে গেল আমার হাত থেকে। এবার আমি নিশ্চিত তলিয়ে যাব। কিন্তু তা হল না, তখনই অন্য কারও হাত এসে সজোরে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরল।

তারপর কী হয়েছিল জানি না। কিছু বোঝার মতো চেতনাও আমার মধ্যে ছিল না। শুনেছিলাম পুকুরের জল খেয়ে আমার পেট নাকি জয়ঢাক হয়ে গিয়েছিল। আর আমাকে যে রক্ষা করেছিল তার নাম বিশু দাস। সেও সে সময় পুকুরঘাটে গিয়েছিল স্নান করতে। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুলের মুঠি ধরে তুলে এনেছিল। আর তুলে এনেছিল বলে অনিবার্য অন্তিম মুহূর্ত থেকে আমি ফিরে এসেছি।

একটু সুস্থ হবার পরে কাকাকে বলতে শুনেছিলাম, কী ভয়ংকর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছিল ভাবা যায় না। অনেক দিন পরে জলে নেমে আমি নিজেই ডুবে যাচ্ছিলাম। মুঠিটা ধরে রাখতে পারলাম না। ভাগ্যিস ওসময় বিশু ছিল!

পুকুরপাড়ে লোকজন ছুটে এসেছিল। ভিড় লেগে গিয়েছিল রীতিমতো। কার মুখে শুনে মা ছুটে এসেছিল আলুথালু।

অনেকদিন পরে জলে নামলে কি কেউ সাঁতার ভুলে যায়? কী জানি। কাকা খুব ভাল সাঁতার জানে বলে জানতাম। স্বাস্থ্যও পেটানো। বিশু দাস না থাকলে আমি কোন অতলে তলিয়ে যেতাম!

বিশু দাস গরিবগুরবো মানুষ। মা তাকে বাড়িতে ডেকে এনে হাতে একশো টাকা ধরিয়ে দিয়েছিল।

সেই ঘটনার পর আমার রোখ চেপে গিয়েছিল। স্থানীয় একটা ক্লাবের মেম্বার হয়ে এক মাসের মধ্যে সাঁতার শিখে গিয়েছিলাম। এখন আমি অনায়াসেই শিবপুকুরের এপার-ওপার করতে পারি ইচ্ছে হলেই।

এ-বছর জৈষ্ঠ্যের শেষে বাবা একদিন বাড়িতে এল ধুম জ্বর নিয়ে। বাবা এসেছিল দু'দিনের জন্যে, কিন্তু প্রায় দেড় মাস বাড়িতে থেকে যেতে হল। প্রথম প্রথম তীব্র জ্বরজারি থাকল। বাড়িতে ডাক্তার ডেকে দেখানো হল। ওষুধ-ইঞ্জেকশন চলল। রক্ত পরীক্ষা করানো হল। ওষুধ বদলানো হল। কিন্তু জ্বর কমার কোনওই লক্ষণ দেখা গেল না। কয়েকদিন পরে অসুখটা রীতিমতো চিন্তার হয়ে দাঁড়াল। ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, মনে হচ্ছে ভাইরাস ইনফেকশন। পেশেন্টকে এখনই হাসপাতালে শিফ্‌ট করতে হবে।

কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হল না বাবাকে হাসপাতালে পাঠাতে। বলল, যা চিকিৎসা হবে বাড়িতে হবে। যা টাকা লাগবে লাগুক।

কাকার ইচ্ছে ছিল বাবাকে হাসপাতালেই পাঠাতে। হাসপাতালে নানারকম আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, বাড়িতে সে সুযোগ পাওয়া যাবে না। কিন্তু মা'র আপত্তি দেখে কাকাও কোনও জোর করল না। যা হোক, বাবা চিকিৎসায় সাড়া দিল। কয়েকদিন পরে অসুখ কমে আসতে থাকল। এক মাস পরে বাবা রীতিমতো সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু তখনই বাবাকে কাজে পাঠাতে রাজি হল না মা। আরও পনেরো দিন ছুটি বাড়িয়ে নিতে হল বাবার।

বাবার অসুখের সময় মাকে দেখেছি নাওয়া-খাওয়া ভুলে বাবার শুশ্রূষা করতে, জলের মতো টাকা খরচ করতে। কাকাও কর্তব্যে কোনও ত্রুটি করেনি। উদ্বিগ্ন মুখে এ-ডাক্তার সে-ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করেছে, ওষুধ কিনে এনেছে। কাকার দলের ছেলেরাও সবসময় খোঁজখবর করেছে। আমাকে কোনও বড় কাজ করতেই হয়নি। সত্যি বলতে কী, মা আর কাকার আপ্রাণ চেষ্টায় বাবা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিল। অবশ্য কাকিমা যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল, এমনও নয়। মুখ বুজে বাবার জন্যে করেছে। পাড়াপ্রতিবেশী, পার্টির লোকজনও সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু মা যেন একাই একশো হাত হয়ে বাবার সেবা করেছে।

ঠিক এই জায়গাতেই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। ঘটনাগুলোকে কিছুতেই নিজের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছিলাম না। বাবার জন্যে মা'র এত উদ্বেগ, বাবাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে এত আকুলিবিকুলি, এও যেমন সত্য, নিশীথ রাতও তো তেমনই সত্য। অন্য সময় হলে বাবার জন্যে মা'র এই উৎকণ্ঠাকে লোকদেখানো বলতে পারতাম। কিন্তু মা'র মধ্যে সত্যি

কোনও অভিনয় ছিল না। কাকাও তাই। বাবার অসুখের সময় কাকাকে রামের ভাই লক্ষ্মণের মতোই মনে হয়েছে।

এ সবই ঠিক। অকপটও। কিন্তু চরিত্রগুলোর ফাঁকফোকরগুলো আমার জানা ছিল বলে আমি মোহিত হয়ে যাইনি। আমি শুধু কারণটা খুঁজছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেলাম। পাহারাওয়ালার চোরা লণ্ঠনের আলোয় আমি অপরাধীর মুখ দেখতে পেলাম। মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে তো আমি কবেই, যে-রাতে মাকে কাকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে প্রথম দেখেছিলাম, সেদিনই গলা টিপে মেরে ফেলেছিলাম।

আসলে মা কিংবা কাকার একটা তৈরি প্ল্যাটফর্মের দরকার ছিল। চোরচোর খেলার বুড়ি ছুঁয়ে নিজেকে অধরা রেখে দেবার মতো। বাবা হচ্ছে বুড়ি। বাবা হচ্ছে নিরাপদ আড়াল। বাবা থাকলে মা সুরক্ষিত। কাকা সুরক্ষিত। বাবা থাকলে সবকিছু প্রকাশ্যে চলে আসবে না। দোহাই দেবার মতো অবকাশ থাকবে।

সবকিছুর পরেও আমি মা'র সন্তান। কিন্তু কাকার তো নই। আমি বেশ বুঝতে পারি কাকা আমাকে পছন্দ করে না। সেই যে এক রাতে আমাকে ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, সেটাই আমাকে অপছন্দ করার সবচেয়ে বড় কারণ। তারপর একদিন আমাকে ডেঁপো বলেছিল তাচ্ছিল্যের গলায়। পলিটিক্স-করা ধুরন্ধর মানুষ, মুখে ঠিক উলটো ভাবটাই দেখায়। যেন আমার কত বড় হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক। আমি তো বেশ বুঝতে পারি সবটাই কাকার অভিনয়।

অবশ্য কে আমাকে কী ভাবল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি নির্দ্বিধায় কাকাকে ঘৃণা করি। মাকে ঘৃণা করি। বাবাকে ঘৃণা করি। আমার মনোভাব আপসহীন। বাবাকে ঘৃণা করি বাবার চোখ বুজে ভালমানুষ সেজে থাকার জন্যে। এবং সেটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বাবা শুধু টাকা চিনত বলে। নিষিদ্ধ নেশার মতো টাকার প্রতি বাবার অদম্য আকর্ষণ ছিল বলে। আর কাকাকে শুধু ঘৃণা নয়, একটা প্রতিহিংসা পোষা বেড়ালের মতো আমাব পায়ে পায়ে ফিরত। আমার কাকা পয়লা নম্বর ধাপ্পাবাজ। ধাপ্পাবাজিটা যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনই আমার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কাকার ভালমানুষির চালটা ভাল করেই জানতাম, কিন্তু মুখে কোনওদিনও সে-ভাব প্রকাশ করিনি। আমি বাড়িতে বেশি কথা বলতাম না। একরকম কথা বলতামই না। আমি একা একা ঘরের অন্ধকার কোণে বসে মনের সঙ্গে সাপলুডো খেলতাম।

দীর্ঘ অসুখ থেকে সেরে ওঠার পরে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে বাবা ফের কাজে যোগ দিল। তখন বাবার স্বাস্থ্য অনেক ভেঙে গেছে, কাহিল হয়ে পড়েছে ঢের। ট্রেনে ট্রেনে আর ছোটাছুটি করতে পারে না। হালকা কাজ নিয়ে থাকতে হত। নিউ জলপাইগুড়ির একটা ছোট রেল কোয়ার্টার বাবার নতুন ঠিকানা হল। দৌড়ঝাঁপ করতে পারত না বলে বাড়িতে আসত না, কোয়ার্টারেই থাকত। একজন সবসময়ের কাজের লোকও রাখা হল। সে রান্নাবান্না থেকে যাবতীয় কাজ করত। মাসে একবার বাবা বাড়িতে আসত। তাও কেবল এক দিনের জন্যে।

বাবার অসুখের পর মা'র একটা অদ্ভুত পরিবর্তন চোখে পড়ল। পরিবর্তন, না সাময়িক বিরতি, ঠিক বুঝতে পারলাম না। অপরাধবোধ কিংবা বিবেকবোধ যাই হোক না কেন, মা'র মধ্যে চপল ভাবটা অনেক কমে গেছে। হয়তো বাবার লম্বা অসুখটার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে শরীর ও মনের দিক থেকে অবসন্নতা এসে গেছে মা'র।

বর্ষা চলে যাবার সময় হঠাৎই ঘুরে দাঁড়াল। পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল শহরের ওপরে। কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! অবিরাম অঝোর ধারার আবছায়াতে আকাশ আর মাটি একাকার হয়ে গেল। মাঠঘাট, পথজনপদ, ঘরবাড়ি, গাছগাছালি ভিজে ঝুপঝুপে হয়ে রইল সারাদিন, সারারাত। রাস্তায় লোকজন গাড়িঘোড়া কমে গেল, দোকানবাজার জনশূন্য হয়ে রইল, স্কুলে কলেজে রেনি ডে-র ছুটি, অফিস আদালতে হাতেগোনা লোক। সর্বত্রই শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনও কথাই নেই কারও মুখে। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা, মেঘের আড়ালে সূর্যের অজ্ঞাতবাস। সকালেও অন্ধকার, দুপুরেও অন্ধকার, বিকেলেও অন্ধকার। সমস্ত শহর, শহর সংলগ্ন বসতি অঞ্চল তলিয়ে রইল জলের তলায়। প্রবীণরা বললেন, এমন অবিরাম বৃষ্টি তাঁরাও দেখেননি জীবৎকালে।

চার দিন পর বৃষ্টি থামল। আকাশের ঠাসবুনট মেঘ ভাঙল, চারদিকে রোদ্দুর ঝলমলিয়ে উঠল। উজ্জ্বল আকাশ, কিন্তু মেঘ ঘনাল মানুষের মুখে। খবর পাওয়া গেল পাহাড়ের চার দিনের লাগাতার বৃষ্টির জল বিপুল বিস্তারে নেমে আসছে সমতলে। তিস্তার জল ঢুকে পড়ছে শহরে। মিশছে শহুরে নদী করলায়। একেই তো চার দিনেব নিশ্ছিদ্র বৃষ্টিতে করলা টইটম্বুর, সেই জলে বিপুল বেগে ধেয়ে এল তিস্তার বাড়তি জল। সকাল থেকেই উঠোনে পায়ের পাতা ডোবানো জল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলল সেই জল। দুপুরে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। পাড়া জাগিয়ে আতঙ্কের আর্তনাদ শোনা গেল। ডুবে গেল! ভেসে গেল! বাঁচাও, বাঁচাও! জল তো নয়, যেন লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধ কালনাগিনী ছুটে এসে বিষাক্ত ছোবলে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে সামনে যা পাচ্ছে। টিনের চাল ভাসল, বাঁশের বেড়া ভাসল, গেরস্তের ঘর থেকে টেনে এনে ভাসিয়ে দিল টেবিলচেয়ার, বাক্সপেটরা, থালাবাসন। ভেসে গেল গোরুছাগল, কুকুরবেড়াল। মানুষের আর্ত চিৎকার আর জলপ্লাবনের মহারোষের শব্দ মিলেমিশে অবিরাম মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে চলল। রাক্ষসী বন্যার ক্ষুধার গ্রাস থেকে কারও নিস্তার নেই। ডোবাপুকুর, মাঠঘাট, ঘরবাড়ি ডুবিয়ে মানুষজন ভাসিয়ে পাগলপারা নদী ছুটে বেড়াল দশ দিক। ধ্বংস। মৃত্যু। সর্বনাশ।

আমাদের বাড়ির ঘবগুলোর মধ্যে ঘোলা জল ঢুকছে হু হু করে। দেখতে দেখতে খাটবিছানা ছুঁই ছুঁই। আরও ওপরে উঠবে। দরজার ওপরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে যাবে। ঘরে থাকা আর নিরাপদ নয়। পালাও, পালাও। প্রাণ বাঁচাতে হলে আরও ওপরে আশ্রয় নিতে হবে। সরু সিঁড়ি বেয়ে সবাই একতলার ছাতের ওপরে চলে গেলাম। সে এক অসহনীয় অবস্থা। ছোটরা ভয় পেয়ে কাঁদছে, বড়রা চিৎকার চেঁচামেচি করছে। বাবা আগের দিন বাড়িতে এসেছিল। আজ ফিরে যাবার কথা। আজ ফেরা তো হবেই না, কবে ফিরবে কোনও নিশ্চয়তা নেই। একই ছাতের ওপরে মা, বাবা, আমি, কাকিমা, বাবাই, তাতাই। পঞ্চানন আর হরিপদ জল ভেঙে আজ কাজে আসতেই পারেনি। একমাত্র কাকা এখনও ছাতে ওঠেনি। দামি জিনিস বাঁচাতে সব ঘরের দরজা বন্ধ করে শেকল তুলে দিয়ে তবে ওপরে উঠবে। কিন্তু প্রবল স্রোতের তোড়ে কি দরজা বন্ধ করা যায়? প্রাণপণ চেষ্টা করে কাকা যখন ঘরগুলোর দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে শেকল তুলে দিল, তখন জল উঠে গেছে ছয় ফুটি মানুষটার গলা পর্যন্ত।

আমরা ছাতে দম বন্ধ করে বসে কাকার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এবার ছাত থেকে বারান্দায় দেখা গেল কাকাকে। কাকিমা ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করে বলল, উঠে এসো, তুমি এখনই ছাতে উঠে এসো। জিনিসপত্র যায় যাক, ওসব চাই না আমার। তুমি প্রাণে বাঁচো আগে।

বাবাও গলা তুলে বলল, শান্তি, এবার ওপরে উঠে আয়। হু হু করে জল বাড়ছে। এরপরে মুশকিলে পড়ে যাবি।

কাকা হাত তুলে বলল, যাচ্ছি, যাচ্ছি। কাকা বুক সমান জলের মধ্যে টলোমলো পা ফেলে ছাতের সিঁড়ির দিকে এগোতে চাইল। পারছে না। গর্জন করে ঘোলা জল সেখানে খেপা মোষের মতো

ফুঁসছে। চারপাশ থেকে ভেসে আসা মানুষের আর্ত কলরব ছাপিয়ে শুধু প্রমত্ত প্লাবনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাকার বুক ছাড়িয়ে জল উঠছে। ছাতের ওপর থেকে বাবা চিৎকার করে ডাকছে কাকাকে। কাকিমা, বাবাই, তাতাই কাঁদছে। মা সর্বনাশের মুখ নিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

সিঁড়ির দিকে যেতে না পেরে সামান্য পিছিয়ে এসে কাকা কোনওমতে বারান্দার রেলিঙের ওপর উঠে দাঁড়াল। জল দাঁড়াল কাকার কোমর বরাবর। কাকা ছাতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি জোয়ান ছেলে, ছাতের একধারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আমাকেই ডান হাতটা বাড়িয়ে দিতে হল কাকার দিকে। কিন্তু কাকার বাড়ানো হাত আমার হাত পর্যন্ত পৌঁছোল না। এক-দেড় ফুট দূরে থেকে গেল। কাকা তার হাত যত দূর সম্ভব বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু দূরত্বটা একই থেকে যাচ্ছে। এদিকে বন্যার জল বেড়েই চলেছে। কাকার বুক ছুঁয়ে ফেলেছে প্রায়। কাকিমা পাগলের মতো করছে, বাবাই-তাতাই ডাক ছেড়ে কাঁদছে।

আমি হাত বাড়িয়ে আছি। হঠাৎই আমার মনে পড়ল একদিনের কথা। সেই যে প্রথম সাঁতার শেখার দিন ডুবে যাওয়া থেকে আমাকে বাঁচাতে কাকার বাড়ানো হাত হঠাৎ ছুটে যাওয়ার ঘটনা। আজ যদি তেমন কোনও ঘটনা ঘটে যায়?

আর ঠিক সে সময়ই বাবাকে বলতে শোনা গেল, পেয়ারাগাছ, পেয়ারাগাছ। সামনের পেয়ারাগাছের ডালে উঠে পড় শান্তি। ওই তো ডালটা। ধর, ধর—

বারান্দার রেলিঙের গা ঘেঁষে একটা পেয়ারাগাছ ছিল। গাছটার অর্ধেক জলের তলায় চলে গেলেও ওপরের দুটো ডাল জলের ওপর দুলছে। কাকা গাছটা দেখে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ডাল ধরে ফেলল। তারপর নীচের শক্ত ডালে পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। এবার কাকার বাড়ানো হাত অনেক কাছে চলে এসেছে। আমার বাড়ানো হাত থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে শুধু।

বাবা বলল, আর একটু, আর একটু, এই তো— আর একটু শান্তি—

আমি আমার শুয়ে-থাকা শরীরটা আরও একটু এগিয়ে নিয়ে এসে কাকার হাতটা ধরতে চাইলাম। প্রথমবার পারলাম না। দ্বিতীয়বার যখন প্রায় পেরে যাচ্ছি, তখনই মা হঠাৎই চলে এল আমার কাছে। বলল, না না, তুই না। তুই সর স্নেহ। কাকার হাত তোর বাবা ধরবে। তুই সরে যা।

বাবা ছুটে এল কাছে। বলল, কী বলছ তুমি? সরবে কেন, স্নেহই তো পারবে। জোয়ান ছেলে, লম্বা হাত—

মা অধীর গলায় বলল, আমি যা বলছি, দয়া করে তুমি তাই করো। ধরো ধরো, ঠাকুরপোর হাত ধরো।

বাবা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মা প্রায় টান মেরে বাবাকে ছাতে শুইয়ে দিয়ে বলল, হাত বাড়িয়ে নিজের ভাইয়ের জীবন বাঁচাও। এক মুহূর্ত দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে কিন্তু।

বাবা আর দ্বিরুক্তি না করে হাত বাড়িয়ে দিল কাকার হাতের দিকে। কাকাকে টেনে তুলল ছাতে।

মৃত্যুভয় থেকে মুক্তির আনন্দে উল্লাস করে উঠল কাকিমা, বাবাই-তাতাই।

আমি এক পাশে তখন সরে এসেছি। মা অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। আমি মা'র সেই ভাঙাচোরা ভঙ্গিটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

মা কাকে বাঁচাল?

দুর্ঘটনা থেকে কাকাকে? নাকি, প্রতিহিংসার লোভ থেকে আমাকে?

বোধহয় দু'জনকেই।

তিন্নির ডলপুতুল

তিন্নির চার বছরের জন্মদিনে ওর ছোটমামা ভারী সুন্দর একটা ডলপুতুল কিনে দিয়েছিলেন। বেশ বডসড় পুতুল। পাকা গমের মতো গায়ের রং, বড় বড় চোখ, ফুলো ফুলো গাল, হাসিহাসি মুখ আর গোল গোল হাত-পা। পুতুলটাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল তিন্নির। সেই যে তাকে নিয়ে মেতে উঠেছিল তো মেতেই রইল। মাস গেল, বছর গেল, তিন্নির খেলার সাথী আর বদলাল না। সে ডলটাকে সাজাত-গোছাত, মাথায় লাল রিবন পরিয়ে দিত, মুখে পাউডার মাখাত, ওর সঙ্গে কথা বলত বাগ করে শাসন কবত। যেন ডলটা কোনও নিষ্প্রাণ পুতুল নয়, রক্তমাংসের মানবী সঙ্গী। আবও অনেক সুন্দর সুন্দর খেলনা সে উপহার পেযেছে মা, বাবা, মাসি কিংবা মামার কাছ থেকে জন্মদিন কিংবা অন্য কোনও উপলক্ষে। কিন্তু সেগুলোকে সে নেহাতই খেলনা মনে করত। খেলনাগুলো ঘরের এক কোণে পড়ে থাকত। ডলপুতুলটা কিন্তু যে-জায়গায় ছিল সে-জায়গাতেই থেকে গেল। এখনও তিন্নিদের বাড়িতে গেলে শোওয়ার ঘরে ছোট্ট টেবিলের ওপর ডলটাকে দেখা যাবে। সমযেব ব্যবধানে বঙের উজ্জ্বলতা অনেক কমিয়ে দিযেছে। এখানে-ওখানে কালচে ছোপ পড়েছে। তবু পুতুলটা এখনও তিন্নিব সবচেযে প্রিয় জিনিস হয়ে আছে। যেমন তিন্নির মা কিংবা বাবা ঠিক তেমনি।

তিন্নিব বযেস এখন একুশ।

শিলিগুড়ির এক ইঞ্জিনিযার ছেলের সঙ্গে ওর বিযের কথাবার্তা হযে আছে। পাত্রপক্ষ কিছুদিন আগে তিন্নিকে দেখে পছন্দ কবে গেছে।

তিন্নিদের বাড়ির তিনটে বাড়ি পরে হলুদ রঙের দোতলা বাড়িটা আমাদের বাড়ি। আমাদের বাড়িব সঙ্গে তিন্নিদের বাড়ির খুব ভাল সম্পর্ক। আমাদের বাড়ির লোকজন যেমন তিন্নিদের বাড়িতে যায, তিন্নিদের বাড়ির লোকজনও তেমনি আমাদের বাড়িতে আসে। দু'টি পরিবারের মধ্যে বহুদিনের হৃদ্যতা। আমার বাবার সঙ্গে তিন্নির বাবা অসীমকাকুর অনেকদিনের বন্ধুত্ব। সেই স্কুল আব কলেজ জীবন থেকে। জলপাইগুড়ি শহরের উত্তরাংশে রাজবাড়ির কাছে যখন নতুন বসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল, তখন আবও কয়েকজনের সঙ্গে বাবা আর অসীমকাকু দু'জনেই সেখানে নতুন বাড়ি করে চলে এসেছিল। অসীমকাকু ব্যাঙ্কে আর বাবা জীবনবিমা অফিসে চাকরি করে। তিন্নি অসীমকাকুর একমাত্র মেয়ে। তিন্নির কোনও ভাইও নেই। একমাত্র মেয়ে বলে তিন্নি একটু বেশি আদরেই মানুষ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তিন্নির মাথা ঘুরে যায়নি। বেশি আদর কখনই বেশি আশকারা হয়ে যায়নি তিন্নির কাছে। সে খুব মিষ্টি স্বভাবের খোলামেলা মনের শান্ত মেয়ে। দেখতে সে ছোটবেলা থেকেই ভাল ছিল, এখন সেই ভালটা আরও ভাল হয়ে গেছে। ফরসা, সুঠাম, সুদর্শনা। এ-বছরই সে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। আরও পড়বে সে। খুব ভাল পাত্র পেয়ে গিয়ে অসীমকাকু মাসখানেক পর তার বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইলেও তিন্নির পড়াশোনা আটকাবে না। ছেলের বাবার সঙ্গে সেইরকমই কথাবার্তা হয়ে আছে অসীমকাকুর। তিন্নির শ্বশুরও নাকি খুব ভালমানুষ।

সেই ছোট্টবেলা থেকে তিন্নি আমার খুব ভাল বন্ধু। বলতে গেলে আমি আর তিন্নি একই সঙ্গে আলো-বাতাসে বড় হয়েছি। আমি তিন্নির চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিলাম। সেজন্যে আমি কখনও কখনও দাদাগিরি ফলাতে চাইলেও তিন্নি পাত্তা দিত না। আবার আমি একদিন তিন্নিদের বাড়িতে

না গেলেই তিন্নির মুখ ভার হয়ে যেত। পরের দিন আমাকে দেখেই চোখ পাকিয়ে বলত, এই যে মশাই, কাল আসা হয়নি যে বড়?

আমি মজা করে বলতাম, কাল এলে কী হত?

তিন্নি বলত, বা রে ডলি খুশি হত না! জানো কাল থেকে ও কিছুই খায়নি!

আমি বলতাম, তুমি তো তোমার ডলিকে নিয়েই থাকো, আমি আসব কেন?

তিন্নি সেই ডলপুতুলটাকে ডলি বলে ডাকত।

তিন্নি সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ওলটাত।

আসবে না আসবে না, আমার বয়েই গেছে।

এ সবই নিছক কথার কথা ছিল। অবুঝ বয়সের কোনও কথারই অন্তর্গত কোনও অর্থ থাকে না। আমাদের কথারও ছিল না। তারপর যখন আরও বড় হলাম, সেই কিশোর বয়সেও আমাদের সম্পর্কের মধ্যে বাল্যের সরলতাই থেকে গেল। তিন্নি তখনই যে চোখে পড়ার মতো দারুণ সুন্দর দেখতে হয়ে গেছে, রূপেগুণে একেবারে একশোয় একশো— সেসব কথা মা, বাবা, দিদি কিংবা অন্য কারুর মুখে শুনতাম। তা নিয়ে আমি মোটেই ভাবাভাবি করতাম না। তিন্নির মতো মেয়ে সুন্দর হবে, এ এমন নতুন কথা কী! আমি তিন্নির সঙ্গে যেমন মিশতাম, ওদের বাড়িতে যেমন যেতাম, সবই আগের মতোই থেকে গেল। আমার মনে কোনও নতুন ভাবনা এসে বাসা বাঁধল না।

এক কিশোরের সঙ্গে এক কিশোরীর অবাধ মেলামেশাকে দু'বাড়ির কেউ ভুরু কুঁচকে দেখতও না।

এমনি বয়েসে কোনও একদিন তিন্নি বলেছিল, কাল আসোনি কেন পার্থদা?

আবার সেই একই কথা।

কাল এলে কী হত?

তিন্নি রাগ দেখিয়ে বলেছিল, কী আবার হবে। কিছুই হত না।

আমি গম্ভীর গলা করে বলেছিলাম, কিছুই হত না বলেই তো আসিনি।

তিন্নি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে বলেছিল, বাব্বা, অমনি রাগ হয়ে গেল? বেশ আর বলব না।

আমিও হেসে বলেছিলাম, তোমার ডলির খবর কী?

তিন্নি চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ঠাট্টা করছ?

লঘু গলায় বললেও আমি কিন্তু সত্যিই ঠাট্টা করিনি। আমি জানতাম ডলপুতুলটা এখনও, এতদিন পরেও, তিন্নির সবচেয়ে আদরের জিনিস। হয়তো ছোটবেলার মতো সবসময় পুতুলটাকে নিয়ে এখন আর ব্যস্ত থাকে না, হয়তো শিশু বয়েসের পুতুল খেলার মতো ছেলেমানুষি এখন আর নেই, তবু পুতুলটাকে এখনও সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। খেলাটা এখনও আছে তবে খেলার ধরনটা বদলে গেছে। তিন্নি যদি লেখাপড়ায় ভাল না হত, আচার-ব্যবহারে একদম সঠিক না হত, যদি হাসিতে খুশিতে প্রাণময়তায় চতুর্দশীর চাঁদের মতো ঝলমল না করত, তা হলে তার এই ডলপুতুল নিয়ে থাকাটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হত, তাকে অপরিণত মনের মেয়ে বলে মনে হত। কিন্তু তিন্নি তাকে ভুল বোঝবার কোনও অবকাশই রাখেনি। তিন্নির মতো মেয়ে আর হয় না, পরিচিতজনের মুখে এ-কথা যে কতবার শুনেছি।

দিন, মাস, বছরের সঙ্গে বয়েসও এগিয়ে চলল। কৈশোর পার হয়ে যৌবনে চলে এলাম। জীবনের প্রেক্ষাপটই পালটে গেল। আমি ভালভাবে পাশটাশ করে জীবনকে মনের মতো তৈরি করতে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ঢুকে গেলাম। তিন্নিদের বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা কমে গেল। কালেভদ্রে যাই। কাকিমার সঙ্গে কথা বলি। তিন্নির ঘরে যাই। হাসি, কথা বলি। অসীমকাকু আমার ভালমন্দর খোঁজখবর নেন। কিছুক্ষণ থেকে চলে আসি।

মাঝখানে অনেকদিন যাওয়া হল না তিন্নিদের বাড়ি। ছোটকাকার কাছে গিয়ে দিল্লিতে কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু যে-কাজের জন্য গিয়েছিলাম সেটা মনঃপূত হল না। ফিরে এলাম।

ফিরে এসেই তিন্নিদের বাড়ি গেলাম।

তিন্নি বলল, এই যে মিস্টার, এতদিন আসা হয়নি কেন?

আমি ঠোঁট উলটে বললাম, এলে কী হত! কিছুই হত না। তাই তো আসিনি।

চোরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তিন্নি অদ্ভুত গলায বলল, তাই নাকি?

আমি বললাম, তাই তো। এলে কী এমন হত।

তিন্নি কিন্তু আগের মতোই ঝরঝরিয়ে উঠল না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অস্বচ্ছ গলায় বলল, জানো না এলে কী হত?

আমি কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। তখনই বুঝতে পারলাম শরীরের সঙ্গে আমাদের মনেরও বয়স বেড়ে গেছে। আমরা দু'জনেই এখন অবাধ্য বযসে চলে এসেছি। ছেলেবেলার মেলামেশা এখন সরলতার সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। এবার আর সকৌতুকে ওর ডলপুতুলের কথা জিজ্ঞাসা করতে পাবলাম না। আমি অবাক চোখে তিন্নিকে দেখলাম। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িযে আছে। তিন্নিকে দেখলাম কি? নাকি দেখলাম এক সুন্দরী যুবতীকে। কে জানে।

আমি একসময নিঃশব্দে তিন্নিদের বাড়ি থেকে চলে এলাম।

বাড়িতে এসে ভাবলাম কেন এমন হল। তিন্নির কাছে কেন এমন দুর্বল হয়ে পড়লাম। এমন করে তো কোনওদিন তিন্নিকে ভাবিনি। এক সহজ-সরল সম্পর্ককে কেন এমন জটিল করে তুললাম। ভাবতে ভাবতে রাগ হযে গেল তিন্নির ওপরই। সে কেন ও-কথা বলল। ও-কথা না বললে তো এমন করে আকাশ-পাতাল ভাবতে হত না। আমি সেই আগের আমিই থেকে যেতাম।

সাবাবাত আমাব ঘুম হল না।

মা একদিন বলল, এই, তোব কী হযেছে বল তো? খাস না দাস না, ভাল করে কথা বলিস না।

আমি বললাম, কিচ্ছু হযনি। এখানে আমাব ভাল লাগছে না। ভাবছি আবার দিল্লিতে ছোটকাকার কাছে চলে যাব।

মা আমার দিকে তাকিযে রইল। আমি জানি মা ঠিক বুঝতে পেরেছে আমি মোটেই ঠিক কথা বলছি না।

কিছুদিন পবে শিলিগুড়ি থেকে কয়েকজন এসে তিন্নিকে দেখে গেল। দু'দিন পরে মা বলল, জানিস তো পার্থ, তিন্নির বিযেব সব ঠিক হযে গেছে। এই সামনের সাতাশে আষাঢ়। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে। খুব ভাল পাত্র। হবে না কেন, তিন্নির মতো মেযে কি পড়ে থাকে।

বুঝলাম এই বিয়ের কথাবার্তার ব্যাপারটা তিন্নি আগেই জানত।

মা একসঙ্গে আরও অনেক কথা বলে গেল। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তিন্নিকে বাড়ির মেয়ের মতোই এ-বাড়িব সবাই মনে করে। তার ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়াটা দারুণ খুশির সংবাদ তো হতেই পারে মা'ব কাছে? তিন্নি আর আমার ছেলেবেলা থেকে খুব কাছাকাছি থাকাটা একটা মধুর সখ্যতা ছাড়া অন্য কিছু কেউ ভাবে না। তা ছাডা, আমাদের বংশগত অবস্থানের জন্য অন্য কিছু ভাবাব সুযোগও কম। তিন্নিরা চ্যাটার্জি, ব্রাহ্মণ। আমরা মিত্র, কাযস্থ। সবচেয়ে বড কথা এসব বাধা উপেক্ষা করার মতো কোনও পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়নি। এদিকে আমার নিজেকে তৈরি করাটা এখনও অনেক সময়ের ব্যাপার। আমার সামনে প্রতিষ্ঠার বিরাট জমি পড়ে আছে। পায়ের নীচের জমি এখনও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো শক্ত হয়নি।

এ সবই আমি জানি। খবরটা শুনে আনন্দে-উল্লাসে আমার লাফিয়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে মায়ের কথাটা আমার বুকের মধ্যে আষাঢ়ের মেঘের মতো গুমগুম করে বেজে উঠল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেলাম।

তিন্নির বিয়ের দিন দ্রুত এগিয়ে এল। বাধ্য মেয়ের মতো তিন্নি বিয়েটা সহজভাবেই মেনে নিল। মেয়েরা বড় হলে তার বিয়ে হয়, বিয়ে হলে সে শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়, এটাই তো নিয়ম। আমিও চুপচাপ হয়ে গেলাম। অন্য কিছু করার মতো সাহস কিংবা নাটকীয়তা আমাদের মধ্যে ছিল না।

কাজেই চমকে দেবার মতো কিছুই হল না। সমাজ সংস্কার বাধ্যবাধকতা সব নিজের জায়গায় চলে গেল। আমি শুধু মন খারাপ করে ভাবলাম তিন্নির জীবনে আমি আর থাকব না। তার প্রত্যেকদিনের কাজে-অকাজে আনন্দে-উচ্ছ্বাসে আমি শুধু অনেক দূরের এক হলুদ স্মৃতি হয়ে থাকব। আমাকে তেমন করে মনেই পড়বে না তিন্নির।

তিন্নির বিয়ের দু'দিন আগে আমি সারাদিন বাড়িতেই ছিলাম। শুয়ে-বসে খবরের কাগজ পড়ে সময় কাটাতে হচ্ছিল। তখনও ভাল করে সন্ধে হয়নি। বাইরেটা আবছা হয়েছে মাত্র। আমি ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। শুধু তাকিয়েই ছিলাম, দেখছিলাম না কিছুই। আমি তখন সময় কাল পার হয়ে চলে গিয়েছিলাম অনেক দূরে। কোনও এক মেঘলা দিনের নির্জন দুপুরে এক আদিগন্ত ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে আমি একা একা হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার চারপাশে কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু জনহীন শূন্য মাঠ।

তিন্নি কখন যে চুপ করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। হঠাৎ শুনলাম সে বলছে, বাইরের দিকে অমন করে কী দেখছ পার্থদা?

আমি ঘুরে তাকালাম। তখনও ঘরে আলো জ্বালানো হয়নি। ছায়াছায়া অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম আমার পাশে তিন্নি দাঁড়িয়ে আছে।— তুমি! এ-সময়?

দুর্বলভাবে হাসল তিন্নি।— চলে এলাম দেখতে তুমি কী করছ।

বললাম, কিন্তু তোমার না পরশুদিন বিয়ে?

তো কী হয়েছে? তিন্নি অধীরভাবে দু'পাশে মাথা নাড়ল। বিয়ের কোনও কথার মধ্যে থাকতে চায় না সে। মনে হল ভেতরে ভেতরে সে ছটফট করছে। হঠাৎই আমার একটা হাত ধরে ব্যাকুল গলায় বলল, তোমাকে একটা জিনিস দিতে চাই পার্থদা?

বললাম, কী জিনিস?

তিন্নির হাতে কাগজে মোড়া কিছু একটা ছিল। সেটা আমার দিকে তুলে বলল, এটা। এটা তোমার কাছে থাকুক।

কী এটা?

খুলেই দ্যাখো না।

আমি তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা হাতে নিয়ে খুলে ফেললাম। আর খুলে ফেলতেই দেখলাম ভেতরে রয়েছে তিন্নির আবাল্য ভালবাসার জিনিস সেই ডলপুতুলটা।

আমি ভয়ানক অবাক হয়ে তিন্নির দিকে তাকাতেই দেখলাম সে পাশে নেই। কখন চলে গেছে ঘরের বাইরে।

শিস

শিয়ালদা থেকে ছেড়ে সন্ধের দার্জিলিং মেল নিউজলপাইগুড়ি পৌঁছাবে পরের দিন সকাল আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে। স্টেশনে নেমে প্রথমেই খোঁজ করবে হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জারটা চলে গেছে কিনা। যদি না চলে গিয়ে থাকে, তবে সেই ট্রেনে গিয়ে সোজা জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে এসে নামবে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখবে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় যাবে বলে বাস, মিনিবাস এক-পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ঘুমটি দোকানগুলোর সামনে। তুমি যে-কোনও একটা বাসে উঠে পড়বে। সেখান থেকে সোজা দোমহনি মোড়ে এসে নামবে। আর যদি দার্জিলিং মেল লেট থাকে, লেটই থাকে সাধারণত, হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জারটা পাবে না। সেক্ষেত্রে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনের বাইরে এসে ডুয়ার্সগামী যে-কোনও বাস ধরে দোমহনি মোড়ে এসে নামবে। হ্যাঁ, সব বাসই দোমহনি মোড় হয়ে যাবে। শিলিগুড়ি, নিউজলপাইগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়ি শহর থেকে ডুয়ার্স যেতে হলে সব গাড়িকেই তিস্তা নদীর ব্রিজ পার হতে হয়। আর তিস্তা ব্রিজ পার হলেই ঢিল ছোড়া দূরত্বে দোমহনি মোড়।

তা হলে তুমি দোমহনি মোড়ে এসে গেলে। এবার তোমার গন্তব্য বিশালাক্ষ্মী মন্দির। মন্দির ওই নামেই। এককালে পুজোটুজো হত, এখন বাতিল, পড়ো মন্দির। বিগ্রহ টিগ্রহ কিছু নেই। বাস থেকে নেমেই তুমি দেখবে মোড়ের একপাশে গাছগাছালির নীচে সওয়ারির জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে রিকশা, ভ্যানরিকশাওয়ালা। তুমি যে-কোনও একজনের কাছে গিয়ে বলবে বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে যাব। আসলে তুমি তো মন্দিরে যাচ্ছ না, তুমি যাচ্ছ রায়বাড়ির নিশানাথ নন্দীর কাছে। রায়বাড়ি কিংবা নিশানাথ নন্দীকে রিকশাওয়ালা না-ও চিনতে পারে, কিন্তু ভাঙাচোরা হলেও বিশালাক্ষ্মী মন্দির সবাই চেনে। ওই মন্দিরের পাশেই রায়বংশের একদা জোতদারির দোতলা বাড়ি রায়বাড়ি। বাড়িটাও খুব জীর্ণ, ঝুরঝুরে, প্রায় ভূতুড়ে বাড়ির মতো। সন্ধের আবছা আলোয় হঠাৎ দেখলে বুক ছ্যাঁত করে উঠবে। মনে হবে কোনও কঙ্কালের চক্ষুকোটর যেন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তা তোমার তো আত্মগোপন করে থাকার জন্যে নদীর চরের ধারে জলজঙ্গলের মধ্যে নির্জন জায়গায় এরকম একটা বাড়িরই দরকার। বাড়িটার ময়লা চেহারা বরং তোমাকে খুশিই করবে।

টাইটেল শুনেই বুঝতে পারছ নিশানাথ নন্দী রায়বংশের কোনও উত্তরপুরুষ নন। কর্মচারী মাত্র। একসময় বাড়িটার দেখভাল করার জন্যে মাসোহারা দিয়ে তাকে রাখা হয়েছিল। এখন মাসোহারাও যায় না, রায়বংশের কেউ বাড়িটার খোঁজও রাখে না। বাড়িটা একরকম নিশানাথেরই থাকার জায়গা হয়ে গেছে। বয়েস পঁচাত্তরের আশেপাশে, শুকনো শরীর, একমাথা পাকা চুল, নিজেরও বাড়িটার মতোই ভগ্নদশা। মানুষজনের কাছ থেকে একটেরেতে সরে গেছে। তবে মানুষ খুব ভাল। কোনও ঝামেলা জটিলতার মধ্যে নেই। মেয়ে আর নাতনিকে নিয়ে থাকে। কী ভাবে তার চলে আমার জানা নেই। সম্ভবত বাড়ির সংলগ্ন জমিতে কিষান লাগিয়ে চাষবাস করে সংসার চালায়। মাঝে অবশ্য আমি একবার ওদিককার একজনের হাত দিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে ছিলাম। সেও তো অনেকদিন হয়ে গেল। জানি না এখন কেমন আছে। তবে আছে। মাঝে তার কাছ থেকে একটা পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম।

সে যাই হোক, তুমি রিকশা থেকে নেমে ও-বাড়ির কাছে গিয়ে নিশানাথ নন্দীর খোঁজ করবে। তাকে পেয়ে গেলে তবে তুমি রিকশা ছাড়বে। রিকশাওয়ালা অবাস্তব ভাড়া না চাইলে দরদস্তুর

করে নিজেকে জাহির করবে না। আর এখন তো শীত পড়ে ভালই। তুমি যতটা পারো নিজেকে ঢাকাঢুকা দিয়ে রাখবে। যাবার পথে কোনও লোকের সঙ্গেই গায়ে পড়ে আলাপ করবে না। মনে রাখবে, একটা মার্ডার কেসের ব্যাপারে পুলিশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তোমাকে ফাঁসাবে। তুমি যেহেতু বিরোধীপক্ষীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আছ আর পুলিশের কাছে তোমার রেকর্ড ভাল নয়, এবং সবচেয়ে বড় কথা, তুমি আমার কাছের লোক, আমাকে বিপাকে ফেলতে লেজ ধরে টানাটানি করবে। যেজন্যে আমার পক্ষে তোমাকে এখানে কোথায়ও শেলটার দেওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। কাজেই নিজের স্বার্থে, নিজের মাথা বাঁচাতেই তোমাকে পাবলিকের মধ্যে মিশে যেতে হবে। আশা করি নিজের ভালটা নিজেই বুঝবে।

হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম। ধরে নেওয়া যাক এবার তুমি দাঁড়িয়ে আছ নিশানাথ নন্দীর মুখোমুখি। পোড়ো বাড়ির মতো পোড়ো চেহারা দেখে তাকে চিনতে তোমার কোনওই অসুবিধে হবে না। তোমার প্রথম কাজ হবে বেশ বিনীতভাবে নন্দীমশাইকে একটা প্রণাম করা। জানি বয়স্কদের প্রণাম করাটা তোমাদের মতো ছেলেছোকরাদের খুব একটা আসেটাসে না। তবু প্রণাম করবে নিজের স্বার্থেই। যস্মিন দেশে যদাচার। তা ছাড়া দেশগাঁয়ের প্রবীণ মানুষেরা শ্রদ্ধাভক্তি পেতে ভালবাসেন। তাঁদের মন প্রসন্ন হয়। তা হলে ধরে নেওয়া যাক, ফার্স্ট রাউন্ডটা তুমি জিতে গেলে। এইবার তোমার পরবর্তী কাজ হবে পকেট থেকে আমার দেওয়া চিঠিটা বের করে নন্দীমশাইয়ের হাতে দেওয়া। চিঠিতে আমি লিখে দিয়েছি তুমি আমার খুব পরিচিত লোক, অসুখে ভুগে উঠে কয়েকদিনের বিশ্রাম নেবার জন্যে দোমহনি যাচ্ছ। রায়বাড়িতেই থাকবে। সঙ্গে কিছু টাকাও দিলাম নন্দীমশাইয়ের মাসোহারা হিসেবে। আর হ্যাঁ, এই তিনশো টাকা তুমি রাখো। প্লাস পারো তো নিজের থেকেও কিছু নন্দীমশাইয়ের হাতে দেবে। কোনও চিন্তা নেই। আমি রায়বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষ। টাকা ফিরিয়ে দেবার মতো অবাধ্যতা দেখাবে না নন্দীমশাই। তোমার খাতির যত্ন অবশ্যই করবে।

আবার বলছি একটু বিনীতভাবে থাকার চেষ্টা করবে। তোমার সামনে এখন সমূহ বিপদ। তোমার ব্যবহার যেন নন্দীমশাই আর তার মেয়ে নাতনির মন জয় করতে পারে। যাকে বলে ভোল পালটে থাকতে হবে তোমায়। নিরাপদে থাকার জন্যে সেটা তোমার একান্ত দরকার। আর হ্যাঁ, মোস্ট ইমপর্টেন্ট পয়েন্ট, আবার বলছি, চিঠিতে তোমার নাম ব্রজেন লিখিনি, লিখেছি অমল। টাইটেলও মিত্র নয়, সেন। ব্রজেন মিত্র নয়, তুমি হচ্ছ অমল সেন। নাম টাইটেলটা মুখস্থ করে রেখো। সহজ সরল নাম, মনে রাখার কোনও অসুবিধে নেই।

যাও। আবার বলছি, খুব সাবধান। নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। তুমি ব্রজেন মিত্র নও, অমল সেন। ও কে?

২

সন্ধের অন্ধকারে কে বা কারা বংশীর চায়ের দোকানে কুপিয়ে খুন করে গেল হাবুল দত্তকে। যে-রাস্তার ধারে বংশীর দোকান, সে-রাস্তায় তখন জনকোলাহল মুখর ব্যস্ত শহর চলমান। কিন্তু ঘটনার পরই রাস্তা নিঝুমপুরী। না, ঘটনাস্থলে কেউ ছিল না। কেউ কিছুই দ্যাখেনি, জানেও না কিছু।

হাবুল দত্ত এ-অঞ্চলের বামপন্থী যুব সংগঠনের হেভিওয়েট নেতা। সরকারি দলের আনুকূল্যে তার লম্বা হাত, শরীরের ছায়া বহুদূর বিস্তৃত। যেমন কিনা ব্রজেন মিত্র হল বিপক্ষীয় দলের যুব নেতা, প্রাক্তন বিধায়ক অবনী রায়ের ছায়াসঙ্গী শাগরেদ। দু'-একবার হাবুলের সঙ্গে ব্রজেনের টক্করও লেগেছে। সেসব অবশ্যি দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, খুনখারাপি কিছু হয়নি। এবার হাবুল দত্ত খুন হওয়াতে সন্দেহের তিরের মুখটা তাই ব্রজেনের দিকেই ঘুরে গেল। বিশেষ করে দিন

পনেরো আগে একটি ক্লাবের জমি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের পর ঘটনাটা ঘটছে বলে। ব্রজেন জানে ওপরতলার অঙ্গুলিহেলনে অবনী রায়ের কেশাগ্র স্পর্শ না করে তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে লক-আপে পুরে দেবে পুলিশ। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। পাবলিকের কাছে ব্রজেনের সঙ্গে অবনী রায়েরও পায়ের নীচের মাটি আলগা করে ইমেজ নষ্ট করে দেওয়া হবে। দোষী নির্দোষ কে জানতে চায়! কাজেই আত্মগোপন করে থাকাই এখন একমাত্র উপায়। যদিও এই খুনের বিন্দু-বিসর্গতে ব্রজেন নেই, তবু ঘটনার চরিত্র তার চারদিকে চারটে সন্দেহের কালো দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে গেছে।

খুনের দিন গভীর রাতে লোক মারফত নিজের বাড়িতে ব্রজেনকে ডাকিয়ে এনে অবনী রায়ই পরামর্শটা দিলেন। উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত প্রান্তে যেখানে অবনী রায়ের পূর্বতন পুরুষদের এককালে জোতদারি ছিল, সেই দোমহনিতে কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে ব্রজেনকে। কীভাবে যেতে হবে, কোথায় কী করতে হবে, সব বুঝিয়ে দিলেন। সঙ্গে নিশানাথকে একটা চিঠিও লিখে দিলেন নিজস্ব প্যাডে। কিছু টাকা মাসোহারাও পাঠালেন।

ভোরের আলো ফোটার আগেই ব্রজেন বাড়ি ছেড়ে কলকাতার অন্যত্র এক দলীয় কর্মীর বাড়িতে লুকিয়ে থেকে সন্ধের অন্ধকারে নিউজলপাইগুড়িগামী দার্জিলিং মেলে উঠে বসল। সময়টা শীতকাল। তাই চাদর আর মাফলারেব আড়ালে চলে গেল শরীরেব নব্বইভাগ অংশ। পরের দিন ঠিক সময়মতোই পৌঁছে গেল নিউজলপাইগুড়ি- জলপাইগুড়ি- দোমহনি- রায়বাড়ি। ঠিক যেমনটি বলেছিলেন অবনী বায। তাঁর মুখের কথাগুলোই যেন হাত ধরে ব্রজেনকে পৌঁছে দিল গন্তব্যে।

৩

চিঠি পড়েই নিশানাথের কপালের প্রশ্নের ভাঁজগুলো মসৃণ হয়ে গেল। বড়ই প্রীত দেখাল তাঁকে।

ছোটকর্তার চিঠি! বা বা, বেশ বেশ। অনেকদিন পরে স্মরণ করেছেন। টাকাও পাঠিয়েছেন দেখছি। বড়ই ভাললোক আমাদের ছোটকর্তা। আরে, কী কাণ্ড দেখুন। আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি না হোক। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন অমলবাবু। দিন, আপনার ব্যাগটা দিন তো আমার হাতে।

অমলবাবু! নামটা এক মুহূর্তেব জন্যে কানে বাজল, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যে ফিরে এল। ব্রজেন মিত্র নয়, এখন আপাদমস্তক সে অমল সেন। ভদ্র এবং সংযত যুবক। সবুজ প্রকৃতির মধ্যে কয়েকটা নিরিবিলি দিন কাটিয়ে দেবার জন্যে দোমহনির রায়বাড়ির অতিথি হয়েছে।

চলুন।

নিশানাথের পেছন পেছন ব্রজেন বাড়ির ভেতরে ঢুকল। জায়গাটা মফস্‌সল শহর দোমহনিও ঠিক নয়, হাটবাজার জনবসতি থেকে অনেক দূরে একপাশে তিস্তা নদীর বিস্তীর্ণ চর অঞ্চল, এক পাশ ধরে ডানদিকে গেলে জঙ্গলের গাছগাছালি, সেই গাছগাছালির ধারে বহুদিনের পুরনো দোতলা বাড়ি। চারধার সুনসান করছে। এককালে নাকি এই বাড়িটা ঘিরে ঘনবসতি ছিল, মানুষজন ছিল। তিস্তার রাক্ষুসে হাঁ এখন জমিজমা খেতিবসতি সবকিছু গ্রাস করে নিয়েছে। পড়ে আছে শুধু নিঃসঙ্গ বাড়িটা। বয়েসের থাবায় যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি ক্ষতবিক্ষত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। মাঝেমাঝে পলেস্তারা খসে ইটের মুখ বেরিয়ে আছে, কার্নিসে কার্নিসে গজিয়ে উঠেছে বট অশ্বত্থ আগাছা জঙ্গল, অধিকাংশ ঘরের দরজা জানলা নেই। সবই ভেঙে গেছে কিংবা অচিরেই ভেঙে পড়বে। দেয়ালের রং একসময় হয়তো সাদা ছিল, এখন সময়ের ধুলোবালিতে ধূসর হয়ে গেছে। মনে হয় সামান্য ভূমিকম্প হলেই বাড়িটা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ধুলোধুলো হয়ে যাবে। একটা কাঠের

নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিশানাথের পিছু পিছু ব্রজেন দোতলায় উঠে এল। দোতলায়ও একই অবস্থা। দিনের বেলাতেই অন্ধকার ছমছম করছে বাড়ির ভেতরে। টানা বারান্দার ডান দিকের শেষ ঘরটার সামনে নিশানাথ দাঁড়ালেন। এ-ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে শিকল তোলা। নিশানাথ দাঁড়িয়ে পড়ে সিঁড়ির দিকে তাকালেন।

সোনাই! ওপরে একটু আয় তো মা।

নীচের তলা থেকে নারীকণ্ঠের সাড়া এল, যাই গো দাদু।

শিকল নামিয়ে ঘরের দরজা খুললেন নিশানাথ। ভেতরে স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার। নিশানাথ ঘরে ঢুকে জানলা খুলে দিলেন।

আসুন।

ঘরে ঢুকে ব্রজেন দেখল ভেতরটা যতখানি খারাপ হবে ভেবেছিল, তা কিন্তু নয়। মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা তক্তাপোশের ওপর বিছানা গোটানো রয়েছে। বাঁ দিকে জানলার সামনে একটা টেবিল, টেবিলের সামনে কাঠের চেয়ার। দেয়ালে পুরনো ধরনের একটা আয়না ঝুলছে। ডানদিকে একটা আলনাও রয়েছে। ওপরে ওঠার সময় বাড়িটা ব্রজেন যদ্দুর দেখেছে, মনে হল বাড়ির সব ঘরের মধ্যে এই ঘরটাতেই থাকা যায়।

কে থাকে এ-ঘরে? ব্রজেন প্রশ্ন করল।

কেউ না। ছোটকর্তা আগে যখন আসতেন, তখন থাকতেন। তা ইদানীং উনি তো আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। মাঝেমধ্যে ওঁর চিঠি নিয়ে নিজের লোক কেউ কেউ আসেন বটে। তখন এ-ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। এই যেমন কিনা আজ আপনি এসেছেন অমলবাবু। অন্য সময় এ-ঘরটা বন্ধই থাকে। ওই অতিথি কক্ষ আর কী।

আপনি? আপনারা? জিজ্ঞেস করতে হয়, তাই যেন করা। নিজের স্বভাবটা যথাসম্ভব অমায়িক রাখার চেষ্টা করে ব্রজেন।

আমরা নীচে। মেয়ে আর নাতনিকে নিয়ে কোনওমতে মাথা গুঁজে আছি আর কী। সবই ছোটকর্তার দয়া। বুড়ো কর্তামশায় এককালে এ-বাড়িটা দেখশোনার জন্যে আমাকে রেখেছিলেন। তা তিনি গত হয়েছেন। ছোটকর্তা আছেন। একসময় নুন খেয়েছি। এখনও বাড়িটা দেখেশুনে রাখি এই আর কী। নইলে জবরদখল হতে কতক্ষণ।

নিশানাথ বুঝি কথা বলতে ভালবাসেন। তা গ্রামগঞ্জের সরল সিধে বয়স্ক মানুষেরা বুঝি এমনিই হয়। শহরের লোক পেলে মান্যিগন্যি করে একটু বেশি কথাই বলতে থাকে। ব্রজেন চুপ করে রইল।

কাঠের সিঁড়িতে দুদ্দাড় উঠে আসার শব্দ হল। একটু পরেই ষোলো সতেরো বছরের একটি মেয়েকে দ্রুত উঠে আসতে দ্যাখা গেল। এক দ্যাখাতেই ব্রজেনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এমন দপদপে রূপের মেয়ে খুব একটা দ্যাখেনি সে। বড় বড় ডাগর চোখ, ফরসা, আদুরে আদুরে গড়ন। একমাথা এলানো কালো চুলের মধ্যে টলটলে মুখটা যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। এমন বন্য সৌন্দর্য ব্রজেন আগে কখনও দ্যাখেনি। সে নিজের অবাক হওয়ার ভাবটা সামলে নিল। এখানে সে কলকাতার মাথাগরম করা জোয়ান ছেলে নয়। এখানে সে এসেছে ভদ্র শান্ত যুবকের পরিচয়ে। তা ছাড়া ডাকসাইটে নেতা অবনী রায়ের নিজের লোক নিশানাথ নন্দী। এমন কিছু করা সমীচীন হবে না যা কিনা অবনী রায়ের পছন্দ নয়। ব্রজেন ফের খোলসের মধ্যে ঢুকে গেল।

ব্রজেনকে দেখেই মেয়েটি থেমে গেল। যেন এমন পরিস্থিতির জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। একটু সময় স্থির চোখে ব্রজেনকে দেখেই সে চোখ ফিরিয়ে নিল নিশানাথের দিকে। একটা জিনিস কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল ব্রজেনের। মেয়েটির চোখদুটো কেমন যেন সন্দিগ্ধ সন্দিগ্ধ। ওর উচ্ছল শরীর সামান্য সময় হলেও ব্রজেনের চোখ অপলক করেছিল, তখনই মেয়েটির চোখের তারা চমকে উঠতে দেখেছিল সে।

নিশানাথ বললেন, এই দ্যাখো! লজ্জা পাস কেন সোনাই। এঁকে ছোটকর্তা পাঠিয়েছেন কলকাতা

থেকে। কয়েকদিন এ-বাড়িতে বিশ্রাম নেবেন। এক কাজ কর দিকিনি। যা, চট করে গিয়ে মাকে বল এক কাপ চা আর— ইয়ে, অমলবাবু, মুড়ি খাবেন তো? পেঁয়াজ নুন লঙ্কা দিয়ে মাখা গরম মুড়ি? এখানে তো চট করে অন্য কিছু—

ব্রজেন এখন লাগাম টেনে ধরা অমায়িক মানুষ। বলল, মুড়ি মাখা তো? খুব চলবে? দারুণ জিনিস।

সঙ্গে কচি শশা?

দারুণ!

নিশানাথ সোনাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, যা তো মা, মাকে গিয়ে বল—

সোনাই নিশানাথের কথা শেষ করতে দিল না। যেমন এসেছিল, তেমনি দ্রুত নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। যেন পালিয়ে বাঁচল।

তখনই ব্রজেনের শিস দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল। নিতান্তই অভ্যেসবশত। কিন্তু নিজেকে থামিয়ে দিতে হল।

দেখলেন তো সোনাইকে। আমার নাতনি। একটু সময় চুপ করে থেকে নিশানাথ বললেন, তা হলে এখন হাত মুখ ধুয়ে মুখে কিছু দিয়ে বিশ্রাম নিন অমলবাবু। অনেক দূর থেকে সেই কলকাতা থেকে এসেছেন। জার্নির ধকল অনেকখানি হয়েছে বই কী। রাধা— সোনাইয়ের মা— পরিষ্কার চাদর পেতে বিছানা করে দেবে'খন। এখন হাতমুখ ধুতে একটু নীচে নামতে হয়। পাতকোর জলে হাত মুখ ধুয়ে নেবেন।

ব্রজেন সুটকেসটা তক্তাপোশের ওপর রেখে ডালা খুলল। এখন প্যান্ট জামা খুলে পাজামা আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরবে। এখানে এই পাহাড়ের পাদদেশে, শীত কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি। পাঞ্জাবির ওপর একটা হাফ সোয়েটার পরে নিতে হবে। হাতঘড়িতে সময় দেখল। বেলা বারোটা বাজে। চা-টা খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে চান করে নিতে হবে। একটা কথা মনে এল। কলকাতা থেকে অনেক দূরে এখন সে। ওদিকে, কলকাতায় এখন কী হচ্ছে কে জানে। পুলিশ তাকে খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে কিনা ভগবান জানে। সে নিশানাথের দিকে তাকাল।

খবরের কাগজ কিছু রাখেন নাকি বাড়িতে? বাংলা দৈনিক?

নিশানাথ বললেন, সব দিন রাখা হয় না। ওই হাটের দিন দোমহনির বাজার থেকে কিনি। কাল তো হাটবার, একটা এনে দেব'খন।

হাত মুখ ধুয়ে ওপরে ওঠার পরে শশার কুচি দিয়ে মুড়ি আর চা দিয়ে গেল নিশানাথের মেয়ে রাধা। বছর চল্লিশের নরম চেহারার মহিলা। দেখেই বোঝা যায় এই মহিলাই হল সোনাইয়ের মা। দু'জনের চেহারার তফাত উনিশ-বিশ। তাও তফাতটা বয়েসের পার্থক্যের। সোনাইয়ের যখন এমনি বয়েস হবে, তখন সেও এমনটিই দেখতে হবে। সোনাইয়ের মতো অতটা না হলেও মা-ও বেশ সুন্দরী। তবে মেয়ের মতো শানানো নয়। শান্ত, স্নিগ্ধ। রাধা সধবা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু নিশানাথ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পুরুষ চোখে পড়েনি ব্রজেনের। কথাটা মনে হত না, যদি না মেয়েকে নিয়ে মা সুদীর্ঘকাল বাপের কাছে না থাকত। ব্রজেন ভাবল, একসময় নিশানাথের কাছ থেকে জেনে নেবে ব্যাপারটা।

নীচে নামার সময় ব্রজেনের একঝলক বাড়িটা দেখা হয়ে গেছে। বাড়িটাই বিরাট, কিন্তু উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন এমন অবস্থা হয়েছে দু'-তিনটে ঘর ছাড়া সব ঘরই বসবাসের অযোগ্য। নিশানাথকে দেখেই বোঝা যায়, যে তার এমন কিছু আর্থিক সঙ্গতি নেই যে টুটাফুটাগুলো মেরামত করে নেবে। আর অবনী রায় কিংবা আর কোনও শরিক যদি থেকে থাকে, তাদের কাছে নদীর ভাঙনের ধারে নির্জন জঙ্গলে বর্জিত জায়গায় এই ঝুরঝুরে বাড়িটা থাকল কি গেল, কোনও আসে যায় না। ভুতুড়ে বাড়ির মতো বাড়িটা পরিত্যক্তই হয়ে আছে। নীচের দু'টি ঘরের একটাতে নিশানাথ আর অন্যটাতে মা আর মেয়ে কোনওমতে থাকে। নিশানাথের ওই চলে যাচ্ছে আর কী।

মনে হয় বাড়ির সামনের কিছু জমি জন খাটিয়ে আবাদ করিয়ে আর হয়তো টুকটাক অন্য কিছু করে মেয়ে আর নাতনিকে নিয়ে দিনগুজরান করছে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় দিবানিদ্রার আগে এইসব নানান কথা এসে যাচ্ছিল ব্রজেনের এলোমেলো ভাবনার মধ্যে। চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে আলস্যের আয়েশে। নিশানাথের যেমনই অবস্থা হোক না কেন ব্রজেনকে যত্নের কোনও ত্রুটি রাখেননি। খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্তও রীতিমতো ভাল। সুগন্ধী সরু চালের ভাতের সঙ্গে ঘরে বানানা ঘি, তিন-চার পদের ব্যঞ্জন, টাটকা মাছ, সবই আছে। ব্রজেনের মৃদু আপত্তি নিশানাথের মেয়ে রাধা কানে তোলেনি। রাধার কথা ভাবতেই সোনাইয়ের কথা আবার মনে এসে গেল ব্রজেনের। কী আশ্চর্য, সকালবেলায় সেই প্রথম দেখার পর আর একটি বারের জন্যেও দেখতে পেল না তাকে। মেয়েটা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যেন। অথচ সে যে বাড়িতে আছে বিলক্ষণ টের পাওয়া যাচ্ছে। এই সুদূর মফস্‌সল অঞ্চল, তার এক পাশে নিঃসঙ্গ এই কবেকার দোতলা বাড়িটা যেমন রহস্যপুরীর মতো, এ-বাড়ির ওই মেয়েটিকেও তেমন রহস্যময়ী মনে হচ্ছে। তখন সোনাই কী দেখেছিল ব্রজেনের মধ্যে যে তার চোখের তারাদুটো ওভাবে চমকে উঠেছিল! অথচ সোনাই তো ব্রজেনকে এই প্রথম দেখল, ব্রজেনও এর আগে সোনাইকে কখনও দ্যাখেনি। তবে সোনাইকে ব্রজেনের চোখে থইথই যুবতী শরীরের নেশা ধরিয়ে দিয়েছে তা ব্রজেন বিলক্ষণ টের পাচ্ছিল। এখন এই নিঝুম দুপুরে যখন সমস্ত বাড়িটা এক অপার্থিব নৈঃশব্দের মধ্যে তলিয়ে আছে, দূরে কোথায়ও কোনও নিঃসঙ্গ ঘুঘুর একটানা ডাক ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই, নিশানাথ রাধা সোনাই কে কোথায় আছে টের পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বন্ধ ঘরের বিছানায় একা একে শুয়ে থাকতে থাকতে ব্রজেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে আরাম পাচ্ছিল, কতকগুলো অশ্লীল ইচ্ছে তার মনে থাবা খুলছিল। ইচ্ছে করছিল খুশির শিস দিতে দিতে উদোম হয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে। শালা নিকুচি করেছে ভদ্দরলোক সাজার। ইস, এ-সময় যদি গাঁইয়া মেয়েটাকে এ-ঘরে একলা পেয়ে মনের আশা মিটিয়ে নেওয়া যেত।

ভাবতে ভাবতে একসময় ব্রজেন ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল। আসলে ট্রেন-বাসের ধকল গেছে গত রাত থেকে। এক ফোঁটা ঘুমোতে পারেনি। এখন বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারছিল না।

৪

তখনও ঠিকঠিক সন্ধে হয়নি, বিকেলের আলো ময়লা হয়ে আসছিল শুধু, ব্রজেন ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের বিস্তৃত অবাধ ভূখণ্ডের দিকে তাকিয়ে ছিল। শীতশীত করছিল। সুটকেস খুলে চাদর বের করে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে সে। এ-বাড়ির ঠিক পশ্চিমমুখো পেছনে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে বিশাল চর অঞ্চল। ব্রজেনের ইতিমধ্যে নিশানাথের কাছ থেকে জানা হয়ে গেছে ওটা তিস্তা নদীর চর। নদী দেখা যাচ্ছে না, বহু দূরে নদীর একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে শুধু। এখন শীতের আরম্ভে নদী শান্ত, শীর্ণতোয়া। কোথায়ও কোনও জনমানব নেই, শব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, সুনসান করছে বিশাল চর। অবশ্য এই অলৌকিক প্রাকৃতিক দৃশ্য যে ব্রজেন মুগ্ধ হয়ে দেখছিল এমন নয়। সে ভাবছিল সোনাইয়ের কথা। কিছুক্ষণ আগে সে দিবানিদ্রা থেকে উঠেছে, তারপর চা খেয়েছে এক কাপ। ঘন দুধ মেশানো ভালই চা। এখানে এই সুদূর প্রান্তে এত ভাল চা আশা করেনি সে। অবশ্য চা এখন দেশের যে-কোনও জায়গায় সহজলভ্য। আর উত্তরবঙ্গের মাটি তো চা আবাদের মাটি। আবার এও হতে পারে সে আসার জন্যে দুপুরের কোনও সময় নিশানাথ জোগাড়যন্ত্র করে এনেছেন। ধূমায়িত চা নিয়ে এসেছিল নিশানাথের মেয়ে রাধা। ব্রজেন ঘুরে দেখেছিল রাধাকে।

চা? বারবার আপনাকে ওপরে উঠতে হচ্ছে। কাউকে তো পাঠিয়ে দিতেও পারতেন।

রাধা সামান্য হেসেছিল শুধু। চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে প্লেট দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে বলেছিল চা খান। শীতের সময় তো, তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে যাবে।

রাধা আবার নীচে নেমে গিয়েছিল। সোনাই কাছে আসছে না। অথচ ব্রজেনের ভিন্ন অনুভূতি বলে দিচ্ছিল সে আছে। আশেপাশে কোথায়ও আছে। কাছেকাছে, আড়ালে আবডালে লুকিয়ে থেকে অবাক কৌতূহলী চোখে ব্রজেনকে দেখছে। ব্রজেনের গা শিরশির করে উঠল। এমন আগুনপারা যুবতী এত কাছে থেকে আগে কখনও দ্যাখেনি। একটা চটুল গানের কলি শিস দিয়ে উঠল সে। মন উতলা হলে শিস দিতে ভালবাসে ব্রজেন।

ঘুম হল অমলবাবু?

নাম শুনে কপালে ভাঁজ পড়ল ব্রজেনের। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল নিশানাথকে। পরক্ষণেই মনে পড়ল এখানে সে ব্রজেন মিত্র নয়, অমল সেন। আসলে দুপুরের লম্বা ঘুম তার দু'নম্বরি পরিচিতিটাকে কিছুটা অস্পষ্ট করে দিয়েছিল। নিজেকে অমল সেনের মধ্যে এনে সে বলল, হল। ভালই হল। দুপুরের দিকে ঘুমানোর অভ্যেস আমার ঠিক নেই। কিন্তু আজ আর জেগে থাকতে পারলাম না। তা আপনাকে অনেকক্ষণ পরে দেখছি। ছিলেন না বাড়িতে?

না। ওই রোডসাইডের দিকে একটু গিসলাম। টুকটাক কিছু কেনার ছিল। আসলে হপ্তার বাজারটাজার হাটের দিনই করে নিই কেনা। আজ আপনি এসেছেন বলে— আসছে কাল হাটের দিন অমলবাবু। যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? শীতের হাট। খুব জমে ওঠে। নতুন সবজি, এটা সেটা —

যাব বলতে গিয়েও ব্রজেন থেমে গেল। এখানে সে এসেছে আত্মগোপন করতে। হুটহাট কোথায়ও চলে যাওয়া ঠিক হবে না। বিশেষ করে হাটঘাটের অনেক লোকের মধ্যে। কিছু হবে বলে মনে হয় না। পুলিশ তাকে খুঁজছে কিনা তাও জানে না। তবু সাবধানের মার নেই। বলল, ইচ্ছে তো খুব করছে। আসলে বড় অসুখ থেকে সেরে উঠলাম তো। শরীরে ঠিক জোর পাই না।

এবার নিশানাথ ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কথাই তো ছোটকর্তা চিঠিতে লিখেছেন বটে। না না, কোথায়ও যাবার দরকার নেই। বাড়িতেই বিশ্রাম নিন, তা চা-টা কিছু দিয়েছে তো আপনাকে? নাকি—

না না, দিয়েছে চা। ওই তো আপনার মেয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু ওই যে মেয়েটি, আপনার নাতনি, কী যেন নাম—

সোনাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সোনাই, সেই যে তখন দেখলাম, তারপরে তো আর দেখছি না। ও কি. মানে. বলছিলাম, ও কি—

নিশানাথ কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে থেকে জানলার বাইরে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন। ব্রজেনের মনে হল সোনাই সম্বন্ধে কোনও কারণে কিছু বলতে নিশানাথ স্বতঃস্ফূর্ত নন। এই অবস্থায় আর কিছু জিজ্ঞেস করাটা সৌজন্যের বাইরে চলে যাবে। নিশানাথ ভাবতে পারেন সোনাই সম্পর্কে বেশি কৌতূহল দেখাচ্ছে সে। প্রসঙ্গটা সঙ্গে সঙ্গে বদলে নিতে ব্রজেন বাইরেটা দেখতে দেখতে বলল, জায়গাটা দারুণ কিন্তু। হইচই নেই, নদীর বিরাট চর, ফাঁকা, নিরিবিলি। ভালই আছেন, কী বলেন?

ভাল আছি? সামান্য সময় চুপ করে থেকে নিশানাথ বললেন, বাইরে থেকে দেখলে যা মনে হয়, তা কিন্তু সবসময় সত্যি হয় না অমলবাবু।

মানে?

মানে, আমরা কেউই ভাল নেই অমলবাবু, একদম ভাল নেই।

বুঝলাম না। আপনার কেউই ভাল নেই মানে?

সে অনেক কথা অমলবাবু। বললে পরে মহাভারত হয়ে যাবে। ভাগ্য আমার মেয়ে রাধা আর

নাতনি সোনাইকে মেরে রেখেছে। আর ওরা ভাল না থাকলে আমিই বা ভাল থাকি কেমন করে! ওরাই তো আমার সব। নিশানাথের গলা ভারী বিষণ্ণ শোনাল।

ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে এসেছিল। ব্রজেন কিছুক্ষণ নিশানাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে-মুখ কোনও সুখী মানুষের মুখ নয়, একজন ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের হতাশ মুখ।

আপনার যদি আপত্তি না থাকে নিশানাথবাবু—

নিশানাথ ম্লান হাসলেন, আপত্তির কী আছে। কয়েক দিন তো থাকছেন, তখনই বুঝবেন সোনাই আর সব মেয়ের মতো স্বাভাবিক নয়। সে বাইরের মানুষের কাছে আসে না। ভয় পায়। আর রাধা, সোনাইয়ের মা— চলুন না একটু বাড়ির সামনেটায় ঘুরে আসি। আপনাকে সব বলব। আপনি ছোটকর্তার লোক। আমারও আপনজন। আপনাকে বলতে বাধা নেই। বড় দুঃখের কথা। তবু বললে পরে যদি বুকের ভারটা একটু হালকা হয়।

দরজার বাইরে লণ্ঠনের আলো এগিয়ে আসতে দেখা গেল। রাধা আলো নিয়ে এসেছে। লণ্ঠনটা ঘরে রেখে আবার সে চলে গেল।

ব্রজেন বলল, ঠিক আছে। চলুন। একটু ঘুরেই আসা যাক।

৫

নিশানাথ তাঁর একমাত্র মেয়ে রাধার বিয়ে দিয়েছিলেন পাশের গঞ্জশহর ময়নাগুড়ির বিশ্বনাথের সঙ্গে। স্বাস্থ্যবান, নম্র, ভাল স্বভাবের ছেলে। বাড়ির অবস্থাও ভাল, জমিজমা আছে। বিশ্বনাথের নিজেরও চালু মুদির দোকান আছে গঞ্জের বাজারে। দিব্যি সুখেশান্তিতে ছিল রাধা। বছর ঘুরতেই কোল আলো করে এল ফুটফুটে মেয়ে সোনাই। এদিকে বিশ্বনাথের আয়ও বাড়ল। ছোট দোকান আরও বড় হল। বাড়তি একজন কর্মচারীও রাখতে হল। মেয়ে বউকে নিয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়বাড়ন্ত হয়ে রইল বিশ্বনাথের সংসারে।

কিন্তু সুখের দিন দীর্ঘায়ু হল না। বেশি সুখ কারওই কপালে ছিল না। না বিশ্বনাথের, না রাধার, না সোনাইয়ের। চরম দুর্ঘটনাটা ঘটল সোনাইয়ের যখন চোদ্দো বছর বয়েস। বাড়ন্ত গড়ন, চোদ্দো বছরের মেয়েকে মনে হত আঠারো বছরের। যেমনি আগুনে রূপ, তেমনি সুঠাম শরীর, তেমনি প্রাণচঞ্চল। এক দেখায় চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যেত না।

বছর চারেক আগে ফাগুন মাসে তিন বন্ধুর সঙ্গে সোনাই গিয়েছিল জল্পেশের শিব চতুর্দশীর মেলায়। বিখ্যাত মেলা। প্রতি বছর শিবরাত্রিতে শুরু হয়ে দু'সপ্তাহের বেশি দিন দোকানপাট লোকজনে জমজমাট হয়ে থাকে। বাসেই গিয়েছিল। কী খেয়াল চাপল মাথায়, চার বন্ধু ঠিক করল হেঁটেই বাড়ি ফিরবে। খুব একটা দূরও নয়। ওই তো ময়নাগুড়ি থেকে মাত্র কয়েক মাইল। চার বন্ধু গল্প করতে করতে সন্ধের আগেই বাড়ি পৌঁছে যাবে, ভয়েরই বা কী আছে। চেনাজানা জায়গা।

তো নিয়তি কেন বাধ্যতে! হেঁটে ফেরার সিদ্ধান্তটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। পথটা যত ছোট ভেবেছিল, দেখা গেল তত ছোট নয়, দিনের আলো থাকতে থাকতে বাড়ি ফেরা হল না। ওরা যখন বাড়ি থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে, তখন চারপাশ ময়লা করে দিয়ে বিকেল ফুরিয়ে গেছে। চারপাশ নিঝুম, লোকজন বাড়িঘর নেই, আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চার বন্ধুর মুখের হাসি তখন বন্ধ হয়ে গেছে। পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল যত তাড়াতাড়ি পারে মাঠটা পেরিয়ে রাস্তায় ওঠার জন্যে। রাস্তায় বাসটাস কিছু একটা পেয়েও যেতে পারে। কিন্তু রাস্তায় ওঠা হল না। তার আগেই অন্ধকার ফুঁড়ে তিনটে মূর্তিমান বিভীষিকা ওদের পথ আগলে দাঁড়াল। বোঝা গেল পশু তিনটে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল শিকারের জন্যে। সামনে আসতেই তিনটে ক্ষুধার্ত শ্বাপদ ঝাঁপিয়ে পড়ল শরীর শিকারে। না, চারজনের ওপরে নয়। ওদের লক্ষ্য ছিল সোনাই। একজন

টর্চ জ্বেলে মুখগুলো দেখে বাকি তিনটে মেয়েকে ধমকে ভাগিয়ে দিল। মেয়ে তিনটে শরীর বাঁচাতে পাগলের মতো ছুটে পালাল রাস্তার দিকে।

বাকি থাকল সোনাই। একজন ওর মুখ চেপে ধরল। তারপর সবাই মিলে টেনে নিয়ে গেল মাঠের এক ধারে ঝোপের পেছনে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে সোনাইয়ের বাবা বিশ্বনাথ টর্চ লণ্ঠন আর লোকজন নিয়ে এসে যখন ঝোপের পেছন থেকে সোনাইকে উদ্ধার করল, তখন মানুষের জান্তব লালসা মিটিয়ে ধ্বস্ত রক্তাক্ত দেউলিয়া মেয়েটি মাঠের ঘাসের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল। জ্ঞান ছিল, কিন্তু ঘোলাটে আচ্ছন্ন অস্বচ্ছ সেই জ্ঞান। কয়েক মিনিটের আবিল ঝড় তার পৃথিবীকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। ওই তিনটে মেয়েই কোনওমতে ময়নাগুড়িতে পৌঁছে দুঃসংবাদটা দিয়েছিল। কারা এ-কাজ করেছিল, পরিচিত না বাইরের কেউ, জানা যায়নি।

ওই ঘটনার পরই হাসিখুশি চনমনে মেয়েটা তার সব স্বাভাবিকতা হারিয়ে অন্যরকম হয়ে গেল। বদলে গেল চোখমুখের ভাষা। বাইরের কাউকে দেখলেই ছুটে পালায়। সবসময় কী যেন খুঁজে বেড়ায়। সে-সময় তার মুখে ফুটে ওঠে তীব্র প্রতিহিংসা। ভাল করে খায় না দায় না ঘুমায় না। প্রাণবন্ত উজ্জ্বল মেয়েটা দপ করে নিভে গিয়ে আতঙ্কের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

কিন্তু সোনাইয়ের মা রাধার দুর্ভাগ্য তখনও শেষ হয়নি। ওর স্বামী বিশ্বনাথ উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেল আদবের মেয়ের ওই অবস্থা দেখে। কিছুকাল পরে একদিন কী একটা কাজে শিলিগুড়ি যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই যে গেল, আর ফিরে এল না। এল না তো এলই না। পুলিশে খবর দিয়ে, নিজেরাও অনেক খোঁজখবর করেও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। এক মাস যায়, দু'মাস যায়, বিশ্বনাথ আর ফিরে আসে না। জলজ্যান্ত মানুষটা দৃশ্যপট থেকে হঠাৎই যেন মুছে গেল। এরপর গ্রামগঞ্জে মফস্‌সলে যা হয়, সব দুর্ঘটনার দায়ভাগ এসে পড়ল রাধার ঘাড়ে। অলক্ষুনে অপয়া বউ বলে শ্বশুরবাড়িতে জুটল গঞ্জনা আর অবহেলা। ক্রমে এমন অবস্থা হল যে মেয়েকে নিয়ে বাপের কাছে দোমহনিতে চলে আসতে বাধ্য হল রাধা। ধর্ষিতা মেয়েকে পুনর্বাসন কেউ দিল না। না সমাজ, না রাষ্ট্র। উলটে কপালে জুটল নিন্দা আর কুৎসা। আক্রান্তই লোকের কাছে অপরাধী হয়ে গেল।

নিশানাথ তাঁর বলা শেষ করে ভারী গলায় বললেন, ওদের শুধু নয়, সবই আমারও গতজন্মের পাপের ফল অমলবাবু, নইলে এই বৃদ্ধ বয়সে এত কষ্ট সইতে হচ্ছে কেন। রাধার মা, আমাব স্ত্রী, ভাগ্যবতী মহিলা ছিল। এসব কিছুই তার দেখে যেতে হয়নি। তার আগেই দেহ রেখেছে।

কাউকে চেনা যায়নি? ব্রজেন আলগোছে প্রশ্ন করল। তখন সে যদিও মনে মনে অন্য কথা ভাবছিল। ভাবছিল সোনাইয়ের ভারভরন্ত ডাঁসালো শরীরের কথা। এমন শরীরই তো হাতছানি দিয়ে ডেকে আনে পুরুষকে। সেই ছেলে তিনটে ব্যতিক্রম হবে কেমন করে।

নিশানাথ ম্লান হেসে বললেন, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে অমলবাবু, ওদের চিনতে যাবে। গাঁয়ে গঞ্জে পঞ্চায়েতে এখন সাধারণ মানুষের প্রাণটা হাতের মুঠোয় ধরা থাকে। বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলে প্রাণটাই হাত ফসকে বেরিয়ে যাবে। আপনি এসব তো জানেনেই অমলবাবু।

আবার সেই অমলবাবু নামটা ব্রজেনের অনভ্যস্ত কানে বাজল। সে হাঁটা থামাল না। মুখ দিয়ে শুধু একটা ইতিবাচক শব্দ করল।

চারদিকে তখন রাত্রি আরও গড়িয়ে গেছে। থমথম করছে নিস্তব্ধ নির্জন অন্ধকার। ব্রজেনের কেন যেন মনে হল এতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকাটা তার ঠিক হচ্ছে না। কলকাতা থেকে এত দূরে কিছু হবে না হয়তো, তবু সাবধানে থাকতে ক্ষতিও তো নেই।

চলুন নিশানাথবাবু, বেশ রাত হয়েছে। এবার ফেরা যাক। গায়ে গরমজামা পরিনি, ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে।

নিশানাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, তাই তো, তাই তো। আপনি আবার অসুখ থেকে উঠেছেন। চলুন চলুন, পা চালিয়ে ফেরা যাক। কী কাণ্ড দেখুন, গল্পে গল্পে খেয়ালই ছিল না।

৬

পরের দিন দুপুরে ব্রজেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানান এলোমেলো ভাবনাকে এক জায়গায় জড়ো করতে চাইছিল। হাবুল দত্তের ওইভাবে খুন হয়ে যাবার কথা, নিজে ওই ঘটনায় কোনওভাবে জড়িত না থেকেও সরকার পক্ষের গুটি সাজানোর ছক থেকে বাঁচতে এইভাবে সুদূর উত্তরবঙ্গের এই জনহীন প্রান্তে পালিয়ে আসার কথা, নিশানাথের কথা, সোনাইয়ের কথা, মেলা ফেরত অন্ধকার মাঠে সোনাইয়ের ইজ্জত লুঠের কথা, টুকরো টুকরো মেঘের মতো ব্রজেনের মনের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সব ভাবনাকে একসময় শূন্য করে দিয়ে শুধু সোনাইয়ের কথাই সে ভাবছিল। কলকাতা থেকে অবনী রায়ের চিঠি নিয়ে আসা ভদ্র যুবক অমল সেন নয়, সে ভাবছিল অকৃত্রিম ব্রজেনের মতো করে। সোনাই তা হলে উচ্ছিষ্টা? তার সামনে ইজ্জতের কোনও লক্ষ্মণরেখা টানা নেই? ব্রজেনের ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠল। ওই পাগলপারা রূপের আগুনে নিজের শরীরকে তাপিয়ে নেবার ভারী ইচ্ছে করছিল তার। শিষ দিয়ে একটা চটুল সুর ভাসিয়ে দিল বাতাসে।

কী যেন একটা খসখস শব্দ হল না? মাথাটা পাশে ফেরাতেই ব্রজেনের মনে হল দরজার সামনে দিয়ে ছায়ার মতো কিছু একটা দ্রুত সরে গেল যেন। উঁহু, মনের ভুল কক্ষনও নয়। খোলা দরজার সামনে পরদা ঝুলছে। পরদার নীচের ফাঁকা জায়গা দিয়ে কারও চকিতে সরে যাওয়া পা দেখতে মোটেই ভুল হয়নি ব্রজেনের।

তাই যদি হয়, কে তবে চলে গেল ওখান দিয়ে?

নিশানাথ? তাই বা হয় কেমন করে। নিশানাথ তো হাটে গেছেন। যাবার সময় জানিয়ে গেছেন ব্রজেনকে।

নিশানাথের মেয়ে রাধা?

ধুস! বিশ্বাস হয় না রাধা এ-সময় ওপরে উঠে ঘরের দরজার সামনে দিয়ে ওভাবে চলে যাবে। এ-সময় তার দুপুরের ঘুমে নিজের ঘরের বিছানায় থাকার কথা। গতকালও তাই ছিল। আর রাধাকে যতটুকু দেখেছে ব্রজেন, তার কাছ থেকে এমনতর আচরণ আশা করাটাই বোকামি। তবে?

শুধু চলে যাওয়াই নয়, এবার ব্রজেনের সন্দেহ হল কেউ পরদা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েছিল। নিশ্চয়ই উঁকি দিয়েছিল। আর সেজন্যে পরদাটা এখনও যেন একটু একটু কাঁপছে। তাই যদি হয়, কে সে?

নিশানাথ আর রাধাকে বাদ দিলে একজনই তো থাকে এ-বাড়িতে। সে হল সোনাই।

ব্রজেন নিশ্চিত হল পরদার পেছন দিয়ে চলে যাওয়া মানুষটা অন্য কেউ নয়, সোনাই। কাল সেই প্রথম দেখার পর তার সোনাইকে আর দ্যাখেনি সে। তবে মনে হয়েছে কাছাকাছি কোথাও সে আছে। নিজেকে লুকিয়ে রেখে ব্রজেনের সবকিছু লক্ষ করছে। নিছক কৌতূহল? নাকি যুবতী বয়সের ধর্ম? নিশানাথ বলেছেন সোনাই ঠিক স্বাভাবিক মেয়ে নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক মেয়েরও তো একটা শরীর থাকে। সেই শরীরেও তো বান ডাকে। যেমন কিনা আগাছার ঝোপেও মরশুমি ফুল ফোটে। কোনও ভুল নেই মানুষটি সোনাই ছাড়া অন্য কেউ নয়।

ব্রজেন বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে এল। এবারও মনে হল কেউ যেন ওকে টের পেয়ে চকিতে সরে গেল। ব্রজেন তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে এল। কাউকে দেখল না অবশ্য। নিমেষে নেমে গেছে নীচে। ব্রজেন একশো ভাগ নিশ্চিত হল যে চলে গেল সে সোনাই। সোনাই ছাড়া এমন আচরণ অন্য কে-ই বা করবে।

ব্রজেন সিঁড়ির কাছ থেকে সরে এল। এখন সে কলকাতার ব্রজেন মিত্র, দোমহনিতে আগত অমল সেন নয়। লঘু চিত্তে শিস দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে জানান দিল।

নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল সে। আবার চলে এল দরজার কাছে। আবারও শিস দিয়ে উঠল। একটা চটুল হিন্দি গানের সুর। সেই সুর যেন জানিয়ে দিচ্ছে ঘরের দরজা খোলাই আছে, ইচ্ছে করলে যে-কেউ চলে আসতে পারে। বিছানায় গিয়ে আবার সে শুয়ে পড়ল।

শিস দেওয়া বন্ধ করল না। শুয়ে শুয়েই একটু সময় শিস দেওয়া চালু রাখল। চেষ্টা করল না ঘুমিয়ে পড়তে। কিন্তু বারবার চলে আসছে অবাধ্য ঘুম। আজও দুপুরের খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। মুরগির মাংসটা দারুণ হয়েছিল। নিশানাথের মেয়ের হাতের রান্নার সত্যিই জবাব নেই।

দু'চোখের পাতা ঘুমের আমেজে সবে জড়িয়ে এসেছে, হঠাৎই যেন একটা বিদ্যুৎ শিখা ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রজেনের ওপর। কিছু বোঝার আগেই কারও ধারালো হিংস্র দাঁত সবশক্তি দিয়ে কামড়ে ধরল ব্রজেনের গলা। অপ্রস্তুত ব্রজেনের আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টাই সফল হল না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল, কিন্তু কিছুতেই মরণকামড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারল না। অতর্কিত আততায়ী তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। হাত পা ছুড়ে সে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল, কিন্তু পারল না। ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ার আগে ব্রজেন বুঝতে পারল তার গলা কামড়ে ধরেছে এক নারী। ব্রজেনের হাতের মুঠোয় ধরা আছে তার দীর্ঘ চুলের মুঠি। কে এই নারী?

৭

রাধার ঘুম আসছিল না। এপাশ ওপাশ করতে করতে হঠাৎ একটা চিন্তা তার মাথায় এল। তাই তো, সোনাইকে তো অনেকক্ষণ ঘরে দেখছে না। তখনই ওপরতলা থেকে ভেসে আসা একটা অপরিচিত শব্দ তার কানে এল। কী মনে হতে সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। কান খাড়া করে শব্দটা শোনার চেষ্টা করল। মহা চিন্তিত দেখাল তাকে। আজ সকাল থেকেই সোনাইয়ের হাবভাব ভীষণ অন্যরকম লাগছিল। তবে কি সোনাই কিছু করছে।

রাধা আর অপেক্ষা করল না। প্রায় দৌড়ে দোতলায় উঠে এল। দরজা-খোলা ঘরের ভেতরে তাকাতেই চোখে পড়ল ভয়ংকর সেই দৃশ্য। ক্ষিপ্ত বাঘিনির মতো সোনাই কামড়ে ধরে আছে কলকাতার বাবুর টুঁটি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গলা। একজন অল্পবয়েসি মেয়ে কোথা থেকে এমন অমানুষিক শক্তি পেল কে জানে।

সঙ্গে সঙ্গে রাধা ঝাঁপিয়ে পড়ে জোর করে টেনে আনল সোনাইকে।

এ কী করেছিস হতভাগিনী? ইস, কী রক্ত, কী রক্ত! এ কাজ করলি কেন রাক্ষুসি? এখন কী হবে? লোকটার যদি কিছু হয়ে যায়! কেন, কেন এমন করলি—

ক্রুদ্ধ সোনাই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, শিস, ও শিস দিচ্ছিল।

শিস দিচ্ছিল বলেই— শিস দিচ্ছিল তো কী হয়েছে?

ওরা, ওরাও তো অমনি করে শিস দিচ্ছিল সেদিন—

ওরা? ওরা কারা? বল হতভাগী, ওরা কারা?

ওই যে পশুগুলো। শিবরাত্তিরের মেলার দিন মাঠের মধ্যে আমাকে যারা— আমাকে ছেড়ে দাও মা, আমি বদলা নেব, বদলা। শিস, সেই শিস—

উন্মাদিনী মেয়েকে আরও শক্ত করে চেপে ধরে রাধা। কিন্তু পারে না ধরে রাখতে। মায়ের বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ফের ছুটে গেল ব্রজেনের দিকে। হতচকিত জখমি ব্রজেন তখন গলায় হাত দিয়ে উঠে বসতে চাইছে। তার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াল সোনাই। টাটকা রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখে চোখ বন্ধ করল আতঙ্কে। দৃশ্যটা তাকে যেন এক রক্তাক্ত স্মৃতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিকৃত গলায় সে চিৎকার করে উঠল, রক্ত! রক্ত!

বলতে বলতে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে। যেন সেই শিস দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে আসছে তার পেছনে। কাঠের সিঁড়িতে শব্দের ঝড় তুলে নেমে যাচ্ছে সে।

নামতে নামতে ক্রমশ পরিপূর্ণ ধ্বংসের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে একক পরিত্যক্ত একটি মেয়ে, যার এই আলো বাতাসের পৃথিবীতে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল।

গল্প-পরিচিতি

গল্পের নাম। পত্রিকা। প্রকাশকাল—এই ক্রমে বিন্যস্ত

ক্ষতচিহ্ন। উত্তরদেশ। ১৯৭৯
এক্কা দোক্কা খেলা। দেশ। জুন, ১৯৮০
শববাহক। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আগস্ট ১৯৮০
এক গল্পের তিন দশক। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ১৯৮১
আহ্নিক গতি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ১৯৮১
নিজের ছবি। সুকন্যা। মে ১৯৮২
এই প্রবাস। দেশ। জুন ১৯৮৩
খেলনা। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। জুন ১৯৮৩
রক্তাক্ত সম্পর্ক। শারদীয়া আমাদের কথা ১৩৯০
লাল রঙের বল। বিনিদ্র। ১৯৮৫
ঈশ্বরের হাসি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। মার্চ ১৯৮৬
মাননীয় জনগণ। বর্তমান সাপ্তাহিকী। ২০ জুলাই ১৯৮৬
হিমঘর। কথাশিল্প। ১৯৮৭
নিলয় না' জানি। উত্তরদেশ। সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
নকল যুদ্ধ। প্রকৃতি। সেপ্টেম্বর ১৯৯২
অন্তর্ঘাত। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ২১ মার্চ ১৯৯৩
মৃত্যু সংবাদ। শ্যামলছায়া। এপ্রিল ১৯৯৩
সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ১২ মার্চ ১৯৯৫
সাদা দেয়াল কালো দাগ। দৈনিক বসুমতী। ১৩ আগস্ট ১৯৯৫
মনের ঘরে খুন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ আগস্ট ১৯৯৫
গোকুলবাবু ও জন্মান্তরবাদ। দৈনিক বসুমতী। ডিসেম্বর ১৯৯৫
শ্বাস প্রশ্বাস [পূর্ব নাম সন্ধির সর্ত]। শারদীয়া উত্তরস্বর। অক্টোবর ১৯৯৬
পিছু পিছু আসে সে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৬
ফসিল। দৈনিক বসুমতী। ডিসেম্বর ১৯৯৬
ভূপতি, এই ভূপতি। আন্তরিক। ১৯৯৬
একসঙ্গে। দৈনিক বসুমতী। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
পাঁচ নম্বর ভুল। দৈনিক বসুমতী। ২০ জুলাই ১৯৯৭
চোরা নদী। দৈনিক বসুমতী। ১২ এপ্রিল ১৯৯৮
কনকলতা। দৈনিক বসুমতী। ৩১ মে ১৯৯৮
রোমিও মজনু দেবদাস ও তারাপদ। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ২৩ ও ৩০ মে ১৯৯৯
পুনশ্চ। বৈতানিক। ৫ জানুয়ারি ২০০০

সবুজ রঙের শাড়ি। শারদীয় উত্তরস্বর ২০০০
সন্ধ্যার মেঘমালা। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ৫ আগস্ট ২০০১
ক্রান্তিকাল। দেশ। ৪ অক্টোবর ২০০১
মাটির নীচে শেকড়। লাল নক্ষত্র। অক্টোবর ২০০১
যে-ফোন সত্যি ছিল না। [পূর্ব নাম: যে ফোন আসার কথা ছিল না] উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এপ্রিল ২০০২
ভাল থাকা খারাপ থাকা। সাপ্তাহিক বর্তমান। ৮ জুন ২০০২
মাঝখানের দরজা। দৈনিক বসুমতী। ১৮ আগস্ট ২০০২। আগস্ট ২০০২
এষা। শারদীয় উত্তরমুখ। ১৩৯৯। ২ অক্টোবর ২০০২
বনমল্লিকা। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ৫ জানুয়ারি ২০০৩
মনের মধ্যে মন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ১৮ মে ২০০৩
অমৃতের পুত্র। সাপ্তাহিক বর্তমান। ৭ জুন ২০০৩
আবর্তন। দেশ। ১৮ আগস্ট ২০০৩
অপত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
নিশিগন্ধা। উত্তববঙ্গ সংবাদ। ২৭ জুন ২০০৪
মেঘবতী। দেশ। ১৭ জুলাই ২০০৪
ভাল মানুষ। নবজন্ম। অক্টোবর ২০০৪
অতল জল। দেশ। ২ ডিসেম্বর ২০০৪
তিন্নির ডলপুতুল। নবজন্ম। ডিসেম্বব ২০০৪
শিস [অপ্রকাশিত]। ২০০৫